পূজাবার্ষিকী ১৩৮৩
আনন্দমেলা

পূজোয়
চাই
নতুন
জুতো

লিলিপুট ৪২
সাইজ ৩-৮
টা. ১৪.৯৫

লিলিপুট ৫৬
সাইজ ৫-৮
টা. ১৬.৯৫
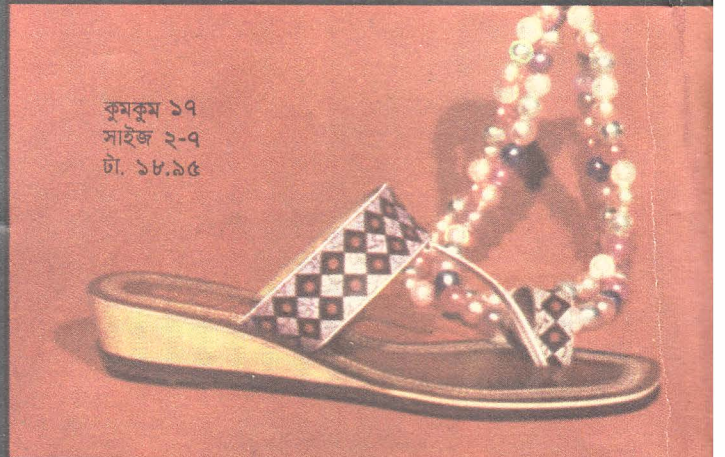
কুমকুম ১৭
সাইজ ২-৭
টা. ১৮.৯৫

কুমকুম ১৮
সাইজ ২-৭
টা. ১৮.৯৫
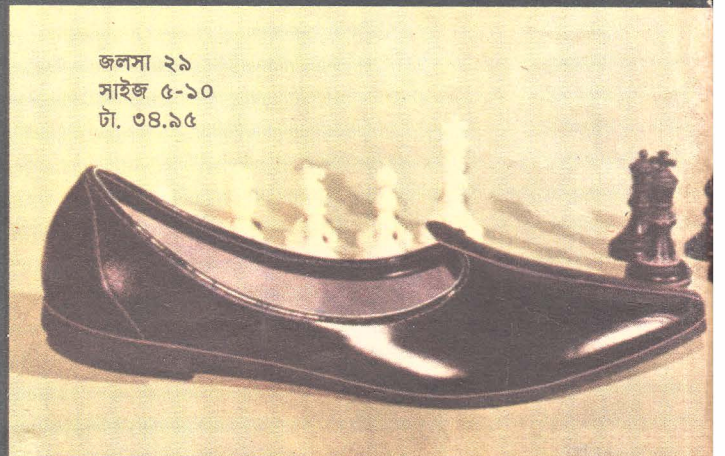
জলসা ২৯
সাইজ ৫-১০
টা. ৩৪.৯৫

ট্রাভেলারস ৫৯
সাইজ ৫-১০
টা. ২৪.৯৫

বাড়ীর
সবার জন্য
বাটার জুতো
Bata

উৎসবের বিশিষ্ট উপচার
কেয়ো-কার্পিন
কেশ তৈল
285 ml.
DELIGHTFULLY PERFUMED
A HAIR OIL OF DISTINCTION
FOOD & TONIC FOR HAIR
DEY'S MEDICAL STORES LTD.
CALCUTTA-16
Dey's
দে'জ মেডিকেলের তৈরী

জাতীয় নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে

টেলিভিস্টার

পপুলার

৫১ সে মি (২০") স্ক্রীন

টেলিভিস্টার সাফল্যের আরেকটি নজীর। আমরা এই চমৎকার নতুন সেটটি প্রস্তুত করতে পেরে গর্বিত। এতে আপনি টেলিভিস্টার মডেলের সব গুণই পাবেন পুরোমাত্রায়।

- আইসি সমেত খুব উঁচু মানের হাইব্রীড কারিগরি দক্ষতা
- সর্বোত্তম কার্যক্ষমতা
- নিখুঁত ছবি
- ত্রুটিহীন ধ্বনি
- ছিমছাম ল্যামিনেটেড ক্যাবিনেট

দেরী করবেন না—আজই আপনার সেট কিনে নিন

televista

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে

বিতরণ ও সার্ভিসিং করেন দেবসন্‌স্ প্রাইভেট লিমিটেড

টেলেরামা (ইণ্ডিয়া) লিঃ দ্বারা কলকাতায় প্রস্তুত

আপনার চুল
সুন্দর সতেজ রাখতে
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
৬০ বছরের ঐতিহ্য-সম্পন্ন আদি ও অকৃত্রিম
সুপ্রাচীন সূত্রের বহু পরীক্ষিত ল্যাক-টোনের সাথে প্রাকৃতিক চন্দন তেল মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এই কেশ তেল—অপরিসীম যত্নে ও সতর্কতায়। একমাত্র উদ্দেশ্য—আপনার চুল যাতে সুন্দর ও সতেজ হয়ে বাড়তে পারে।
অনবদ্য এই কেশ তেলের
প্রস্তুতকারক
বেঙ্গল কেমিক্যাল
BENGAL CHEMICAL
UNSCREW
CANTHARIDINE
HAIR OIL
A SUPERFINE HAIR TOILETRY
Exquisitely perfumed and golden coloured oil for preservation and growth of hair
BENGAL CHEMICAL
ভারতে
এই তেলের বিক্রয়
সর্বাধিক
ACIL/BC 5/76
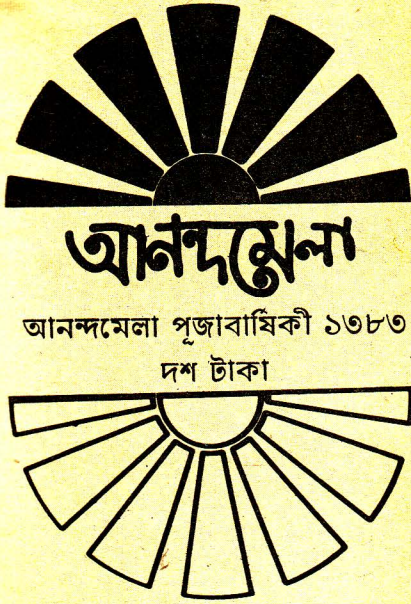
আনন্দমেলা

আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৮৩

দশ টাকা

বিশেষ রচনা

উপন্যাস

বড় গল্প

জঙ্গলের গল্প

কলকাতা-কাহিনী

গল্প

ছড়া

পরীক্ষার্থীদের জন্য

খেলাধুলো

রচনা-বিচিত্রা

প্রচ্ছদ

অলোক ধর

সম্পাদক

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড কলকাতা-৭০০০৫৪
থেকে মুদ্রিত
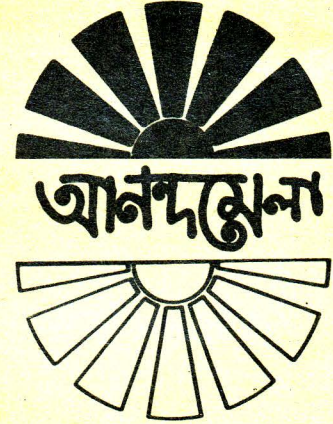
এই আমাদের প্রমান:
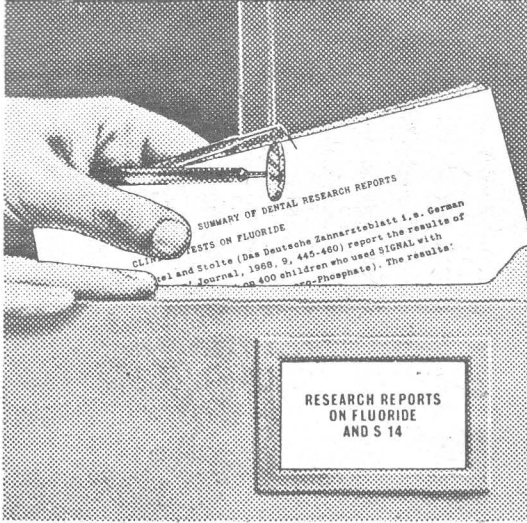
এই আপনার প্রমান:

একমাত্র সিগন্যাল ফ্লোরাইড প্রমান করেছে যে এটি দন্তক্ষয় ও মুখের দুর্গন্ধ রোধ করে

দাঁত পরিষ্কার করার অনন্য এক মূল উপাদানে।

সিগন্যাল-এর ফ্লোরাইড দন্তক্ষয় রোধ করে

জার্ম্মানীতে দন্তচিকিৎসক কিনকেল ও স্টোলটী ৪০০ শিশুর ওপর যে পরীক্ষা চালান তা'র ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয়েছে,—সিগন্যাল ফ্লোরাইড দন্তক্ষয় কমিয়ে ফেলেছে ৩৩%। ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেলের ওপর এক আবরণ সৃষ্টি করে আর তাতেই দাঁত এসিডের আক্রমণ রোধ করার অনেক বেশী ক্ষমতা লাভ করে। তাই যে-সব শিশুরা সিগন্যাল ব্যবহার করছে তারা যদি দাঁতের যন্ত্রণা কাকে বলে তা না জানে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। গোড়া থেকেই সিগন্যালের চিকিৎসায় আপনার বাড়ীর সবাইকে সুরক্ষা যোগান।

সিগন্যাল-এর এস-১৪ মুখে দুর্গন্ধ রোধ করে

ডাঃ হাওয়ার্ড ই, লিগু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ডাক্তারী-পরীক্ষা চালান তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে ব্যবহারের ১৫ মিনিটের মধ্যেই সিগন্যাল-এর এস-১৪ মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের ৯৫% মেরে ফেলে।

সিগন্যাল-এর দাঁত পরিষ্কার করার অনন্য মূল উপাদান স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে দাঁত পরিষ্কার ক'রে দেয়ঃ

সিগন্যাল-এর অনন্য মূল-উপাদান অ্যালুমিনা-ট্রাই-হাইড্রেট দাঁতের এনামেলের ক্ষতি না ক'রে এমন চমৎকারভাবে দাঁত পরিষ্কার করবে যা এক দাঁতের ডাক্তারের পক্ষেই সম্ভব।

একমাত্র সিগন্যাল আপনাকে যোগায় এমন বিশেষ মিশ্রণঃ দাঁত পরিষ্কার করার অনন্য এক মূল উপাদানের সঙ্গে ফ্লোরাইড এবং তা'র সঙ্গে এস-১৪। অন্য কোনো টুথপেস্ট এত সব যোগায় না।

একমাত্র সিগন্যাল ফ্লোরাইড আপনাদের কাছে প্রমান রাখছে- আপনার দাঁতের-ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন।

ফ্লোরাইডযুক্ত সিগন্যাল সম্পর্কে গ্যারেণ্টী দিচ্ছে হিন্দুস্থান লিভার

পেটেণ্ট নং ১১৪৭১৮

লিনটাস-SGF. 63-140 BG

সাঁতার

অন্নদাশঙ্কর রায়

ধন্যি তোমার বুকের পাটা
সন্ধে সকাল সাঁতার কাটা!
দাদা,
রাত্তিরে দেয় গায়ে কাঁটা।

ডুব-সাঁতারে চিৎ-সাঁতারে
তোমার সঙ্গে কেউ কি পারে?
চাচা,
আপনা বাঁচাই দিঘির ধারে।

স্রোত নেই যার সে তো ডোবা
কাপড় কাচে ঝণ্টু ধোবা।
সেথায়
সাঁতার কাটা পায় কি শোভা।

দূরে আছে বহতা নদী
দাদা চলেন সেই অবধি
সাথে
আমরাও যাই, ডোবেন যদি।

ডুব-সাঁতারে চিৎ-সাঁতারে
দাদা গেলেন চোখের আড়ে।
"দাআ-দাআ"
সাড়া না পাই সে-চিৎকারে।

বুদ্ধি খেলে যায় রে মাথায়
দেখতে হবে দাদা কোথায়।
হঠাৎ
উঠে বসি বিদেশী নায়।

দাদা ভাসেন আমরা ভাসি
কাছাকাছি যখন আসি
তখন
দাদার মুখে ফোটে হাসি।

দাদা বলেন, বাঁচালি ভাই
ভবনদীর কিনারা নাই।
ভাবি
পরলোকে হবে কি ঠাঁই!

মাঝিরা দেয় পৌঁছে ডাঙায়
দাদা তখন দু'চোখ রাঙায়।
হাঁ রে!
এরই জন্যে টাকা কে চায়।

ফিরে চল দিঘির টানে
দাদা বলেন কানে কানে।
বাব্বা
আমারও ধড় ফিরল প্রাণে।

ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী

অবনীন্দ্রনাথের ছবি ও ছড়া

আমাদের চোখে গাছের পাতা গাছের পাতাই। গাছের পাতাকে অন্য কিছু বলে কখনোই আমাদের মনে হয় না। কিন্তু একজন বিরাট শিল্পীর কাছে গাছের পাতা একটুও চেহারা না পাল্টিয়ে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস হয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গাছের পাতাকে নানাদিক থেকে এমনভাবে এঁকেছেন যে, পাতাগুলো পাখি হয়ে গেছে। পাখি হয়ে তারা বসে, দাঁড়ায় কিংবা সার বেঁধে আকাশে উড়ে যায়।

অবন ঠাকুর ছবি আঁকেন, ছবি লেখেন। আঁকায় এবং লেখায় যে-কোনো শক্ত জিনিসকে তিনি জলের মতো বুঝিয়ে দিতে পারতেন। তার হাজারটা প্রমাণের একটা প্রমাণ—এই পাতাগুলো কেমন সত্যিকারের পাখি হয়ে গেছে! পাতার সঙ্গে পাখির মিল আছে, এইটুকু বলেই তিনি থামেননি, এঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন। কাকে দেখিয়েছিলেন, জানো? তাঁর স্নেহের ছাত্র প্রশান্তকুমার রায়কে। তিনিও ছিলেন আর-এক শিল্পী। গুরুর আঁকা ছবি আর লেখাকে তিনি পরম মমতায় নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন আজীবন। যাই হোক, এবার থেকে গাছের পাতা দেখলেই অনেকের পাখির কথা মনে পড়ে যাবে, তাই না?

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

চক্ষু খুলিয়া বাছা নিরক্ষ
যেখানে পত্র সেখানে পক্ষ ॥
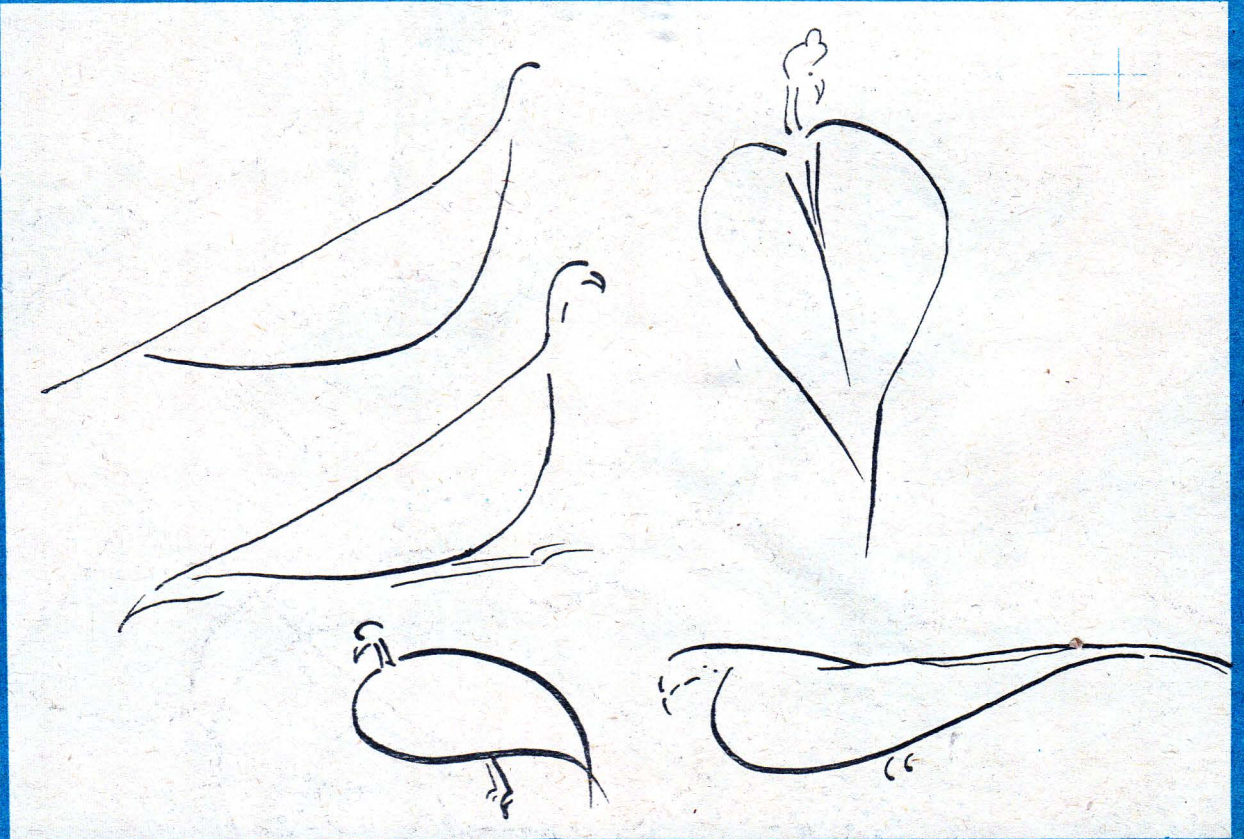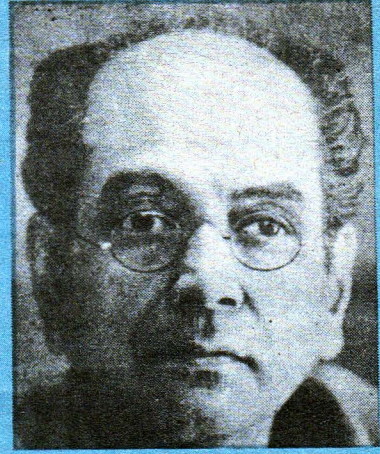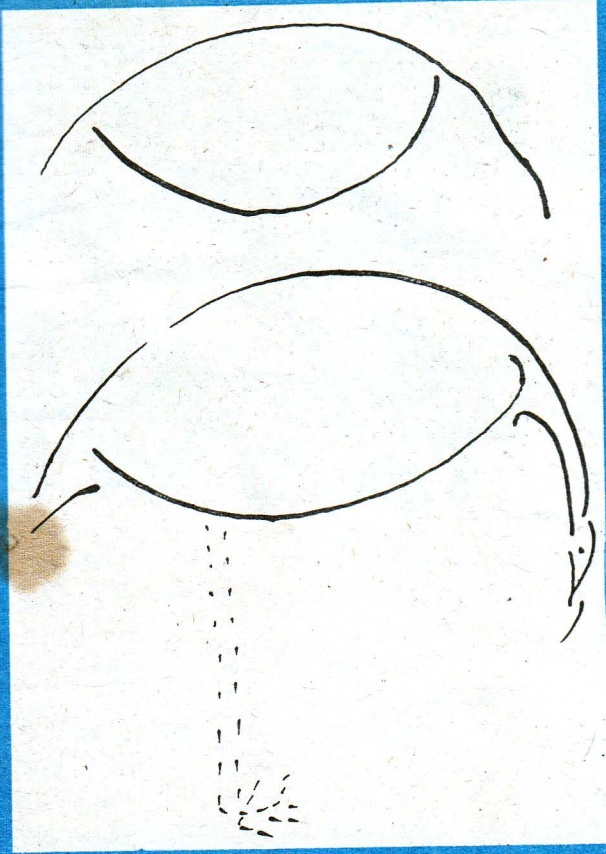
বসা পাখি খসা পাতা
ওড়া পাখি তোড়া বাঁধা ॥

সকল পাখির বসা ওড়া
পাতা ঘেরে আছে ধরা ॥
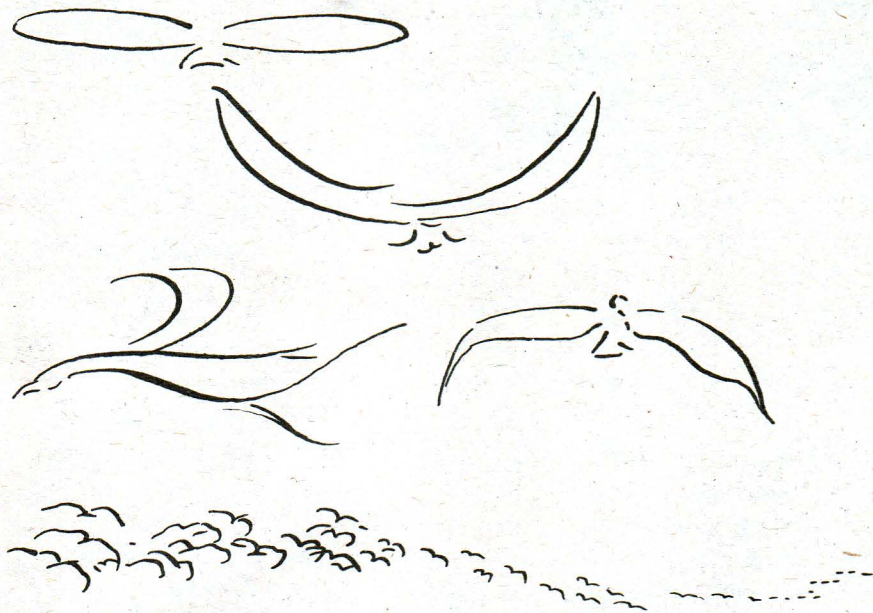
পরীর দেশে

খোকা ॥ প আর রয়ে দীর্ঘঈ পরী, প আর রয়ে দীর্ঘঈ পরী—নাঃ, পড়তে ভাল লাগছে না। (বই ফেলিয়া দিল) কী সুন্দর সমুদ্রের জল নাচছে। আর ঐ যে দূরে—অনেক দূরে জলের মাঝখানে কালো পাহাড়ের মত দেখা যাচ্ছে—ওটা নিশ্চয় দ্বীপ। আমি যদি ওখানে যেতে পারতুম, কেমন মজা হত। (দূরে সংগীত) ও কী। একটা মেয়ে গান গাইতে-গাইতে আসছে।

পরী ॥ (গান)

নীল সাগর ঘেরা রাঙা পরীর দেশ
সেথা নেইক দুঃখ ক্লেশ
উপকূলে হাসি খেলা
ঝিনুক নিয়ে সারা বেলা
সারানিশি ঘুমের মাঝে স্বপন-আবেশ।

খোকা ॥ তুমি কে?

পরী ॥ আমি পরী—আমার নাম আশা-পরী। তুমি আমাকে পরী পরী বলে ডাকছিলে, তাই এসেছি।

খোকা ॥ ও তো আমি পড়া মুখস্থ করছিলুম। তুমি কোথা থেকে এলে?

পরী ॥ ঐ পরীর দ্বীপ থেকে। ওখানে আমার মত আরও অনেক পরী আছে—হাসি-পরী, খেলা-পরী, তৃপ্তি-পরী। তুমি ওখানে যাবে?

খোকা ॥ যাব। কিন্তু কী করে যাব? আমার তো তোমার মত পাখা নেই।

পরী ॥ যদি তোমার সত্যিই যাবার ইচ্ছে থাকে, ভোমরা-বাহনকে ডাকো, সে এসে তোমাকে পিঠে করে নিয়ে যাবে।

খোকা ॥ ভোমরা-বাহন ভোমরা-বাহন, তুমি এসে আমাকে পিঠে করে পরীর দেশে নিয়ে যাও—কৈ আসছে না তো!

পরী ॥ ও রকম করে ডাকলে আসবে না। আচ্ছা আমি ডেকে দিচ্ছি—

আয়রে আয় ভোমরা-বাহন
কড়ি দেব তোকে সাত কাহন।
খেতে দেব চাঁপা ফুলের রস
তুই কি হবি আমার রথ?

(ভোঁ শব্দ)

ভোমরা ॥ কী চাও?

খোকা ॥ আমি পরীর দেশে যাব, তুমি নিয়ে যাবে?

ভোমরা ॥ যাব। কিন্তু একটা কথা আছে। আমার পিঠে চড়বার পর তুমি যদি পিছু ফিরে চাও তাহলে আমি তোমাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব—হাঙ্গরে কুমিরে তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

খোকা ॥ না—আমি পিছু ফিরে চাইব না।

পরী ॥ বাড়ির জন্যে তোমার মন কেমন করবে না?

খোকা ॥ নাঃ।

ভোমরা ॥ আর একটা কথা। পরী-রাজ্যের সিংদরজায় দুটো রাক্ষস পাহারা দেয়। তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তুমি পারবে?

খোকা ॥ খুব পারব! আমার একটা টিনের তলোয়ার আছে। তাই দিয়ে রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে ফেলব।

ভোমরা ॥ আচ্ছা, এস তাহলে আমার পিঠে।

খোকা ॥ এই যে। এবার চল—

(ভোঁ শব্দ)

পরী ॥ খোকা, ফিরে চাও—ফিরে চাও—

খোকা ॥ না, আমি ফিরে চাইব না। ফিরে চাইলে ফেলে দেবে।—ভোমরা-বাহন, আরও জোরে চল—

(জোরে ভোঁ শব্দ)

॥ ২ ॥

(ভোঁ শব্দ)

রাক্ষস ॥ (দূর হইতে) কে রে! কে ভোমরার পিঠে চড়ে এদিকে আসছে? মরবার ইচ্ছে হয়েছে!

ভোমরা ॥ খোকা, ঐ রাক্ষস উড়তে-উড়তে আসছে। নাও, এবার যুদ্ধ করো!

খোকা ॥ আচ্ছা, তুমিও ওর দিকে এগিয়ে চল ভোমরা-বাহন। রাক্ষসটা মস্ত বড়। (ভোঁ শব্দ) কী আশ্চর্য, যতই কাছে যাচ্ছি, রাক্ষসটা ততই ছোট হয়ে যাচ্ছে— এ যে একরত্তি রাক্ষস! কিন্তু কী বিচ্ছিরি চেহারা—দাঁড়াও ওকে এখুনি মেরে ফেলছি।

রাক্ষস ॥ তোকে চিবিয়ে খাব—চিবিয়ে খাব—

খোকা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—

(যুদ্ধের শব্দ)

খোকা ॥ ঐ দ্যাখো ভোমরা-বাহন, রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে ফেলেছি—ঐ সমুদ্রের জলে তার রক্তমাখা ধড়টা ডুবে গেল।

ভোমরা ॥ কিন্তু অন্য রাক্ষসটা যে আসছে।

খোকা ॥ কই?

ভোমরা ॥ ঐ যে একটা কালো মেঘ ছুটে আসছে—ওটা রাক্ষস। বৃষ্টির তীর দিয়ে তোমায় বিঁধবে, বিদ্যুতের বজ্র দিয়ে তোমাকে পুড়িয়ে দেবে। এখনো যদি চাও তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

খোকা ॥ না, কখ্খনো ফিরে যাব না। আমি মেঘ-রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

(যুদ্ধ)

ভোমরা-বাহন, হঠাৎ মেঘ-রাক্ষস কোথায় মিলিয়ে গেল।

ভোমরা ॥ তোমার সাহস দেখে সে পালিয়ে গেছে—আর আসবে না। ঐ সামনে পরী-রাজ্যের সোনার সিংদরজা।

খোকা ॥ চলো চলো, শীগ্গির চলো, আর দেরি কোরো না।—কী সুন্দর পরীরা নেচে নেচে গান করছে—

(পরীদের নৃত্যগীত)

এস নতুন মানুষ পরী-ভূমে
তোমায় আপন করে নেব চুমে চুমে।
নয়নে ফুটাব দীপ্তি
বুক ভরে দেব তৃপ্তি
তুমি খেলার সাথী হবে জাগর-ঘুমে।

খোকা ॥ তোমাদের নাম কী?

পরী ॥ আমার নাম হাসি-পরী। তুমি আমার সঙ্গে খেলা করবে?

খোকা ॥ হ্যাঁ।

পরী ॥ আমার নাম খেলা-পরী। তুমি আমার সঙ্গে খেলা করবে?

খোকা ॥ হ্যাঁ, কিন্তু আশা-পরী কই?

পরী ॥ এই যে আমি। খোকা আমায় চিনতে পারছ না?

খোকা ॥ তুমি কেন আশা-পরী হতে যাবে? আশা-পরীর তো অন্যরকম চেহারা।

পরী ॥ আমিই আশা-পরী সেজে তোমার কাছে গিয়েছিলুম—এখন আমি তৃপ্তি-পরী। তুমি রাক্ষসদের মেরে এ-রাজ্যের রাজা হয়েছে। আমরা তোমার প্রজা, সখী—খেলার সাথী। চলো, সমুদ্রের ধারে ঝিনুক প্রবাল আর মুক্তো নিয়ে খেলা করিগে।

খোকা ॥ চলো—

(পরীর-নৃত্যগীত)

এসো নতুন মানুষ

ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার

ক্রীড়াপ্রিয়

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামগতি গাঙ্গুলি খেলতেন ডাংগুলি
যখন বয়স ছিল সাত ;
পড়েছেন সত্তরে এখন নতুন ক'রে
খেলবেন—এ কী উৎপাত !
বন্ধুরা বলে এসে, পেনসন নিয়ে দেশে
এতদিনে ফিরে এলে রাম,
কী হবে ও ডাং খেলে ? করো না হাত-পা মেলে
বাকী কটা দিন বিশ্রাম।
চুলে যে ধরেছে পাক ! রামগতি কন "থাক,
দেরি আছে ঢের বুড়োবার।
ছেলেবেলা ছিল জানা মোর কসরত নানা,
কাজে চাই খাটাতে এবার।
ঘরে নাতিটার সাথে মারবেল খেলি রাতে
পাছে হাসো তোমরা সবাই।
যতদিন আছি বেঁচে এই ভাবে খেলে-নেচে
মজা করে চলে যাব ভাই।"
যে যা বলে সব বৃথা রাম আওড়ান গীতা
"দেহ গেলে মরে না মানুষ।"
মিলেছে খেলার সাথী গুটি কত রাতারাতি
ঘুগনি লজেন্স দিয়ে ঘুষ।
চোখেতে পড়েছে ছানি, কোথা যায় নাহি জানি
বেপরোয়া লাঠি হাঁকড়ান।
কেউ যদি হেসে ওঠে ভ্রূক্ষেপ নেই মোটে,
"চোপ" বলে কান পাকড়ান।
প্রতিদিন ডানে বাঁয়ে কারো হাতে কারো পায়ে
লাগে তাঁর 'ডাং'টার চোট।
তাই তুলো-আইডিন সাথে লন প্রতিদিন
বিস্কুট, কেক, আখরোট।
কিছু গেলে ছড়ে কেটে চীনেবাদামেতে মেটে ;
বেশী যবে লাগে দৈবাৎ—
ওষুধে ও ডাক্তারে করে দেয় ফাঁক তাঁরে ;
হেসে কন, "নেহি কোই বাৎ।"
একদিন অবশেষে ভবেশের লাঠি এসে
সোজা তাঁর লাগল মাথায়।
রামগতি চিৎপাত ভূতলে অকস্মাৎ
রক্তের ধারা বয়ে যায়।
'স্টীচ্' দিয়ে গোটাকত ডাক্তার আপাতত
গেলেন সামাল দিয়ে। ভাই
বাঁধানো দু'পাটি দাঁত খুলে নিয়ে বারাসাত
গেল চলে। ঘর থেকে তাই
বেরোনো চলে না আর ; শুয়ে বসে খাটে তাঁর
রামগতি এবে হরদম
হাসিয়া ফোকলা দাঁতে নাতি-নাতনীর সাথে
খেলছেন লুডো ও ক্যারম।

অদ্ভুত ম্যাজিক

অজিত দত্ত

মুখেই যারা ফোটাচ্ছে খই
সদাই বস্তা বস্তা,
কেন তারা বিলোয় না তা
ওজন দরে শস্তা ?

কেউ কি পারে কথার প্যাঁচে
ভিজিয়ে দিতে চিঁড়ে ?
তবে তো বেশ আহার জমে
আমেতে আর ক্ষীরে।

অন্য লোকের মাথায় কাঁঠাল
ভাঙা তো হয় ঢের,
সে সব কাঁঠাল কারা যে খায়
পাই না তো তা টের।

কেউ বা আবার ঘোল খাইয়ে
দিচ্ছে ওকে একে,
সে ঘোলগুলি মিষ্টি না টক
কে দেখেছে চেখে ?

আমি বাপু এসব ম্যাজিক
কিছুই জানি নে কো,
তোমরা সবাই মিলে কিন্তু,
আমার দলেই থেকো।

ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার

প্রোফেসর শঙ্কুর
অ্যাডভেঞ্চার
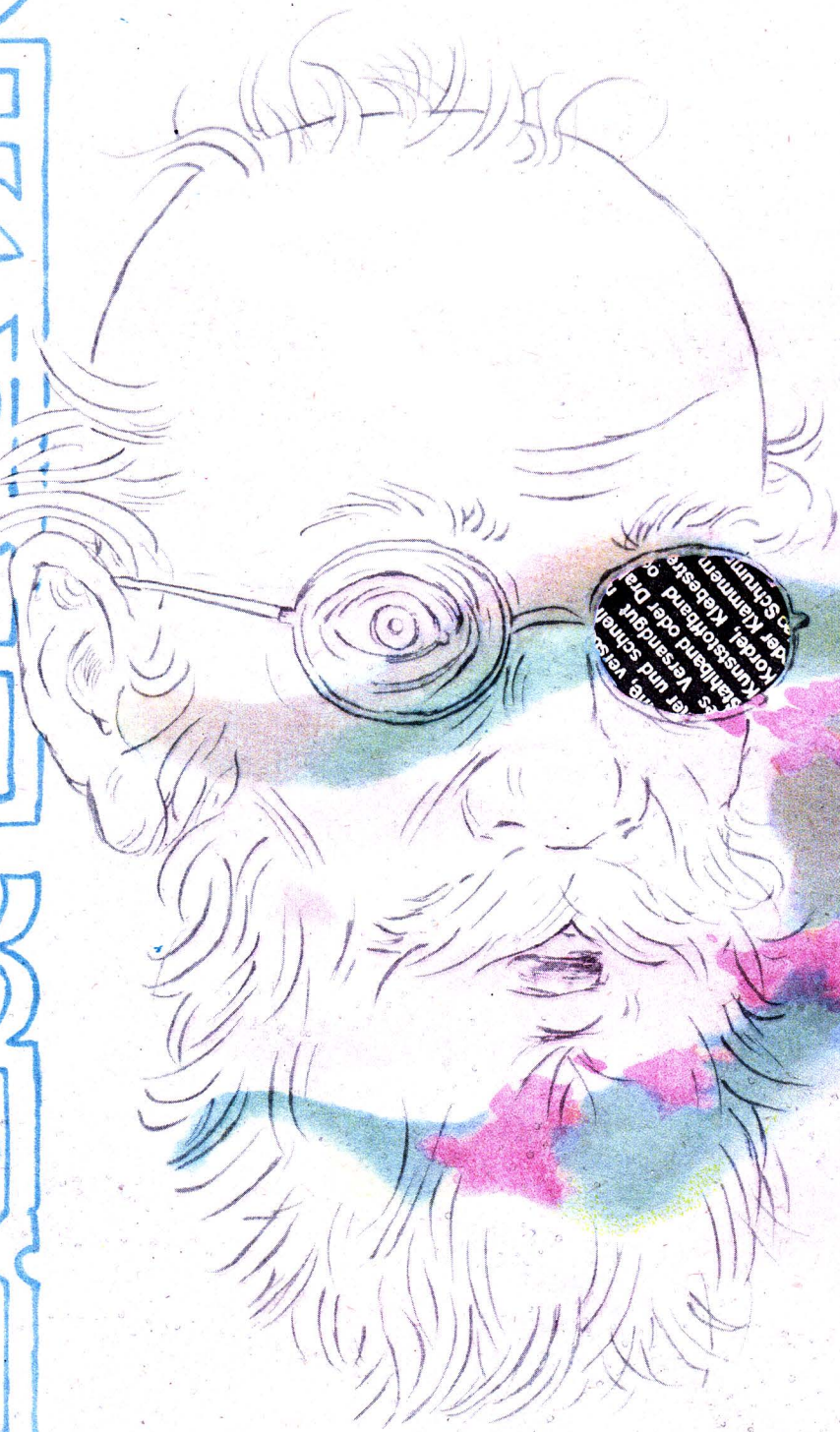
সত্যজিৎ রায়

৭ই জুন

আমাকে দেশ বিদেশে অনেকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করেছে আমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করি কিনা। প্রতিবারই আমি প্রশ্নটার একই উত্তর দিয়েছি—আমি এখনো এমন কোনো জ্যোতিষীর সাক্ষাত পাইনি যাঁর কথায় বা কাজে আমার জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মাবে। কিন্তু আজ থেকে তিন মাস আগে অবিনাশবাবু যে জ্যোতিষীকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসেন, আজ আমি বলতে পারি যে তাঁর গণনা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।

অবিশ্যি এটাও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে গণনা না-ফললেই বেশি খুশি হতাম। তিনি বলেছিলেন, 'আজ থেকে তিন মাস পরে তোমার চরম সংকটের দিন আসছে। শনির দৃষ্টি

পড়বে তোমার উপর। এমনই অবস্থায় পড়বে যে মনে হবে এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো।' এ অবস্থা থেকে মুক্তি হবে কিনা জিগ্যেস করাতে বললেন, 'যে তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু, তাকে সংহার করতে পারলে তবেই মুক্তি।' আমি স্বভাবতই জিগ্যেস করলাম এ-শত্রুটি কে। তাতে তিনি ভারি রহস্যজনকভাবে একটু হেসে বললেন, 'তুমি নিজে।'

এই রহস্যের কিনারা এখনো হয়নি, কিন্তু সংকট যেটা এসেছে তার চেয়ে মৃত্যু যে ভালো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সংকটের সূত্রপাত আজই পাওয়া একটি চিঠিতে। দুমাস আগে আমি ম্যাড্রিড থেকে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ পাই। এই চিঠিতে সম্মেলনের উদ্যোক্তা বিশ্ববিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডি-সান্টস লিখেছিলেন, 'আমরা সকলেই বিশেষ করে তোমাকে চাই। তুমি না-এলে আমাদের সম্মেলন যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করবে না। আশা করি তুমি আমাদের হতাশ করবে না।' এ-চিঠি পাবার তিনদিন পরে আমার বন্ধু জন সামারভিল ইংল্যান্ড থেকে আমাকে লেখে ম্যাড্রিড যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে। ডি-সান্টসকে হতাশ করার কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না। বছরে অন্তত একবার করে বিদেশে গিয়ে নানান দেশের নানান বয়সের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে আমার নিজের চিন্তাকে সঞ্জীবিত করা—এটা আমার একটা অভ্যাসের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এর ফলেই বয়স সত্ত্বেও আমার দেহমন এখনো সজীব।

ম্যাড্রিডের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে চিঠি লিখি, তারও জবাব আমি দুসপ্তাহের মধ্যেই পেয়ে যাই। ১৫ই জুন, অর্থাৎ আজ থেকে আটদিন পরে, আমার রওনা হবার কথা। এই অবস্থায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো আজকের চিঠি। মাত্র তিন লাইনের চিঠি। তার মর্ম হচ্ছে—ম্যাড্রিড বিজ্ঞানী সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ তাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করছেন। পরিষ্কার ভাষা। তাঁরা চান না যে আমি এ সম্মেলনে যোগদান করি। কারণ? কারণ কিছু বলা নেই চিঠিতে।

এ থেকে কী বুঝতে হবে আমায়? কী এমন ঘটতে পারে যার ফলে এ'রা আমাকে অপাঙক্তেয় বলে মনে করছেন?

উত্তর আমার জানা নেই। কোনোদিন জানতে পারব কিনা তাও জানি না।

আজ আর লিখতে পারছি না। দেহমন অবসন্ন। আজ এখানেই শেষ করি।

১০ই জুন

আজ সামারভিলের চিঠি পেলাম। সেটা অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়—

প্রিয় শঙ্কু,

তুমি দেশে ফিরেছ কিনা জানি না। ইন্সব্রুকে গত মাসে তোমার বক্তৃতা সম্পর্কে কাগজে যা বেরিয়েছে সেটা পড়ে আমি দুরাত ঘুমোতে পারিনি। নিঃসন্দেহে তুমি কোনো কঠিন মানসিক পীড়ায় ভুগছ, না হলে তোমার মুখ দিয়ে এ ধরনের কথা উচ্চারণ হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমি খবরটা পড়ে ইন্সব্রুকে প্রোফেসর স্টাইনারকে ফোন করে-ছিলাম। তিনি বললেন বক্তৃতার পরে তোমার আর কোনো খবর জানেন না। আশঙ্কা হয় তুমি ইউরোপেই কোথাও আছ, এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তা যদি না হয়, যদি এ চিঠি তোমার হাতে পড়ে, তাহলে পত্রপাঠ আমাকে টেলিগ্রামে তোমার কুশল সংবাদ জানাবে, এবং সেই সঙ্গে চিঠিতে তোমার এই অভাবনীয় আচরণের কারণ জানাবে। ইতি তোমার

জন সামারভিল

পুনঃ খবরটা কী ভাবে টাইম্স-এ প্রকাশিত হয়েছে সেটা জানাবার জন্য এই কাটিং।

প্রথমেই বলে রাখি যে আমি ইন্সব্রুকে গত মাসে কেন, কোনোকালেই যাইনি।

এইবার টাইমস-এর খবরের কথা বলি। তাতে লিখছে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রোঃ টি, শঙ্কু গত ১১ই মে অস্ট্রিয়ার ইন্সব্রুক শহরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দেন। সভায় স্থানীয় এবং ইউরোপের অন্যান্য শহরের অনেক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। প্রোঃ শঙ্কু এইসব বৈজ্ঞানিকদের সরাসরি কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেন। ফলে শ্রোতাদের মধ্যে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং অনেকেই বক্তাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন। জনৈক শ্রোতা একটি চেয়ার তুলে প্রোঃ শঙ্কুর দিকে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর ইন্সব্রুক-নিবাসী পদার্থবিজ্ঞানী ডক্টর কার্ল গ্রোপিয়াস বক্তাকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন।

এই হল খবর। সামারভিল যেমন চেয়েছিল, আমি তার চিঠি পাওয়ামাত্র জবাব লিখে সে চিঠি নিজে ডাকে ফেলে এসেছি। কিন্তু তাতে আমি কী ফল আশা করতে পারি? সামারভিল কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? কোনো সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষ কি বিশ্বাস করবে যে আমারই পরিবর্তে অবিকল আমারই মতো দেখতে একজন লোক ইন্সব্রুকে গিয়ে এই বক্তৃতা দিয়ে

আমার সর্বনাশ করেছে? সামারভিলের সঙ্গে আমার তেত্রিশ বছরের বন্ধুত্ব; সেই যদি বিশ্বাস না করে ত কে করবে? খবরে বলছে যে ডক্টর গ্রোপিয়াস আমাকে—অর্থাৎ এই রহস্য-জনক দ্বিতীয় শঙ্কুকে—বাঁচান। গ্রোপিয়াসকে আমি চিনি। সাত বছর আগে বোগদাদে আন্তর্জাতিক আবিষ্কারক সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। স্বল্পভাষী অমায়িক ব্যক্তি বলে মনে হয়েছিল। সামারভিলের সঙ্গে তাঁকেও একটা চিঠি লিখে দিয়েছি।

নিজেকে এত অসহায় আর কখনো মনে হয়নি। আশঙ্কা হচ্ছে বাকি জীবনটা এই বিশ্রী কলঙ্কের বোঝা কাঁধে নিয়ে গিরিডি শহরে দাগী আসামীর মতো কাটাতে হবে।
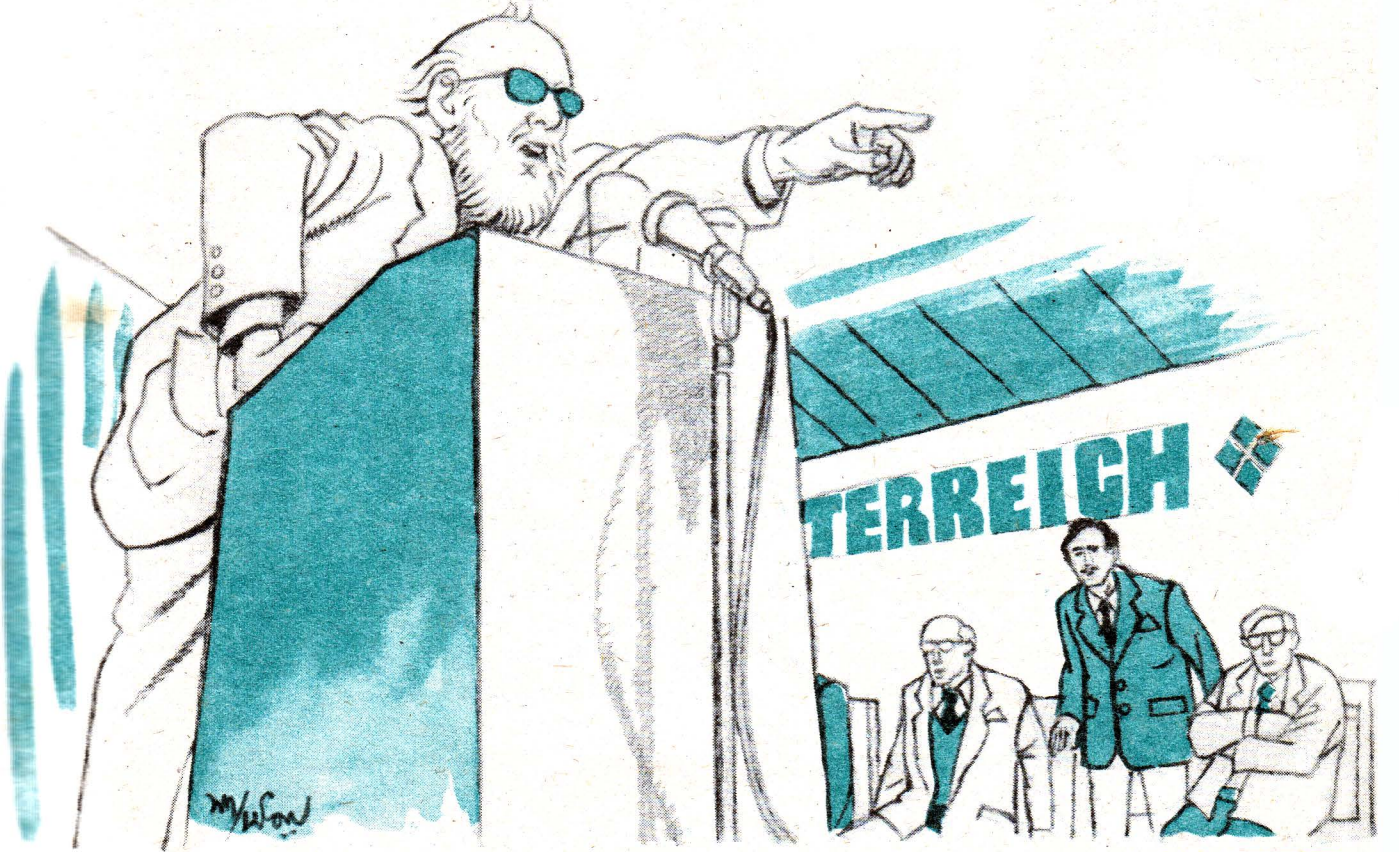
২১শে জুন

গ্রোপিয়াসের চিঠি—এবং অত্যন্ত জরুরী চিঠি। আজই ইন্সব্রুক যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

টাইমস-এর বিবরণ যে অতিরঞ্জিত নয় সেটা গ্রোপিয়াসের চিঠিতে বুঝলাম। রুমানিয়ার মাইক্রো-বায়োলজিস্ট জর্জ পোপেস্কু নাকি আমার দিকে চেয়ার ছুঁড়ে মারেন। এনজাইম সম্পর্কে তাঁর মহামূল্য গবেষণাকে আমি নাকি অর্বাচীন বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তিনি প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। গ্রোপিয়াস মঞ্চে আমার পাশেই বসে ছিল; সে আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে এক পাশে সরিয়ে আমার প্রাণ বাঁচায়। চেয়ারটা একটা মাইক্রোফোনকে বিকল করে দিয়ে টেবিলের উপর রাখা জল ভর্তি দুটো কাঁচের গেলাসকে চুরমার করে দেয়। গ্রোপিয়াস লিখছে—

'তোমাকে আমি হাত ধরে টেনে সটান লাইব্‌নিৎস হলের বাইরে নিয়ে আসি। তুমি তখন এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলে যে তোমাকে ধরে রাখা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। বাইরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছিল; কোনোরকমে তাতে তোমাকে তুলে আমি রওনা দিই। হাত ধরেই বুঝেছিলাম যে তোমার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা ছিল হাসপাতালে নিয়ে যাব, কিন্তু এক কিলোমিটার গিয়ে একটা চৌমাথায় ট্র্যাফিক লাইটের দরুন গাড়িটা থামার সঙ্গে সঙ্গে তুমি দরজা খুলে নেমে পালাও। তারপর অনেক খুঁজেও আর তোমার দেখা পাইনি। তোমার চিঠি পেয়ে বুঝলাম তুমি দেশে ফিরে গেছ। বিদেশী বৈজ্ঞানিক মহলে তোমার নামে যে কলঙ্ক রটেছে সেটা কীভাবে দূর হবে জানি না, তবে তুমি যদি একবার ইন্সব্রুকে আসতে পার, তাহলে ভালো ডাক্তারের সন্ধান দিতে পারি। তোমাকে পরীক্ষা করে

যদি কোনো মস্তিষ্ক বা স্নায়ুর গণ্ডগোল ধরা পড়ে, তাহলে সেদিনকার ঘটনার একটা স্পষ্ট কারণ পাওয়া যাবে, এবং সেটা তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। অসুখ যদি হয়েই থাকে তাহলে তার চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না ইন্সব্রুকে।'

গ্রোপিয়াস ইন্সব্রুকের একটা কাগজ থেকে সেদিনকার ঘটনার একটা ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছে। হন্তদন্ত গ্রোপিয়াস 'আমার' পিঠে হাত দিয়ে 'আমাকে' একপাশে সরিয়ে দিচ্ছেন। এই 'আমি'-র সঙ্গে আমার চেহারার কোনো পার্থক্য ছবিতে ধরতে পারলাম না। কেবল আমার চশমাটা—যেটা ছবিতে দেখছি প্রায় খুলে এসেছে—সেটার কাঁচ স্বচ্ছ না হয়ে ঘোলাটে বলে মনে হচ্ছে। 'আমার' ডাইনে বাঁয়ে টেবিলের পিছনে বসা ব্যক্তিদের মধ্যে আরো দুজনকে চেনা যাচ্ছে; একজন হলেন রুশ বৈজ্ঞানিক ডক্টর বোরোডিন, আর অন্যজন ইন্সব্রুকেরই তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন। ফিংকেলস্টাইন তার হাত দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে রয়েছে। হয়ত সেও আমাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল!

আজ সারাদিন ধরে গভীরভাবে চিন্তা করে বুঝেছি যে আমাকে ইন্সব্রুক যেতেই হবে। সেই জ্যোতিষীর কথা মনে পড়ছে। সে বলেছিল আমার এই পরম শত্রুটিকে সংহার না করলে আমার মুক্তি নেই। আমার মন বলছে এই ব্যক্তি এখনো ইন্সব্রুকেই রয়েছে আত্মগোপন করে। তার সন্ধানই হবে এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য।

সামারভিলকে লিখে দিয়েছি আমার সংকল্পের কথা। দেখা যাক্ কী হয়।

২৩শে জুন

আজ নতুন করে আমার মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

আমার ডায়রি খুলে গত তিনমাসের দিনলিপি পড়ে দেখছিলাম। মে মাসের তেসরা থেকে বাইশে পর্যন্ত দেখলাম কোনো এন্ট্রি নেই। সেটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ উল্লেখযোগ্য কিছু না ঘটলে আমি ডায়রি লিখি না। কিন্তু খট্‌কা লাগছে এই কারণে যে ওই সময়টাতেই ইন্সব্রুকের ঘটনাটা ঘটেছিল। এমন যদি হয় যে আমি ইন্সব্রুকের নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম, ইনসব্রুকে গিয়েছিলাম, ওই রকম বক্তৃতাই দিয়েছিলাম, এবং তারপর ইন্সব্রুক থেকে ফিরে এসেছিলাম—কিন্তু এই পুরো ঘটনাটাই আমার মন থেকে লোপ পেয়ে গেছে? কোনো সাময়িক মস্তিষ্কের ব্যারাম থেকে কি এ-ধরনের বিস্মৃতি সম্ভব? এটা অবিশ্যি খুব সহজেই যাচাই করা যেত; দুঃখের বিষয় যে-দুটি ব্যক্তির সঙ্গে গিরিডিতে আমার প্রতিদিনই দেখা হয়, তাদের একজনও ওই সময়টা এখানে ছিলেন না। আমার চাকর প্রহ্লাদ গত দুমাস হল ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। যাকে বদলি দিয়ে গেছে, সেই ছেদিলালকে জিগ্যেস করেছিলাম। বললাম, 'গতমাসে আমি গিরিডি ছেড়ে কোথাও গিয়েছিলাম কিনা তোমার মনে আছে?' সে চোখ কপালে তুলে বলল, 'আপনার স্মরোন থাকবে না তো হামার থাকবে কেইসন বাবু?' আমারই ভুল হয়েছে ; এ জিনিস কাউকে জিগ্যেস করা যায় না। একজনকে জিগ্যেস করা যেত ; আমার বন্ধু অবিনাশবাবু। কিন্তু তিনি গত শুক্রবার চাইবাসা চলে গেছেন তাঁর ভাগনীর বিয়েতে।

ইন্সব্রুকের কোনো চিঠি আমার ফাইলের মধ্যে পাইনি। আশা করি আমার আশঙ্কা অমূলক।

আমি ৬ই জুলাই ইন্সব্রুক রওনা হচ্ছি। কপালে কী আছে কে জানে।

৭ই জুলাই

ইন্সব্রুক। বিকেল চারটে। ভিয়েনা থেকে ট্রেন ধরে সকাল দশটায় পৌঁছেছি এখানে। ছবি সমেত নকল-শঙ্কুর বক্তৃতা এখানকার কাগজে বেরোনর যে কী ফল হয়েছে সেটা শহরে পদার্পণ করেই বুঝেছি। পরপর তিনটে হোটেলে আমাকে জায়গা দেয়নি। তৃতীয় হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়েছিলাম, ড্রাইভার মাথা নেড়ে না করে দিল। শেষটায় হাতে ব্যাগ নিয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হেঁটে একটা গলির ভিতর ছোট্ট একটা সরাইখানা গোছের হোটেলে ঘর পেলাম। মালিকের পুরু চশমা দেখে মনে হল সে ভালো চোখে দেখে না, আমার বিশ্বাস সেই কারণেই আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হল না। কিন্তু এভাবে গা ঢাকা দিয়ে থেকে কাজের বেশ অসুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে।

আজ রাত্রে সামারভিল আসছে। তাকে গিরিডি থেকেই ইন্সব্রুক যাচ্ছি বলে লিখেছিলাম, এবং এখানে এসেই টেলিফোন করেছি। তার জরুরী কাজ ছিল, তাও সে আসবে বলে কথা দিয়েছে।

গ্রোপিয়াসকে ফোন করেছিলাম। তার সঙ্গে আজ সাড়ে পাঁচটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সে থাকে এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। বলেছে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

আরো একজনকে ফোন করা হয়ে গেছে এর মধ্যেঃ প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন।

শুধু একজনের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনলে চলবে না, তাই ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ভদ্রলোক বাড়ি ছিলেন না। চাকর ফোন ধরেছিল। আমার নম্বর দিয়ে দিয়েছি, বলেছি এলেই যেন ফোন করেন।

পাহাড়ে ঘেরা অতি সুন্দর শহর ইন্‌সব্রুক। যুদ্ধের সময় অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার সব নতুন করে গড়েছে। অবিশ্যি শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। আমার এখন একমাত্র লক্ষ্য হল সেই জ্যোতিষীর গণনায় নির্ভর করে আমার মুক্তির পথ খোঁজা।

৭ই জুলাই, রাত সাড়ে দশটা

গ্রোপিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা গুছিয়ে লিখতে চেষ্টা করছি।

পাঁচটার কিছু আগেই আমার এই অ্যাপোলো হোটেলের একটি ছোক্‌রা এসে খবর দিল হের্ প্রোফেসর শান্‌কোর জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন হের ডকটর গ্রোপিয়ুস। গাড়ির চেহারা দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম। এককালে—অর্থাৎ অন্তত ত্রিশ বছর আগে—এটা হয়ত বেশ বাহারের গাড়ি ছিল, কিন্তু এখন রীতিমত জীর্ণদশা। গ্রোপিয়াস কি দরিদ্র, না কৃপণ?

পাঁচটার মধ্যেই গ্রুনেওয়াল্ডস্ট্রাসে পোঁছে গেলাম। এই রাস্তাতেই গ্রোপিয়াসের বাড়ি। একটা প্রাচীন গির্জা ও গোরস্থান পেরিয়ে গাড়িটা বাঁয়ে একটা গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল। বাড়িটাও দেখলাম গাড়িরই মতো। গেট থেকে সদর দরজা পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে বাগান আগাছায় ভরে আছে, অথচ আসবার পথে অন্যান্য বাড়ির সামনের বাগানে ফুলের প্রাচুর্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেছে।

বোগদাদে গ্রোপিয়াসের চেহারা যা মনে ছিল, তার তুলনায় এবারে তাকে অনেক বেশি
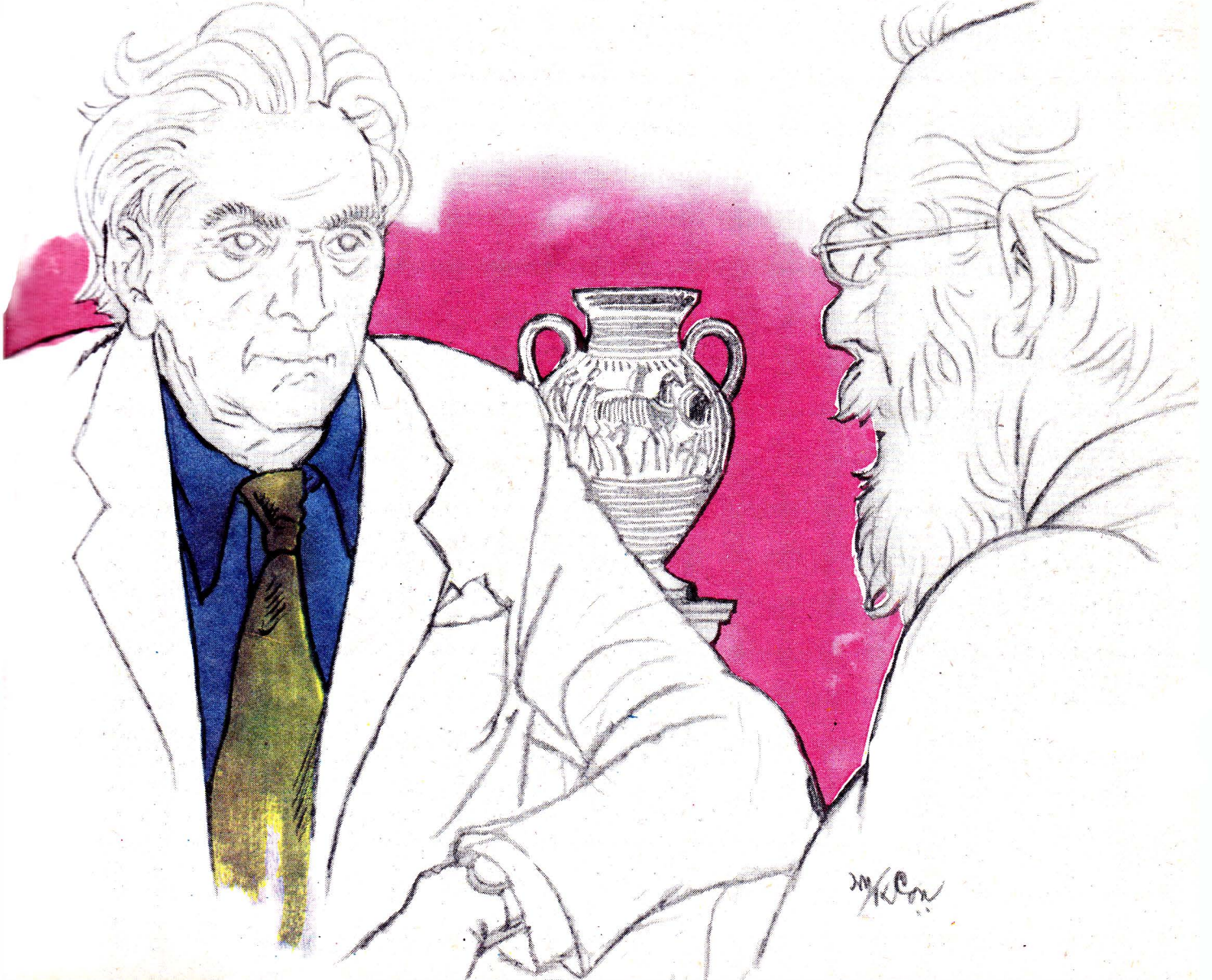
বিধ্বস্ত বলে মনে হল। সাত বছরে এত বেশি বুড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। হয়ত কোনো পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে। আমি এব্যাপারে কোনো অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করলাম না, কারণ তার নিজের স্বাস্থ্যের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন বলে মনে হল।

বৈঠকখানায় দুজনে মুখোমুখি বসার পর গ্রোপিয়াস বেশ মিনিট দুয়েক ধরে আমাকে পর্যবেক্ষণ করল। শেষটায় আমাকে বাধ্য হয়েই হালকাভাবে জিগ্যেস করতে হল, 'আমিই সেই শঙ্কু কিনা সেটা ঠাহর করতে চেষ্টা করছ?'

গ্রোপিয়াস আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে যে-কথাটা বলল তাতে আমার ভাবনা দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

'ডক্টর ওয়েবার আসছেন। তিনি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখবেন। সেদিন তোমাকে ওয়েবারের ক্লিনিকেই নিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তুমি সে সুযোগ দাওনি। আশা করি এবারে তুমি আপত্তি করবে না। একমাত্র আমিই বিশ্বাস করি যে সেদিন তুমি অসুস্থ ছিলে বলেই এসব কথা বলতে পেরেছিলে। অন্য যারা ছিল তারা আমার সঙ্গে একমত নয়। তারা এখনো পেলে তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু ওয়েবারের পরীক্ষার ফলে যদি প্রমাণ হয় যে তোমার মাথায় গোলমাল হয়েছে, তাহলে হয়ত এরা তোমাকে ক্ষমা করবে। শুধু তাই নয়; চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থ হলে তুমি হয়ত আবার তোমার সুনাম ফিরে পাবে।'

আমি অগত্যা বলতে বাধ্য হলাম যে গত চল্লিশ বছরে একদিনের জন্যেও আমি অসুস্থ হইনি। দৈহিক, মানসিক, কোনো ব্যাধির সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই।

গ্রোপিয়াস বলল, 'তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে এত সব নামকরা বৈজ্ঞানিক—শিমানোফস্কি, রিটার, পোপেস্কু, আলটমান, স্ট্রাইখার, এমনকি আমি নিজে—এদের সম্বন্ধে তুমি এত নীচ ধারণা পোষণ কর?'

আমি যথাসম্ভব শান্তভাবে বললাম, 'গ্রোপিয়াস, আমি বিশ্বাস করি যে আমারই মতো

দেখতে আরেকজন লোক রয়েছে, যে নিজে বা অন্য কোনো লোকের প্ররোচনায় আমাকে অপদস্থ করার জন্য এইসব করছে।'

'তাহলে সে লোক এখন কোথায়? সেদিন আমার গাড়ি থেকে নেমে সে শহর থেকে কি ভ্যানিস করে গেল? তোমার না হয় পাসপোর্ট ছিল, টিকিট ছিল, তুমি সোজা প্লেন ধরে দেশে ফিরে গেছ, কিন্তু একজন প্রতারকের পক্ষে ত হঠাৎ শহর থেকে পালানো এত সহজ নয়।'

আমি বললাম, 'আমার বিশ্বাস সে লোক এই শহরেই আছে। এমনও হতে পারে যে সে একজন অখ্যাত বৈজ্ঞানিক, অনেক জায়গায় আমাকে দেখেছে, আমার বক্তৃতা শুনেছে। বোঝাই যাচ্ছে আমার সঙ্গে তার কিছুটা সাদৃশ্য আছে, বাকিটা সে মেক-আপের সাহায্যে পুষিয়ে নিয়েছে।'

গ্রোপিয়াসের চাকর হট চকোলেট দিয়ে গেল। চাকরের সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুরও এসে ঘরে ঢুকেছে, বুঝলাম সেটা জাতে ডোবারমান পিন্‌শার। কুকুরটা আমাকে দেখে লেজ নাড়তে নাড়তে কাছে এসে আমার প্যাণ্ট শুঁকতে লাগল। কিন্তু তার পরেই দেখলাম সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বার তিনেক গর্‌র্ গর্‌র্ শব্দ করল। গ্রোপিয়াস 'ফ্রিকা, ফ্রিকা' বলে দুবার ধমক দিতেই সে যেন বিরক্ত হ'য়ে আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে কিছু দূরে কার্পেটের উপর বসে পড়ল।

'তুমি এখানে এসেছ বলে আর কেউ জানে কি?' গ্রোপিয়াস প্রশ্ন করল।

আমি বললাম, 'ইনসব্রুকে আমার জানা বলতে আর একজনই আছেন। তাঁকে এসে ফোন করেছিলাম, কিন্তু তিনি বাড়ি ছিলেন না। তাঁর চাকরকে আমার ফোন নম্বর দিয়ে দিয়েছি।'

'কে তিনি?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'তিনিও প্রোফেসর শঙ্কুর বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। তোমার পাঠানো খবরের কাগজে ছবিতে তাঁকে দেখলাম।'

গ্রোপিয়াস ভ্রূকুঞ্চিত করল।

'কার কথা বলছ তুমি?'

'প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন।'

'আই সী।'

খবরটা শুনে গ্রোপিয়াসকে তেমন প্রসন্ন বলে মনে হল না। প্রায় আধমিনিট চুপ থাকার পর আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'ফিংকেলস্টাইনের গবেষণা সম্বন্ধে সেদিন তুমি কী বলেছিলে সেটা মনে আছে?'

আমি বাধ্য হয়েই মাথা নেড়ে না বললাম।

'যদি মনে থাকত তাহলে আর তাকে ফোন করতে না। তুমি বলেছিলে একটি তিন বছরের শিশুও তার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে।'

আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। খুব ভালো করেই জানি এই উন্মাদ বক্তৃতার জন্য আমি দায়ী নই, কিন্তু এখানকার লোকের যদি সত্যিই ধারণা হয়ে থাকে যে এই প্রতারকই হচ্ছে আসল শঙ্কু, তাহলে আমার বিপদের শেষ নেই। গ্রোপিয়াস ছাড়া কি তাহলে আমি কারুর উপরেই ভরসা রাখতে পারব না?

একটা গাড়ির শব্দ।

'ওই বোধহয় ওয়েবার এল,' বলল গ্রোপিয়াস।

ডাক্তারকে আমার ভালো লাগল না। জার্মানির তুলনায় অস্ট্রিয়ার লোকেদের মধ্যে যে মোলায়েম ভাব থাকে, সেটা এর মধ্যেও আছে, তবে সেটার মাত্রাটা যেন একটু অস্বস্তিকর রকম বেশি। মুখে লেগে থাকা সরল হাসিটাও কেন জানি কৃত্রিম বলে মনে হয়।

ওয়েবার আধ ঘণ্টা ধরে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করে পরীক্ষা করল, আমিও সব সহ্য করলাম। যাবার সময় বলল, 'গ্রোপিয়াস তোমাকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে, কাল সকালে গটফ্রীট্-স্ট্রসেতে আমার ক্লিনিকে এস, সেখানে আমার যন্ত্রপাতি আছে। তোমাকে সুস্থ করাটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে রইল।'

আমি মনে মনে বললাম—তোমার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি সুস্থ আমি। তুমি একমাস নখ কাটনি, তোমার ঠোঁটে সিগারেটের কাগজ লেগে আছে, তোমার জিভের দোষে কথা জড়িয়ে যায়—তুমি করবে আমার মাথার ব্যামোর চিকিৎসা?

ওয়েবারকে গাড়িতে তুলে দিতে গ্রোপিয়াস ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, ওর দেরি দেখে আমি ঘরটা ঘুরে দেখছিলাম, তাকের উপর ফোটো অ্যালবাম দেখে পাতা উলটে দেখি একটা ছবিতে আমি রয়েছি। এ ছবি আমার কাছে নেই, তবে এটা তোলার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। বোগদাদের হোটেল স্প্লেনডিডের সামনে তোলা। আমি, গ্রোপিয়াস আর রুশ বৈজ্ঞানিক কামেন্‌স্কি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি।

'তোমার সঙ্গে জিনিসপত্র কী আছে?' গ্রোপিয়াস ঘরে ফিরে এসে প্রশ্ন করল।

'কেন বল ত?'

'আমার মনে হয় তুমি আমার এখানে চলে এস। তোমার নিরাপত্তার জন্যই আমি এই প্রস্তাব করছি। আমার বড় গেস্টরুম আছে, তুমি এর আগেও সেখানে থেকে গেছ—যদিও তোমার সেটা মনে থাকার কথা নয়। মে মাসে যখন এসেছিলে তখন তুমি আমারই আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলে।'

ব্যাপারটা অসম্ভব জানলেও মাথাটা কেমন জানি গুলিয়ে উঠছিল। আমি জিগ্যেস করলাম, 'আমাকে কি তুমি নেমন্তন্ন করেছিলে?'

গ্রোপিয়াস এর উত্তরে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একটা ফাইল নিয়ে এল। তাতে অন্য চিঠির মধ্যে আমার দুখানা চিঠি রয়েছে। অবিকল আমার চিঠির কাগজ, আমার সই, আমার অলিভেটি টাইপরাইটারের হরফ। প্রথম চিঠিটায় লিখেছি যে মে মাসে এমনিতেই আমি ইউরোপ যাচ্ছি, কাজেই ইন্‌সব্রুকে যাওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। দ্বিতীয় চিঠিটায় জানিয়েছি কবে পৌঁছচ্ছি।

রহস্য ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে এবং সেই সঙ্গে আমার সংকটাপন্ন অবস্থাটাও ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখানের হোটেলেই যখন আমাকে ঢুকতে দেয়নি, তখন যে-লোককে আমি প্রকাশ্য বক্তৃতায় নাম ধরে অপমান করেছি, আমার প্রতি তার মনোভাব কী হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

কিন্তু গ্রোপিয়াসকে বলতে হল যে এখুনি তার বাড়িতে এসে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব না।

'আজ রাত্রে আমার বন্ধু সামারভিল লণ্ডন থেকে আসছে। কাল যদি আমরা দুজনে একসঙ্গে তোমার বাড়িতে এসে উঠি?

'সামারভিল কে?' একটু সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল গ্রোপিয়াস। আমি সামারভিলের পরিচয় দিয়ে বললাম, 'সে আমার বিশিষ্ট বন্ধু; এবং ঘটনাটা শুনে সে বিশেষ চিন্তিত।'

'তোমার কি ধারণা এখানে এসে তোমাকে দেখলে তার চিন্তা দূর হবে?'

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে গ্রোপিয়াসের দিকে চেয়ে রইলাম। আমি জানি ও কী বলবে, এবং ঠিক তাই বলল।

'তোমার বন্ধুও তোমার চিকিৎসার জন্য আমারই মতো ব্যস্ত হয়ে উঠবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

আমি হোটেলে ফিরেছি সন্ধ্যা সাতটায়। ফিংকেলস্টাইনের কাছ থেকে কোনো ফোন আসেনি। ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসে আজকের আশ্চর্য ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করছি এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। সামারভিল। রেলস্টেশন থেকে ফোন করছে। বললাম, 'কী হল, তুমি আসছ না?'

'আসছি ত বটেই, একটা উৎকণ্ঠা হচ্ছিল তাই ফোনটা করলাম।'

'কী ব্যাপার?'

'তুমি অক্ষত আছ কিনা সেটা জানা দরকার।'

'অক্ষত এবং সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'ভেরি গুড। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি। অনেক খবর আছে।'

আমার সম্বন্ধে সামারভিল যে কতটা উদ্বিগ্ন সেটা এই টেলিফোনেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু কী খবর আনছে সে?

আমার ঘরে যদিও দুটো খাট রয়েছে, কিন্তু ঘরটা এত ছোট যে আমি সামারভিলের জন্য পাশের ঘরটা বন্দোবস্ত করব বলে ঠিক করেছিলাম। যখন বাড়ি ফিরেছি তখনও ঘরটা খালি ছিল। হোটেলের মালিককে সেটা সম্বন্ধে বলব বলে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি সে-ঘরে বাতি জ্বলছে, এবং আধ-খোলা দরজা দিয়ে কড়া চুরুটের গন্ধ আসছে। আর কোনো খালি ঘর আছে কি? খোঁজ নিয়ে জানলাম নেই। অগত্যা আমার এই ছোট ঘরেই সামারভিলকে থাকতে হবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সামারভিল এসে পড়ল। ইতিমধ্যে কখন যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, সেটা খেয়াল করিনি; সেটা বুঝলাম সামারভিলকে ভিজে বর্ষাতি খুলতে দেখে। বলল, 'আগে কফি আনাও, তারপর কথা হবে।'

কথাটা বলে সেও দেখি গ্রোপিয়াসের মতো মিনিটখানেক ধরে আমার দিকে চেয়ে রইল। এ ব্যাপারটা প্রায় আমার গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে, যদিও সামারভিলের প্রতিক্রিয়া হল অন্যরকম।

'তোমার চাহনিতে কোনো পরিবর্তন দেখছি না শংকু। আমার বিশ্বাস তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

আমি এতদিনে নিশ্চিন্তির হাঁপ ছাড়লাম।

কফি আসার পর সামারভিলকে আজকের সারাদিনের ঘটনা বললাম। সব শুনে সে
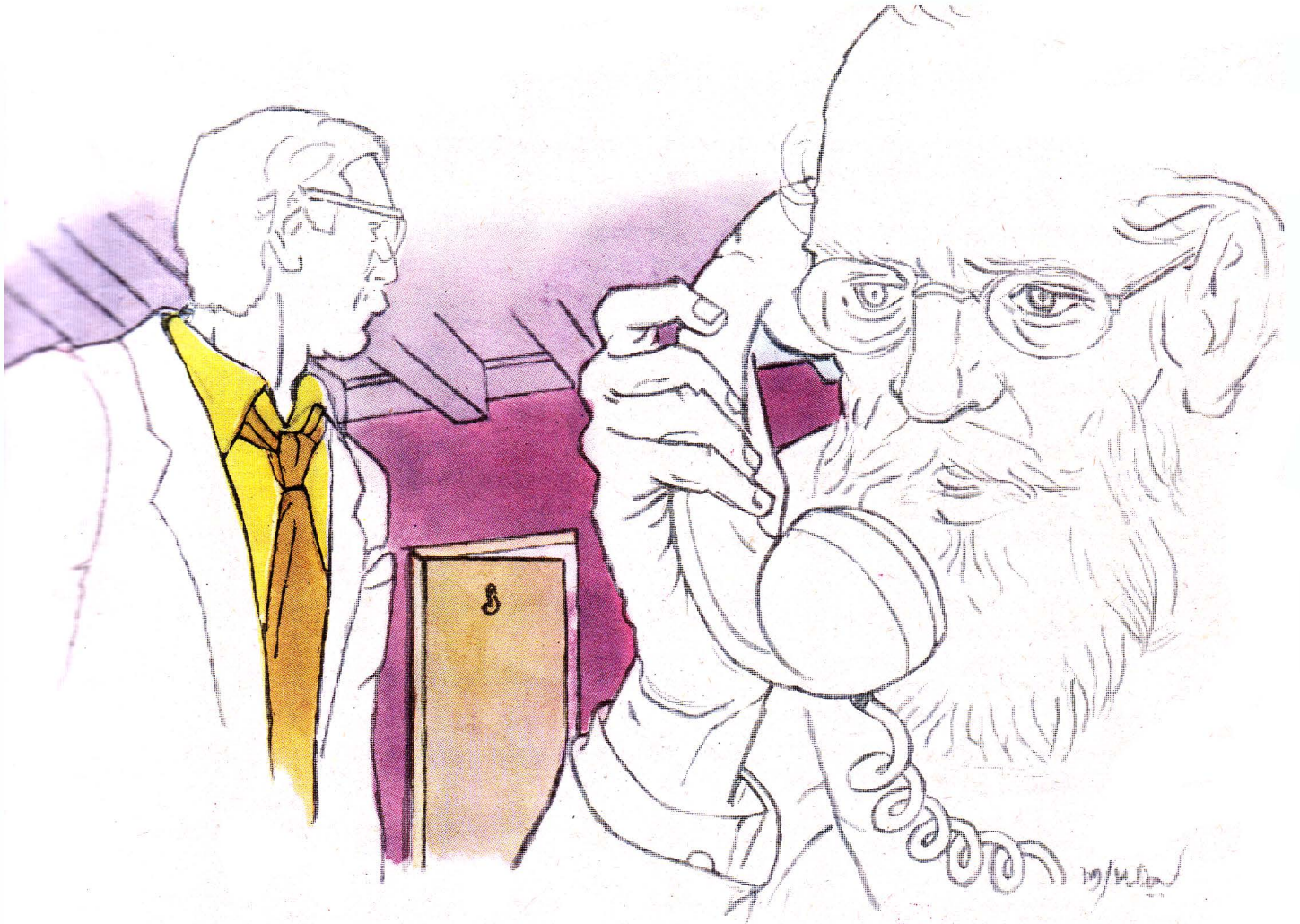
বলল, 'আমি গত কদিনে পুরোনো জার্মান বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ঘেঁটে গ্রোপিয়াসের কয়েকটা প্রবন্ধ আবিষ্কার করেছি। গত দশ বছরের মধ্যে সে কোনো লেখা লেখেনি, কিন্তু তার আগে লিখেছে।'

'কী সম্বন্ধে লিখেছে ?'

'তার ব্যর্থতা সম্বন্ধে।'

'কিরকম ? কিসের ব্যর্থতা ?'

এর উত্তরে সামারভিল যা বলল তাতে যে আমি শুধু অবাকই হলাম তা নয় ; এর ফলে সমস্ত ঘটনাটা একটা নতুন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হল আমার সামনে। সে বলল—

'তোমার তৈরি অমনিস্কোপ, তোমার ধন্বন্তরী ওষুধ মিরাকিউরল, তোমার লিঙ্গুয়াগ্রাফ, তোমার এয়ারকন্ডিশনিং পিল—প্রত্যেকটি জিনিসই গ্রোপিয়াসের মাথা থেকে বেরিয়েছিল। দুঃখের বিষয় প্রতিবারই সে জেনেছে যে তার ঠিক আগেই তুমি এগুলোর পেটেন্ট নিয়ে বসে আছ। অর্থাৎ প্রতিভার দৌড়ে প্রতিবারই সে তোমার কাছে অল্পের জন্য হার মেনেছে। দশ বছর আগে তার শেষ প্রবন্ধে সে অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলেছে যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের জন্য খ্যাতিলাভের ব্যাপারটা নেহাতই আকস্মিক। প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটে ও এর নজিরও দেখিয়েছে—যেমন মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপারে খ্যাতি হল নিউটনের, কিন্তু তারও ত্রিশ বছর আগে ইতালির বৈজ্ঞানিক ফ্রাতেল্লি নাকি এই মাধ্যাকর্ষণের কথা লিখে গেছেন।'

আমি বললাম, 'ঠিক সেইভাবে বেতারের আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমাদেরই জগদীশ বোসের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন মার্কনি।'

'এগজ্যাক্টলি,' বলল সামারভিল। 'কাজেই গ্রোপিয়াস যদি তোমার প্রতি বিরূপভাব পোষণ করে তাহলে আশ্চর্য হয়ো না।'

'তা ত বুঝলাম, কিন্তু এতে দ্বিতীয় শঙ্কুর রহস্যের সমাধান হচ্ছে কীভাবে ?'

প্রশ্নটা করাতে সামারভিল গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'তোমার সঙ্গে গ্রোপিয়াসের শেষ দেখা হয়েছিল বোগদাদে সাত বছর আগে। তারপর থেকে সে আর কোনো বিজ্ঞানী সম্মেলনে যায়নি। এই প্রথম গত মে মাসে ইন্সব্রুকে তারই উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞানী সম্মেলনে সে যোগদান করে। আর—'

আমি সামারভিলকে বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু এই সম্মেলন থেকে আমি কোনো চিঠি পাইনি।'

'সে ত পাবেই না। কিন্তু গ্রোপিয়াস নিশ্চয়ই বলেছে যে সে তোমাকে ডেকেছে। এমনকি সে তোমার সই সমেত চিঠিও নিশ্চয়ই তার ফাইলে রেখেছে।'

আমাকে বলতেই হল যে সে-চিঠি আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

'তার সঙ্গে এর আগে তোমার চিঠি লেখালেখি হয়েছে?' সামারভিল প্রশ্ন করল।

আমি বললাম, 'বোগদাদে ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি ওকে দুবার চিঠি লিখেছি, আর পর পর পাঁচ বছর নববর্ষের সম্ভাষণ জানিয়ে কার্ড পাঠিয়েছি।'

সামারভিল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে চেহারার মিল আছে এমন কোনো লোক নিশ্চয়ই জোগাড় করেছে গ্রোপিয়াস। যেটুকু তফাৎ সেটুকু মেক-আপের সাহায্যে ম্যানেজ করেছে, আর বক্তৃতার বিষয়টি তাকে আগে থেকেই শিখিয়ে নিয়েছে। টাকার লোভে একাজটা অনেকেই করতে রাজি হবে। এই দ্বিতীয় শঙ্কুর ত কোনো দায়-দায়িত্ব নেই; সে ফরমাশ খেটে টাকা পেয়ে খালাস, এদিকে আসল শঙ্কুর যা সর্বনাশ হবার তা হয়েই গেল, আর গ্রোপিয়াসেরও প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেল। ভালো কথা, তোমার বক্তৃতার কোনো রেকর্ডিং গ্রোপিয়াসের কাছে থাকতে পারে?'

প্রশ্নটা শুনেই আমার মনে পড়ে গেল বোগদাদে গ্রোপিয়াসকে একটা ছোট্ট টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে দেখেছি। আমি বললাম, 'সেটা খুবই সম্ভব। শুধু তাই না, আমার একটা ভাল রঙিন ছবিও তার কাছে আছে। আমি আজই দেখেছি।'

সামারভিল একটা আক্ষেপসূচক শব্দ করে বলল, 'মুশকিলটা কী জান? যাকে শঙ্কু সাজিয়েছে তাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অথচ গ্রোপিয়াসের শয়তানি প্রমাণ করতে গেলে এই দ্বিতীয় শঙ্কুর প্রয়োজন।'

এই হোটেলে ঘরে টেলিফোন নেই। দোতলার তিনজন বাসিন্দার জন্য একটিমাত্র টেলিফোন রয়েছে প্যাসেজে। যদি এক নম্বরের জন্য ফোন আসে তাহলে একবার একবার করে রিঙ হতে থাকে, দুই নম্বর হলে ডবল রিং, আর তিন হলে ট্রিপল। টেলিফোন দুই দুই করে বাজছে দেখে বুঝলাম আমারই ফোন।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে ফোন ধরলাম।

'হ্যালো!'

'প্রোফেসর শঙ্কু কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম ফিংকেলস্টাইন।'

আমি বৃথা বাক্যব্যয় না করে আসল প্রসঙ্গে চলে গেলাম।

'গত মে মাসে এখানে একটা বিজ্ঞানী সভায় তুমি বোধহয় উপস্থিত ছিলে। কাগজে তোমার ছবি দেখলাম।'

'তুমি কি তোমার চশমা হারিয়েছ?'

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের কী জবাব দিতে হবে ভাবছি, সেই ফাঁকে ফিংকেলস্টাইন আরেকটা প্রশ্ন করে বসল।

'তোমার চশমার কাঁচ কি ঘোলাটে, না স্বচ্ছ?'

আমি বললাম, 'স্বচ্ছ। এবং সে চশমা আমার কাছেই আছে, কোনদিন হারায়নি।'

'আমার তাই বিশ্বাস। যাই হোক, বিজ্ঞান-সভায় যে-শঙ্কু বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনি ঘর থেকে বেরোবার সময় তাঁর চশমাটা খুলে মেঝেতে পড়ে যায়। সেটা আমি তুলে নিই। শুধু চশমা নয়, তার সঙ্গে একটি জিনিস আটকে ছিল, সেটাও আমার কাছে আছে।'

'কী জিনিস?'

'সেটা তুমি এলে দেখাব। ওটা না পেলে কিন্তু আমারও ধারণা হত যে যিনি বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি আসল শঙ্কু, নকল নন।'

কথাটা শুনে আমার হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেছে। বললাম, 'কখন তোমার সঙ্গে দেখা করা যায়?'

ফিংকেলস্টাইন বলল, 'এখন রাত হয়ে গেছে, আর দিনটাও ভালো না। কাল সকাল সাড়ে আটটায় আমার বাড়িতে এসো। বেশি সকাল হয়ে যাচ্ছে না ত?'

'না, না। ঠিক সাড়ে আটটায় যাবো। আমার সঙ্গে আমার ইংরেজ বন্ধু জন সামারভিলও থাকবে।'

'বেশ, তাকে নিয়ে এস। তখনই কথা হবে। অনেক কিছু বলার আছে।'

ফোন রেখে দিলাম। সামারভিল পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনে আবার ঘরে ফিরে এলাম। সামারভিল দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'তিন নম্বরে যিনি আছেন তাঁকে চেনো?'

'কেন বল ত? লোকটি আজ সন্ধ্যায় এসেছে।'

'ভদ্রলোকের একটু বেশিরকম কৌতূহল বলে মনে হল। চুরুটের গন্ধ পেয়ে পিছনে ফিরে দেখি দরজাটা এক ইঞ্চি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার ফোনের কথা শোনায় তার এত আগ্রহ কেন?

এর উত্তর আমি জানি না। লোকটা কে তাও জানি না। আশা করি কাল ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে কথা বললে রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হবে।

এখন রাত এগারটা। বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সামারভিল শুয়ে পড়েছে।

৯ই জুলাই

কাল ডায়রি লিখতে পারিনি। লেখার মতো অবস্থা ছিল না। সেই জ্যোতিষীর গণনা শেষ পর্যন্ত ফলেছে। একটা কথা মানতেই হবে; শয়তানিতে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিককে টেক্কা দেওয়া অসম্ভব। যাক গে, আপাতত কালকের অসামান্য ঘটনাগুলো বর্ণনায় মনোনিবেশ করি।

সকাল সাড়ে আটটায় ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে ফিংকেলস্টাইনের ঠিকানা দেখে সামারভিল বলল, 'হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। বেশি দূর না—আধ ঘণ্টায় পৌঁছে যাব।' সামারভিলের চেনা শহর ইন্‌সব্রুক। তা ছাড়া আমাকে ট্যাক্সিতে তোলার বিপদের কথাও ও জানে।

আটটায় বেরিয়ে পড়লাম। প্রাচীন শহরের ভিতর দিয়ে রাস্তা। সামারভিল দেখলাম অলিগলির মধ্যে দিয়ে শর্টকাটগুলোও জানে। একটা গলি পেরিয়ে খোলা জায়গায় পড়তেই দেখি ডাইনে ছবির মতো সুন্দর সিল নদী বয়ে যাচ্ছে। আমরা নদীর ধার ধরে কিছু দূর গিয়ে বাঁয়ে একটা পার্ক ছাড়িয়ে আবার বাঁ দিকেই ঘুরে একটা নির্জন রাস্তায় পড়লাম। এটাই রোজেনবাউম আলে অর্থাৎ ফিংকেলস্টাইনের বাড়ির রাস্তা। এগারো নম্বর খুঁজে পেতে কোনোই অসুবিধা হল না।

ছোট অথচ ছবির মতো সুন্দর বাড়ি। সামনেই বাগান, তাতে নানা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে, আর তারই মধ্যে সামনের দরজার ডান পাশে একটা আপেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো।

আমরা এগিয়ে গিয়ে দরজার বেল টিপলাম। একজন প্রৌঢ় চাকর এসে দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখেই তার মুখে হাসি ফুটে ওঠাটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল।

'আসুন ভেতরে...আপনি কিছু ফেলে গেছেন বুঝি?'

আমার বুকের ভিতরে যেন একটা হাতুড়ি পড়ল।

'প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন আছেন?' সামারভিলের গলার স্বরে সংশয়।

'মনিব ত এখনো ঘরেই আছেন।'

'কোথায় ঘর?'

'দোতলায় উঠেই ডান দিকে। ইনি ত একটু আগেই—'

তিনধাপ করে সিঁড়ি উঠে দোতলায় পোঁছে গেলাম। ডানদিকের ঘরের দরজা খোলা। সামারভিল তার লম্বা পা ফেলে আগেই ঢুকে 'মাই গড!' বলে দাঁড়িয়ে গেল।

এটা ফিংকেলস্টাইনের স্টাডি। মেহগেনির টেবিলের সামনে অদ্ভুতভাবে মাথাটাকে পিছনে চিতিয়ে চেয়ারে বসে আছে ফিংকেলস্টাইন, তার হাত দুটো চেয়ারের দু পাশে ঝুলে রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, যা অনুমান করেছি, তাই। ফিংকেলস্টাইনের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে। কণ্ঠনালীর দুপাশে আঙুলের দাগ এখনো টাটকা। এই দৃশ্য দেখে ফিংকেলস্টাইনের চাকর যেটা করল সেটাও মনে রাখার মতো। একটা অস্ফুট চিৎকার করে আমার দিকে একটা বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে সে টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটার উপর হুমড়ি দিয়ে পড়ল। তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট; সে পুলিশে খবর দেবে।

সামারভিল যেটা করল সেটা অবশ্য তার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচায়ক। সে এক ঘুঁষিতে ভৃত্যটিকে ধরাশায়ী করল। দেখে বুঝলাম ভৃত্য অজ্ঞান।

'তুমি ফাঁদে পড়েছ, শঙ্কু! রুদ্ধশ্বাসে বলল সামারভিল। 'মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হবে।'

'কিন্তু ওটা কী?'

আমার চোখ চলে গেছে টেবিলের উপর রাখা একটা প্যাডের দিকে। তাতে একটিমাত্র কথা লেখা রয়েছে লাল পেনসিলে—'এর্স্‌টে'। অর্থাৎ ফার্স্ট, প্রথম। আরো যে কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল ফিংকেলস্টাইনের সেটা কথাটার পরেই পেনসিলের দাগ থেকে বোঝা যাচ্ছে। পেনসিলটা পড়ে রয়েছে টেবিলের পাশে মেঝেতে।

যা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। 'এর্স্‌টে' লিখে কী বোঝাতে চেয়েছিল ফিংকেলস্টাইন? প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়—এইভাবে বোঝানো যেতে পারে এমন কী আছে ঘরের মধ্যে? বইয়ের তাক বোঝাতে পারে কি? মনে হয় না। আমি বুঝতে পারছি কী জিনিসের অবস্থান বোঝাতে চেয়েছিল ফিংকেলস্টাইন। আমার চশমা।

জিনিসটা পাওয়া গেল টেবিলের প্রথম—অর্থাৎ ওপরের দেরাজটা খুলে। কাগজপত্র কলম পেনসিল ইত্যাদির মধ্যে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স রাখা রয়েছে, তার ঢাকনাতে জার্মান ভাষায় লেখা 'শঙ্কুর চশমা এবং চুল'। বাক্সটা নিয়ে আমরা দুজনে চম্পট দিলাম। ভৃত্য এখনো বেহুঁশ।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় লক্ষ্য করলাম জুতোর ছাপ; ওঠার সময় তাড়াতাড়িতে চোখে পড়েনি।

বাইরেও রয়েছে সেই ছাপ; দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেট ছাড়িয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। আসার ছাপ, যাওয়ার ছাপ, দুরকমই আছে। কাল রাত্রের বৃষ্টিই অবিশ্যি এর জন্য দায়ী।

আমরা ছাপটা অনুসরণ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখি সেটা রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর উঠে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও আমরা পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। দশ মিনিট এদিকে ওদিকে খুঁজেও যখন দ্বিতীয় শঙ্কুর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়ে হোটেলে ফিরে আসতে হল। মালিক আমাকে দেখেই বলল, 'তোমার ফোন এসেছিল। ডক্টর গ্রোপিয়াস। তোমাকে অবিলম্বে টেলিফোন করতে বলেছেন।'

দোতলায় উঠে দেখি আমাদের পাশের ঘর আবার খালি হয়ে গেছে।

খাটে বসে পকেট থেকে বাক্সটা বার করলাম। খুলে দেখি শুধু চশমা নয়, তার সঙ্গে
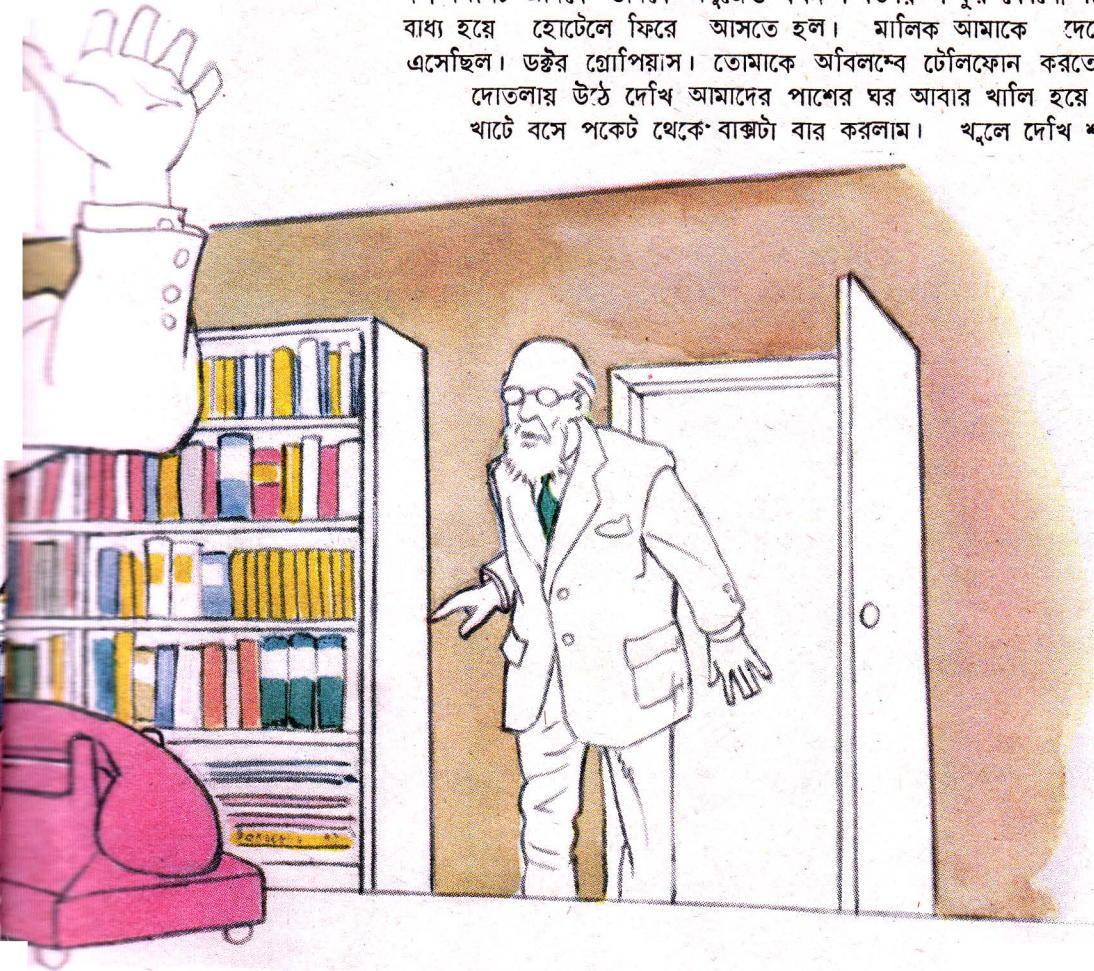
একটা ছোট্ট খামও রয়েছে। চশমাটা ঠিক আমার চশমারই মতো, কেবল কাঁচটা গ্রে রঙের। খামটা খুলতে তার থেকে একটা চিরকুট বেরোল, তাতে লেখা—'লাইব্‌নিৎস হলে বিজ্ঞান সভায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর শঙ্কুর চোখ থেকে খুলে পড়া চশমা-সংলগ্ন নাইলনের চুল।

নাইলনের চুল?

খামের ভিতরেই ছিল চুলটা। দেখতে ঠিক পাকা চুলেরই মতো বটে, কিন্তু সেটা যে কৃত্রিম তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই চুল থেকেই ফিংকেলস্টাইন বুঝে ফেলেছিল যে বক্তৃতাসভার শঙ্কু আসল-শঙ্কু নয়।

কিন্তু আমার এই সংকটে ফিংকেলস্টাইনের সাহায্য লাভের আর কোনো উপায় নেই।

ঘরের দরজা বন্ধ ছিল; তাতে হঠাৎ টোকা পড়াতে দুজনেই চমকে উঠলাম। এ সময় আবার কে এল?

খুলে দেখি গ্রোপিয়াস।

সামারভিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে গ্রোপিয়াসকে বসতে বললাম, কিন্তু সে বসল না। দরজার মুখে দাঁড়ান অবস্থাতেই বলল, 'আজ তোমাকে নিয়ে যাব বলেছিলাম, কিন্তু আজ ওয়েবারের একটু অসুবিধে আছে। তা ছাড়া আমার বাড়িতে আজ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আমার এক চাকর ফ্রান্‌ৎস কাল রাত্তিরে থ্রম্বোসিসে মারা গেছে। আজ তার শেষকৃত্য; আমায় উপস্থিত থাকতে হবে।'

এর উত্তরে আমাদের কিছু বলার নেই; কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর গ্রোপিয়াসই কথা বলল। এবার সে একটা প্রশ্ন করল।

'ফিংকেলস্টাইন মারা গেছে জান কি?'

আমি যে ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছিলাম সেটা পাশের ঘর থেকে একজন লোক শুনেছিল সেটা মনে আছে। সে যদি গ্রোপিয়াসের অনুচর হয়ে থাকে তাহলে আমার সাড়ে আটটায় অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কথা গ্রোপিয়াসের কানে পেঁৗছেছিল নিশ্চয়ই। তবুও আমি অজ্ঞতা ও বিস্ময়ের ভান করে বললাম, 'সে কি? কখন?'

'আজ সকালে। অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্স থেকে ফোন করেছিল এই কিছুক্ষণ আগে। ওর চাকর আনটন প্রথমে পুলিশে খবর দেয়, তারপর অ্যাকাডেমির প্রেসিডেণ্ট গ্রোসমানকে ফোন করে।'

আমরা দুজনে চুপ। গ্রোপিয়াস এক পা এগিয়ে এল।

'আনটন একজন লোকের কথা বলেছে—গায়ের রঙ ময়লা, মাথায় টাক, দাড়ি আছে, চশমা আছে; আজ সকালে ফিংকেলস্টাইনের বাড়িতে গিয়েছিল। তার নামটাও বলেছিল আনটন।'

'বর্ণনা যখন আমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তাহলে নামটাও মিলতে পারে,' আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম। 'আর সেটাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ সকালে সত্যিই গিয়েছিলাম ফিংকেল-স্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে সামারভিল ছিল। গিয়ে দেখি ফিংকেলস্টাইন মৃত। তাকে টুঁটি টিপে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।'

'প্রোফেসর শঙ্কু,' রক্ত জল করা গলায় বলল গ্রোপিয়াস, 'বক্তৃতায় ভাষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকদের আক্রমণ করা এক জিনিস, আর সরাসরি তাদের একজনকে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করা আরেক জিনিস।' তুমি নিজেই যখন বলছ তোমার মস্তিষ্কে কোনো গোলমাল নেই, তখন এই অপরাধের জন্য তোমার কী শাস্তি হবে সেটা তুমি জান নিশ্চয়ই?'

এবার সামারভিল মুখ খুলল। তারও কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

'ডক্টর গ্রোপিয়াস, আপনি যখন বক্তৃতার দিন মঞ্চ থেকে শঙ্কুকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার চোখ থেকে চশমাটি খুলে পড়ে যায়। ঘোলাটে কাঁচ, কতকটা সানগ্লাসের মতো। সেই চশমাটি ফিংকেলস্টাইন তুলে নেয়। চশমার ডান্ডায় একটি চুল আটকে ছিল। চুলটা নাইলনের। আজ ফিংকেলস্টাইনের চাকরের কথায় মনে হল শঙ্কুরই মতো দেখতে আরেকজন লোক আমাদের আধ ঘণ্টা আগে ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আমরা সিঁড়িতে তার জুতোর ছাপ দেখেছি। বাড়ির বাইরে এবং রাস্তাতেও দেখেছি। এই লোকটি যাবার কিছু-ক্ষণের মধ্যেই খুনটা হয়। আততায়ী দস্তানা পরেনি। তার আঙুলের স্পষ্ট ছাপ ফিংকেল-স্টাইনের গলায় ছিল। এই জাল-শঙ্কু যে-খুনটা করেছে, সেটা আপনি আসল শঙ্কুর ঘাড়ে চাপাবেন কি করে?'

গ্রোপিয়াস হঠাৎ হো হো করে এক অস্বাভাবিক হিংস্র তেজে হেসে উঠল।

'কী করে চাপাবো সেটা দেখতেই পাবে! কাল শঙ্কু আমার বাড়িতে বসে আমার পেয়ালা থেকে হট চকোলেট খেয়েছে, আমার ফোটো অ্যালবামের পাতা উলটে দেখেছে—এসবে কি আর তার আঙুলের ছাপ পড়েনি? আজকাল কৃত্রিম আঙুলের ছাপ তৈরি করা যায় প্রোফেসর সামারভিল!—হান্‌স গ্রোপিয়াসের আবিষ্কার এটা! ইতিমধ্যে ইউরোপের তিনজন সেরা ক্রিমিন্যালকে আমি এর উপায় বাতলে দিয়েছি!'

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি যে দরজার বাইরে গ্রোপিয়াসের আড়ালে আরেকটি লোক দাঁড়িয়ে
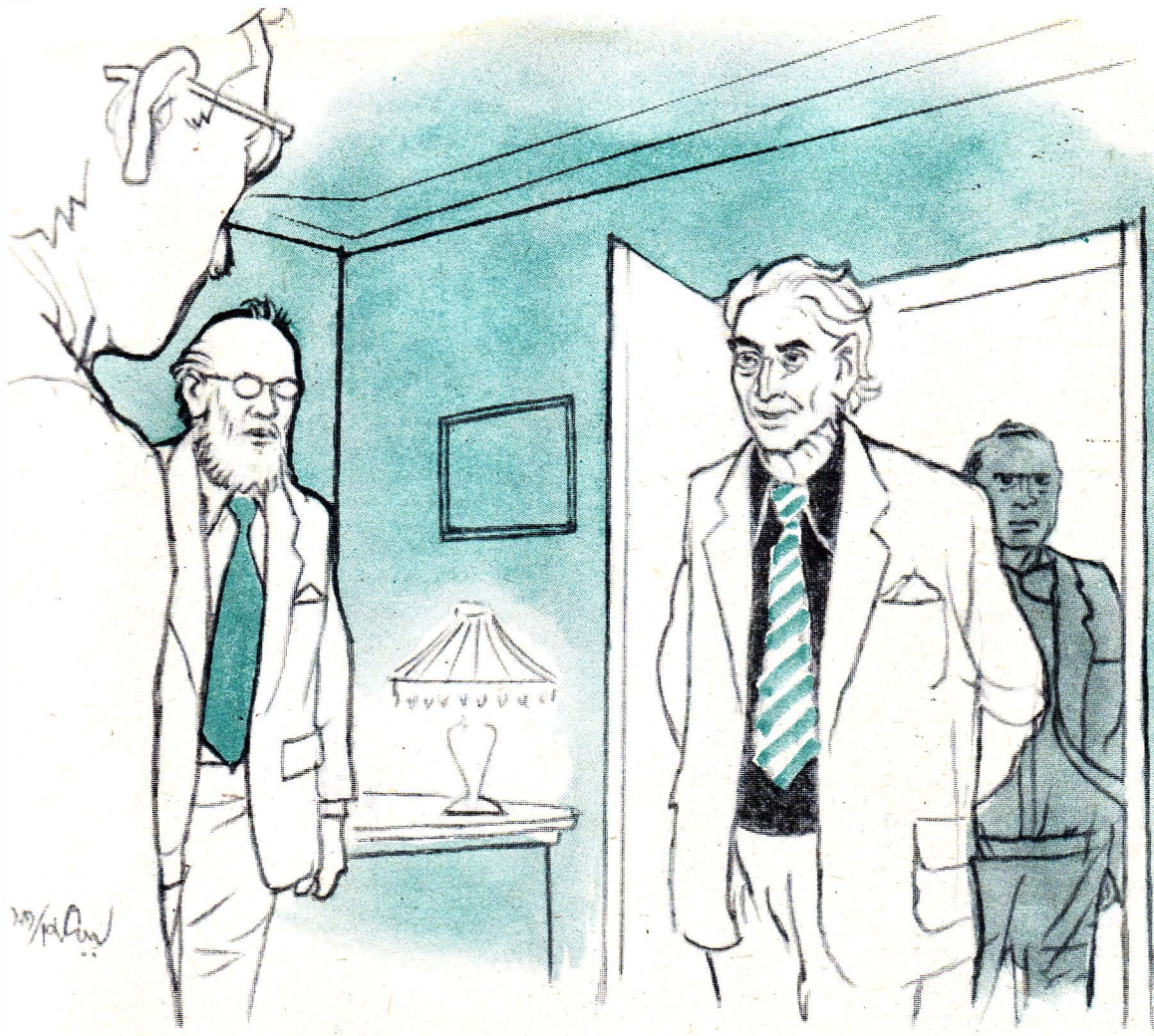
আছে পকেটে হাত দিয়ে। একে আমি চিনি। এই লোকই সেদিন পাশের ঘর থেকে আড়ি পেতেছিল।

'অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তোমার এই পরিণাম হতে চলেছে,' গ্রোপিয়াস আমার দিকে চেয়ে বলল। 'এই অবস্থায় পড়ে মাথা যদি সত্যিই খারাপ হয়, তাহলে অবিশ্যি ওয়েবারের ক্লিনিক রয়েছে; সেখানে আমারই আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে ব্রেন-সাপ্লান্টের কাজ শুরু হয়েছে। এবারে বোধহয় আর আমাকে টেক্কা দিতে পারবে না! গুড ডে, শঙ্কু! গুড ডে, প্রোফেসর সামারভিল!'

গ্রোপিয়াস আর তার অনুচর ছাদের সিঁড়িতে ভারি শব্দ তুলে নিচে নেমে গেল। আমি খাটে বসে পড়লাম। সামারভিল পায়চারি শুরু করেছে। দুবার তাকে বলতে শুনলাম—কী শয়তান! কী শয়তান!

আমি বুঝতে পারছি চারদিক থেকে জাল ঘিরে আসছে আমাকে। আঙুলের ছাপও যদি মিলে যায় তাহলে আর বেরোবার কোনো পথ নেই। যদি না—

যদি না জাল-শঙ্কুকে খুঁজে বার করে পুলিশের সামনে উপস্থিত করা যায়।

'ফাঁদে যখন পড়েছি,' পায়চারি থামিয়ে বলল সামারভিল, 'তখন ফাঁদের শেষ দেখে যেতে হবে। মরতে হলে লড়ে মরা ভালো, এভাবে নয়।'

বুঝলাম আমার বিপদকে নিজের ঘাড়ে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না সামারভিল।

চাবি দিয়ে সুটকেস খুলে রিভলভার বার করে সে পকেটে পুরল। বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিকারেও যে তার আশ্চর্য দখল সেটা সে ভিনিজুয়েলার জঙ্গলে অনেকবার প্রমাণ করেছে। আমিও আমার 'অ্যানাইহিলিন গান' বা নিশ্চিহ্নাস্ত্রটা সঙ্গে নিলাম। মাত্র চার ইঞ্চি লম্বা আমার এই আশ্চর্য অস্ত্রটি আমি পারতপক্ষে ব্যবহার করি না।

ঘরের দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমরা হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটা ট্যাক্সি দেখে সেটাকে হাত তুলে থামিয়ে এগিয়ে যেতে ড্রাইভার আমাকে দেখেই 'নাইন, নাইন' অর্থাৎ না না বলে মাথা নাড়ল। সেটাই আবার ইয়া ইয়া হয়ে গেল যখন সামারভিল তার হাতে একটা একশো গ্রোশেনের নোট গুঁজে দিল।

একটুক্ষণ আগেই একটা সাইরেনের শব্দ পেয়েছি; আমাদের ট্যাক্সিটা যখন রওনা হয়েছে
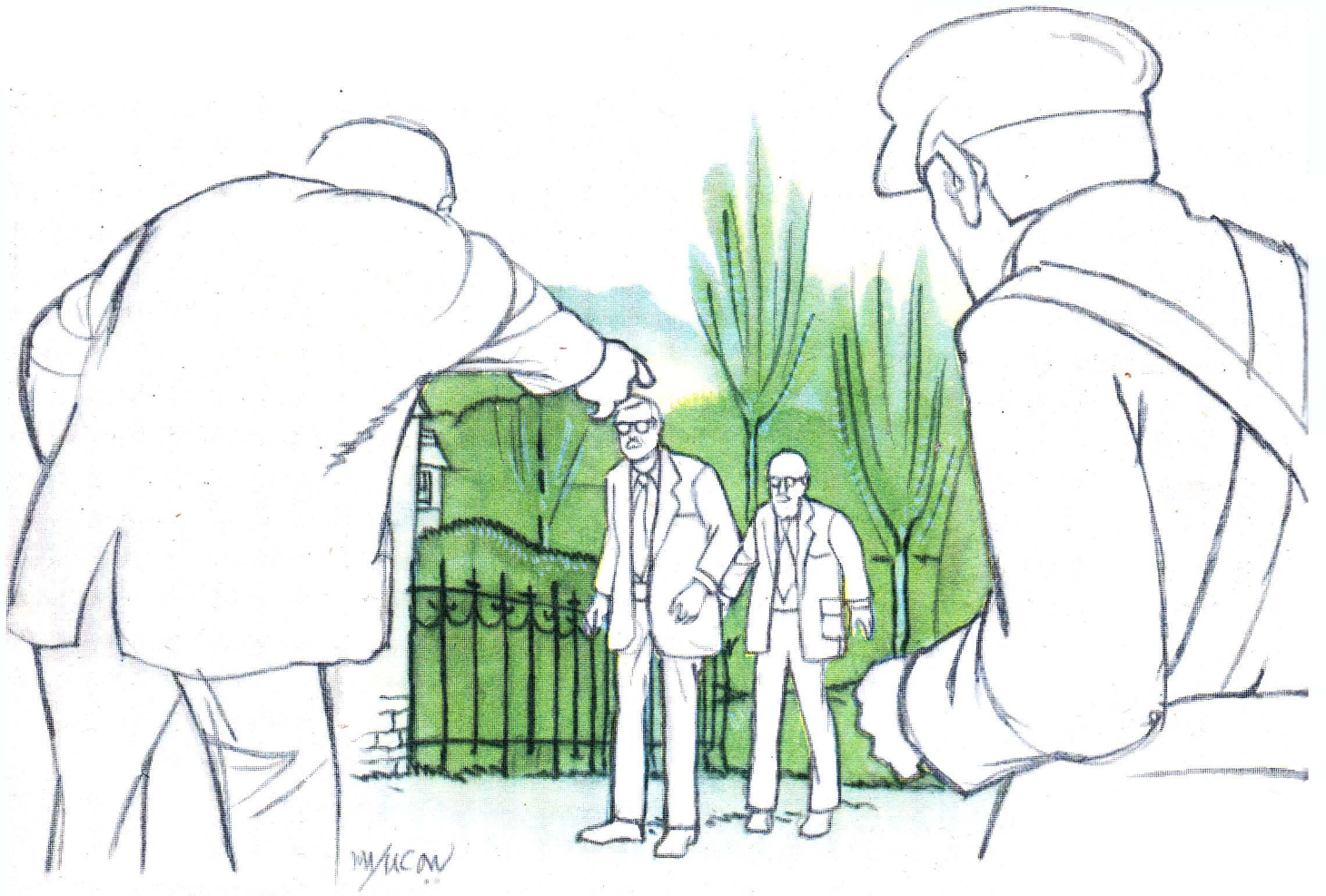
তখন দেখলাম একটা পুলিশের গাড়ি আমাদের হোটেলের দিকে যেতে আমাদের গাড়িটা দেখেই ব্রেক কষল।

সামারভিল এবার একটা দুশো গ্রোশেনের নোট ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বলল, 'খুব জোরে চালাও—গ্রুনেওয়াল্ডস্ট্রাসে যাব।'

সকালে রোদ বেরিয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি পশ্চিম দিক থেকে কালো মেঘ এসে আকাশটাকে ছেয়ে ফেলেছে। তার ফলে তাপমাত্রাও নেমে গেছে অন্তত বিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট। আমাদের মার্সেডিস ট্যাক্সি ঝড়ের মতো এগিয়ে চলল ট্র্যাফিক বাঁচিয়ে।

মিনিট দশেক চলার পর পিছনে দূর থেকে আবার সাইরেনের শব্দ পেলাম। সামারভিল ড্রাইভারের পিঠে হাত দিয়ে একটা মৃদু চাপ দিল। ফলে আমাদের গাড়ির গতি আরো বেড়ে গেল। স্পীডোমিটারের কাঁটা প্রায় একশো কিলোমিটারের কাছাকাছি পেঁছে গেছে। চালকের অশেষ বাহাদুরি যে আমাদের অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে বাঁচিয়ে সে বিশ মিমিটের মধ্যে এনে ফেলল গ্রুনেওয়াল্ডস্ট্রাসে-তে।

সামনে একটা মিছিল, তাই বাধ্য হয়ে গাড়ির গতি কমাতে হল। দশ-বারোজন লোক একটা কফিন নিয়ে বাঁয়ে গোরস্থানের গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল। তার মধ্যে দুজনকে চিনলাম—কাল যে চাকরটি হট চকোলেট এনে দিয়েছিল, এবং গ্রোপিয়াস নিজে।

আমাদের গাড়ি গোরস্থানের গেট ছাড়িয়ে গ্রোপিয়াসের গেটে পেঁছানর ঠিক আগে সামারভিল চেঁচিয়ে উঠল—

'স্টপ দ্য কার!—গাড়ি ব্যাক্ কর।'

বকশিস পাওয়া ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে ব্যাক্ করে গোরস্থানের গেটের সামনে এসে থামল। আমরাও নামলাম, আর সেই সঙ্গে সাইরেনের শব্দে গোরস্থানের স্তব্ধতা চিরে পুলিশের গাড়ি এসে আমাদের ট্যাক্সির পিছনে সশব্দে ব্রেক কষল।

গোরস্থানে একটা সদ্য-খোঁড়া গর্তের পাশে রাখা হয়েছে কফিনটাকে। শবযাত্রীদের সকলেই আমাদের দিকে দেখছে—এমনকি গ্রোপিয়াসও।

পুলিশের গাড়ি থেকে একজন ইন্স্পেক্টর ও আরো দুটি লোকের সঙ্গে নামলো ফিংকেলস্টাইনের ভৃত্য আনটন, এবং নেমেই আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'ওই সেই লোক।'

পুলিশ অফিসার আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

গোরস্থানে পাদ্রী তার শেষকৃত্য সুরু করে দিয়েছে।

'প্রোফেসর শঙ্কু? আমার নাম ইন্‌স্পেক্টর ডীট্রিখ। আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু—'

দুম্—দুম্—দুম্!

সামারভিলের রিভলভার তিনবার গর্জিয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনবার কাঠ ফাটার শব্দ।

'ওকে পালাতে দিও না!—সামারভিল চিৎকার করে উঠল—কারণ গ্রোপিয়াস গোরস্থানের পিছন দিক লক্ষ্য করে ছুট দিয়েছে। একজন পুলিশের লোক হাতে রিভলভার নিয়ে তার দিকে তীরবেগে ধাওয়া করে গেল। ইন্‌স্পেক্টর ডীট্রিখ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যে পালাবে তাকেই গুলি করা হবে।'

এদিকে আমার বিস্ফারিত দৃষ্টি চলে গেছে কফিনের দিকে। তিনটের একটা গুলি তার পাশের দেয়াল ভেদ করে ভিতরে ঢুকে গেছে। অন্য দুটো ঢাকনার কানায় লেগে সেটাকে দ্বিখণ্ডিত করে স্থানচ্যুত করেছে।

কফিনের ভিতর বিশাল দুটি নিষ্পলক পাথরের চোখ নিয়ে যিনি শুয়ে আছেন তিনি হলেন আমারই ডুপ্লিকেট—শঙ্কু নাম্বার টু।

এবারে সমবেত সকলের রক্ত হিম করে, ডীট্রিখের হাত থেকে রিভলভার খসিয়ে দিয়ে, পুলিশের বগলদাবা গ্রোপিয়াসকে অজ্ঞান করে দিয়ে, কফিনবন্ধ দ্বিতীয় শঙ্কু ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বুঝলাম তাঁর পাঁজরা দিয়ে গুলি প্রবেশ করে তাঁর দেহের ভিতরের যন্ত্র বিকল করে দিয়েছে; কারণ ওই বসা অবস্থাতেই গ্রোপিয়াস-সৃষ্ট জাল শঙ্কু তাঁর শরীরের ভিতরে রেকর্ড করা একটি পুরোন বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন—

'ভদ্রমহোদয়গণ!—আজ আমি যে কথাগুলো বলতে এই সভায় উপস্থিত হয়েছি, সেগুলো আপনাদের মনঃপূত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু—'

আমি আমার অ্যানাইহিলিন বন্দুকটি পকেট থেকে বার করলাম। আমার এই পৈশাচিক জোড়াটিকে পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারলে তবেই আমার মুক্তি।

সংকলন ও পরিচিতি ঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শমীর চিঠি

গতবার পুজো সংখ্যায় তোমরা রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতার কথা পড়েছিলে। এবারে তোমাদের বলব শমীন্দ্রনাথের কথা। রবীন্দ্রনাথের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথ; সংক্ষেপে 'শমী' নামেই তাঁর পরিচিতি। শমীর জন্ম ১৮৯৪ সালের ১২ ডিসেমবর। সে সময় রবীন্দ্রনাথ কখনও শিলাইদহে, কখনও কলকাতায় থাকতেন। ১৯০১ সালের ডিসেমবর মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। বিদ্যালয় স্থাপনের এক বছরের মধ্যেই কবিপত্নী মৃণালিনীদেবীর মৃত্যু ঘটল। শমী তখন সাত বছর এগারো মাসের শিশু। স্ত্রী-র মৃত্যুর আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বড় দুই মেয়ে মাধুরীলতা ও রেণুকার বিবাহ দিয়েছেন। মা মারা যাওয়ার পর রেণুকা আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পীড়িতা কন্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনও যান হাজারিবাগ, কখনও আলমোরা।

শমী ও মীরা

রেণুকাকে বাঁচাতে পারলেন না রবীন্দ্রনাথ। মায়ের মৃত্যুর নয় মাস পরেই রেণুকার অকাল-মৃত্যু হল। শোকার্ত রবীন্দ্রনাথ এবার শান্তিনিকেতনে 'নতুনবাড়ি' ও 'দেহলি'-তে মাতৃহীন পুত্রকন্যাদের নিয়ে জীবন কাটাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে দাদা রথীন্দ্রনাথের মতো শমীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করেছেন। ছাত্র, অধ্যাপক, সকলের প্রিয়জন হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর সরল শান্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখ, তাঁর নম্র-শিষ্ট ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করত। ছাত্রাবস্থায় জামাকাপড়ের কোনো বিলাসিতা তাঁর ছিল না, চালচলনে ছিল না লেশমাত্র অহংকার। নতুন ছাত্রদের দেখাশুনো করে, তাঁদের অসুবিধা দূর করে তিনি তৃপ্তি পেতেন। নতুন ছাত্রেরা শমীর সান্নিধ্যে বাড়ি ছেড়ে আসার দুঃখ ভুলে যেতেন।

শমীর মধ্যে দয়া-মায়া-করুণারও প্রকাশ দেখেছিলেন তাঁর সতীর্থ বন্ধুরা। গরিব-দুঃখীদের সেবা করার সুযোগ পেলে তিনি খুশী হতেন। অধ্যাপক ভূপেশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে প্রতি বিকালে যেতেন ভুবনডাঙা গ্রামে, সঙ্গে থাকত ওষুধের বাক্স। অসুস্থ লোকেদের মধ্যে প্রয়োজনমত সেই ওষুধ বিলিয়ে দিতেন, কখনও বা অসহায় রোগীকে বিছানায় বসিয়ে নিজে হাতে ওষুধ খাইয়ে দিতেন। শরীর দুর্বল ছিল বলে খেলাধুলোর সুযোগ পেতেন না তিনি, তাই বিকালে খেলার মাঠের পরিবর্তে রওনা দিতেন কাছাকাছি গ্রামের দিকে। প্রখ্যাত শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে তাঁর সহপাঠী। তিনি লিখছেন, "বিকেল হলেই আমরা ছেলের দল ছুটি খেলতে। শমী যায় না। সে তার নরম তুলতুলে দু' হাতের ভিতর একটি শক্ত কাঠের বাক্স নিয়ে গ্রামের মেঠো পথে পা বাড়ায়। প্রথম প্রথম অবাক হতাম। পরে জানলাম, রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি ওষুধভর্তি ওই কাঠের বাক্সটি ওর হাতে ধরিয়ে দেন। সে-ও পরম আনন্দে বাক্সটি হাতে তুলে নেয়। কোথায় কোন্ গ্রামে কার পেটের অসুখ, কোথায় কার কাশি সর্দি, কার চর্মরোগ সব দেখেশুনে বাবামশাইয়ের নির্দেশ-মতো ওষুধ দেয় দশ বছরের শমী অর্থাৎ শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যার কাছে খেলার মাঠে খেলতে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী মজার ব্যাপার গ্রামের রাঙামাটির পথে ঘোরা আর অসুস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে ওষুধ বিলি করা।"

মীরা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "শমী যখন স্কুলে যেত গান গাইতে-গাইতে যেত। তার গলা মনে হয় যেন বাড়ির আশে-পাশে এখনো দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি। তার গলা ছিল ভারি মিষ্টি। শরীরটা তার বেশি সবল ছিল না। আমরা যখন মেজো মা জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে ছিলুম, তখন নতুন জ্যাঠামশায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে 'পুরাতন-ভৃত্য' আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন। যখনি নতুন জ্যাঠামশায়ের বন্ধুবান্ধবরা আসতেন, শমীকে দিয়ে 'পুরাতন-ভৃত্য' আবৃত্তি করিয়ে তাঁদের শোনাতেন। শমী যখন হাতের ভঙ্গি করে 'কেষ্টা ব্যাটাই চোর' বলত তখন তাঁরা তার অভিনয়-ভঙ্গি দেখে না হেসে পারতেন না। তাছাড়া 'বিসর্জন' নাটকের কিছু কিছু পাঠ তার মুখস্থ ছিল। শান্তিনিকেতনে দাদারা একবার 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় করেছিলেন। সেই অভিনয় দেখে শমী একাধারে দু-তিনটা পাঠ আয়ত্ত করে নিয়েছিল। শমী কতকটা বাবার গুণ পেয়েছিল। মনে হয় বড়ো হলে ও বাবার মতো ভালো অভিনয় করতে পারত।"

দাদা রথীন্দ্রনাথও তাঁর 'পিতৃস্মৃতি'তে লিখেছেন, "অত অল্প বয়সেই তার (শমীর) তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তার রসগ্রাহী মনের পরিচয় পেয়ে আমি মাঝে মাঝে চমকে উঠতুম। বড় হলে সে যে কবি হবে, বাবার প্রতিভা তার মধ্যেই প্রকাশ পাবে, আমার সন্দেহ ছিল না।"

ঘোড়ার পিঠে শমী। পাশে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে শমীন্দ্রের বড় দান হল ঋতু-উৎসবের প্রবর্তন। এখন তো সারা দেশে বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব—ঋতুতে ঋতুতে উৎসবের আয়োজন হয়। তাতে তোমরাও যোগ দাও—কেউ নাচের দলে, কেউ গানে, কেউ-বা আবৃত্তিতে। শান্তিনিকেতন থেকেই ঋতু-উৎসব এখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, ঋতু-উৎসবের প্রবর্তক শমীন্দ্রনাথ। ১৯০৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীপঞ্চমী (সরস্বতী পুজোর দিন) উপলক্ষে শমীন্দ্রনাথ ঋতু-উৎসবের আয়োজন করলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। শমী ও আরো দু'জন ছাত্র 'বসন্ত' সাজেন, একজন সাজেন 'বর্ষা' আর তিনজন হন 'শরৎ'। শান্তিনিকেতনের সবচেয়ে পুরোনো ছাত্রাবাস 'আদিকুটির'-এর ঘরে মঞ্চ সাজিয়ে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। বসন্তকালের সূচনায় উৎসব—তাই যাঁরা 'বসন্ত' সেজেছিলেন তাঁরা বসন্ত ঋতুর ফুলের মুকুট মাথায় দিয়ে, হাতে ফুলের সাজি নিয়ে মঞ্চে ঢোকেন। সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলায় ঋতুস্তব আবৃত্তি করেন কয়েকজন ছাত্র। আবৃত্তির পর গান। শমীন্দ্রনাথ একা "এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে/ আনন্দ বসন্ত সমাগমে" গানটি করেন। অনুষ্ঠানের সমগ্র পরিকল্পনাও তাঁর। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে ফিরে অনুষ্ঠানের বর্ণনা শুনে উৎসাহিত হন। পরের বছর তাই তিনি বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেনের সাহায্যে 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবের আয়োজন করলেন। কিন্তু সেই উৎসবে যোগ দেওয়ার সুযোগ শমীর ভাগ্যে ঘটেনি। তার বহু আগে, ঋতু-উৎসব-প্রবর্তনের নয় মাস পরেই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মর্তের বন্ধন ছিন্ন করে শমীকে বিদায় নিতে হয়েছে।

১৯০৭ সালের পুজোর ছুটি। শমী তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ভোলার সঙ্গে মুঙ্গেরে বেড়াতে যান। ভোলা অর্থাৎ সরোজচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র। মুঙ্গেরে ভোলার মামার বাড়ি। নতুন জায়গায় গেলে শমীর স্বাস্থ্য ভালো হবে, এই ভেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে-আশা পূর্ণ হল না। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের কাছে টেলিগ্রাম পৌঁছল, শমীর কলেরা হয়েছে। তক্ষুনি তিনি ছুটলেন মুঙ্গের। কিন্তু সকলের শুভকামনা নিষ্ফল করে ২৩ নবেম্বর ৭ অগ্রহায়ণ রাত্রে মাত্র তেরো বছর বয়সে শমী শেষ নিশ্বাস ফেললেন। ঠিক পাঁচ বছর আগে এমনই এক সাতই অগ্রহায়ণ শমীর মা মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ঘটেছিল। কী আশ্চর্য যোগ।

পুত্রশোকাতুর রবীন্দ্রনাথ পরের দিনই মুঙ্গের থেকে শান্তিনিকেতনের দিকে রওনা দিলেন। রাত্রে ট্রেনে আসতে আসতে দেখলেন জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে,কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। তাঁর মন বললে, কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।

এই সংকল্প নিয়ে শোকাহত শান্তিনিকেতনে পৌঁছলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলেছেন আশ্রমের অধ্যাপকদের সঙ্গে। তাঁরা তো স্তম্ভিত রবীন্দ্রনাথের শান্ত-সংযত ব্যবহার দেখে। কেবল তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন দেখা করতে এলেন, তখন তাঁর চোখে দেখা গেল জলের রেখা। বড়দাদাও শোকাবিমূঢ়—কেবল ছোটভাইয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর বার বার অস্ফুট স্বরে বলছেন "রবি! রবি!" এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে যাঁর সঙ্গে শমীন্দ্রনাথ ভুবনডাঙা বিদ্যালয়ে পড়াতে যেতেন। একটি পুঁটুলি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, শমীর এই জামাকাপড়গুলো ভুবনডাঙার ছাত্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিও।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা শমীর স্কেচ

কিন্তু বাইরে যতই শান্ত অবিচল থাকুন, ভিতরে-ভিতরে শমীকে হারানোর শোক তাঁকে দগ্ধ করেছে সারাজীবন ধরে। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেও একান্ত নিভৃতে যখনই শমীকে স্মরণ করেছেন, তখন আর রবীন্দ্রনাথের চোখের জল বাধা মানেনি। সেই বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্র-অনুরাগী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। তিনি লিখেছেন, "শমী মারা যাওয়ার সময় কবিকে কেউ বিচলিত হতে দেখেনি। অথচ তার অনেক বছর পরে শমীর কথা বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে এল, তাও একদিন দেখেছি।"

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' নামে একটি কবিতার বই আছে। তোমাদের অনেকেরই ওই বইটির সঙ্গে পরিচয় রয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই ওই বইয়ের সেই 'খোকা'-কে চেনো
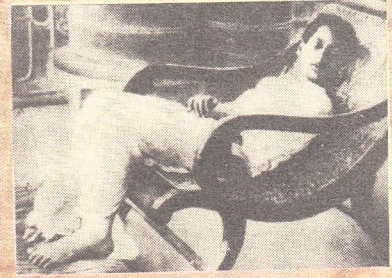
ইজিচেয়ারে শুয়ে শমী

যে 'বীরপুরুষ'-এর মতো তার মা-কে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করবে বলে কল্পনা করছে। আবার কখনো সেই খোকাই 'বাবার মতো' হয়ে দাদাকে 'তুমি ভারী দুষ্টু ছেলে' বলে বকুনি দেয়, কখনো বা 'রামের মতো' বনবাসে যেতে চায়, কিংবা বড়ো হয়ে 'খেয়াঘাটের মাঝি' হবার বাসনা জানায়। মায়ের কাছে তার কত আবদার, কত বায়না, কত দাবি! এই 'খোকা'-ই হলেন শমীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা স্বীকার করেছেন। তাঁর এক বন্ধুপত্নী নালিশ করেছিলেন—আপনার 'শিশু'-র কবিতাগুলিতে 'খোকা'-ই নায়ক, 'খুকি'র স্থান নেই কেন? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমার কবিতাগুলি সবই খোকার অর্থাৎ শমীর নামে। কবিতাগুলি যখন লিখেছিলাম তখন শমী ও তার মায়ের জীবনটাই আমার সামনে ছিল।" খুব সুন্দর ভাষায় কৈফিয়ত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছিলেন, "খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠমধুর সম্বন্ধ সেইটি আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী—তখন খুকী ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই [শমীন্দ্র] তখন চক্রবর্তীসম্রাট ছিল। সেইজন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারি নে।"

শমীন্দ্রনাথের লেখা কয়েকটি চিঠি এখানে ছাপা হল। তিনি যে বানান লিখেছিলেন, তা আমরা পালটাইনি।

শমীর নোটবুক খাতা ও ঠিকুজি

শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায় শমীর একটি নোটবুক, একটি এক্সারসাইজ খাতা ও তাঁর ঠিকুজি সযত্নে রক্ষিত আছে।

নোটবুকটির সাইজ ৬১/২×৪ ইন্‌চি, মলাট বাদামী রঙের। মলাটের উপরে 'বন্দেমাতরম্' লেখা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় নোটবুকটি কেনা। মলাট উলটালে বাঁদিকে চোখে পড়বে যে-দোকান থেকে কেনা তার নাম—'জ্ঞানালয়'—৪ কলেজ স্কোয়ার। ডানদিকের পাতায় ইংরেজীতে শমীর হাতে লেখা Note Book — Shamindranath Tagore—Santiniketan.

এই নোটবুকটি হল শমীর গানের খাতা। সে-সময়ে তাঁর বাবা যে-সব গান রচনা করেছেন সেগুলিই শমী লিখে রেখেছেন। সূচীপত্র-ও আছে। দশটি পুরো গান আর একটি গানের প্রথম চারটি চরণ লেখা আছে। প্রত্যেকটি গানের শেষে 'শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর'—স্বাক্ষর আছে। তাঁর বাবার মতো সেই স্বাক্ষর।

গানগুলি হল—সার্থক জন্ম, পথের গান, সোনার বাংলা, দেশের মাটি, দ্বিধা, অভয়, হবেই হবে, বাউল, একা, মাতৃমূর্তি। একাদশ-সংখ্যক গানটির উপরে লেখা আছে **বাউল:** "যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক/আমি তোমায় ছাড়ব না মা।"—এই গানের প্রথম চার চরণ।

নোটবুকের শেষদিকে আবার আছে একটি ব্রহ্ম-সংগীত—"বিপদে মোরে রক্ষা কর"—সমগ্র গানটিই আছে। গানের উপরে লেখা আছে "ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।"

একসারসাইজ বুকটির প্রথম কয়েক পাতা নেই। মনে হয় এটি তাঁর বাংলা খাতা। তাঁর বাবার লেখা বিদ্যালয়-পাঠ্য রচনা 'রোগশত্রু'র (পাঠপ্রচয় গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে) শেষাংশ শমীর হাতে নকল করা খাতার প্রথমেই আছে। তারপরেই 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি নকল করে রেখেছেন। বাকি পৃষ্ঠাগুলি সাদাই রয়ে গেছে। খাতাটি রবীন্দ্রভবনকে দান করেছেন ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি শমীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ছাত্র ছিলেন।

খাতা ছাড়া আছে শমীর ঠিকুজি।

তবে শমীর সেই সাদাখাতার ডায়েরি আমরা পাইনি। সেই ডায়েরি সম্বন্ধে শমীর শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—শমীর মৃত্যুর পর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সেই ডায়েরির পাতা উল্টাতে উল্টাতে দেখেন ঠিক যেদিন শমী মারা গেছেন, সেইদিন পর্যন্ত ডায়েরিতে তারিখ আছে তারপরে আর নেই। রবীন্দ্রনাথ তা দেখে মন্তব্য করে-ছিলেন—"এর থেকে মনে হয় এমন একজন আছেন যাঁর কাছে আমাদের ভবিষ্যৎ-ও অজানা নয়।"

স্বীকৃতি

শমীন্দ্রনাথের তিনখানি ও রথীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে সযত্নে রক্ষিত আছে। বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ সুরজিৎচন্দ্র সিংহের সম্মতিক্রমে আমরা চিঠিগুলি প্রকাশ করছি। এর জন্য ডঃ সিংহের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সংকলন ও শমীন্দ্র-পরিচিতি রচনার কাজে রবীন্দ্রভবনের কর্মিগণ সাগ্রহে সহায়তা করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আলোকচিত্রগুলি তুলেছেন বিশু পাল।

শমীর চিঠি

গাছে গোলাপফুল
এখনও ফোটেনি
কদমফুলও ফোটেনি
খালি বকুলফুল
ফুটেছে জ্যাম অনেক
দিন ফুরিয়ে গেছে

ইতি তোমার শমী
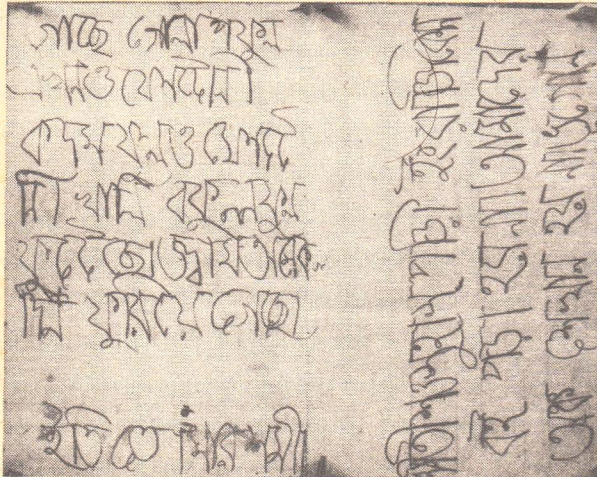
রবীন্দ্রনাথকে লেখা শমীর চিঠি

১

রবীন্দ্রনাথকে লেখা শমীন্দ্রনাথের চিঠি

ওঁ

বোলপুর
শনিবার

বাবা,

আগেকার মত আমরা এখনও হ্যান্‌রাইটীং লিখি। আমাদের ক্লাসে ভোলা পটল আমি প্রফুল্ল ক্ষীতীশ ও সুহাস পড়ি। ইংরাজি কোন বই পড়া হয় না। আমাদের অঙ্ক শেখান হয় না। ভূগোল ইতিহাস্‌-ও পড়া হয় না। বাংলাও পড়া হয় না। উমাচরণ ভাল আছে। বৃষ্টির সময় ঘরের ভিতর পড়ি। দিদিমার বাগানে এখন কিছু তরকারি হয়নি। গোলাপ গাছে গোলাপ ফুল এখনও ফোটেনি। কদম ফুলও ফোটেনি। খালি বকুল ফুল ফুটেছে। জ্যাম [জ্যাম ?] অনেকদিন ফুরিয়ে গেছে।

ইতি তোমার শমী

২

দিদিমা রাজলক্ষ্মী দেবীকে লেখা শমীন্দ্রনাথের চিঠি

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
৮ই আশ্বিন। ১৩১৪
বুধবার
25th Sept. 1907

শ্রীচরণেষু,

দিদিমা, কিছুদিন হ'ল তোমার একটা চিঠি পেয়েছি, কিন্তু Examination এর হাঙ্গামায় উত্তর দিতে পারিনি। সোমবার থেকে ক্রমাগত Examination হচ্ছে—একটুও সময় নেই। সোমবার দিন প্রথম দুই ঘন্টা অঙ্কের Examination হল। তারপর ১½ ও ১½ ঘন্টা ইতিহাসের পরীক্ষা হল। তার (পর) ২½ থেকে ৪½ পর্যন্ত ইংরাজীর পরীক্ষা হল। তারপর কাল প্রথম দুই ঘন্টা সংস্কৃতর পরীক্ষা হল, তারপর বাংলার পরীক্ষা হল। দুপুরবেলা ২½ থেকে ৪½ পর্যন্ত ভূগোলের পরীক্ষা হল। তারপর আজ একটু সময় পেয়েছি। আবার কাল থেকে পরীক্ষা আরম্ভ হবে। তোমরা কেমন আছ? আমরা ভাল আছি।

ইতি
শ্রীশমীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ—বাঘু ভাল আছে। ভূপেশবাবু ভাল আছেন। বড় বৌঠান, কমলা ভাল আছেন্। শমী

৩

বড়দিদি মাধুরীলতাকে লেখা শমীন্দ্রনাথের চিঠি

ওঁ

শ্রীচরণেষু

দিদি, পর্শু থেকে ক্রমাগত Examination—তাই চিঠি লিখ্‌তে পারিনি। তোমার ছাত্রদের বড়বৌঠান পড়ান্, তাদেরও Examination হয়েছিল। অবিশ্যি মুখে মুখে। তারা সবাই পাস্। প্রভব ১০ এর মধ্যে ৯½ পেয়েছে। শশাঙ্কও

...বে ভাল পেরেছে। তাদের জন্য আর একটা Reader এসেছে। তার নাম—Macmillan's New Literary Reader.

হীরেন চলে গেছে। তার সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে।

রামকৃষ্টর ফের opporation করা হয়েছিল। এখন ভাল আছে। ভয়ানক দুর্ব্বল হয়ে গেছে।

ইতি
শ্রীশমীন্দ্রনাথ

মীরাদিদি,

আজকে আবার দাদাদের চিঠি লিখতে হবে তোমাকে আর লিখতে পারলুম না।

ইতি
শ্রীশমীন্দ্র

৪

জনৈক অধ্যাপককে লেখা শমীন্দ্রনাথের চিঠি

ওঁ

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
২১এ আশ্বিন, ১৩১৪
মঙ্গলবার

শ্রীচরণেষু,

মাস্টার মহাশয়, সব ছেলেরাই চলে গেছে—কেবল আমি আর প......দাদা আছি। আমি উপরে বাবার ঘরে শুই এবং পড়াশোনা করি। খাতা বই প্রভৃতি-ও এইখানেই থাকে। পটলদা, নীচের ঘরে থাকে। তারও বই প্রভৃতি এখানেই থাকে। শ্যামদা, মন্মথ প্রভৃতি মালদহের ছেলেরা ছিল—কাল তারা চলে গেছে।***

পর্শু আমরা চণ্ডীদাসের ভিটা দেখতে গিয়েছিলাম, সেটা এখান থেকে ১২ মাইল দূরে। ৩টা গরুর গাড়ী এসেছিল। ভূপেনবাবু, জগদানন্দবাবু, তারিণীবাবু, শাস্ত্রী মহাশয়, ভূপেনবাবুর একজন বন্ধু, পূর্ণবাবু, শ্যামদা, মন্মথ, পটলদা, হিমাংশুদা, ভবানীদা, আমি তাতে চড়ে ৫।৬ মাইল একটু রৌদ্র পড়লে হেঁটে আরও ৫।৬ মাইল গিয়ে নান্নুর গ্রামে পৌঁছলাম। নান্নুরেই চণ্ডীদাসের ভিটে। গ্রামটি মন্দিরে পূর্ণ। এক জায়গাতেই প্রায় ১৪।১৫টি মন্দির রয়েছে। সেই মন্দিরগুলোর পাশে একটা একতলা-সমান ঢিপি। তাতে অনেক ইট প্রভৃতি পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হয়, বহুকাল পূর্বে এখানে কোন বাড়ী ছিল। লোকে বলে সেইখানে বিশুলা দেবীর মন্দির ছিল আর সেখানটাকেই চণ্ডীদাসের ভিটা বলে। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছাতনা। কিন্তু তিনি ভ্রমণ করতে করতে এই গ্রামে এসে নির্জন দেখে বিশুলা দেবীর মন্দিরে অবস্থান করেন। বিশুলা দেবীর মন্দির এখন সেই ভিটার পাশেই। সেই গ্রামটি বেশ নির্জন। যখন সেখান থেকে বাড়ী ফিরি, তখন রাত্রি সাড়ে তিনটা। সেখানে কিছু মুড়ি কিনিয়া খাইয়াছিলাম।

কাল ভোরে জগদানন্দবাবুর সঙ্গে আমি আর পটলদা বারহারওয়া যাব। আপনি কেমন আছেন? ভোলা কেমন আছে? জ্যাঠামহাশয়, জ্যাঠাইমা প্রভৃতি কেমন আছেন? আমরা সকলে ভাল আছি। ইতি—

প্রঃ শ্রীশমীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ—মামাকে চিঠি লেখা হয়নি। ২।১ দিনের মধ্যে লিখব। তাঁদের ঠিকানাটা লিখে পাঠাবেন। আপনি কি সমস্ত ছুটি ওখানে থাকবেন? ইতি—

প্রঃ শমীন্দ্র

৫

শমীন্দ্রনাথকে লেখা দাদা রথীন্দ্রনাথের চিঠি

ভাই শমী, তোমার ছবি ও চিঠি পেয়েছি। তোমাকে চিঠি না লিখে এই ছবিটা পাঠাচ্ছি, এই ছবি থেকে চট্ করে যেরকম বুঝতে পারবে, চারপাতা বরফের বর্ণনা থেকে সেরকম বুঝতে পারতে না, তাই চিঠি লিখলুম না। আজ কিন্তু আর এরকম বরফ নেই, সব গলে যাচ্ছে। আমরা ভাল। ইতি—

দাদা

সোমবার, ৯ই পৌষ

পত্র পরিচিতি

॥ পত্র ১ ॥

শমীন্দ্রনাথ যখন এ-চিঠি লেখেন তখন তাঁর বাবা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আলমোরায়। মৃত্যুপথ-যাত্রিণী মাতৃহীনা মধ্যমা কন্যা রেণুকার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যেই সেখানে যান। শমীন্দ্রনাথকে রেখে যান শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে। শমীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৮ বছর ৪ মাস। চিঠিতে যাঁদের নাম আছে তাঁদের মধ্যে **পটল** হলেন অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ত্রিগুণানন্দ রায়। **ক্ষিতীশ**-এর সম্পূর্ণ নাম ক্ষিতীশচন্দ্র মুস্তাফি। **উমাচরণ** রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য। **দিদিমা** হলেন শমীন্দ্রনাথের মা মৃণালিনীদেবীর গ্রাম-সম্পর্কে পিসিমা রাজলক্ষ্মীদেবী।

॥ পত্র ২ ॥

মৃত্যুর পূর্বে মৃণালিনীদেবী তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করার ভার দিয়ে যান রাজলক্ষ্মীদেবীর উপরে। পত্নী-বিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন-সংসারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন রাজলক্ষ্মীদেবীকে। তাঁকেই ছেলেমেয়েরা দিদিমা বলে সম্বোধন করতেন।

এই চিঠিটি শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাস দুয়েক আগে লেখা।

বাসু : শমীর পোষা কুকুর।

ভূপেশবাবু : শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভূপেশচন্দ্র রায়।

বড় বৌঠান : শমীন্দ্রনাথের বড় জ্যাঠামহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী হেমলতাদেবী।

॥ পত্র ৩ ॥

দিদিমার চিঠির সঙ্গে একই কাগজের অন্য পাতায় এই চিঠিটি লেখা। নীচেই লিখেছেন ছোটদিদি মীরাকে।

তোমার ছাত্রদের : মাধুরীলতা যখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন তখন শিশুদের ক্লাস নিতেন। সেই ক্লাসের খবরই এখানে শমীন্দ্রনাথ দিয়েছেন।

দাদাদের চিঠি : দাদা রথীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায়। সেখানে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা পড়ছেন।

॥ পত্র ৪ ॥

এই চিঠিটিও মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে লেখা। এই চিঠি লেখার কিছুকাল পরেই শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে যান, যেখানে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। চিঠিটি সুধীরচন্দ্র করের "শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা" বইয়ে ছাপা হয়েছে। তবে 'জনৈক অধ্যাপক'কে তা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত ওই অধ্যাপকের নাম নগেন্দ্রনাথ আইচ।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যাঁদের কথা, তাঁদের মধ্যে **ভূপেনবাবু** হলেন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, **শাস্ত্রীমহাশয়** হলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। এঁরা প্রত্যেকেই শান্তিনিকেতনের খ্যাতনামা অধ্যাপক।

ভোলা : সরোজচন্দ্র মজুমদার, শমীন্দ্রের সহপাঠী।

জ্যেঠামহাশয় : রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

মামা : নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। মৃণালিনীদেবীর সহোদর ভাই।

॥ পত্র ৫ ॥

দাদা রথীন্দ্রনাথ বরফ-ঢাকা ছবির নীচে এই ছোট্ট চিঠিটি লিখেছেন। তখন তিনি আমেরিকায় পড়তে গিয়েছিলেন।

বসুধৈব কুটুম্ বকম্

সুবোধ ঘোষ

একটা বক এসেছে।

কবে এসেছে?

নন্দু আর রামুয়া জবাব দিল—এই তো দিন-পাঁচেক আগে।

একটা বকের আবির্ভাবের ঘটনা যে এত বড় একটা বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে, সেটা আগে কখনও কল্পনা করেনি রামতনু, তসীলদার রামতনু। কিন্তু নন্দু আর রামুয়ার চোখ মুখের চেহারা দেখে বেশ স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে যে ওদের মনের ভিতরে বেশ জোরে একটা আশ্চর্যের বাতাস বইছে। কিন্তু এই আশ্চর্যের সবটাই একটা খুশির কাণ্ড বলে সবারই বোধ হয়েছে কি? না, তা নয়। কারও ধারণা, এটা ভেলাডিহির এই নিরালা জংগলের জীবনে একটা ভাল ঘটনার আগাম ইঙ্গিত। কিন্তু কী ধরণের ভাল ঘটনা? এ বছরে ভেলাডিহির মকাই আর বজরার দুগুণ ফলন হবে, এরকম কোন সৌভাগ্যের ঘটনা কি? না, তাও নয়। তবে কি খারাপ ঘটনার ইঙ্গিত? বৃষ্টি হবে না, আর চষা ক্ষেতের মাটি জো হারিয়ে একবারে শুকনো ছাইয়ের মতো একটা বস্তু হয়ে যাবে? না, তাও নয়।

ভাণ্ডারীজীর চাকর নন্দু, কাঠকাটা কাণা লালজিয়া ও শালের ধুনো যোগাড় করে প্রতি মঙ্গলবারে পাঁচ ক্রোশ দূরের ধনপুরের হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে অন্তত দশটা পয়সা রোজগার করে যে লোকটা, চাকর নন্দুরই শ্বশুরাল গাঁ সম্পর্কে শালা হয় যে রামুয়া, তাদের সবারই মনের ভিতরে যেন একটা চিন্তা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এ কেমন লক্ষণ? কিসের লক্ষণ? হঠাৎ কেন এবং কোথা থেকে একটা বক এসে ভেলাডিহির একটা বুড়ো শালগাছের কাঁধের উপর মস্তবড় একটা ফাটলের মধ্যে ঠাঁই নিল? শাল গাছটা দাঁড়িয়ে আছে তসীলদার রামতনুর কাছারিঘরের ঠিক পিছনের উইঢিবিগুলির মাঝখানে। বক কি উই খেতে ভালবাসে? না, বকের এরকম অদ্ভুত অভ্যাসের কথা তো কখনও ওরা শোনেনি। শুধু জানা আছে যে, বকেরা মাছ ভালবাসে।

এই তো ক'দিন আগে, হোলির দিনে এই তিনজনেই কাছারী ঘরের বারান্দার উপর হাততালি দিয়ে নেচেছিল আর গান গেয়েছিল—নদী কিনারে বগুলা বৈঠে, মছলি
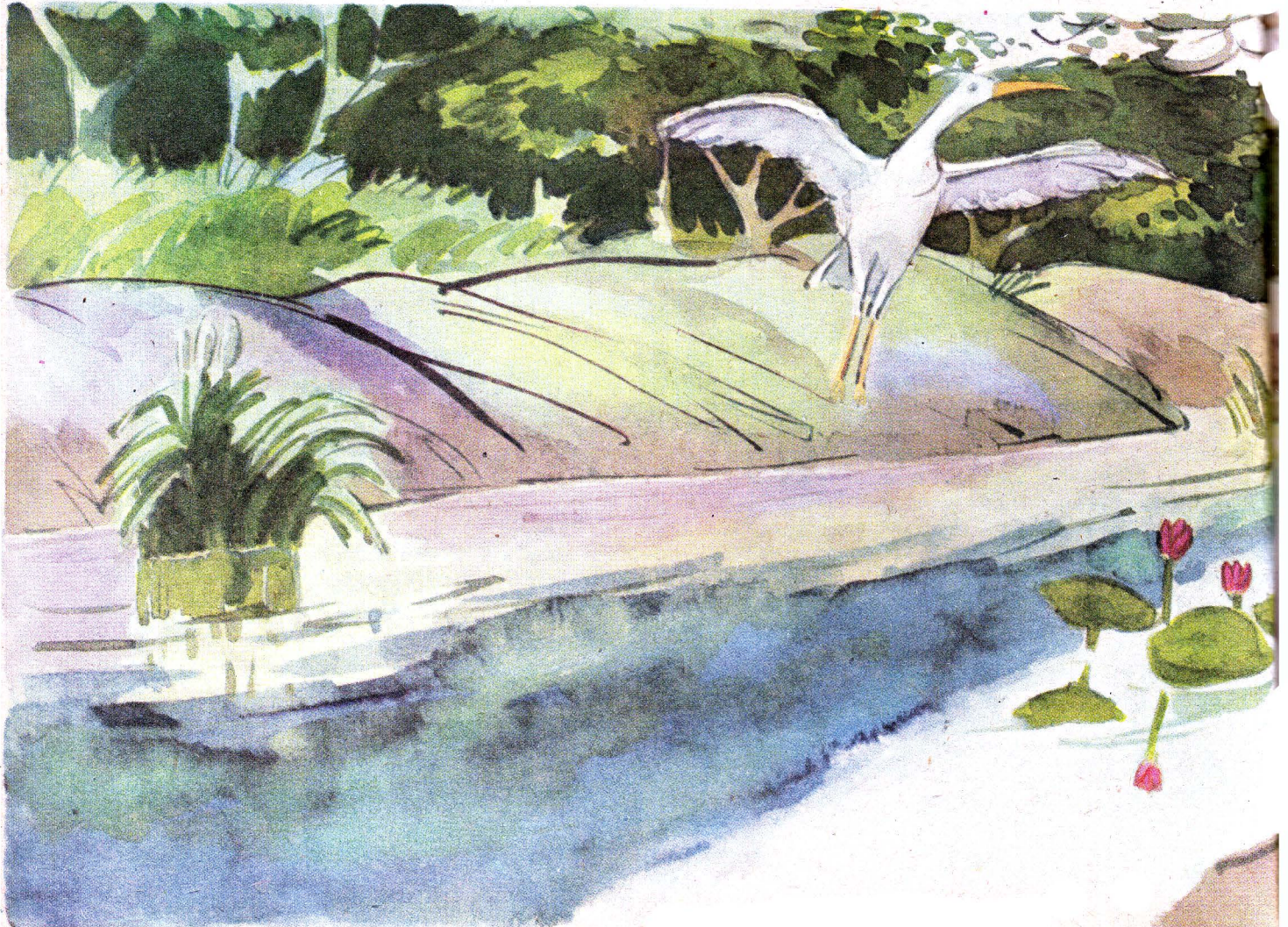
চুনি চুনি খায়। গানটাকে শুনতে রামতনুর একটুও ভাল লাগেনি।

সেই গানের শেষ দিকের ভাষাটা শুনতে যতই খারাপ লাগুক, আগন্তুক এই বকটাকে দেখতে রামতনুর একটুও খারাপ লাগা দূরে থাকুক, খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু নন্দ, রামুয়া ও লালজিয়ার মতো আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে শুরু করেনি যে, এই বকের আগমন হয় একটা খুব ভাল লক্ষণ নয়তো খুব একটা মন্দ সংকেত। রামতনুর মনের মধ্যে ছেলেবেলার একটা প্রিয় ছড়ার ভাষা গুন্‌গুন্‌ করেঃ—

বক মামা বক মামা
মাছ দিয়ে যা
বউ দেবে আলো চাল
ঘরে নিয়ে খা॥

বক মামা মাছ দিয়ে যাবেন, এবং মানুষের ঘরের বউ খুশি হয়ে বক মামাকে কিছু আলোচাল দিয়ে দেবে। ঘরে ফিরে গিয়ে আলো চাল খাবেন বকমামা। সেই ছেলে-বেলার জীবনে মনের ও প্রাণের মধ্যে এমন কোন সন্দেহের কথা ছিল না যে, আলোচাল খাওয়ার জন্যে বকের পেটে ও মুখে কোন লোভ নেই, বকেরা চাল খায় না। প্রফেসর চারুবাবু কাব্য পড়াতে গিয়ে আকাশের উড়ন্ত বলাকা-পংক্তির নানা ভাবভঙ্গীর কথা বলতেন। আজও স্মরণ করতে পারে রামতনু, চারুবাবুর মুখ থেকে বলাকা-পংক্তির নানা ভাবভঙ্গীর কথা শুনে সেদিন বক নামক সাধারণ পাখি-প্রাণীটাকে সত্যিই কাব্যের একটা চমৎকার বিহঙ্গম বলে মনে হতো। ভুলে যেতে হতো যে, বকেরা খাল বিল ও ডোবার কিনারাতে ঘুরে-ফিরে ও ছোঁ মেরে-মেরে পুঁটি মাছ ধরে আর খায়।

ভেলাডিহি থেকে মাত্র এক ক্রোশ দূরে চুটুপালুর বাঁশ-জঙ্গলের দক্ষিণে যে ঝিল আছে, তার জল পানি-ফলের লতা-পাতায় ঢাকা, তবু নানা ফাঁক দিয়ে স্বচ্ছ জলের চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায়, মাগুর লেঠা আর পুঁটি মাছের একটা জ্যান্ত সংসার কিলবিল করছে। অনেক বক রোজই এখানে আসে আর সারা দিন ধরে ঝিলের কিনারাতে ঘুরে ঘুরে চকচকে সাদা-সাদা পুঁটি পেট ভরে খেয়ে নিয়ে সন্ধ্যা হবার আগেই আবার কোথায় যেন চলে যায়। যারা পানিফল তোলবার জন্যে ঝিলের কিনারাতে ভিড় করে তারা দেখে একটু ভয় পায় যে, শত-শত বক উড়ে এসে ঝিলের কিনারাতে ঠাঁই নিয়েছে। পানিফল তোলবার হিড়িকে ঝিলের জল নড়ে উঠবে আর পুঁটি মাছের ঝাঁক ছটফট করে লাফাবে, এই সম্ভাবনার বার্তাটা কে এদের কেমন করে পোঁছে দেয়, কে জানে। রামতনু একবার নিজের চোখে ওই ঝিলের পানিফল তোলবার দৃশ্য দেখেছিল। গিরিডির বাজারের এক সব্জীবেচা কুঁজরা মহাজন তার দশ-বারো জন লোক সঙ্গে নিয়ে ঝিলের পানিফল তুলছে। কুঁজরা মহাজন হলো ঝিলটার ইজারাদার. সব পানিফল তারই প্রাপ্য। পানিফল তোলবার সেই দৃশ্যের সঙ্গে মিলে-মিশে আরও একটা দৃশ্য ছিল। শতশত বকের মাছ ধরে খাওয়ার বিপুল এক ব্যস্ততার দৃশ্য। সত্যিই তো, ভেবে দেখবার মতো এবং একটু বিস্ময়েরই প্রশ্ন বটে, কী করে

এইচ এম ভি-র নিবেদন
ছোটদের রামায়ণ
'ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি—
রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টি আমার কী?' কত শত
বছর ধরে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ভরত-শত্রুঘ্নের কথা বুকে নিয়ে ছোটরা
বড় হয়েছে। ভয়-তাড়ানো প্রাণ-ভরানো সেই রামায়ণী কথা
এই প্রথম ছোটদের মুখের ভাষায়, মনের মত সুরে, নাম-করা
বড় বড় শিল্পীদের গানের একটি চমৎকার লং প্লে রেকর্ডে বেরুলো।
ছোট-বড় সকলের উপভোগ্য জমকালো এই রামায়ণ রচনা করেছেন
কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে এতে গেয়েছেন
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়,
অংশুমান রায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।
ছোট্ট শ্রোতারা, আজই এইচ এম ভি ডিলারের দোকান থেকে
এই রেকর্ডটা আনিয়ে নাও। তারপর সকলে মিলে
হৈহৈ করে শোনো।
এইচ এম ভি-র ছোটদের গান
"ঠাকুরমার ঝুলি"—গীতিনাট্য — বিভিন্ন শিল্পী
হাট্টিমাটিম টিম, ময়নার মা ময়নামতী, যমুনাবতী সরস্বতী/আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম, দোল দোল দুলুনী; সজলপুরের কাজল মেয়ে — আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়
"এক যে ছিল শেয়াল"—গীতিনাট্য — বিভিন্ন শিল্পী
"জাগো সুন্দর চির কিশোর" (নজরুল) — বিভিন্ন শিল্পী
"ছড়া ছড়া ছড়া, মজার সুরে ভরা" — বিভিন্ন শিল্পী
খুকুর ছড়া/বিদেশিনী কাদের রাণী, ছোট্ট পাখি চন্দনা — আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘোড়ার ডিমের অমলেট/ভূত পেত্নীর বিয়ে — রঞ্জিত মল্লিক ও সহশিল্পীবৃন্দ
"ভুশুণ্ডি মাঠ"/"সুন্দর বনে সুন্দরীগাছ" — বিভিন্ন শিল্পী
"বর্ণপরিচয়"— দুই খণ্ড — বিভিন্ন শিল্পী
তোমাদের জন্য আরো অনেক রেকর্ড আছে
HMV
হিজ মাস্টার্স ভয়েস
GC 8938

বকেরা খবর পেল যে, আজ এই সকালেই ঝিলের পানিফল তুলে নেওয়া হবে?

এই ভেলাডিহিতেও যে ছোট্ট একটা জংলী পুকুর আছে, সেটা পুঁটি আর শামুক-গুগলির পুকুর নয়। এই সাতটা এক ক্রোশ দূরের ওই ঝিলের সব বকেরই নিশ্চয় জানা ছিল। প্রমাণ এই যে, ভেলাডিহির এই জংলী পুকুরে পুঁটি মাছ খাওয়ার আশায় কোন বক কোনদিন এখানে আসেনি। এই প্রথম একটা বক এসেছে। তাই অনেকে আশ্চর্য হয়েছে। সেইজন্যে আজ সকাল হতেই ভাণ্ডারীজীর চাকর নন্দু এসে রামতনুকে খবরটা দিয়েছে—এক বগুলা আয়া, একটা বক এসেছে।

রামায়ণে আছে রামচন্দ্রের উক্তি: পশ্য লক্ষণ পম্পায়াং বকঃ পরম ধার্মিকঃ। প্রফেসর চারুবাবু বলতেন: রামচন্দ্রের এই উক্তি বকের সম্পর্কে একটা খাঁটি প্রশস্তির বাণী, বকের চরিত্রের সম্পর্কে কোন ঠাট্টার বাণী নয়। অনেক পণ্ডিত এই উক্তিটির ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। হে জলদ, বলাকার পংক্তি আকাশে উড়ে উড়ে তোমাকে অভিনন্দিত করছে, কালিদাসের উক্তিটাও বলতে গেলে বকের সম্পর্কে একটি প্রশস্তির বাণী। উড়ন্ত বকের সারির রূপ কবির চোখে খুব সুন্দর বলে মনে হয়েছিল। উড়ন্ত বকের সারিবাঁধা দল যেন কালো মেঘের বুকে সাদা ফুলের মালার মত শোভা ধারণ করে।

ছেলেবেলায় কেষ্টনগরের মামাবাড়িতে থাকবার সময় যে ছড়াটা পাড়ার ভানুদা আর রত্নাদির মুখে শুনেছিল রামতনু, সেটার ভাষা বেশ-একটু অন্য রকমের। সে ছড়াতে বকমামার কাছে মাছ চাওয়া হয়নি। চাওয়া হয়েছে ফুল। সে ছড়ার সঙ্গে কালিদাসের কল্পনার কোন সম্পর্ক নেই, তবু বকের কথার সঙ্গে ফুলের কথা এসে পড়েছে।

বক মামা বক মামা
ফুল দিয়ে যা।
নারকেল গাছে কড়ি আছে
গুণে নিয়ে যা॥

যা-ই হোক, এখানে এই নিতান্ত একলা একটা সাদা বকের আগমন সত্যিই যে একটু রহস্যের ব্যাপারের মতো মনে হয়। ভেলাডিহির জংলী পুকুরে তো মাছ-টাছ নেই। পুকুরের জলে সামান্য কিছু শেওলা আর পানিফলের কয়েকটা লতা-পাতা ভাসছে। তবে একটা বক এখানে এসে বুড়ো শালগাছের ডালপালার মধ্যে ঠাঁই নিল কেন? বকটা কি বোকা? বকের বুদ্ধির অভাব আছে, এমন গল্প তো কোনদিনও শোনেনি রামতনু।

নন্দু আর রামুয়া এসে হাসতে থাকে।—আপনি তো বকটাকে বোকা বলে মনে করেছিলেন।

রামতনু—হ্যাঁ, সন্দেহ হয়েছিল।

—কিন্তু দেখে আসুন গিয়ে, বকটা পুকুরের কিনারাতে ঘুরে-ঘুরে টুপ-টুপ করে ঠোঁটের ঠোকর দিয়ে মাছ মারছে আর খাচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট পুঁটি আর এই এক আঙুলের চেহারার মতো ছোট্ট ছোট্ট বেলে।

রামতনু — ওই পুকুরে মাছ এল কবে, কোথা থেকে এল?

লালজিয়া এক হাতে কপাল ছুঁয়ে কথা বলে।—পরমাত্মা জানে, আর ওই বক জানে।

যে পুকুরে মাছ ছিল না, সে পুকুরে এখন ছোট-ছোট পুঁটি আর বেলে কিলবিল করছে, এটা যেমন একটা রহস্যের আশ্চর্য, ঠিক তেমনই একটা আশ্চর্য হলো বকটা কেমন করে টের পেল যে, ভেলাডিহির জংলী পুকুরে এখন মাছ এসেছে?

নন্দু বলে — এ আর কী এমন আশ্চর্যের ব্যাপার বাবু! আমি দেখছি, চুটুপালুর ঝিলটার পানিফল তোলবার ইজারা নিয়েছে গিরিডির যে ইদ্রিস মিঁয়া, তাকে ঝিলের এক ক্রোশ দূরের সড়কে হাঁটতে দেখে বকের দল উড়ে এসে ঝিলের কিনারায় বসেছে। বকেরা সব বুঝতে পারে। মানুষের বুদ্ধির চেয়ে বকের বুদ্ধি অনেক বেশী।

আজ সকালবেলার দ্বিতীয় খবর — এক বাবু আয়া! নন্দু খবর দিল, বেশ মোটাসোটা চেহারার একজন বাবু এসেছেন!

তসীলদার রামতনুর আগেই জানা ছিল যে, ঠাকুর-সাহেবের বেয়াই বলে যাঁর নামডাক আছে, সেই রঘুবাবু জঙ্গলের সব হরতকী তুলে নিয়ে যাবার হুকুমনামা পেয়েছেন। এটা একটা খাতিরী ব্যাপার, মেহেরবানির ব্যাপারও বলা চলে। রঘুবাবুকে কৃপা করবার জন্যেই তাঁকে এবছরের মধ্যে জঙ্গলের সব হরতকী তুলে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছেন ঠাকুরসাহেব। ভাণ্ডারীজী বলেছেন, রঘুবাবু সত্যি করে ঠাকুর সাহেবের একজন কুটুম বেয়াই নন, ঠাকুর সাহেবের এক বন্ধুর মেয়ের শ্বশুর। ঠাকুর সাহেবের চিঠিতে নির্দেশ পেয়ে ভাণ্ডারীজী একমাস আগেই রঘুবাবুর থাকবার জন্যে একটা ঘর তুলে রেখেছেন। খড়ের চালা, মাটির দেয়াল, কাঁচা শালকাঠের একটা দরজা। ওই তো সেই ঘরটা, দরজা খোলা, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ঘরের ভিতরে কাঁচা বাঁশের একটা খাটিয়ার উপর বসে রয়েছেন আগন্তুক রঘুবাবু।

বুড়ো শালগাছের একটা মগডালের পাতা কাঁপিয়ে দিয়ে বকটা যেন হঠাৎ খুশির আবেগে উড়তে শুরু করেছে। ধবধবে সাদা বকের পাখনা দুটো ঝাপট দিয়ে সকালবেলার বাতাসের সঙ্গে খেলা করছে। বকটা উড়ে এসে প্রথমে রামতনুর ঘরের খাপরার চালার উপর বসলো। তারপর আবার তেমনই একটা হঠাৎ-খুশির আবেগে যেন দুই ডানাতে কাঁচা রোদের ছোঁয়া নেবার আনন্দে উড়তে উড়তে কোথায় যেন চলে গেল, বোধহয় ভেলাডিহির সেই জংলী পুকুরটার দিকে।

হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন রঘুবাবু।—কী মশাই? একটা সাদা বক উড়ে গেল বোধ হচ্ছে।

রামতনু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রঘুবাবু—আমার কোমরে যে ষোল বছর ধরে একটা অদ্ভুত রকমের বাতের ব্যথা লেগেই রয়েছে, তার সবচেয়ে ভাল ওষুধ হলো ওই সাদা বক।

রামতনু—কী বললেন ঠিক বুঝলাম না।

রঘুবাবু—সাদা বকের মাংস। একদিন খেলে অন্তত একটা মাস সে ব্যথা আর থাকে না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন রঘুবাবু—যাক্ মশাই, দেখে একটু নিশ্চিন্ত হলাম। তিনটে মাস এখানে থাকতে হবে আর হরতকীর সঙ্গে মারামারি ফাটাফাটি করতে হবে, শরীরটাকে তো একটু পোক্ত করে বানিয়ে রাখতেই হবে।

রামতনু—তা তো বটে, কিন্তু কী দেখে নিশ্চিন্ত হলেন?

রঘুবাবু—অন্তত একটা সাদা বক তো পাওয়া যাবে। একটা সাদা বকের মাংস খেলে একটা মাস, এমন কি দেড়-দু'মাসও এই কোমরটাতে বাতের ব্যথাটা আর জোর করতে পারবে না।

চমকে ওঠে রামতনু।—বকটক এখানে পাবেন বলে মনে হচ্ছে না।

—কেন? এই তো, নিজের চোখে দেখতেই পেলাম, একটা সাদা বক উড়ে গেল।

—ওটা মাত্র দিন চার-পাঁচ হলো, কে জানে কোথা থেকে উড়ে এসেছে। এখানকার বক নয় ওটা। ওটা আজই না হোক, দু'চার দিনের মধ্যে চলে যাবে।

—তাহলে তো দু'চার দিনের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

—কিসের ব্যবস্থা?

—বকটাকে মারবার ব্যবস্থা।

রামতনুর দুই চোখে একটা কটমটে ভাব ফুটে উঠলেও রঘুবাবুর চোখে একটা উল্লাসের ভাব চকচকিয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠেন রঘুবাবু—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বাস্ বাস্ বাস্। আর ভাবতে হবে না। আমার এতক্ষণ মনেই পড়ছিল না যে, তীর মেরে কিংবা গুলেল ছেড়ে বকটাকে ঘায়েল করবার লোক আমার সঙ্গেই আছে। জট্টু জট্টু, এ জট্টু, চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন রঘুবাবু।

নন্দু বলে, রঘুবাবুর সঙ্গে যে চাকরটা এসেছে, তারই নাম জট্টু।

রামুয়া বলে—চাকর তো বটেই, কিন্তু ঠিক চাকর নয় জট্টু। জট্টু হলো একটা কামিয়া।

রঘুবাবু—ঠিক কথা। কামিয়া।

চমকে ওঠে রামতনু। কামিয়া! কামিয়া! কলেজের প্রিন্সিপাল রেভারেড কেনেডি একদিন প্রফেসর চারুবাবুকে বেশ শক্ত করে কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন—আপনাদের জাতির ভয়ানক ডিসগ্রেস ছিল যে সাটি (সতীদাহ), সেটা তো এখন নেই। কিন্তু আর-একটা ডিসগ্রেস আছে; কামিয়াটি (কামিয়ৌতি), স্লেভ কেনাবেচা, স্লেভ রাখা।

দুই চোখ অপলক করে দেখতে থাকে, বছর চোদ্দ-পনের বয়স হবে, একটা রোগা-পটকা চেহারার ছেলে রঘুবাবুর ঘরের দাওয়া থেকে নেমে আর দৌড়ে এসে দাঁড়ালো। রামতনুর পায়ের কাছে মাটির উপর মাথা ঠেকিয়ে আর রামতনুরই পায়ে মাড়ানো মাটি থেকে এক টিপ ধুলো তুলে নিয়ে নিজের কপালের উপর ঘষে দিল ছেলেটা, যার নাম জট্টু।

রঘুবাবু বললেন—এ ব্যাটা একটা জংলী জাতের ছেলে। ওর বাপ-মা দু'জনেই আমাদের কেনা কামিয়া। নগদ এক'শো বিরাশি টাকা দিয়ে ওদের দু'জনকে কেনা হয়েছিল, তখন ওরা দুজনে ছিল নিতান্ত একটা ছোঁড়া আর ছুঁড়ি। ক্ষেত-খামারের খাটুনির কাজ করতেই জানতো না, পারতোও না। এখন অবশ্য পুরো খাটুনি খাটতে পারে।

আর চমকে ওঠে না রামতনু। চোখ দুটো যেন স্তব্ধ হয়ে শুধু জট্টু নামের ছেলেটাকে দেখতে থাকে। কামিয়া কথাটা অনেকদিন আগেই শুনেছিল রামতনু। 'টমকাকার কুটীর' বইটাতে যে ক্রীতদাসের কথা আছে, কামিয়া তো প্রায় সেইরকমেরই কেনা চাকর, সারাজীবন ধরে খাটবার চাকর। কামিয়া কখনো ধারের টাকা শোধ করতে পারে না। শুনেছে রামতনু, কেউ-কেউ কামিয়া হতে গিয়ে নিজেকে একেবারে বিক্রী করেই ফেলে। তার মানে কিছু বেশী টাকা ধার পায়। ধার তো শোধ হয় না, তিন পুরুষ খাটলেও না।

ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করে রামতনু—তোমার নাম জট্টু? হেসে ফেলেন রঘুবাবু—ওর সঙ্গে এত মিহি করে কথা বলবেন না মশাই। ও হলো কামিয়ার ছেলে কামিয়া। একটু ধমক দিয়ে কথা বলুন। ধমক না খেলে ওরা বাঁচে না।

—আপনার নাম?

—রামতনু।

—বাঃ খাসা নাম। ভালই হলো। আপনাকে নাম ধরে ডাকলে ভূত পালিয়ে যাবে। যাক্‌গে, এসব বাজে কথা বলাবলি করে কোন লাভ নেই। আসল কথা হলো, বকটাকে আজ-কালের মধ্যে ঘায়েল করতে হবে।

—কী করে ঘায়েল করবেন?

—দেখবেন দেখবেন, এই কামিয়া ছোঁড়াই দেখিয়ে দেবে। জংলী জাতের ছেলে, হাতের টিপ সাংঘাতিক। গুলেল ছুঁড়ে একটা কাঠবিড়ালীকে মারতে ওর এক মিনিট সময় লাগে, বকটাকে মারতে বড়জোর দু'মিনিট সময় লাগবে। বক! আহা, সাদা বক!...আচ্ছা মোশাই...।

—বলুন।

—আপনি তো লেখাপড়া শিখেছেন।

—হ্যাঁ।

—তবে চাণক্য শ্লোক নিশ্চয় পড়েছেন।

—পড়েছি।

—তাহলে আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো, বসুধৈব কুটুম্ বকম্ কথাটার মানে কি? বক কেন দুনিয়ার সবারই কুটুম হবে?

—আপনি যে-কথা বলছেন, চাণক্য শ্লোকে সে-কথা নেই।

—আছে আছে আছে। আপনি জানেন না। আপনি চাণক্য শ্লোক পড়েননি।

—তাই যদি আপনি মনে করেন, তবে মনে করুন।

—সাদা বক সত্যিই চমৎকার প্রাণী। সাদা বকের মাংস যেমন সুস্বাদু, তেমনই কোমরের বাত বিনাশ করবার অব্যর্থ ওষুধ। আপনি জানেন না।

ভাণ্ডারীজীর চাকর নন্দুর কাছ থেকে সব খবর পায় রামতনু। কামিয়া ছেলে জট্টুর খবর, আর সাদা বকের খবর। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গুলেল হাতে নিয়ে জংলী পুকুরটার চারদিকে ছুটোছুটি করে জট্টু। কিন্তু সাদা বকটাকে ঘায়েল করতে পারে না। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে নন্দু—বাজে কথা, রঘুবাবুর যত সব বাজে কথা। এই দশ-দিনের মধ্যেও বকটাকে মারতে কামিয়া ছোঁড়া জোট্টুর সাধ্যিই হলো না।

রামু — কিন্তু কেন সাধ্যি হলো না, বুঝতে পারছি না। সেদিন আমার কথা শুনে গুলেল তুলে এক টিপেই গাছের উপর-ডালের একটা পাকা বেলকে মেরে নামিয়ে দিল ছোঁড়া। সাংঘাতিক হাতের টিপ! কিন্তু...।

লালজিয়া বলে—কিন্তু, তাই তো, তবে বকটাকে মারতে পারছে না কেন?

নন্দু—আমার মনে হয়, এই বক সত্যিই বক নয়। বকের মতো চেহারা নিয়ে অন্য কোন আত্মা হঠাৎ ভেলা-ডিহিতে চলে এসেছে।

নন্দুর ধারণার কথাগুলি কানে আসতে শিউরে ওঠে রামতনু। হতে পারে, হতে পারে, অসম্ভব নয়। মহাভারতের ধর্ম বকের রূপ ধরে যুধিষ্ঠিরের কাছে দেখা দিয়েছিল। নিতান্ত একটা গল্পের ঘটনা। খুব আশ্চর্যের ঘটনা, কিন্তু ততটা আশ্চর্যের ঘটনা না হয়েও ভেলাডিহিতে আগত এই সাদা বক অন্য কোন একটা আশ্চর্যের আত্মা হতে পারে তো।

রঘুবাবু হঠাৎ এসে বেশ চড়া রকমের রাগের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন—আপনি আপনার চাকর নন্দুকে একটু সাবধান করে দিবেন, মোশাই। নন্দু খুব খারাপ কাজ করেছে।

—অ্যাঁ, খারাপ কাজ?

—হ্যাঁ। জট্টুকে, কামিয়া ছোঁড়াটাকে দু'দিন দুটো রুটি খেতে দিয়েছে।

—সেটা কি খারাপ কাজ?

—হ্যাঁ, ওটা নিয়ম নয়। মকাই কিংবা বজ্‌রা ছাড়া কামিয়াকে অন্য কিছু খেতে দিতে নেই। জট্টু ব্যাটার বাপ-মা চোদ্দপুরুষ কখনও রুটি খায়নি।

বাড়িয়ে বলেননি রঘুবাবু। নন্দু আর রামুয়া দেখেছে, রঘুবাবুর ঘরের দাওয়াতে একধামা মকাই আছে। এবেলা চারটে আর ওবেলা চারটে মকাই পায় জট্টু, পুড়িয়ে নিয়ে খায়। রঘুবাবুর ভাত-ডাল রান্না হয়ে যাবার পর উনানে যে-টুকু আগুন থাকে, তাতেই মকাই পুড়িয়ে নিতে হয়। আগুনের তাত না থাকলে মকাইয়ের কাঁচা দানা খেতে হয়।

খেজুর-পাতার তৈরী একটা ছেঁড়া চাটাই আছে, সেটাকে কম্বলের মতো গায়ে জড়িয়ে রঘুবাবুর ঘরের উনানের এক পাশে শুয়ে থাকে কামিয়া ছেলেটা। ভোরে উঠেই উনন ধরিয়ে রঘুবাবুর জন্যে ভাত চড়ায়; তারপর রঘুবাবুর কাপড় ফতুয়া ও গামছা ক্ষারের জলে ডুবিয়ে

নিয়ে কাচাকাচি করে। তারপর চমকে উঠে হাত ধুয়ে ফেলে। ধমক দিয়ে হাঁক ছেড়েছেন রঘুবাবু।...যা যা, বকটাকে এখনি মেরে নিয়ে, এখনই চলে আয়। আজ বকটাকে তুই যদি না মারিস, তবে আমিই আজ তোকে মেরে ফেলবো।

গুলেল হাতে নিয়ে দৌড় দেয় জট্টু। এ দৃশ্য মাঝে-মাঝে রামতনুর চোখেও পড়েছে। একদিন দুপুরবেলা আর-একটা দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে রামতনু। ছালা ভর্তি হরতকী মাথায় বয়ে নিয়ে আসছে জট্টু। কামিয়া ছেলেটাই তাহলে রোজ দুপুরে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে হরতকী তুলছে। বাঃ, চমৎকার এক ভয়ানক দৃশ্য, চোদ্দ-পনের বছর বয়সের রোগা-পটকা চেহারার একটা বাচ্চা-মানুষের মাথার উপর এক মণ ওজনের বোঝা। জট্টুর শরীরটার ওজন তিরিশ সের হবে কিনা সন্দেহ।

এরপর রঘুবাবুর সঙ্গে রোজই রামতনুর বেশ ঝাঁঝালো রকমের একটা তর্কাতর্কির ব্যাপার বেধে ওঠে। আজ সকালে, কাল দুপুরে, পরশু সন্ধ্যায় আর তরশু রাতের বেলাতে নন্দু লালজিয়া আর রামুয়া বেশ একটু ভয় পেয়ে ছটফট করে। ভয় এই যে, তসীলদারবাবু বোধহয় এখনই রঘু-বাবুকে মুখের উপর একটা ঘুসি বসিয়ে দেবে। হে ভগবান, কৃপা করে হয় বকটাকে, নয় কামিয়া ছোঁড়াটাকে সরিয়ে দাও। নইলে...।

নন্দুয়াদের ভীরু স্বরের প্রার্থনার কথা শুনে রামতনুর প্রাণটাও যেন ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। ছেলেটা আর ক'দিন বাঁচবে? চেহারার দশা যা হয়েছে তাতে তো আর একটা মাসও বেঁচে থাকবে বলে ভরসা করা যায় না।

কিন্তু কী আশ্চর্য, পুরো দুটো মাস বেঁচে রইল জট্টু, হরতকীর বোঝা টেনে-টেনে দুটো মাস পার করে দিল। ঠিকই তো, দেখে বোঝা যায় জট্টুর রোগা চেহারাটা আর-বেশী রোগা হয়নি। বরং মনে হয়, জট্টুর রোগা হাড্ডির উপর যেন নতুন একটু শাঁস লেগেছে।

নন্দু আর রামুয়াকে ডাক দিয়ে রামতনু একটা কাজের কথা বলে। গোপন কাজের কথা। রঘুবাবু যেন জানতে শুনতে কিংবা দেখতে না পান। দশটা টাকা জট্টুর হাতে তুলে দিয়ে বলতে হবে—এখনি পালিয়ে যা জট্টু, ট্রেনে উঠে আসানসোল চলে যা। সেখানে বাবুদের বাড়িতে বাসন মাজবি আর কাপড় কাচবি। খুব ভাল থাকবি। ভাল খাওয়া, ভাল কাপড়।

পরামর্শের কথা শুনে প্রথমে হেসে ফেললো আর মুখ ফিরিয়ে নিল জট্টু। তারপর চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো—এমন কথা আমাকে বলবেন না। আমাকে প্রাণে মেরে ফেললেও আমি বাবার ঘর ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে পারবো না।

বাবা, খুব চমৎকার বাবা। রঘুবাবু তাঁর কামিয়া ছেলেটাকে একদিন কিল-চড় মারতে মারতে প্রায় বেহুঁস করে দিলেন।—তুই রোজ ফাঁকি দিচ্ছিস, তুই ইচ্ছে করে বকটাকে মারছিস না।

বাতের ব্যথায় বেঁকে যাওয়া কোমরের উপর একটা হাত রেখে, আর-এক হাতে জট্টুকে পিটতে থাকেন রঘুবাবু। জট্টুর নাক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। চিৎকার করে কথা বলেন রঘুবাবু—বকটার সঙ্গে কি তোর কুটুম্বিতা হয়েছে রে ছুঁচো, কামিয়ার বাচ্চা কামিয়া?

জংলী পুকুরটার কিনারাতে, নরম মাটির নরম ঘাসের উপর শুয়ে-শুয়ে কী যেন খাচ্ছে জট্টু। জট্টুর হাতে কচুপাতার একটা ঠোঙা। একদিন রামতনুর চোখে পড়েছে এই অদ্ভুত দৃশ্যটা।

ও জট্টু! রামতনুর ডাক শুনে চমকে ওঠে আর উঠে বসে জট্টু। কচুপাতার ঠোঙাটাকে লুকোবার চেষ্টা করে। রামতনু আরও জোরে হাসতে থাকে।—বেশ করেছো জট্টু। খাও, খাও।

ফিরে আসবার সময় পথের মাঝেই থমকে দাঁড়ায় রামতনু।—কী ব্যাপার? তাই তো, কী খাচ্ছে জট্টু? পানিফল? এই পুকুরে পানিফল আছে কি? হয় তো আছে।

দুই চাকর, নন্দু ও রামুয়া, এবং ধনপুরের হাটে শালের ধুনো বিক্রী করে দশ পয়সা রোজগার করে যে অতি গরীব লোকটা, যার নাম লালজিয়া, সবাই প্রায় রোজই রামতনুর কাছে এসে যে-সব ঘটনার খবর শুনিয়ে যায়, সে-সব ঘটনা যেন ভেলাডিহির জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য কোন জাদুকরের খেলার মতো অদ্ভুত এবং চমৎকার।

কামিয়া ছেলেটা রোজই সকালে গুলেল হাতে নিয়ে সাদা বকটাকে মারবার জন্য পুকুরটার কাছে ছুটে আসে বটে, কিন্তু রঘুবাবু কিছুই জানতে কিংবা বুঝতে পারে না যে, কামিয়া ছেলে ওই জট্টু পুকুরের কাছে এসে মিটিমিটি হাসতে থাকে। হাতের গুলেল ঘাসের উপর ফেলে রেখে ঘুরে বেড়ায়, কখনও বা পুকুরের কিনারাতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকে। বকটাকে গুলেল ছুঁড়ে ঘায়েল করবার কোন চেষ্টা তো করেই না জট্টু, বরং এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে, বকটা কোথায় গেল, কী করছে? বকটা এক-একবার জট্টুর মাথার এত কাছা-কাছি হয়ে উড়তে থাকে যে, বকের দুই পাখার ঝাপটানির বাতাস লেগে জট্টুর মাথার রুক্ষ চুল ফুরফুর করে উড়তে থাকে।

না, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না তসীলদারবাবু, তাই একদিন জট্টুকে পুকুর কিনারার নিরালা থেকে ধরে নিয়ে এল নন্দু আর রামুয়া।

দৃশ্যটা দেখেছে নন্দু আর রামুয়া, বকেরা যেমন করে গরু মহিষের পিঠের উপর ও ঠুক-ঠুক করে ঠোকর দিয়ে গরু-মহিষের গায়ের পোকা বাছে আর খায়, ঠিক তেমনই করে জট্টুর মাথার উপর বসে আর ঠোঁটের ঠোকর দিয়ে কী যেন খাচ্ছে। কাছে পৌঁছবার আগেই উড়ে চলে গেল বকটা। দেখতে পায় নন্দু আর রামুয়া, সত্যিই তো পোকা, কুচি কুচি গুবরে পোকার মতো চেহারা অজস্র পোকাতে জট্টুর মাথাটাকে যেন ছেয়ে ফেলেছে।

রামুয়া—এই দেখুন বাবু, চোখ মেলে একবার দেখুন, জট্টুর মাথার এই পোকা মেরে খাচ্ছিল জট্টুর মাথার উপর বসে সেই সাদা বকটা।

রামতনু —তোমার মাথাতে এত পোকা এল কেমন করে, কোথা থেকে?

জট্টু বলে—জঙ্গলের হরতকী গাছের পোকা।

না, খুব বেশী আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। বক একটু সাহসী হয়ে একটা ছেলে-মানুষের মাথার চুলের পোকা খাবে, সেটা কী আর এমন অদ্ভুত ব্যাপার? কিন্তু খুব বুঝতে পারা যাচ্ছে, জট্টু আর সাদা বকটার মধ্যে বেশ ভালরকমের একটা ভাব-সাবের ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

রঘুবাবু রাগ করে জট্টুর খোরাক অর্ধেক করে দিয়েছেন। ভাল কাজ করতে পারে না, হরতকীর বোঝা ভাল মতো টানতে পারে না। আর, সাদা বকটাকে মারতেই পারলো না। এসব তো কামিয়া ছোঁড়াটার ধূর্ত মতলবের

কান্ডা ফাঁকিবাজি! না, জট্টুকে রোজ এবেলা আর ওবেলা দুমুঠো করে মকাই খেতে দেওয়া হবে না। জট্টুর ফাঁকিবাজির শাস্তি, ওকে দুটো করে মকাই খেতে দেওয়া হবে।

এরপর একটি ঘটনা চোখে দেখতে পেয়ে নন্দু আর রামুয়ার শুধু দুই চোখ নয়, দুই প্রাণও ভক্তিতে ভরে গিয়েছে। সাদা বকটা সত্যিই তো একটা আত্মা, নইলে জট্টুকে মাছ খাওয়াবে কেন?

এই ঘটনা দেখে মনে করেছে নন্দু আর রামুয়া, ভুখ্‌খা জট্টুর দুঃখটাকে বুঝে ফেলে এই সাদা বক। বকটা আজকাল জট্টুকে মাছ খাওয়ায়। এখন বুঝুন, ছেলেটার ঝিরকুটে শরীরে কেন শাঁস ধরেছে।

রামতনু হাসে।—কেমন করে বুঝলে? নিজের চোখে দেখেছো কি, সত্যিই বকটা জট্টুকে মাছ খাওয়াচ্ছে?

নন্দু—মাছ খাওয়াতে দেখিনি। তবে দেখেছি, জট্টুর হাতে শালুকপাতার ছোট্ট একটা ঠোঙা, চিৎপাত হয়ে শুয়ে কী যেন খাচ্ছে জট্টু। আর বকটা পুকুরের ধারে নিমগাছের ডালের উপর বসে উসখুস করছে আর জট্টুকে দেখছে।

রামতনু—কিন্তু এটা কি নিজের চোখে দেখেছো যে, শালুকপাতার ঠোঙা থেকে মাছ তুলে নিয়ে খাচ্ছে জট্টু?

নন্দু—না, তা দেখিনি, কিন্তু...।

রামতনু—কিন্তু মাছ নয়, জট্টু বোধহয় পুকুর থেকে দুটোচারটে পানিফল তুলে নিয়ে...।

রামুয়া—না, পানিফল নয়, বাবু। পানিফল খেতে হলে শালুকে পাতার ঠোঙা দরকার হয় না।

রামতনু—যদি সত্যিই মাছ খেয়ে থাকে জট্টু, তবে বুঝতে হবে যে, নিজের হাতে মাছ ধরে নিয়ে সেই মাছ কাঁচা-কাঁচাই খেয়ে ফেলে বেচারা।

নন্দু আর রামুয়া একসঙ্গে কথা বলে প্রতিবাদ করে।—না বাবু, না। প্রায় রোজই তো দেখছি, কোনদিনও চোখে পড়েনি যে, জট্টু হাত দিয়ে পুকুরের মাছ জল থেকে ছেঁকে নিয়ে তুলছে। তা ছাড়া, হাত দিয়ে ওই ছটফটে পুঁচকে মাছ ছেঁকে তোলা সম্ভবই নয়।

প্রশ্নটা আরও জোর নিয়ে রামতনুর সারা মনটাকে যেন ছেয়ে ফেলছে। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি বকটা মাছ ধরে-ধরে জন্মদুঃখী কামিয়া ছেলেটাকে খাওয়ায়? তবে তো নন্দু আর রামুয়াই ঠিক কথা বলেছে। ওটা বক নয়, ওটা অন্য কোন আত্মা, বকের চেহারা ধরে ভেলাডিহির জংলী পুকুরের চারদিকে ঘুরোঘুরি করছে।

কামিয়া ছেলে এই জট্টুর শীতকালের পোষাক দেখে বাঁশ-বাদাড়ের শজারুও বোধহয় হেসে ফেলবে। একটা ছেঁড়া কম্বলের আসনের মাঝখানে একটা বড় ফুটো করা হয়েছে, তারই ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে শীতের সাজ পরেছে জট্টু। শীতের কোন পৌষ-মাঘ এখনও আসেনি বটে, কিন্তু খুব হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। নন্দু আর রামুয়া জট্টুর এই বিচিত্র জামাটার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করে।—যাক্, রঘুবাবুর মতো একটা ইয়ের মনেও দয়া আছে তাহলে!

জট্টুর মেহনতের কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম নেই। রোজই দেখা যায়, হরতকীর বোঝা মাথায় নিয়ে, টলতে টলতে, কখনও বা খোঁড়াতে খোঁড়াতে, কখনও বা হোঁচট খেয়ে-খেয়ে জংগলের পথ ধরে ঘরের দিকে ফিরে আসছে জট্টু।

নন্দু ও রামুয়াকে একদিন জট্টুর গায়ের কদর্য চেহারার কম্বল-টুকরোটার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করতে দেখে খুব রাগ করলেন রঘুবাবু। কাছে এসে বললেন—কিসের এত হাসাহাসি। কামিয়া ছেলেটার গায়ের জামা দেখে?

নন্দু—হ্যাঁ বাবু।

রঘুবাবু—জেনে রাখ, আমি তোমাদের তসীলদারবাবুর মতো বাজে রকমের দয়াবাজি করি না। যা করি, খাঁটি দয়ার কাজ করি। কোন এই বয়সের কামিয়া ছেলে জামা গায়ে দেয় না। ওটা নিয়ম নয়। তবু আমি, নিতান্ত নরম মনের মানুষ বলে কামিয়া ছেলেটাকে একটা গরম জামা দিয়েছি।

কদিন পরে অনেকেরই চোখে পড়ে, কামিয়া ছেলে জট্টু যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে হাঁটছে।—কী ব্যাপার, অসুখ-টসুখ হলো না কি? এ জট্টু? লালজিয়ার ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় জট্টু। হাসতে চেষ্টা করে জট্টু। জবাব দেয়—বাবা বলেছে, আমার কোন বিমারী হয়নি।

বিমারী হয়নি, ভাল কথা। কিন্তু ছেলেটা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন? পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই আবার ডিগডিগে হয়ে গেল জট্টু। আগের মতো নয়, আগের চেয়েও বেশি ডিগডিগে।

যারা কামিয়া ছেলেটার খোঁজ রাখতে চেষ্টা করে, তারাই জানতে পেরেছে, এরই মধ্যে একদিন খুব বমি করেছে জট্টু, বমির মধ্যে রক্তও আছে।

দেখতে পায় নন্দু, জট্টুর গলাটা বিশ্রী রকমের একটা ঘড়ঘড় শব্দ করছে। জট্টু বলেও ফেলেছে—বুকে ব্যথা।

একে একে জট্টুর শারীরিক অবস্থাটার নানা রকমের খবর রামতনুর কাছে পেঁছে দিয়ে আর চিন্তিত হয়ে বেশ বিষণ্ণ হয় নন্দু, রামুয়া আর লালজিয়া। না, আর চুপ করে থাকা উচিত নয়। বেশ-একটু উত্তেজিত মন নিয়ে রঘুবাবুকে প্রশ্ন করে রামতনু।—ছেলেটার অসুখ করেছে। তবু ওকে আপনি খাটাচ্ছেন?

রঘুবাবু—হ্যাঁ, তা তো বটে। কামিয়া যদি না খাটে, তবে কে খাটবে?

রামতনু—ছেলেটার তো অসুখ হয়েছে, ভুলে যাচ্ছেন কেন?

রঘুবাবু—কামিয়ার অসুখ হয় কেন? হবে কেন?

রামতনু—বাজে কথা বলবেন না। ছেলেটার জন্য একটু ওষুধের ব্যবস্থা না করলে চলবে কেন?

হেসে ফেলেন রঘুবাবু।—ওষুধ? কামিয়া কি বিলিতী কুকুর যে অসুখ হলে ওষুধ খাওয়াতে হবে? কামিয়ারা ওষুধ খায় না। ওদের ওষুধ খাওয়ার দরকার হয় না। আপনি কিছুই বোঝেন না, জানেনও না। তাই মিথ্যে দয়াবাজি করছেন। ...ওরে জট্টু, এ জট্টু, এখানে আয়।

জট্টু আসতেই জিজ্ঞেসা করেন রঘুবাবু।—কী রে, ওষুধ খাবি?

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে জট্টু।—না না, কভি না।

রঘুবাবু—শুনলেন তো। এখন বুঝুন, কেমন করে কী দয়াবাজি করবেন।

এরপর একদিন যে ঘটনার আওয়াজ শুনতে পেল নন্দু আর রামুয়া, সেটা হলো রঘুবাবুর প্রমত্ত গালাগালি আর ধমকের আওয়াজ। দাওয়ার উপর কিংবা বাইরে, কোথায় যে বসে আছে জট্টু, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। রঘুবাবুর রাগ ফেটে পড়ছে আর বলছে।—অসুখ হয়েছে; কাজ করতে পারছিস না। তবে তুই তো প্লেগের ইঁদুর হয়ে গিয়েছিস। মরে যা, মরে যা। চলে যা, চলে যা।

কদিন পরেই একদিন, অমাবস্যার রাত্রিতে খুব জোর

বৃষ্টি হয়ে গেল। ভেলাডিহির জঙ্গলে যেন হাজার-হাজার ঝর্নার প্রাণ কলকল করে জেগে উঠেছে। বৃষ্টি থামলো মাঝ-রাতে, নতুন ঝর্নার কলরব থামলো শেষরাতে।

ওয়াক্ ওয়াক্ ওয়াক্!

উড়ে উড়ে শেষ রাতের অন্ধকার আর ভিজে বাতাসে একটা করুণ আতঙ্কের ডাক ছাড়ছে বকটা। ওই সাদা বকটা তো নিশাচর জাতের বক নয়, তবে কেন শেষ রাতের অন্ধকার ফিকে না হতেই উড়তে শুরু করছে। কী হলো? সন্দেহ হয়, কোন না কোন একটা খারাপ রকমের ব্যাপার ঘটেছে।

সকালবেলার প্রথম রোদ ফুটে উঠতেই রঘুবাবু এসে হাঁকডাক শুরু করেন। —এ তসীলদারবাবু, এ রামতনুবাবু। তাড়াতাড়ি একবার বাইরে আসুন। হতভাগা কামিয়া ছোঁড়াটাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। কাল দুপুরে দেখতে পাইনি, বিকেলেও না, রাত্রিতেও না। আজও দেখতে পাচ্ছি না, যদিও সকাল হয়ে গিয়েছে। রাত্রির বৃষ্টির জলের নতুন ঝর্নাতে ছোঁড়া সত্যিই ভেসে গিয়েছে নাকি? নইলে এখনও দেখা দিচ্ছে না কেন?

ঠিক এই দুশ্চিন্তায় এই দুটো দিন সব সময় ছটফট করেছে নন্দু রামুয়া আর লালজিয়া। জট্টুকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দু'দিন আগে হরতকীর জঙ্গলে যাবার সময় জট্টুকে দেখতে পেয়েছিল নন্দু, জট্টুর গলার ভিতরে যেন বন্ধ হয়ে একটা ব্যথা ঘড়ঘড় করছে। বুকটা ধুকছে। কিন্তু ...খুব মিনতি করে একটা কথা বলেছে জট্টু: কিন্তু বাবাকে কখনও আমার অসুখের কথা বলবেন না, নন্দুজী।

রঘুবাবু এখন বলছেন—দুদিন ধরে খুঁজছি, কোথাও ছোঁড়াকে দেখতে পাচ্ছি না। এদিকে আমার কষ্ট, আমার ক্ষতি দুইই যে আর সহ্য হচ্ছে না। দুদিন হাত পুড়িয়ে ভাত রেঁধেছি। হরতকী তোলবার কাজ বন্ধ হয়েই রয়েছে। কামিয়ার বাচ্চা কামিয়া আমাকে কী যন্ত্রণাই না দিচ্ছে।

ভেলাডিহির কাছারি-বাড়ি এলাকার প্রায় সব ঠাঁই খোঁজা-খুঁজি করা হলো। না কামিয়া জট্টু কোথাও নেই। দেখা গেল, রঘুবাবুর ঘরের ভিতরেও কেউ নেই, কাঁচা বাঁশের খাটিয়ার নীচে একটা কম্বলের টুকরোর উপর একটা বিড়াল ঘুমিয়ে রয়েছে। ঘরের দাওয়ার উপরেও কেউ নেই। জট্টুর মকাইয়ের ঝুড়ির মধ্যে খুব শুকনো তিন-চারটে সিঁড়িঙে মকাই পড়ে রয়েছে। চেঁচিয়ে ওঠে নন্দু—কী আশ্চর্যের কথা, খেজুর-পাতার সেই ছেঁড়া চাটাইও নেই, যেটা গায়ে জড়িয়ে দাওয়ার উপর শুয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ে থাকতো, বেচারা জট্টু।

চেঁচিয়ে ওঠে লালজিয়া। আরে, এই তো এখানে শুয়ে রয়েছে জট্টু। ছেঁড়া চাটাই গায়ে জড়িয়ে একেবারে নিরেট ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছে ছেলেটা।

নিরেট ঘুম! কথাটার মানে কি? সবাই এগিয়ে যেয়ে দেখতে পায়, হরতকীর গাদার একপাশে শুয়ে রয়েছে, ঘুমিয়ে আছে কামিয়া ছেলে জট্টু। আর, কয়েকটা ছোট-ছোট মরা বেলেমাছ জট্টুর মুখের কাছে মাটির উপর পড়ে আছে। জট্টুর মুখ থেকে লালা গড়িয়ে মাটি ভিজিয়ে দিয়েছে।

মরে রয়েছে জট্টু। রঘুবাবুর মুখের দিকে কটমট করে তাকায় আর চেঁচিয়ে ওঠে রামতনু।—স্পষ্ট করে সত্যি করে বলুন, জট্টু মরলো কেন?

হেসে ফেলেন রঘুবাবু। —এত দুঃখের মধ্যেও আপনার কথা শুনে হেসে ফেলতে হচ্ছে। আমাকে নয়, ভগবানকে জিজ্ঞেসা করুন, কেন মরলো।

আবার হেসে ফেলেন রঘুবাবু। —মরা জট্টুর মুখের কাছে এই সব মাছ এল কোথা থেকে, কে পাঠালো? আমার তো ভাবতে বেশ ভয় করছে আবার মজাও লাগছে।

নন্দু বলে—আমি জানি, এই মাছ কোথা থেকে এসেছে, কে দিয়ে গিয়েছে?

রঘুবাবু—কে?

নন্দুর দুই চোখ ছলছল করে—যে আত্মা জট্টুকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল, সে।

—কে সে?

রামতনু বলে—সে আপনার মতো একটা মানুষ নয়, সে হলো একটা অমানুষ প্রাণী, একটা সাদা বক, যার মাংস খাওয়ার জন্যে আপনার পেটে রাক্ষুসে ক্ষুধা জ্বলছে।

হো হো করে হাসতে থাকেন রঘুবাবু। —আপনারা কেউই তো এখন গাঁজা খাননি, তবে এরকমের কথা বলছেন কেন? বক বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে মানুষকে? বক কি মানুষের কুটুম? বক কি দ্বারভাঙ্গার শিশিরবাবুর মতো পাকা ডাক্তার? বক কি বুঝে ফেলেছিল যে, জট্টুর বুকের সর্দি বসে গিয়েছে?

রামতনু—কী বললেন? ছেলেটার বুকের সর্দি বসে গিয়েছিল?

—হতে পারে।

—আমার সন্দেহ, ছেলেটার নিউমোনিয়া হয়েছিল।

—হতে পারে। ভগবান জানেন।

টুপ করে একটা শব্দ হয়। কী অদ্ভুত কাণ্ড। মরা জট্টুর বুকের উপর একটা জ্যান্ত লেঠা মাছ টুপ করে পড়েছে আর ছটফট করছে।

এ কী? এ কী? গাছ থেকে মাছ ঝরে পড়লো কেন?

সবাই যেন একসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে আর চোখ তুলে গাছের মাথার দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে একটা ধবধবে সাদা মায়ার ছবির মতো, একটা সাদা বক গাছের ডাল ছেড়ে দিয়ে উড়ে যায়। সকাল বেলার সোনালী রোদের আভা সাদা বকের পাখনা দুটোর উপর কী চমৎকারই না একটা রূপের জলুস ঢেলে দিয়েছে।

রামতনু বলে—এইবার দেখলেন তো, বুঝলেন তো, জট্টুকে কে মাছ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

মুখের চেহারা যতদূর সাধ্য বিশ্রী ও বিকৃত করে জবাব দেন রঘুবাবু—হ্যাঁ বুঝেছি, বসুধৈব কুটুম্ বকম্ চাণক্য যা বলেছেন তাই সত্যি। থামুন এবার, আর মিথ্যে তর্ক করবেন না।

রামতনু—না, আর তর্ক করবো না। কিন্তু থানাতে ডায়েরী করাবো, আপনি জট্টুকে না খাইয়ে-খাইয়ে আর মারধর করে মেরে ফেলেছেন।

রঘুবাবুর মাথাটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। —এরকম একটা মিথ্যে নালিশ করলে আমার তো সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমার কালাপানি শাস্তি হলে আপনার মতো দয়ালু মানুষ কি খুশি হবে?

রামতনু—হবে, সবচেয়ে বেশি খুশি হবে কে জানেন?

—কে?

—ওই সাদা বকটা।

ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

আমাদেরও ফাস্টবোলার ছিল

সুজিত মুখোপাধ্যায়

ভূত দেখলে রামনাম, মরণকালে হরিনাম, ইত্যাদি অব্যর্থ মন্ত্র আমাদের ছোটবেলাতেই শিখিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ইংল্যান্ডের মাঠে সঙ্গীন অবস্থায় পড়ে অংশু গাইকোয়াড়ের বা বিরজু পটেলের একটাও এ-ধরনের মন্ত্র যখন মনে এল না, তখন তারা অন্তত কয়েকটা মানুষের নাম আওড়াতে পারত। যেমন রামজী বা নিসার বা সুঁটে ব্যানারজী। মনে মনে দাঁত পিষে বলতে পারত, "আমাদেরও এককালে ফাস্ট বোলার ছিল। আজ তারা থাকলে তোরা ব্যাটারা এত সহজে ছাড়া পেতিস না।"

এককালে ছিল, এর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যাবে না। চলচ্চিত্রে এ'রা সংরক্ষিত নন, যান্ত্রিক উপায়ে এ'দের বলের বেগ মেপে রাখা নেই, শুধু মুখে মুখে বলা আছে, আর অল্পস্বল্প ছাপার অক্ষরে লেখা আছে। আমি প্রমাণ পাই উলটো তরফ থেকে। আজকালকার ভারতীয় ব্যাটধারীরা বিদেশী ফাস্ট বোলারকে সামলাতে পারে না কারণ ঘরোয়া ক্রিকেটে তাদের ফাস্ট বোলিং খেলার অভিজ্ঞতা নেই। অথচ আগেকার কালে বিদেশী ফাস্ট বোলারকে রুখতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বেগ পেতে হয়নি। কারণ তখন দেশেই ফাস্ট বোলিংয়ের যথেষ্ট প্রচলন ছিল, দেশে বসেই ব্যাটসম্যানরা হাত পাকাতে পারত।

এই আলোচনায় ফাস্ট বোলার কথাটা না ব্যবহার করে পেস বোলার অথবা ইদানীং চালু কথা 'পেসার' বললে যথাযথ হয়। ফাস্ট বোলার ছাড়াও ফাস্ট-মিডিয়াম থেকে মিডিয়াম-ফাস্ট অবধি পেসার কথাটা চলতে পারে। অতীতের বোলারদের গতিবেগ নিয়ে চুলচেরা বিচার করা সম্ভব নয়, কাল আর স্থানের দূরত্ব যত পিছু হটে, ততই এই জাতের বোলারদের বেগ বাড়তে থাকে। তাই পেস বোলার বলে নানা বেগের বোলারের উল্লেখ করা যায়, যাঁদের প্রতিটি বল—মারাত্মক জোরে না ফেললেও—প্রকৃত পেস্-এর কাছেপিঠে সর্বদাই থাকত।

ফাস্ট বোলিং দিয়ে বিশেষ-আক্রমণ হবে অচিরেই জানা যায়, যখন কোনো টেস্ট একাদশে দুজনের চেয়ে বেশী ফাস্ট বোলার থাকে। এর সবচেয়ে পুরনো নজির ইংলণ্ড যখন ১৯৩২-৩৩'এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করল, লারউড, ভোস, বোওজ আর অ্যালেন। সাম্প্রতিকতম হল ক্লাইভ লয়েডের, ভারতকে দমানোর জন্যে হোলডিং, ড্যানিয়েলস, হোলডার আর জুলিয়েন। চারটে কামান দাগা হয়তো চরম অবস্থার লক্ষণ, কিন্তু তিনজন পেসার নিয়ে লড়তে অনেক দেশই নেবেছে। তিরিশের দশকে ভারতদলের পক্ষেও এটা সহজ ও সম্ভব ছিল।

চুয়াল্লিশ বছর আগে লর্ডস'এ সেই ঐতিহাসিক পঁচিশে জুন দুপুরে টস হেরে যখন ভারতদল মাঠে নামল, নিসার আর অমর সিংয়ের পায়ে-পায়ে গেলেন জহাঙ্গীর খাঁ। প্রথম ইনিংসে নিসারের পাঁচ উইকেট নেওয়া অনেকেরই জানা আছে, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে জাহাঙ্গীরের কীর্তি নিয়ে কেউ উচ্ছ্বাস করেছে বলে আমার মনে পড়ে না। প্রথম উইকেট ৩০'এ, অমরসিং'এর বলে নাউডুর হাতে সাটক্লিফ। তারপর ৩০ থেকে ৬৭ পৌঁছতে ইংল্যান্ডকে আরও তিনটে উইকেট খোয়াতে হয়। হোম্স, হ্যামন্ড, উলী। তিনজনেই জহাঙ্গীরের বলে। অনুমান করি জহাঙ্গীরের পেস ছিল নিসারের চেয়ে অনেক কম, কিন্তু অমরসিংয়ের চেয়ে বেশী। এর চেয়ে ধারালো ত্রিফলা পেস বোলিং ভারতের আর হয়নি।

এই সফরের পর জহাঙ্গীর ইংলণ্ডে ফিরে যান কেমব্রিজের ছাত্র হয়ে। অনেক পেস বোলার কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ডে পড়াশুনো করেছেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে ডক্টরেট লাভ করার কৃতিত্ব তাদের মধ্যে একমাত্র শুধু জহাঙ্গীর খাঁরই।

এম সি সি দল ১৯৩৩-৩৪'এর শীতকালে ভারতের মাটিতে তিনটে টেস্ট খেলে। জহাঙ্গীর খাঁ দেশে নেই, তাই নিসার-অমরসিংকে সাহায্য করবার জন্যে বোম্বাইতে ডাকা হল রামজীকে, কলকাতায় গোপালনকে, মাদ্রাজে নাজির আলিকে। সাত বছর আগে গিলিগান দলের সঙ্গে বোম্বাইতে যে বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলা হয় তাতে ভারতদলের বোলিংয়ের সূচনা করেন রামজী আর নাজির আলি। সরকারী টেস্ট খেলার দিন আসতে-আসতে দুজনেরই সূর্য পশ্চিম আকাশে চলেছে। শোনা যায়, রামজীর যৌবনে চোখধাঁধানো পেস ছিল, আর নাজির আলির ব্যাটসম্যান হবার শখ বাড়বার আগে অবধি তিনি বেশ জোরে বল করতেন।

১৯৩৫-৩৬ সালে এল রাইডারের অস্ট্রেলিয়ান দল। এরা পাঁচটা বেসরকারী 'টেস্ট' খেলে! কলকাতায় ছাড়া অন্য চারটে খেলায় আমাদের তরফ থেকে অন্তত তিনজন করে পেসার প্রয়োগ করা হয়েছিল। লাহোরে তো চারজন—নিসার, সালাউদ্দীন, দেবরাজ পুরী ও সুঁটে ব্যানারজী। ভারতের হয়ে একই একাদশে চারজন পেসার আর কখনো খেলেনি। এই সীজনের নতুন নির্বাচন হল রাজপুতনার মবারক আলি, আলিগড়ের সাহাবুদ্দীন আর সালাউদ্দীন, পাঞ্জাবের পুরী ও বাংলার ব্যানারজী।

গোপালন রাইডার দলের বিরুদ্ধে খেলবার সুযোগ না-পেলেও ১৯৩৬'-এর ইংল্যান্ড সফরে তাঁকে পাঠানো হয়, সুঁটে ব্যানারজীকেও। কিন্তু এ'রা দুজনেই দেশে ফিরলেন তিনটে টেস্টের মধ্যে একটাতেও না-খেলে। কারণ, নিসার-অমর সিং ছাড়াও জহাঙ্গীর খাঁ বিলেতেই হাজির, এবং তাঁকেই তৃতীয় পেসার নিয়োগ করা হয়। ইংলন্ডের পীচের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তিনটে টেস্টে চুয়ান্ন ওভার বল করে জহাঙ্গীর একটাও উইকেট পাননি। অধিনায়কের উচিত ছিল ওঁকে রেহাই দিয়ে গোপালন অথবা ব্যানার্জীকে দলে নেওয়া।

গোপালন আর ভারতদলের সঙ্গে বিদেশ যাননি। সুঁটে ব্যানারজীর কপালে লেখা আরেকবার ইংল্যান্ড সফরে যাওয়া,

আরেকবার একটিও টেস্ট না-খেলে ফেরত আসা। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে এর চেয়ে বড় অবিচার আর কারও উপর করা হয়নি। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ পেসার যেমন গোপালন, পূর্ব ভারতের একমাত্র প্রকৃত ফাস্ট বোলার সুঁটে ব্যানারজী। প্রচুর বলের বেগ আর মনের জোর তো ছিলই, ভগবান আর নির্বাচক সদয় না থাকলেও ১৯৩৭-৩৮ সালের সীজনেই ব্যানারজী নিসারের সমকক্ষ হবার সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন। এর দশ বছর পরে সুঁটে ব্যানারজী যখন তাঁর ক্রিকেট জীবনের প্রথম ও শেষ সরকারী টেস্ট খেললেন, তখন আর একটানা পেস দখলে নেই কিন্তু অকস্মাৎ বল ঠুকে ব্যাটসম্যানকে টলাবার ক্ষমতা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ব্যানারজী উপস্থিত বলেই বোমবাইতে সেই টেস্ট ম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জোনস আর ট্রিম বাম্পার ছুঁড়তে ভরসা পায়নি। ভারত দল এই খেলায় জয়লাভের কয়েক মিনিটের মধ্যে পেঁছবার পিছনে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যানার্জীর চারটে উইকেট নেওয়ার অবদান আছে।

প্রাচুর্য। আক্রমণের যে পদ্ধতিকে আমি ত্রিশূলভাবে কল্পনা করছি, সেটা সাত-আট বছর প্রয়োগ করা হয়েছিল। তৃতীয় শূলটা বদলাত, প্রধান দুই শূলে ছিল উত্তর ভারতের মহম্মদ নিসার আর পশ্চিম ভারতের অমরসিং। পেস বোলিংয়ে এর চেয়ে ভালো যুগলবন্দী আমাদের আর কখনো হয়নি।

যুগল বাঁধা হল কিন্তু দেশ থেকে সাত হাজার মাইল দূরে। তার আগে কোয়াড্রাঙ্গুলারে ওঁরা পরস্পরের বিপক্ষেই খেলতেন মুসলীম দলের হয়ে নিসার, হিন্দু দলের হয়ে অমরসিং। ১৯৩২-এর ইংলণ্ড সফরে সপ্তম খেলায় এরা প্রথম একজোট হন, টেস্টের আগে পনেরোটা ম্যাচে মাত্র চারবার এঁরা একসঙ্গে খেলেন। অথচ লর্ডস টেস্টে যারাই এই পেসার-জোড়কে ইংল্যাণ্ড ব্যাটিংয়ের উত্তমার্ধকে বিপদে ফেলতে দেখেছিল, তারাই চিনেছিল যে, এরা উৎকৃষ্ট পেস বোলার শুধু নয়—এরা পরস্পরের পরিপূরক। কামারশালায় লোহা যেভাবে কাবু করা হয়, এরাও সেভাবেই একজন ধরে আর অন্যজন

লালা অমর সিং

মহম্মদ নিসার

মারে।

১৯৩৭-৩৮'এ ভারত সফরে আসে লর্ড টেনিসন দল, আর পাঁচটা বেসরকারী টেস্ট খেলে। নতুন পেসার সেবার পরখ করা হয়নি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মবারক আলি, ব্যানারজী, গোপালন—এঁদেরই কাজে লাগানো হয় নিসার বা অমরসিং নতুন বল হাতছাড়া করলে। বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ হলে ১৯৪৬-এ যখন সরকারী টেস্ট আবার চালু হল ভারত-ইংল্যাণ্ড খেলা দিয়ে, ততদিনে ভারতের বোলিং পরিকল্পনা ও কৌশল আগাগোড়া বদলে গেছে। প্রথমে মাঁকড়, তারপর গোলাম আমেদ, তারপর সুভাষ গুপ্তে, এদের থেকে যে স্পিন-নির্ভর টেস্ট বোলিং শুরু তা আজও চলছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ একজোড়া পেস বোলার হয়তো একসঙ্গে ভারতের হয়ে নেবেছে, কিন্তু তিনজন পেসার আর কখনো হয়নি। অথচ দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমানা পার হয়ে তাকিয়ে দেখছি, পাকিস্তান পেস বোলার বিনা খেলতে নামে না।

আগেই বলেছি, তিরিশের দশক ভারতবর্ষে পেস বোলারের

১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ অবধি ভারত দল ছয়টি সরকারী আর নয়টি বেসরকারী টেস্টম্যাচ খেলে। প্রায় প্রত্যেকটিতে নিসার-অমরসিং খেলেছেন, যদি না শারীরিক কারণে বা ক্রিকেটীয় রাজনীতির দরুন এক বা অন্যজন বাদ গেছেন। এই দুজনের খাতা খুলে হিসেব করলে দেখা যাবে যে, ভারতের হয়ে নিসার ৬৮টি উইকেট নিয়েছেন (প্রতি ২৪·৮৩ রানে এবং ৪০ বলে উইকেট) আর অমরসিং নিয়েছেন ৭৪টা (প্রতি ২১·৪৩ রানে এবং ৬৩ বলে উইকেট); গড়পড়তা কোনোটাই আহামরি কিছু নয়, কিন্তু অঙ্কের পার্থক্যে ধরা পড়ে পেসার চরিত্রে এই দুজনের কী পার্থক্য ছিল।

নিসারকে একটা বল করতে দেখলেই বোঝা যেত যে, বোলিং করায় তাঁর এক এবং অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য সোজা আর লেংথে রেখে প্রাণপণ জোরে বল করা। সে যুগের ক্রিকেট-

কাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় নিসার আউটসুইং দিতেন না ইনসুইং, অনেকেই উত্তর দেবেন "বুঝলে,ছোকরা, সুইং-টুইং করার সময় থাকত না নিসারের বলে। পাইথাগোরাস না ইউক্লিড সেই যে বলে গেছেন যে এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত যাওয়া যায় সরলরেখায়, নিসারও যেন তাই বিশ্বাস করতেন।"

এই বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করতে নিসার দৌড়ে আসতেন প্রায় বিশ গজ। চওড়া কাঁধ, মোটা বুক ও পিঠ, হাকুচ ছড়ানো শরীর, এই সব নিয়ে ছোটবার সময় ধুপধাপ আওয়াজ হত বিস্তর, যেন গুমটি পেরিয়ে মেলট্রেন যাচ্ছে। এ জাতের বোলাররা অনেকেই বোলিং করার দৌড়টা শেষ করে লাফ দিয়ে। নিসারের সে ধরনের লম্ফঝম্ফ না থাকলেও বোলিং ক্রীজের কাছে পৌছতে-পৌছতে ব্যাটসম্যানের দৃষ্টিতে মনে হত নিসারের অবয়ব হঠাৎ আয়তনে বেড়ে গেছে। বাঁ হাতটা জাহাজের মাস্তুলের মতো উঁচু, ডান উরুর

সুটে ব্যানার্জী

পেছনে বলধরা মুঠো দেখা যাচ্ছে না, বাইশ গজের পীচ কী করে যেন পনেরো গজের হয়ে গেছে। পাক খেয়ে ডান হাতটা নীচে নামতেই বাঁ পা সশব্দে পটকালো, পরমুহূর্তে বলটা পীচ থেকে চমকে উঠে উইকেট কীপারের দস্তানায়। মারাঠী ভাষায় বোলারকে বলে 'গোলন্দাজ', নিসার যেন সত্যিই প্রত্যেক ওভারে দুটো করে বিনা বারুদে গোলা ছুঁড়তেন।

নিসারের দৈত্যপনার তুলনায় অমরসিংয়ের বোলিং ধরন ছিল অগোছালো আর আপাতদৃষ্টিতে অকেজো। লম্বা লম্বা হাত আর পা সামলাতেই ব্যস্ত, আঁকুপাঁকু করে কোনোরকমে দশ-বারো পা দূরত্ব অতিক্রম করে অমরসিং বোলিং ক্রীজে পৌছতেন। বোলিং দৌড়ে কোনো ছিরিছাঁদ নেই, যেন ব্যাটসম্যান হত্যায় এতই উৎসুক যে, স্টাইল টেকনিক ইত্যাদি বর্জন করে ন্যূনতম সময়ে বলটা ফেলতে চান।

একবার ক্রীজে পৌছে কিন্তু অমরসিংয়ের হঠাৎ পরিবর্তন হত। এখন-অবধি-অস্বস্তি-জাগানো অঙ্গভঙ্গি করা শরীরটা ধনুকের ছিলার মতো কখন টান্-টান্ হয়ে তৈরি হয়েছে, খালি চোখে বোঝা যায়নি। ধনুকের মতনই তীব্র সম্ভাবনা নিয়ে শরীর বাঁকলো আর সোজা হল, ডান হাতটা কান ঘেঁষে ঘুরল, তীর ছুটল বলের আকার নিয়ে।

অতরকম গোলমেলে অঙ্গাঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে কী যে হচ্ছে চট্ করে ধরা যায় না। নিসারের বোলিং পদ্ধতি যত সহজ ও সরল, অমরসিংয়ের বোলিং ততই চতুর আর বিভ্রান্তিকর। মাথায় নিসারের সমান অথচ গায়ে কোনো বর্তুলতা নেই বলে অমরসিংয়ের শারীরিক শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যেত না। অথচ কাঁধ আর পিঠের কাছি-প্রমাণ পেশীর তেজ কাজে লাগিয়ে সর্বদাই অমরসিং সেই অভাবনীয় ব্যাপার ঘটাতেন, যা সব ব্যাটসম্যান জানে অথচ কোনো গতিবিদ্যাবিদ বৈজ্ঞানিক মানতে চায় না—বলটা বোলারের হাত থেকে যত জোর এল তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেগে পীচ ছেড়ে উঠল। ঋজু কব্জির ঝাঁকানিতে এই 'অফ-দী-পীচ-পেস' অমরসিং ইচ্ছেমত কমাতে বাড়াতে পারতেন, যেন দুটো আঙুলে কোনো যন্ত্রের ডায়াল ঘোরাচ্ছেন।

উত্তর বা দক্ষিণ থেকে হাওয়া বইলে নিসারের ভাগে পড়ত হাওয়ার অনুকূলে বল করা, অমরসিংয়ের ভাগে হাওয়ার প্রতিকূলে। ব্যাটসম্যানকে বুক চিতিয়ে বল করায় ইনসুইং দেওয়া অমরসিংয়ের স্বাভাবিক অস্ত্র,—বল নতুন হোক বা পুরনো। আউট সুইং করবার জন্যে অমরসিংকে একটু চেষ্টা করে কোমর থেকে কাঁধ উলটো দিকে মুচড়ে ফল পেতে হত। ডান হাতটা এবার নামত ডান পায়ের গোছ ঘেঁষে নয়, গায়ের সামনে তেরছাভাবে বাঁ হাঁটুর কাছাকাছি। বল পুরনো হলে অমরসিং দিক বদলিয়ে হাওয়া পিঠে নিতেন, যাতে হাত থেকে পীচে বল পড়ার বেগ বাড়বার সম্ভাবনা হয়। সাধারণ বল পড়ত অফব্রেক, কাঁধ আর বাহুর প্ররোচনায়, যাতে বলটা ছিটকে ভেতরে ঢুকত যেন বলে কেউ হুল ফুটিয়েছে। স্বাদ বদলের জন্যে কদাচিৎ দীর্ঘ তর্জনীর বিপরীত তাড়নায়, বলটা লেগস্টামপ্ থেকে অফের দিকে ঝুঁকতো, যাকে আমরা পরে লেগকাটার বলে আখ্যায়িত করেছি। কোনো পূর্বাভাস না দিয়ে বলের রাশটানার কাজটা অমরসিং স্বচ্ছন্দে করতেন, মিড্ উইকেট থেকে একটুও বাতাসের সাহায্য পেলে এই পেস বদলানো অল্পগতি বলটা স্লিপ-এর দিকে ভেসে যেত, প্রায় আউট সুইং-এর মতন। মিডিয়ম-ফাসট বোলার যে এত রকম বল বদলানোর ফাঁদ ব্যাটসম্যান ধরার জন্য পাততে পারে, তা অমরসিংয়ের আগে আমাদের দেশে জানা ছিল না।

অমরসিং অসময়ে মারা গেলেন ১৯৪০ সালে, নিসারও দু-এক বছরের মধ্যেই বড় খেলা থেকে বিদায় নিলেন। নিসারের বেগ আর অমরসিংয়ের কৌশল আলাদা আলাদা বোলারের কাছে আমরা কোনোদিন আবার হয়ত দেখব, কিন্তু একজোটে একই ম্যাচে আমাদের স্বপক্ষে এমন জুড়ি আর পাওয়া যাবে কি না তাতে সন্দেহ আছে। অমরসিংয়ের জুড়ি কখোনই বোধহয় আর জন্মাবে না। নেভিল কার্ডাস বলে গেছেন যে, কিছু কিছু ক্রিকেটার আছেন, যাঁরা একবারই তৈরী হন, কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁদের বানিয়েই ছাঁচটা ভেঙে ফেলেন। কিন্তু নিসারের মত অজটিল নির্ভেজাল ফাস্ট বোলার নিশ্চয় আবার জন্মাবে। দুজন এমন বোলার পেলেই আমি দল পাকিয়ে নিজের পয়সায় কিংস্টন নিয়ে যাব। আর কিংস্টনের পাড়ায়-পাড়ায় হাঁকব, "আয়, কে আসবি লড়তে আয়। আমাদেরও ফাস্ট বোলার আছে।"

উপন্যাস

শংকর

পিকলুর কলকাতা-ভ্রমণ

দাদু ভবনাথ সেনের সঙ্গে এই সাত-সকালে পিকলুর ঠাকুমার ঝগড়া লেগেছে। উপলক্ষ অবশ্যই পিকলু।

চিঁড়ে-ভাজা আর চা হাতে পিকলুর ঘরে ঢুকেই ঠাকুমা দেখতে পেলেন তাঁর আদরের নাতি মাদ্রাজ-থেকে-পাঠানো পিকচার পোস্টকার্ডখানার দিকে একমনে তাকিয়ে আছে। ছবিখানা পাঠিয়েছে শতরূপা। একদিকে বঙ্গোপসাগরের রঙিন ফটো, অন্যদিকে শতরূপার নিজের হাতের লেখা, "দাদা, আমরা আজ ভেলোর যাচ্ছি। ওখান থেকে তোকে আবার চিঠি লিখব।"

ঠাকুমা জানেন, পিকলু এই চিঠিটা গতকালও সাত-আট-বার পড়েছে। আজও সেই দৃশ্য দেখে পিকলুকে আদর করে তিনি বললেন, "সোনা আমার, কিচ্ছু ভেবো না—সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শতরূপার শক্ত কী এক অসুখ হয়েছে—তাই পিকলুর বাবা-মা বোনকে নিয়ে ভেলোর গিয়েছেন। ঠাকুমা ভরসা দিলেন, "ওখানে মস্ত হাসপাতাল, বড়-বড় সব ডাক্তার—শতরূপা ক'দিনেই সেরে উঠবে।"

এর পরেই ঠাকুমা রেগে উঠলেন দাদুর ওপর। হাঁটার স্পিড ডবল করে দিয়ে রীতিমতো বিরক্তভাবে বৈঠকখানায় হাজির হলেন। দাদু ভবনাথ সেন তখন গড়গড়ার লাল রবারের পাইপটা বাঁ-হাতে ধরে ডান হাতে একখানা চিঠির খাম খুলবার চেষ্টা করছেন। চিঠিখানা লিখেছে সাহিত্যিক ভবনাথের কোনো ভক্ত পাঠক: "আপনার লেখার তুলনা হয় না। আপনি আমাদের দেশের গৌরব।"

"তুমি কি অপদার্থই থেকে যাবে? সংসারের কোনো কাজে লাগবে না?" হুংকার ছাড়লেন ঠাকুমা। সহজে রাগেন না

ঠাকুমা, কিন্তু একবার মেজাজ গরম হলে ও'র মাথার ঠিক থাকে না।

দাদু ততক্ষণ গড়গড়ায় আর-একবার টান দিয়ে চিঠির গোছা থেকে একখানা পোস্টকার্ড টেনে নিলেন। বেনারস থেকে একজন পাঠিকা লিখছেন ঃ "আপনার লেখা পড়তে - পড়তে বিশ্বসংসারের কথা ভুলে কোথায় যেন চলে যাই।"

চিঠিখানা ঠাকুমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ভবনাথ বললেন, "দেখো, কী সব লিখছে।"

"আমার তো বিশ্বসংসার ভুললে চলবে না," মুখ ঝামটা দিলেন ঠাকুমা। "আমার ঘর-সংসার আছে—পিকলুর চিন্তা আছে।"

"পিকলু তো খুবই ভাল ছেলে—ওর সম্বন্ধে আমার তো কোনো চিন্তাই হয় না।" অত্যন্ত শান্তভাবে ভবনাথ আবার গড়গড়ার পাইপে মুখ লাগালেন।

ঠাকুমা কয়েক মুহূর্ত ভবনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু ওদিক থেকে আর কোনো সাড়া না - পেয়ে গলার স্বর টপ ভল্যুমে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "বলি, তুমি কি এই কলকাতা শহরে আছ? না বলিভিয়া বাহামায় চলে গিয়েছ?"

ঠাকুমার এইসব কথা নিজের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে পিকলু ফিক করে হেসে ফেলল। দাদুর শেষ কিশোর উপন্যাসটার পটভূমি বলিভিয়া। দুর্দান্ত হয়েছে নবেলখানা। ওটা পড়া ছিল বলেই তো কুইজ কনটেসটে পিকলু ক্লাশের সবাইকে হারিয়ে দিল। মাস্টারমশাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন. বলিভিয়া কোথায়? ক্লাশের ছেলেরা কিছুই বলতে পারল না। একজন আন্দাজে ঢিল ছুড়ল, "বাইলাডিলার কাছে—মধ্যপ্রদেশে।" "নো নো—একেবারেই ভুল।" মাস্টারমশায় গম্ভীরভাবে বললেন "আর কেউ? এনি ওয়ান এলস?" পিকলু দাঁড়িয়ে উঠে বলে দিল. "দক্ষিণ আমেরিকায়।" "বলিভিয়ার রাজধানী?" মাস্টারমশায় ভাবলেন, এবার পিকলু হেরে যাবে। কিন্তু সংগে সংগে সে উত্তর দিল ঃ লা-পাজ। এসব খবর দাদুর বই থেকে পিকলু জেনে ফেলেছে।

পিকলু ভেবেছিল, দাদু দক্ষিণ আমেরিকায় ওইসব জায়গায় নিজে গিয়েছেন—অনেকদিন থেকেছেন। না হলে লা-পাজ শহরের অমন বর্ণনা করবেন কী করে? কিন্তু কলকাতায় এসে ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। "বলিভিয়া! মাগো! সে আবার কোথায়? গতবার তো বই লেখার আগে হরিময় ঠাকুরপোর সংগে বালিতে গিয়ে ক'দিন থকল।"

"বালী। বালীদ্বীপ! সেও তো অনেক দূর। ভারী সুন্দর জায়গা।" ওখানকার ক'খানা রঙিন ছবি পিকলু দেখেছে। ওখানকার মেয়েদের মাথায় কী চমৎকার ফুল গোঁজা থাকে।

ঠাকুমা বললেন, "দূর। বালিতে তো কোনো মেয়ে মাথায় ফুল গোঁজে না। আমার বাপের বাড়ি তো বালিতে—বালি-উত্তরপাড়ায়। এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে—তোকে একদিন নিয়ে যাবো'খন।"

বালিভিয়ার কথায় দাদু মুখ তুলে চাইলেন। পিকলুর ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বলছ?"

"বলছি বই কি। বলবার জন্যেই তো এসেছি। কিন্তু কোনো কথাই তোমার কানে ঢুকছে না," ঠাকুমা বেশ জোরের সঙ্গেই ঝগড়া করতে গেলেন।

কিন্তু সাহিত্যিক দাদু ইতিমধ্যে অন্য কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছেন। চোখ বন্ধ করেছেন, মাঝে-মাঝে শুধু গুড়ুক-গুড়ুক চাপা আওয়াজ হচ্ছে।

এবার ঠাকুমার রাগ বাড়ল। বললেন, "ঠিক আছে। তোমার দ্বারা যখন হবে না, তখন আমি লালবাজারেই খবর পাঠাচ্ছি।"

নাটকীয় এই মুহূর্তে এক ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

বাইরের দরজাটা বন্ধ ছিল না। ভদ্রলোক বলতে যাচ্ছিলেন, "বাড়ির দরজা কখনও খুলে রাখবেন না। কখন কী বিপদ হয় —কে জানে। চোর-ছ্যাঁচড়ে দেশটা বোঝাই হয়ে আছে।"

ঠিক এই সময় ঠাকুমার মুখে লালবাজার কথাটা শুনে ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন।

"অ্যাঁ! সাতসকালে লালবাজার কেন? যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই...অ্যাঁ...বউদি..."

ভদ্রলোক যে এ-বাড়ির শুভানুধ্যায়ী এবং সকলকেই খুব ভালবাসেন তা বোঝা যাচ্ছে।

পিকলু দেখল, জাম রঙের খাদি হাফ-হাতা পাঞ্জাবি পরেছেন ভদ্রলোক। রোগা পাকানো চেহারা। বোধহয় দাদুর বয়সী হবেন ভদ্রলোক। মাথা জুড়ে মস্ত টাক—শুধু এক থেকে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় ঘন কালো চুল রয়েছে—ঠিক যেন টেকো মাথার তলায় একখানা মোটা কালো রিবন জড়ানো আছে।

দাদু হেসে ভদ্রলোককে ভরসা দিলেন, "চুরি ডাকাতির ব্যাপার নয়। উনি একবার বেয়াইমশায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান।"

এ-কথা শুনে ভদ্রলোক আরও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। "কী সর্বনাশ! কী করেছিলেন ভদ্রলোক? লালবাজার লক্-আপ সে-অতি বিশ্রী জায়গা! ব্রিটিশ আমলে একবার হাজতে রাত কাটিয়ে এসেছিলাম।"

ভদ্রলোকের কথায় দাদু বেশ মজা পাচ্ছেন। গড়গড়ায় টান দেওয়া বন্ধ করে তিনি বললেন, "লক্-আপ নয়। খোকার শ্বশুরমশায় তো এখন ওখানেই ট্রান্সফারড হয়েছেন। লাল-বাজারের মধ্যে বড় বড় কোয়ার্টারও আছে। আমার গিন্নী তো কয়েকদিন ওখান থেকে ঘুরে এসেছেন।"

দাদুর টেকোবন্ধুটি এবার টাকে হাত দিলেন। বললেন, "বউদি! আপনিই তাহলে হচ্ছেন সেই রাইট পার্সন যাকে আমি খুঁজছি।"

"কী করতে হবে বলুন?" দিদিমা ঝগড়া বন্ধ রেখে জিজ্ঞেস করলেন।

গলাটা একটু নামিয়ে টেকো ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "একটা কোশ্চেনের অ্যানসার জানবার আমার খুব ইচ্ছে। আপনার বেয়াইকে যদি একটু জিজ্ঞেস করেন, বিনা লাইসেন্সে কোন্ সাইজ পর্যন্ত রামপুরিয়া সঙ্গে রাখা যায়?"

"কী পুরিয়া?" ঠাকুমা ঠিক বুঝতে পারছেন না। "খোকার শ্বশুর তো ডি-সি, উনি ডাক্তার নন—পুরিয়া-টুরিয়া কোথায় পাবেন?"

টেকো ভদ্রলোক এবার ছোট ছেলের মতো হেসে ফেললেন। "এত বড় রাইটারের বউ আপনি। থার্টি-এইট ইয়ার্স বাংলা বইয়ের লাইনে আছেন—আর সামান্য ব্যাপারটা জানেন না। গতবারের সাপ্তাহিক শিহরণ পত্রিকায় দাদার যে-লেখাটা বেরিয়েছে সেখানেই রামপুরিয়ার রেফারেন্স রয়েছে। অপূর্ব লাইনখানা : 'রামপুরিয়া রামও নয়, পুরিয়াও নয়—স্রেফ একধরনের ছুরি ; স্প্রিং টিপলেই কেউটে সাপের মতো বেরিয়ে এসে ছোবল মারে।' অথচ অন্য সময় দেখলে ছুরি বলে মনেই হয় না!"

পিকলুর গল্পটা পড়া হয়নি। কিন্তু মা পড়েছিল, এবং পিকলু শুনেছে, এই রামপুরিয়ার কল্যাণেই নায়ক শশধরবাবু দুর্দান্ত দস্যু ভোজরাজের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

সেই থেকেই বোধহয় এই ভদ্রলোক ভাবছেন, পথেঘাটে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে সঙ্গে একখানা রামপুরিয়া রাখবেন।

"সঙ্গে রাখবার আর জিনিস পছন্দ করতে পারলে না!" দাদু বকুনি লাগালেন। ছোরাছুরি রিভলবার কিছু সঙ্গে রাখাই দাদু যে পছন্দ করেন না তা পিকলু জানে।

ভদ্রলোক এবার বললেন, "আপনি তো বলে খালাস। কিন্তু শ্রীভৃগু প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে লিখছেন, সাবধান, শত্রু কাছেই আছে। যে কোনো ক্ষতি হতে পারে।"

দাদু বলতে গেলেন, "ওই সব রাবিশগুলোয় তুমি বিশ্বাস করো!" কিন্তু ঠাকুমা ওঁকে থামিয়ে বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না, রামপুরিয়ার মাপটা আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।"

ঠাকুমা এবার বাইরের লোকের সামনে হাঁড়ি ভাঙলেন। "যা অবস্থা দেখছি, আমাকে এবং পিকলুকে এ-বাড়ি ছেড়ে লালবাজারেই উঠতে হবে। ওঁর তো কোনোদিকেই নজর নেই —দিন রাত শুধু প্লট প্লট আর প্লট। গল্পের প্লট খোঁজা ছাড়া আপনার দাদার আর কিছুই ভাল লাগে না।"

টেকো ভদ্রলোক এবার বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলেন। কোন্ পক্ষে সাপোর্ট দেবেন বুঝতে পারছেন না।

দাদু এবার বাইরের লোকের সামনে অপমানিত হয়ে বললেন, "লেখকের বউ হয়েছ যখন, তখন প্লট, ক্যারাকটার এসব সহ্য করতেই হবে।"

"লেখক জানলে বিয়েই করতাম না," ঠাকুমা সোজাসুজি উত্তর দিলেন। বিয়ের আগে তুমি তো শুধু পদ্য লিখতে। ছোট ছোট জিনিস, বেশী হুজ্জুত নেই। তারপর এই ছেলেদের লাইনে এসে তোমার কী যে দুর্মতি হল। কখনও কিছু বলবার উপায় নেই—সব সময় প্লট নিয়ে ডুবে আছ।"

টেকো ভদ্রলোক এবার দাদুর পক্ষে যাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "ওঁর যে আবার সব স্পেশাল প্লট। একটু বেশী খাটাখাটনি করতেই হয়—সাধে কি আর ওঁকে শিশুসাহিত্য-সম্রাট টাইটেল দেওয়া হয়েছে!"

"রাখুন রাখুন!" এই বলে ঠাকুমা এবার পিকলুর ঘরে চলে এলেন।

বউদির মেজাজ আজ এত চড়া কেন, এখনও ভদ্রলোক বুঝতে পারেননি।

ভবনাথ সেন গড়গড়ায় সামান্য টান দিয়ে বললেন, "তোমার বউদির দোষ নেই। প্রায় এক সপ্তাহ হল পিকলু

এসেছে, অথচ এখনও পর্যন্ত কিছুই কলকাতা শহরের দেখানো হল না।"

"ভুলুর ছেলে! বম্বে থেকে এখানে এসেছে?" টেকো-ভদ্রলোক বেজায় খুশী হলেন। দাদুর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ রেখে তিড়িং করে ভদ্রলোক এবার ভিতরের ঘরে চলে এলেন।

ঠাকুমা পিকলুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, "তোমার দাদুর বন্ধু—হরিময় চৌধুরী।"

হরিময়বাবু বললেন, "তোমাদের সঙ্গে দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তা আছে, কিন্তু সেটা আমি বলি না এই জন্যে যে, দুর্জনেরা বলবে সাহিত্যিক ভবনাথ সেন শুধু আত্মীয়-তোষণ করছেন।"

ঠাকুমা বললেন, "বুঝতেই পারছেন, ভুলুর ছেলে—পিকলু।"

"খুউব বুঝতে পারছি—খুউব ছোটবেলায় যখন এসে-ছিলে তখন রিকশ চড়ে দু'জনে খুইব ঘুরেছি।"

তখন যে পিকলু রিকশ চড়ত তা মনে নেই। ঠাকুমা বললেন, "রিকশ চড়লে তোর আর কিছুই ভাল লাগত না। কান্নাকাটি—এই দাদুই সামলাত।"

ঠাকুমা এবার বোধ হয় অতিথির জন্যে চা আনতে গেলেন। হরিময়বাবু বেজায় খুশী মেজাজে একখানা বেতের টুল টেনে নিয়ে পিকলুর পাশে বসে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল নামখানা যেন কী?"

"পুণ্যশ্লোক সেন।" পিকলুর উত্তর শুনেই হরিময়বাবু টাকে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। "হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে বটে—তোমার দাদু খুব পছন্দ করে নাম দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে কনসাল্টও করেছিলেন এবং, সত্যি বলতে কী, আমি তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার দাদুর মাথায় যা ঢোকে তা করবেনই।"

এমন সুন্দর নাম, বম্বেতে কত মারাঠী ভদ্রলোক এই নামের প্রশংসা করেন। অথচ হরিময়বাবুর আপত্তি কেন?

হরিময়বাবু বললেন, "আমার আপত্তি টেকনিক্যাল কারণে। নাতিনাম্ ঠাকুর্দাক্রমঃ! যার দাদু এত বড় লেখক, সেও নিশ্চয় লেখক হতে পারে!"

পিকলু চুপ করে আছে। হরিময়বাবু বললেন, "হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। চার্লস ডিকেন্স, এত বড় নভেলিস্ট—তাঁর নাতনী মণিকা ডিকেন্স নাম করা লেখিকা হয়েছে। উপেন্দ্র-কিশোর রায়। তাঁর নাতি সত্যজিৎ রায়—এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ! এখন ভবনাথ সেনের নাতির এইট্টি পার্সেন্ট চান্স লেখক হবার। কিন্তু ওই 'পুণ্যশ্লোক' নামটা উচ্চারণ করতে কচি-কচি ছেলেমেয়েদের বুকে ধাক্কা লাগবে।"

হরিময়বাবুর কথা শুনে পিকলু হেসেই ফেলল। লেখক হবার কোনো ইচ্ছে নেই পিকলুর, সে হতে চায় বৈজ্ঞানিক; মহাকাশে যাবার বৈজ্ঞানিক। বোন শতরূপাকে সে বলে রেখেছে, ফ্রী পাশে সে একবার বোনকে সমস্ত মহাকাশ ঘুরিয়ে আনবে।

হরিময়বাবু বললেন, "আমাকে তুমি ঠিক চিনতে পারছ না। আমি চমচম পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর।"

চমচম পত্রিকার নিয়মিত পাঠক পিকলু। প্রথম পাতায় হেডিং থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত সে পড়ে ফেলে, কিন্তু সেখানে হরিময়বাবুর নামটা সে একবারও দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না।

"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?" এবার নিজের টাক মাথায় হাত দিলেন হরিময়বাবু। জিজ্ঞেস করলেন, "এই জিনিসটার নাম কী?" ফিক করে হেসে ফেলল পিকলু। ওই জিনিসটার নাম কে না জানে? টাক। হরিময়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "টাকের একটা সিরিয়াস সংস্কৃত নাম আছে!"

পিকলুর এবার মনে পড়ছে, চমচম পত্রিকায় সম্পাদকের নাম থাকে ঃ ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরী। ইন্দ্রলুপ্ত মানে তাহলে টাক!

চাপা গলায় হরিময়বাবু বললেন, "ছদ্মনামখানা কী রকম হয়েছে? তোমার দাদু তো প্রথমে শুনেই আমাকে কংগ্রাচুলেট করেছিলেন। সন্তুষ্ট হয়নি শুধু আমার ভাইপো—ইলু। চৌধুরী অথবা ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরী নামে কোনো চিঠি দেখলেই সে চটে উঠত।"

হরিময়বাবু এবার মনের খুশিতে চমচম পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন পিকলুর সঙ্গে। হরিময়বাবুর ওই স্বভাব—ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই তাদের সঙ্গে একদম মিশে যান, তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় চমচম পত্রিকা সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ করেন।

হরিময়বাবু বললেন, "চমচম নামখানা তোমার মিষ্টি লাগে না?"

"মিষ্টি বলে মিষ্টি!" পিকলু উত্তর দিল।

"অথচ আমার চাকর এবং সহ-সম্পাদক বিজয়ের ধারণা নামটা মোটেই ভাল নয়।" দুঃখ করলেন হরিময়বাবু। বললেন, "কাগজের নাম দিতে গিয়ে খু-উ-ব কষ্ট পেয়েছি। যে নামই পছন্দ হয়, দেখি সে নামে একখানা পত্রিকা রয়েছে। না-হলে আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স ছিল সন্দেশ। খেতে এবং পড়তে দুই মজা। কিন্তু ও নামে কাগজ রয়ে গিয়েছে। তখন দেখলাম, নেকসট্ টু সন্দেশ ইজ চমচম। কোনো পত্রিকার নাম তো বোঁদে বা মিহিদানা রাখা যায় না। আমার বন্ধুর ইচ্ছে ছিল জিলিপি নাম হোক। আমার জন্ম বেনারসে। রবড়ি এবং জিলিপির ওপর আমার একটু টান থাকবেই। কিন্তু জিলিপির প্যাঁচের মধ্যে আমি ছেলেদের ঢোকাব না। তাছাড়া জিলিপি গরম না-থাকলে খাওয়া যায় না। চমচম গরম খেতেও ভাল, বাসী খেতেও গ্রেট! পুরনো সংখ্যাগুলো যে-কেউ পড়ে দেখুক, মনে হবে আধঘণ্টা আগে প্রকাশিত হয়েছে।"

হরিময়বাবু যে খাওয়া-দাওয়া ভালবাসেন তা তাঁর কথা-বার্তায় বোঝা যাচ্ছে। পিকলুকে বললেন, "তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুউব ভাল হল। আমার দু'একটা গোপন পরি-কল্পনা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে নিই।"

চায়ের কাপ হাতে ঠাকুমা ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে পড়েছেন। তিনি হেসে বললেন, "ওইটুকু ছেলের সঙ্গে আপনার আবার কী পরামর্শ?"

হরিময়বাবু চোখ গোলগোল করে বললেন, "আমাদের চমচম পত্রিকার নীতিই হল পাঠকদের পরামর্শ অনুযায়ী চলা। দেখেন না, প্রথম পাতায় মোটা অক্ষরে লেখা থাকে—বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।"

ঠাকুমা আবার মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, "আপনার আর বয়স বাড়ল না—ছোটদের কাগজ সম্পাদনা করতে গিয়ে আপনি ছোট হয়ে রইলেন।"

হরিময়বাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পিকলুকে সাবধান করে দিলেন, "যা-কিছু তোমার সঙ্গে আলাপ হবে সমস্ত টপ সিক্রেট।"

পিকলুর উত্তরের অপেক্ষায় না-থেকেই হরিময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "টপ-সিক্রেট কথাটার মানে জানো তো? যাকে বলে কিনা, ভী-ষ-ণ গোপনীয়; কাউকে বলা চলবে না।

মিলিটারিতে, পুলিসে, গভরমেণ্টে কালো-কালো বাক্সে এই সব টপ-সিক্রেট কাগজপত্তর থাকে—এমন সব খবর যা শুধু চোখের জন্যে, মুখের জন্যে নয়। সেইসব খবর দেখলে চোখ চমচম হয়ে যাবার অবস্থা।"

পিকলু সামনের বছরে এন-সি-সিতে ঢুকবে। মিলিটারিতে ওর ভয় নেই। সে বলল, "বলুন আপনি, কেউ জানতে পারবে না।"

হরিময়বাবু বললেন, "আমার সহ-সম্পাদক বিজয় পর্যন্ত ব্যাপারটা জানে না। ওকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না—মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, আমাদের সমস্ত গোপন খবর মাসিক শিশুবন্ধু পত্রিকায় চলে যাচ্ছে।"

এরপর পিকলু এবং হরিময়বাবুর গোপন আলোচনা আরম্ভ হল। পাঠকদের মন জয় করবার জন্যে চমচম সম্পাদকের মাথায় নতুন এক পরিকল্পনা এসেছে। খাবার জিনিসই মানুষকে সবচেয়ে টানে—এ বিষয়ে হরিময়বাবুর মনে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বার করবেন কাটলেট সংখ্যা। "তোমার কী মনে হয়? ঘোষণা করা মাত্রই হৈ-চৈ পড়ে যাবে না?"

পিকলু ঠিক বুঝতে পারছে না। "চমচম পত্রিকার কাটলেট সংখ্যা!" সে একটু সন্দেহ প্রকাশ করল।

কিন্তু হরিময়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আপত্তিটা কী? মিষ্টির সংগে কেউ নোনতা খায় না?"

দিদিমা এই সময় আবার ঘরে ঢুকলেন। হরিময়বাবু আবার টাকে হাত দিলেন। দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন "নাতিটিকে কেমন দেখলেন?"

"টপ ক্লাস বলতে যা বোঝায়," সংগে সংগে মতামত দিলেন হরিময়বাবু। "ঠিক যেন একখানা গরম কবিরাজী চিকেন কাটলেট। খাসা বুদ্ধি!"

দিদিমাও বললেন, "খাসা ছেলেই বটে। বম্বেতে আবার কুইজ মাসটার হয়েছে। সাধারণ জ্ঞানে কেউ ওর সংগে পেরে ওঠে না।"

এই খবর পেয়ে হরিময়বাবু আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। "অ্যাঁ! বলবেন তো। এত বড় খবরটা আমার কাছে চেপে গিয়েছেন। আমার ভীষণ উপকার হল। দুখানা কোশ্চেন আমার পকেটে রয়েছে, পাঠকরা পাঠিয়েছে। এ সংখ্যাতেই উত্তর দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু নকুলবাবুকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"নকুল কে?" ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলন।

"চলমান বিশ্বকোষ—উনিই তো আমাদের প্রশ্নোত্তর বিভাগের শক্ত-শক্ত কোশ্চেনের উত্তরগুলো দেন। কিন্তু ওঁকে ক'দিন থেকে পাচ্ছি না—কোথায় যেন লেকচার দিতে গিয়েছেন।"

কোশ্চেন দুটো শোনবার জন্যে পিকলুর আগ্রহ হচ্ছে। হরিময়বাবু এবার পকেট থেকে কাগজখানা এবং সেই সংগে পড়বার চশমা বার করে ফেললেন। চশমাটা নাকে লাগাতে লাগাতে বললেন, "আজকালকার ছেলেমেয়েদের যা বুদ্ধি! এমন সব কোশ্চেন পাঠায় যে সম্পাদকের মাথা ভোঁ-ভোঁ করে। উত্তর ভাবতে-ভাবতে ঘেমে উঠি—এ-মাথায় চুল গজাবে কী করে? ইঞ্জিন সব সময় গরম হয়ে আছে!"

এবার কোশ্চেনখানা ছাড়লেন হরিময়বাবু: "কোন্ দেশের রাজা দাড়ির ওপর ট্যাক্সো বসিয়েছিলেন? বাব্বা! কী প্রশ্ন! মাথা ঘুরিয়ে দেয়। ইনকাম-ট্যাক্স, সেল-ট্যাক্সের বড় বড় অফিসারদের জিজ্ঞেস করলাম, গোঁফের ওপর ওঁরা কখনও ট্যাক্সো বসিয়েছেন কিনা। কিন্তু কেউ বলতে পারল না।"

পিকলু বলে উঠল, "খুবই সোজা প্রশ্ন। রাশিয়ার রাজা পিটার দ্য গ্রেট।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন হরিময়বাবু। এবার তিনি সেকেণ্ড প্রশ্নখানা ছাড়লেন। "কোন্ দেশের রানী নকল দাড়ি পরতেন?"

এবারেও মেরে বেরিয়ে গেল পিকলু। বললে, "আমাদের ক্লাশের সব ছেলে জানে, মিশরের রানীরা নকল দাড়ি পরতে ভালবাসতেন!"

হাতের গোড়ায় একটা হাতপাখা ছিল—সেটা তুলে নিয়ে নিজেকে ঘনঘন হাওয়া করতে লাগলেন হরিময়বাবু। চিৎকার করে বললেন, "বউদি, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছে। আপনার এই নাতির জ্ঞানের বহর দেখে।"

নাতির প্রশংসা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে ঠাকুমা বললেন, "ওইটুকু ছেলে যে কত খবর রাখে, আমি তো অবাক হয়ে যাই।"

ঠাকুমা এবার খবর দিলেন, "এই দেখুন না, এতদিন পরে কলকাতায় এল, এখনও পর্যন্ত কলকাতার কিছু দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারলাম না। কিন্তু পিকলু আমাকে গড় গড় করে শুনিয়ে দিল মনুমেণ্টের উচ্চতা কত। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল নাকি কয়েক ইনচি করে মাটিতে বসে গিয়েছে।"

"ভারী মজার খবর তো!" খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন হরিময়বাবু। "মাটিতে বসতে-বসতে শেষ পর্যন্ত কোন্ দিন তাহলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উধাও হয়ে যাবে! ওর চুড়োয় ঘাস গজাবে!"

ঠাকুমার বোধ হয় দাদুর সঙ্গে ঝগড়া করার কথাটা আবার মনে পড়ে গেল।

দাদু একমনে গড়গড়ায় টান দিচ্ছেন—আর মাঝে মাঝে ধোঁয়া খাওয়া বন্ধ রেখে চুপচাপ বসে আছেন।

দাদুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ঠাকুমা চড়া গলায় বললেন, "বলি, শুনছ?"

দাদু যেন অন্য কোনো রাজত্বে চলে গিয়েছিলেন। আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন, "কিছু বলছ?"

ঠাকুমা ঃ "বলি কী করছ?"

দাদু বললেন, "ভাবছি। ভেবে-ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না।"

এ-ঘরে বসে হরিময়বাবু ফিসফিস করে পিকলুকে বললেন, "তোমার দাদু গল্পের প্লট ভাবছেন—চমচমের কাটলেট সংখ্যার জন্যে স্পেশাল উপন্যাস।"

হরিময়বাবু ঠাকুমাকে পাকড়াও করে পিকলুর ঘরে নিয়ে এলেন। হাতজোড় করে আবেদন করলেন, "বউদি, এই সময় দাদাকে একদম ডিসটার্ব করবেন না। ভবনাথ সেনের মুড নষ্ট হলে দেশের ক্ষতি হবে।"

ঠাকুমা রেগেমেগে উত্তর দিলেন, "একশোবার ডিসটার্ব করব। পাঁচটা নয়, দশটা নয়—একটি নাতি, এতদিন পরে এখানে এল; মনমরা হয়ে বাড়িতে বসে আছে। তাকে নিয়ে একবারও বেড়ানো হল না—কীরকম দাদু!"

হরিময়বাবু কিন্তু ভবনাথের অবস্থা আন্দাজ করতে পারছেন। ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ভবনাথ বললেন, "হরিময়, তুমি এসেছ। তোমাকে দেখলেই ভয় করে—মনে হয় পালিয়ে যাই।"

"ভয়ের কী আছে? আমি তো তাগাদা দিতে আসিনি।" হরিময়বাবু সান্ত্বনা দেন ভবনাথকে।

ভবনাথ বললেন, "কী যে হল—গল্পটা শুধুই আটকে যাচ্ছে।"

"আটকাতে-আটকাতেই হঠাৎ খুলে যাবে। গতবারেও তো গোড়ার দিকে গপ্পোটা আটকাচ্ছিল। তারপর যখন বেরুলো তখন বাজারে হৈ-চৈ পড়ে গেল।"

ভবনাথ বললেন, "সব ভাল যার শেষ ভাল। আমি তো গল্পের শেষ না-ভেবে প্রথম লাইন লিখি না। খোদ শরৎ চাটুজ্যে মশাই আমাকে গোপনে পরামর্শটা দিয়েছিলেন—লাস্ট লাইনটা মনে না আসা পর্যন্ত কখনও ফার্স্ট লাইনটা লিখবে না।"

হরিময়বাবু বললেন, "আপনি সাধনা চালিয়ে যান। কোনোরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন না।"

এরপর হরিময়বাবু পিকলুর ঘরে ফিরে এসেছেন। তেমন দরকার হলে তিনি নিজেই পিকলুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবেন। অবশ্য পিকলুর যদি আপত্তি না-থাকে।

পিকলুর ঠাকুমার কাছে প্রস্তাবটা দেবার কথা হরিময়বাবু ভাবছেন, ঠিক সেই সময় তিরিক্ষি মেজাজে দরজার ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠল।

উঃ! কান ফুটো হয়ে যাবে! লোকটা হয় পালোয়ান, না-হয় জীবনে কখনও বেল বাজায়নি। বাড়িতে একটা লেখক গভীর চিন্তা করছেন, সেই সময় কি এইভাবে কেউ বেল

বাজায়? ভবনাথের উচিত এই সময়টা অন্তত সাহিত্যিক নগেন পালের মতো বাইরে লিখে দেওয়া : 'দয়া করে জ্বালাতন করবেন না। প্লিজ্ ডোণ্ট ডিসটার্ব।"

নিজেই দরজা খুলতে গিয়ে হরিময়বাবু একটু ঘাবড়ে গেলেন। সাড়ে-ছ' ফুট লম্বা একখানা চলমান পাহাড় হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। লোকটার মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু প্রমাণ সাইজের ইম্পিরিয়াল গোঁফ। এই গোঁফটাই যে ইম্পিরিয়াল, তা অন্য সময় হলে হরিময়বাবু বলতে পারতেন না। কিন্তু পিকলুর দাদু গতবারের উপন্যাস-খানায় নানারকম গোঁফের বিস্তারিত খবরাখবর দিয়েছেন। দু'দুবার প্রুফ সংশোধন করে হরিময়বাবুর ওসব মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এই ইম্পিরিয়াল গোঁফ ও দাড়ি প্রথম রেখেছিলেন ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন।

ইম্পিরিয়াল গোঁফের মালিককে পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক নিমেষে দেখে নিলেন হরিময়বাবু। পাঞ্জাবি এবং ধুতির সঙ্গে লোকটা কালোরঙের ভারী বুট জুতো পরেছে।

ঘরে ঢুকেই সে দাদুকে সেলাম ঠুকল এবং জানাল, তার নাম হুকুম সিং—লালবাজার থেকে এসেছে।

লালবাজার শুনেই হরিময়বাবু কিছুক্ষণের জন্যে ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেলেন। ঠাকুমা বললেন, "কিছু চিন্তা করবার নেই—হুকুম সিং অতি অমায়িক লোক; পিকলুর পুলিস-দাদুর কাছেই ওর ডিউটি।"

হরিময়বাবুর অবস্থা দেখে হুকুম সিংও একটু মজা পেল। বলল, "হামি তো পিলেন-ডিরেসে আছি, এখোন কোনো চিন্তা নেই।"

অ্যালসেশিয়ান কুকুর এবং পুলিস যে-ড্রেসেই থাকুক হরিময়বাবু বেশ অস্বস্তি বোধ করেন। অত বড় সাহিত্যিক নগেন পাল, তাঁর কাছে লেখা নেওয়াই বন্ধ করে দিলেন হরি-ময়বাবু, স্রেফ ওই কুকুরের ভয়ে। বাড়িতে বাছুরের সাইজের কুকুর থাকলে কে সেখানে লেখা আনতে যাবে? এক-একটা কুকুর যা অসভ্য হয়! মালিক ছাড়া কাউকে মানুষই মনে করে না।

হুকুম সিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠাকুমা একগাল হেসে ফেললেন। পিকলুর পুলিসদাদু ওকে পাঠিয়েছে, পিকলুকে বেড়িয়ে আনবার জন্যে।

"খোদ পুলিসের সঙ্গে হাওয়া খাওয়া!" হরিময়বাবু প্রস্তাবটায় বেশ উৎসাহিত বোধ করছেন।

ভবনাথ অনুরোধ করলেন, "হরিময়, তুমিও ওদের সঙ্গে একটু ঘুরে এসো না। যেখানে খুশি যতক্ষণ বেড়াতে পারবে। পুলিস সঙ্গে থাকলে আমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না!"

হরিময়বাবু ঠিক মনঃস্থির করতে পারছেন না। ভবনাথ-বাবু বললেন, "আমার নাতিটি খুব ইনটেলিজেণ্ট। রাস্তায় বেরুলেই নানা প্রশ্ন করে। তুমি থাকলে উত্তর দিতে পারবে।"

ভ্রমণের ব্যাপারে হরিময়বাবু কখনও পিছপা হন না—সে দূরদেশ ভ্রমণই হোক আর কলকাতা ভ্রমণই হোক। এবার আবার স্পেশাল সুবিধে—সঙ্গে পুলিস রয়েছে।

২

হুকুম সিংয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে বেজায় খুশী হরিময়বাবু। তাঁর আনন্দ যেন পিকলুর থেকেও বেশী।

পকেট থেকে চিকলেট বের করে হরিময়বাবু একটা পিকলুকে দিলেন, আর একটা নিজের মুখে পুরলেন। তারপর ফিসফিস করে পিকলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুকুম সিংকে একখানা চিকলেট দেব নাকি? পুলিসে চিকলেট খায় তো?"

হুকুম সিংকে জিজ্ঞেস করতেই সে গোঁফ নাড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়ল। "রাম! রাম! আমি কোভি চিকেন খাই না!"

হরিময়বাবু এবং পিকলু দু'জনেই হাসিতে গড়িয়ে পড়ল। হরিময় নিজস্ব স্টাইলে ব্যাখ্যা করলেন, "ওরে বাবা, চিকেন নয়—চিকলেট। বহুত আচ্ছা চুইং গাম—মুখকে অন্দর রাখকে পানকো মাফিক চিবোনেসে বহুত মজা আতা!" কিন্তু হুকুম সিং কোনো গোলমেলে ব্যাপারে যাবে না।

হরিময়বাবু বললেন, "এ-জানলে আমি কাপড়ের টুপি-খানা সঙ্গে আনতাম।"

পিকলু ভাবল, হরিময়বাবু টাক ঢাকবার জন্যে ব্যস্ত। কিন্তু হরিময়বাবু বললেন, "মোটেই না। টাক থাকলে লোকে খাতির করে। মুদির দোকানে ধার দেয়—ভাবে নিশ্চয় অনেক টাকা আছে।"

"তা হলে?" পিকলু জিজ্ঞেস করে।

আসলে, ভি-আই-পি ভি-আই-পি মনে হচ্ছে হরিময় বাবুর। "ভি-আই-পি বোঝো তো?"

"খুব বড় বড় লোক," পিকলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

হুকুম সিং যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে চাপা গলায় হরিময়বাবু বললেন, "দু'রকম লোকের সঙ্গে পুলিস থাকে। হয় চোর ডাকাত, না-হয় ভি-আই-পি!"

পিকলু এবার হুকুম সিংকে জিজ্ঞেস করল, "পণ্ডিতজী, কলকাতার সব চেনেন আপনি?"

ইম্পিরিয়াল গোঁফ নাড়িয়ে হুকুম সিং উত্তর দিল, "জরুর! কী চিনি না আমি! কলকাতার সব চোর-জোচ্চোর-পকেটমারকে আমি চিনি; তারাও আমায় চেনে।"

মস্ত বড় ভরসার কথা এটা হরিময়বাবুর পক্ষে। গত-কালই ওঁর মানিব্যাগ পকেটমার হয়েছে নেবুতলার মোড়ে। আঃ! হুকুম সিং সঙ্গে থাকলে কী মজাটাই হত—মানিব্যাগটা পকেটেই থাকত, মাঝখান থেকে পকেটমারও ধরা পড়ত।

হরিময়বাবুর পকেট মারার খবরে পিকলুর দুঃখ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু কে যেন ওকে কাতুকুতু দিয়ে হাসিয়ে দিল। পিকলু ভেবেছিল, হরিময়বাবু এই হাসি দেখে খুব দুঃখ পাবেন। কিন্তু তিনিও হাসতে লাগলেন। বললেন, "পকেটমারটার জন্যে আমার দুঃখও হয়। মানিব্যাগ গিয়েছে, কিন্তু মানি যায়নি। টাকাকড়ি আমি রাখি চমচম পত্রিকার একখানা পুরনো খামের মধ্যে। মানিব্যাগটা ফল্‌স্! বাসে-ট্রামে যাচ্ছি অথচ সঙ্গে মানিব্যাগ নেই, দেখলে লোকের কাছে প্রেসটিজ থাকে না। প্রেসটিজ বোঝো তো?" হরিময়বাবু কোশ্চেন করলেন।

"প্রেশার কুকার—খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায়," ঝটপট উত্তর দিল পিকলু, আর সেই শুনে হরিময়বাবু আবার ইন্দ্রলুপ্তে হাত দিলেন।

"মিঃ পিকলু, প্রেস্টিজ দু'প্রকারের। মেয়েদের যে প্রেস্টিজ তার নাম প্রেশারকুকার, আর ছেলেদের প্রেস্টিজের নাম ইজ্জত।"

পিকলু ও হরিময়বাবু দু'জন একসঙ্গে খুব হেসে নিল। আর হুকুম সিং ভাবল, নিশ্চয় কোনো সিরিয়াস গোলমাল হয়েছে, তাই ডি-সি সাহেবের বোম্বাই-নাতি কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে হাসছে।

একজন ঝাঁকামুটে ফুটপাথের এক কোণে পা-ছড়িয়ে আরাম করছিল। হুকুম সিং তাকে গিয়ে ক্যাঁক করে ধরল।

সে-বেচারা তো অবাক। নিজের খুশিমতো সে একটু ভেবেছে, দোষটা কী হল? হুকুম সিং ভারী গলায় তাকে যা বলল, তার অর্থ : 'রাস্তাটা হাঁটবার জায়গা, ঘুমোবার না। বেশী তর্ক করলেই থানা, সেখান থেকে আদালত এবং আদালত থেকে জেল।'

হরিময়বাবু চমকে উঠলেন। "কখনও খেয়াল হয়নি আমার। ফুটপাথ কেবল ফুটের জন্যে! শোবার পারমিশন থাকলে তো নাম হতো ফুট অ্যান্ড হেড পাথ!"

পিকলু জিজ্ঞেস করল, "কলকাতার সব কিছু চেনেন?"

হুকুম বললে, "জ-রু-র!" তারপর গড়গড় করে মুখস্থ বলতে লাগল : আলিপুর, আমহার্স্ট স্ট্রীট, বালিগঞ্জ, বেলিয়াঘাটা, বৌবাজার, বৌনিয়াপুকুর, ভবানীপুর, বিরজুতলা থেকে শুরু করে ট্যাংরা, টালিগঞ্জ, তিলজলা, উল্টোডাঙ্গা এবং [illegible] পর্যন্ত।

নামগুলো পিকলুর বেশ ভাল লাগছে। হুকুমচাচা [illegible] সত্যিই অনেক কিছু জানেন। এর মধ্যে কোথায় গেলে মজা বেশী হয়? পিকলু জানতে চাইছে হরিময়বাবুর কাছ থেকে।

আর-একখানা চিকলেট মুখে পুরে দিয়ে হরিময়বাবু পিকলুর কথায় আঁতকে উঠলেন। "ওসব জায়গায় তো কেউ ইচ্ছে করে যায় না! ধরে নিয়ে গেলে যায়। হুকুম সিং তো কলকাতার সাতচল্লিশটা থানা আর ফাঁড়ির নাম বলে গেল!"

হুকুম সিং একগাল হেসে বললে, "যে-থানায় ইচ্ছে [illegible]।" সর্বত্র চা-পানি পিলাবার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে হুকুম সিং।

কিন্তু হরিময়বাবু বেশ ঘাবড়ে গেলেন। পিকলুকে বললেন, "ওসব জায়গায় আমি কিছুতেই যাচ্ছি না। কে বেল দেবে?"

পিকলুও থানায় যাবার পক্ষপাতী নয়। কিন্তু এই বেলের কথায় একটু আগ্রহ হল ওর। ওখানে গেলে বোধ হয় শিবমন্দিরের মতো বেল পুজো দিতে হয়। "এমনি বেল না কদবেল?" জিজ্ঞেস করে পিকলু।

আরও নার্ভাস হয়ে পড়লেন হরিময়বাবু। "অর্ডিনারি বেল ফল না। স্পেশাল বেল!"

পিকলু বলল, "ও, বুঝেছি। বেল মানে ঘণ্টা! আমরা বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা সম্পর্কে পড়েছি : হু উইল বেল দ্য ক্যাট? বেড়াল কি থানায় গিয়েছিল?"

হরিময়বাবু বললেন, "আরও খারাপ কেস! একবার ঢুকলে বেরিয়ে আসা খুবই মুশকিল!"

পিকলু ভাবল, থানায় গেলে পুলিস খুব খাতির করে, ছাড়তে চায় না। যেমন বন্ধুরা বাড়িতে এলে বাবা বলেন, আরে বোসো, বোসো। এখন যাওয়া হবে না।

হরিময়বাবু শুনিয়ে দিলেন, "যতক্ষণ না কোনো লোক এসে বেল দিচ্ছে ততক্ষণ ছাড় নেই। অথচ আমার মুশকিল হল, যাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা, তাদের কারুর নিজস্ব বাটী নেই। থালা গেলাশ কিছুই চলবে না—স্রেফ বাটি চাই।"

"বাটির সঙ্গে বেলের কী সম্পর্ক?" পিকলু এবার একটু রেগে যায়। তার সন্দেহ হচ্ছে, হরিময়বাবু তাকে ছোট পেয়ে ঠকাচ্ছেন।

কিন্তু হরিময়বাবু বললেন, "বিশ্বাস করো, যাঁর নিজস্ব বাটী নেই, তিনি বেল দিতে পারেন না। বিষয়-সম্পত্তি-বাড়ি-ওয়ালা লোক ছাড়া কাউকে ওখানে বিশ্বাস করা হয় না! বেল মানে জামিন এবং সেই জামিন নিয়ে আসতে হয় আদালত থেকে।" থানায় বেড়াবার প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ এমনি-এমনি ঘুরে বেড়াবার পরে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পিকলু বলল, যা বোম্বাইতে নেই এমন কিছু একটা জিনিস সে এখানে দেখতে চায়।

হুকুম সিং এবং হরিময়বাবু দুজনেই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। যা কলকাতায় পাওয়া যায় না সেই সব দেখতেই তো ছেলেরা লুকিয়ে বম্বে পালায়। যা-কিছু বড়, ভাল এবং মিষ্টি তার নামই তো বোম্বাই—যেমন বোম্বাই আম, বোম্বাই চাদর, বোম্বাই-মিঠাই। কলকাতা-জাম কলকাতা-কাঁঠাল বলে তো কিছুই নেই।

হুকুম সিংয়ের মাথায় কিছু মতলব আসছে না—সে হরিময়বাবুর মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে।

হরিময়বাবু গভীরভাবে চিন্তা করছেন। কিন্তু যা-কিছু স্পেশাল সবই তো বোম্বাই। একখানা পাহাড় বা সমুদ্রও নেই কলকাতা শহরের। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যে হরিময়-বাবু চোখ বুজলেন। পিকলুর ভয় হল, এই ভিড়ের মধ্যে রাস্তায় হরিময়বাবু না গাড়ি চাপা পড়ে যান।

হরিময়বাবুর কিন্তু ওসব দুশ্চিন্তা নেই। বললেন, "কায়দাটা তোমার দাদুর কাছে শিখেছি। যখনই আইডিয়া শর্ট পড়ে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বুজে ব্রেনটাকে ডার্ক রুম করে নিই। তারপর ফটাফট মতলব ভেসে ওঠে।"

হরিময়বাবু হঠাৎ চোখ খুললেন, বললেন, "হয়েছে। তাই বলি, এত বড় কলকাতা শহর—বম্বেতে নেই এমন কোনো এস্পেশাল জিনিস না-থেকে যায়!"

হুকুম সিং বলল, "বাতাইয়ে—এখনই ছোটাসাবকে দেখায় দিচ্ছি।"

হরিময়বাবু সগর্বে ঘোষণা করলেন, "ট্রাম! বম্বেতে এ-জিনিস নেই।"

একটা চলন্ত ট্রামে হাত দেখিয়ে ওরা তিনজন উঠে পড়ল। উত্তেজনার মাথায় ওরা পিছনের গাড়িটাতে চড়েছে। পিকলুর খুব মজা লাগছে। কীরকম ঢক-ঢক করতে করতে গাড়িখানা একটু এগোচ্ছে, আবার থামছে।

ট্রামগাড়িতে হরিময়বাবু বেশী চড়েন না। ওঁর ধারণা, পকেটমারেরা ট্রামকেই একটু বেশী নেকনজরে দেখে। হরি-ময়বাবুর পছন্দ রিকশ।

এই পছন্দর কথা শুনে পিকলু হেসে ফেলল। হরিময়-বাবু বললেন, "হাসছ কি? বেস্ট গাড়ি হল এই রিকশ। তোমার দাদু পর্যন্ত একটা বইতে লিখেছেন—এমন দিন আসছে যখন পৃথিবীতে রিকশ ছাড়া আর কোনো গাড়িই থাকবে না।"

পাছে ট্রামের অন্য লোকরা শুনতে পায় বলে পিকলুর কানের খুব কাছে মুখ এনে হরিময়বাবু বললেন, "রিকশতে পেট্রোল লাগে না, ইলেকট্রিক লাগে না, গোরু লাগে না। রিকশ বিষাক্ত ধোঁয়া ছাড়ে না, মুখোমুখি কলিশনের ভয় নেই—বৃষ্টির জলে গাড়ি আটকায় না—ট্রাফিক জ্যাম পর্যন্ত রিকশকে জব্দ করতে পারে না।"

ট্রামে প্রচণ্ড ঠাসাঠাসি। অজস্র লোক উঠেছে। ভিড়ের চোটে দরজা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। কণ্ডাক্টরকে আসতে দেখে হরি-ময়বাবু টিকিট কাটবার জন্যে পকেটে হাত দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হুকুম সিংয়ের সঙ্গে কণ্ডাক্টরের দৃষ্টি বিনিময় হল। ইংগিতে হুকুম সিং প্রথমে পাঞ্জাবির বুকপকেটটা এবং পরে হরিময়বাবু ও পিকলুকে দেখিয়ে দিল। কণ্ডাক্টর এরপর কাছেই এল না।

হরিময়বাবু বললেন, "আঃ। এরপর থেকে সম্ভব হলে

রোজ আমি হুকুম সিংয়ের সঙ্গে বের হব। কোথাও ওদের টিকিট লাগে না।"

একজন গ্রাম্য বুড়ী লেডিজ সীটে বসে ছিলেন। এবার বোধহয় তিনি গাড়ি থেকে নামবেন। কিন্তু সীট ছেড়ে একটু ঠেলাঠেলি করে বুড়ী হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলেন এবং চিৎকার করতে লাগলেন। "ও দোকানী। দোকানী কোথায় গেল?"

কাতর আর্তনাদ শুনে অনেকে ব্যস্ত হয়ে উঠল। হরিময়-বাবু এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কোথাকার দোকানী খুঁজছেন? এখানে তো কোনো দোকানী নেই।"

সেই কথা শুনে বুড়ী তো হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। "ওমা। কী কথা বলে গো। দোকানী নাকি নেই। আমার সব্বোনাশ হল গো!"

পিকলু এবার বুড়ীকে সাহস দেবার জন্যে বলল, "কী হয়েছে আপনার? ভয় কী?"

পিকলুর হাত ধরে বুড়ী বলল, "এই নোকটা কী বলে! এত বড় দোকানে নাকি দোকানী নেই গো।"

পিকলু এবার গলা বাড়িয়ে কণ্ডাক্টরকে ডাকল। ভিড় ঠেলে খাকি ইউনিফর্ম পরা কনডাক্টর এসে বুড়ীকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

বুড়ী যেন হাতে চাঁদ পেল। "ও দোকানী, তুমি ঝাঁপ ফেলে দিয়েছ কেন? আমি যে বেরুবার দরজা খুঁজে পাচ্ছি না। আবার ওই নোকটা বলে যে দোকানী নেই!"

ভিড়ের মধ্যে দরজা খুঁজে না-পেয়েই যে গাঁয়ের বুড়ী নার্ভাস হয়ে পড়েছে তা বোঝা গেল। গাড়ির মধ্যে অনেকেই হেসে ফেলল। কে যেন বলে উঠল, "দোকানী নয়—কনডাক্টর।"

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বুড়ী ফোঁস করে উঠল। "আ মলো যা। অ্যাদ্দিন কালিঘাটে আসছি, আমাকে দোকানী শেখাচ্ছে!"

ট্রামযাত্রাটা বেশ রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে পিকলুর। দেড় হাজার লোক যেন একসঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে—কিন্তু সে একলা লড়ে যাচ্ছে।

বুড়ীর ভয়ে ভিড়ের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে হরিময়বাবু অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছিলেন। এবার তিনি কায়দা করে পিকলুর কাছে চলে এলেন। বললেন, "বম্বেতে নেই, কলকাতায় আছে—এমন আর-একটা আইটেম মনে পড়েছে। কালীঘাট—মা কালীর মন্দির। কালীঘাট থেকেই তো কলকাতা।"

কালীঘাটে নামবার আগেই আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল। কনডাক্টর কয়েকবার টিকিট চাইতেই কদমছাঁট ও মর্কটমার্কা একটা লোক চোঙাটে প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করল। পকেট থেকে পয়সা বার করবার কোনো ইচ্ছেই যেন ছিল না লোকটার।

মানিব্যাগটার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন হরিময়বাবু। ওঁর চোখ দুটো চমচমের মতো হয়ে উঠল। তারপর বললেন, "ইউরেকা।"

"হুকুম সিং হুঁশিয়ার!" এই বলে হরিময়বাবু মুহূর্তের মধ্যে মানিব্যাগ ও লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হৈ-হৈ কাণ্ড। লোকটার শার্টের কলার ধরে হুকুম সিং হিড়হিড় করে ট্রামের বাইরে নিয়ে এল। পাবলিক বাধা দিল না। কলকাতায় সাদা পোশাকের পুলিসের মার্কামারা চেহারা—সবাই হুকুম সিংকে চিনে ফেলেছে।

"আমার মানিব্যাগ—লস্ট আটলাণ্টা, লস্ট আটলাণ্টা," হরিময়বাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন।

মানিব্যাগখানা লোকটার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হরি-

হরিবাবু বললেন, "এই তো আমার ব্যাগ। বোতাম-দেওয়া পকেটে মায়ের জবাফুল রয়েছে—দেখুন। দেখি-দেখি"—একটা পর্দে থেকে চমচম কাগজের ভিজিটিং কার্ডও বেরিয়ে এল।

লোকটা বিপদ বুঝে বলল, "বিশ্বাস করুন সায়েব, ব্যাগে কিছুই ছিল না। সবশুদ্ধ সাতাশি নয়া পয়সা পেয়েছিলাম।"

কালীঘাটের কালী দেখা মাথায় উঠল। বামাল চোর নিয়ে হুকুম সিং এখন থানায় যেতে চায়।

পিকলু অবাক। কী করে হরিময়বাবু নিজের হারানিধি ব্যাগ চিনতে পারলেন?

সগর্বে হরিময়বাবু নিবেদন করলেন: "খুব সহজে। আমার ব্যাগ যে চমচমের জন্যে স্পেশালি তৈরি। এই দেখো—ব্যাগের দুধারে বড় বড় করে লেখা রয়েছে চমচম! এই ব্যাগ যখন স্পেশালি করেছিলাম তখন উদ্দেশ্য ছিল প্রচারের। দিনের মধ্যে কতবার কত জায়গায় মানিব্যাগ বার করে লেন-দেন হচ্ছে। পরের মানিব্যাগের দিকে সবারই নজর থাকে। সুতরাং চমচম নামটা দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়বে।"

চোরকে ছেড়ে দেবার জন্যে হরিময়বাবু হুকুম সিংকে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। মনে-মনে হিসেব করে হরিময়বাবু বললেন, "সাতাশি পয়সার জন্যে জেলে যাওয়া পোষায় না।"

লোকটাও বেশ চালাক। সুযোগ বুঝে হরিময়বাবুকে সে বলল, "আমাকে হাজতে দিলে, ওই ব্যাগ ফেরত পেতে ছমাস লেগে যাবে হুজুর। কোর্ট-কাছারিতে যাবে ওই ব্যাগ।"

এবার বহুকষ্টে হুকুম সিংয়ের হাত থেকে লোকটাকে ছাড়ানো হল। উত্তেজনায় হরিময়বাবুর টাকে ঘাম জমে গিয়েছে। বললেন, "পকেটমার ধরতে যা কষ্ট হয়েছিল, তার থেকে ছাড়াতে বেশী মেহনত হল।"

কালীঘাট দেখে পিকলুর মন ভরল না। সে কলকাতার আরও অনেক কিছু দেখতে চায়।

খোকাবাবুকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করল হুকুম সিং। কিন্তু খোকাবাবুর ইচ্ছে আজ সমস্ত দিন সে হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়াবে।

কিন্তু হরিময়বাবু ও হুকুম সিং দুজনেই ঘনঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন।

হুকুম সিংয়ের বোধহয় আপিসে ডিউটি আছে। সায়েবের নাতিকে দেখবার জন্যে সে একবার ঝট করে চলে এসেছিল।

একটা দোকানে গিয়ে সে আপিসে ফোন করে দিল। তেমন হলে সে আজ ছুটি নেবে—আপিসেই যাবে না।

একখানা মিনিবাস প্রায় পিকলুর নাকের ডগা স্পর্শ করে চলে গেল। তার গায়ে লেখা: বিবাদী বাগ—টালিগঞ্জ। পিকলু যা দেখবে তার সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলবে। হুকুম সিংকে সে জিজ্ঞেস করে বসল, "বিবাদী বাগ কেন নাম?"

পাজি চোর ডাকাত ধরতে হুকুম সিংয়ের জুড়ি নেই। কিন্তু সাধারণজ্ঞানের কোশ্চেন করলেই সে বেশ মুশকিলে পড়ে যায়। মাথা চুলকে সে বলল, "কোর্টে দো কিসিমের আদমি যায়—এক পার্টির নাম বাদী, যে মামলা করে; অন্য পার্টির নাম বিবাদী। সুতরাং বিবাদী বাগ তার থেকেই হয়েছে।"

হরিময়বাবু একটা টেলিফোন করতে যাবেন ভাবছিলেন। হুকুম সিং সঙ্গে থাকলে টেলিফোনের মালিক ন্যায্যদামের বেশী নেবে না। হুকুম সিংয়ের ব্যাখ্যা শুনে তিনি বললেন, "হলেও হতে পারে। রহস্যময় কোনো শব্দ পেলেই আমি তার মূলে চলে যাই। বিবাদীর মধ্যে বিবাদ শব্দ রয়েছে—তার অর্থ ঝগড়া। মামলাও এক ধরনের ঝগড়া। সুতরাং যে বিবাদ করে সেই বিবাদী। আর বাগ মানে কথা—অর্থাৎ কিনা যেখানে কথা-কাটাকাটি হয়।"

স্ট্যাণ্ডের কাছে বাস ধরবার জন্যে কোটপ্যাণ্ট পরে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বললেন, "ছোট ছেলেকে কী সব বুঝোচ্ছেন? বিবাদী মানে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ। মস্ত তিন বিপ্লবী ছিলেন—ইংরেজ আমলে রাইটার্স বিলডিংস আক্রমণ করেছিলেন। বাগ মানে বাগান।"

একগাল হেসে ফেলল হুকুম সিং। "হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে বটে। বিবাদী মানে ডালহৌসি স্কোয়ার।"

ব্যাপারটা নোটবইতে টুকে নিল পিকলু। পকেটে সে ছোট্ট একটা নোটবই রাখে—কখন কী লেখবার দরকার হয় ঠিক নেই।

এবার টালিগঞ্জের মানে জিগ্যেস করে বসল পিকলু। ওকে অন্যমনস্ক করে দেবার জন্যে হরিময়বাবু বললেন, "মানে জেনে কী হবে? তার থেকে চীনেবাদাম খাও।" পিকলু চীনেবাদামও নিল এবং সেইসঙ্গে মানেও জিগ্যেস করল।

হরিময়বাবু বললেন, "এসব কোশ্চেন আগাম জানলে আমরা দুজনে পড়াশোনা করে বেরোতাম। টকাটক সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতাম—লালদিঘি কেন লাল নয়, গোলদিঘি কেন চৌকো, বউবাজারে কেন বউ পাওয়া যায় না। তবে টালিগঞ্জের কোশ্চেনটা খুউব সোজা। কমনসেন্স থেকেই উত্তর দেওয়া যায়।"

সাহস পেয়ে হুকুম সিং বলে ফেলল, "এটা হামিও জানি। ওখানে অনেক টালি তৈরি হতো।"

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন হরিময়বাবু। "মোটেই নয়। মাটি পোড়ানো টালির সঙ্গে টালিগঞ্জের কোনো সম্পর্ক নেই। ওখানে কর্নেল টলি নামে এক দুর্দান্ত সায়েব ছিলেন। তোমার দাদুর গতবছরের আগের বছরে লেখা উপন্যাসে এঁর কথা লেখা আছে।"

হুকুম সিং ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। খোকাবাবুর সঙ্গে সে একলা ঘুরতে খুব উৎসাহী নয়। তার ইচ্ছে হরিময়বাবুও সঙ্গে থেকে যান।

হরিময়বাবু বললেন, "ঝটপট তাহলে একবার চমচম অফিসটা ঘুরে আসা যাক। আমাকে এতক্ষণ না-দেখে সহ-সম্পাদক বিজয় নিশ্চয় চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া আর্জেন্ট কোনো খবরাখবর থাকলেও জানা যাবে। তোমরাও ততক্ষণ বাড়ি ফিরে হোল-ডে প্রোগ্রামের জন্যে রেডি হয়ে নাও।"

কথা হল, বাড়িতে খবর দিয়েই পিকলু ও হুকুম সিং সোজা চমচম অফিসে চলে আসবে।

পিকলুর দাদু অনেকক্ষণ ধরে ইজিচেয়ারে পাথরের মতো বসে আছেন। এই চেয়ারটা মন্ত্রঃপূত সিংহাসনের মতো। এখানে না-বসলে তাঁর মাথায় গল্পের প্লট আসে না। গত কুড়ি বছরে তিনি যত নামকরা গপ্পো-উপন্যাস লিখেছেন তার শুরু এবং শেষ এই ইজিচেয়ারেই।

গত সাতদিন ধরে এই চেয়ারে বসে তিনি একটা উপন্যাসের প্লট বুনবার চেষ্টা করছেন। কত বিচিত্র রঙীন চরিত্র পরীর মতো পাখা মেলে তাঁর মানসলোকে নেমে আসছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুতেই সুবিধে করতে পারছেন না তিনি। শুধু তো নানা রঙের মানুষ হলেই হল না—একটা

গল্পের দানা বেঁধে ওঠা প্রয়োজন। গল্পের একটা মনের মতো পরিণতি চাই।

গত কয়েক বছর ধরে ভবনাথ সেন যা লিখেছেন তার শেষে একটু দুঃখের ইঙ্গিত আছে। এবারেও একটা দুঃখের গপ্পো ভাবছিলেন তিনি। সেই সময় পিকলু চলে এল কলকাতায়। নাতনী শতরূপার শক্ত অসুখ। তাকে নিয়ে ওর বাবা-মা ভেলোর চলে গিয়েছে। আর পিকলুকে এক বন্ধুর সঙ্গে বম্বে থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে ভবনাথের কাছে। ভবনাথ নিজের ছেলেকে সেইভাবেই লিখে দিয়েছিলেন: "আমরা যখন রয়েইছি তখন পিকলু যতদিন খুশি আমাদের কাছে থাক। তাছাড়া এখন যখন ইস্কুলের ছুটি রয়েছে ওর পড়াশোনার কোনো চিন্তা নেই।"

পিকলু এসেই দাদুর সঙ্গে অনেক গপ্পো করেছে। হাজার হাজার লোক যে দাদুর গপ্পো পড়বার জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকে, তা পিকলু কিছুটা শুনেছে। কিন্তু পিকলু তার ঠাকুমাকে বলেই দিয়েছে, "দাদুর গপ্পো তার ভাল লাগে না। দাদুর থেকে অনেক ভাল গল্প জানে অধরদা। অধরদা ওদের বাড়ির চাকর।

নাতির মন্তব্য শুনে সেদিন বাড়িতে বেশ চাঞ্চল্য। লেখকের নাতি বলে দিয়েছে—পদ্মশ্রী ভবনাথ সেনের থেকে চাকর অধরের গপ্পো ভাল। সবাই মিটি-মিটি হেসেছে।

একসময় ঠাকুমা জিজ্ঞেস করেছেন, "হ্যাঁরে, তুই এমন কথা বললি কেন?"

পিকলুর উত্তর খুব সোজা। দাদুর গপ্পে বড় দুঃখু থাকে। প্রথমে বেশ ঝলমলে লোকজন থাকে, বেশ আনন্দ হয়—তারপর কয়েকপাতা এগোলেই কী যে হয়, সবাই গম্ভীর হয়ে পড়ে। তারপর শেষের দিকে কী কষ্ট, কী কষ্ট! চোখে জল এসে যায়। অথচ পিকলুর একদম কাঁদতে ইচ্ছে করে না। ভীষণ কষ্ট হয়। অধরদা যখন গপ্পো বলেন, তখন ঠিক উল্টো। প্রথমে একটু-একটু দুঃখু থাকে। কিন্তু পিকলু সেজন্যে চিন্তা করে না—সে জানে অধরদা যখন আছেন তখন একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই তাই হয়। শেষ পর্যন্ত কী হাসাহাসি, কী মজা। বন্দিনী রাজকন্যার সঙ্গে অচিন দেশের রাজপুত্রর বিয়ে হয়ে যায়, হিংসুটে রানীর দুষ্টুমি ধরা পরে, দুয়োরানীর দুঃখ শেষ হয়, লোভী রাক্ষসের শাস্তি হয়, গুপ্ত-ধনের সন্ধানে বেরিয়ে ছেলেরা নিরাশ হয়ে ফিরে আসে না, মুঠো-মুঠো মারবেল-সাইজের হীরা হাফ্-প্যান্টের পকেটে পুরে নেয়।

পিকলুর কথাবার্তা ভবনাথকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। মনে মনে ভেবে দেখলেন, নিজের অজান্তেই তিনি পরের পর দুঃখের গপ্পো লিখে গিয়েছেন। কিছু লোকও আছে যারা নিমপাতা এবং উচ্ছে খেতে এবং দুঃখের গপ্পো পড়তে ভালবাসে। তারাই মোহিত হয়ে ভবনাথকে লম্বা-লম্বা চিঠি লেখেন। লিখেছেন এবং ভবনাথকে বিপথে চালিত করেছেন। কিন্তু এবারে ভবনাথ ভাবছেন, পিকলুর মুখে যে করেই হোক হাসি ফোটাবেন তিনি।

কিন্তু ওই পর্যন্ত এসেই তিনি আটকে গিয়েছেন। গত এক সপ্তাহ ধরে কল্পনার সরস্বতীকে তিনি কতভাবে আহ্বান করলেন—কিন্তু নির্মল আনন্দের গল্প কলমে ধরা দিয়েও ধরা দিচ্ছে না। গোড়ার দিকে চরিত্রগুলো তাঁর কল্পলোকে বেশ হাসিখুশী থাকে—কিন্তু তারপর হঠাৎ কী যে হয়, দুঃখের ঘন কাল মেঘে তাঁর মনের আকাশ ছেয়ে যায়। ভবনাথ এখন বুঝতে পারেন, দুঃখের কথা লেখা সবচেয়ে সহজ। কিন্তু এবার তিনি আনন্দ ছাড়া আর কিছুই লিখবেন না।—ভোরের আলোর মতো প্রসন্ন ঝলমলে আনন্দ চাই তাঁর।

তার ফলে এক সপ্তাহ নিষ্ফলা কেটে গেল। ভবনাথ কিছুই করতে পারছেন না। চমচম পত্রিকার সম্পাদক হরিময়বাবু সেবার এসে জোর করে আগামী উপন্যাসের বিষয়টা জানতে চাইলেন। ভবনাথ সেনের মতো লেখকের মাথায় যে গল্প শুকিয়ে গিয়েছে, এ-কথা হরিময়বাবু বিশ্বাসই করেন না। হরিময়বাবুর ধারণা, ভবনাথ একটা আপেলগাছের মতো—ডালে-ডালে অসংখ্য গল্পের রঙিন আপেল ঝুলে রয়েছে, একটা ছিঁড়ে সম্পাদককে দিয়ে দিলেই হল।

বাধ্য হয়ে হরিময়ের হাতে এক টুকরো কাগজে ভবনাথ একটা নাম লিখে দিয়েছেন। হরিময়বাবু বোধ হয় উপন্যাসের নামটা আগাম প্রচার করতে চান। কাগজের টুকরোর দিকে তাকিয়ে হরিময়বাবু তো আনন্দে ও বিস্ময়ে হতবাক। বললেন, "দুর্দান্ত! ভাবা যায় না! বুঝতে পারছি কেলেং-কেরিয়াস কিছু ঘটবে।"

"কী ঘটবে আমি নিজেই কিন্তু জানি না, হরিময়।" ভবনাথ সেন করুণভাবে বলেছিলেন।

কিন্তু চমচম-সম্পাদক তা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, "'খারাপ লোকের খপ্পরে' নামেতেই ছেলে এবং বুড়ো সবাইকে বেঁধে ফেলেছেন। প্রকাশের পূর্বেই চমচম নিঃশেষিত হবে বুঝতে পারছি।"

এসব কথা শুনতে কোন্ লেখকের না ভাল লাগে? কিন্তু ভবনাথ সেন মোটেই শান্তি পাচ্ছেন না—গল্পটা আবছাভাবেও মনের মধ্যে ফুটে উঠছে না।

সাধারণত গল্পগুলো অদ্ভুতভাবে ভবনাথের মাথায় এসে যায়। এই চেয়ারে বসে ভবনাথ মিনিট কয়েক একমনে গড়-গড়ায় টান দিয়ে যান। আশে-পাশে একটা পাতলা ধোঁয়ার পর্দা নেমে আসে। সবকিছু একটু অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় ভবনাথ চোখ বন্ধ করেন—চোখবন্ধ অবস্থায় আরও কয়েকবার গড়গড়ায় টান দেন। ঠিক সেই সময় চোখের সামনে ভবনাথ বিরাট একটা রুপালী পর্দা দেখতে পান। ঠিক যেন সিনেমা হলে বসে আছেন ভবনাথ। তিনি ছাড়া হলে কিন্তু একজনও দর্শক নেই। যেন ওঁর জন্যেই কেউ স্পেশাল শোয়ের ব্যবস্থা করেছে। এই অবস্থায় আস্তে আস্তে পর্দার ওপর কয়েকটা মুখ ফুটে ওঠে। অস্পষ্ট অন্ধকারে ছবি শুরু হয়ে যায়। চরিত্রগুলো আপনা-আপনিই কাজকর্ম শুরু করে, ভবনাথকে কিছুই করতে হয় না। তিনি হাত-পা গুটিয়ে স্রেফ দর্শকের আসনে বসে আছেন। অবশেষে শেষটাও দেখতে পান ভবনাথ। গপ্পোটা পুরো জানা হয়ে যায় ভবনাথের। তখন তিনি আবার গোড়া থেকে ছবিটা দেখতে শুরু করেন—গল্পের যা-কিছু দোষ থাকে এবার তিনি সংশোধন করে নেন।

এরপর কোনো অসুবিধা হয় না ভবনাথের। গড়গড়ার নল সরিয়ে রেখে কলম খুলে কাগজের ওপর তিনি যখন প্রথম লাইনটা লেখেন, তখন গল্পের শেষ লাইনটাও তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এবার তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। কল্পনার ছোট্ট টুনটুনি পাখিটা তাঁর কাছে কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। মনের এই অবস্থায় ভবনাথের অন্য কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হয় না। কাজ তো দূরের কথা, খাবারেও রুচি থাকে না ভবনাথের। শুধু ওই গড়গড়াটুকু ছাড়া। তাও যেন আজ সকাল থেকে বিস্বাদ লাগছে।

পিকলুর কথাটা গিন্নী অমনভাবে শুনিয়ে গেলেন, যেন বাড়িতে নাতির উপস্থিতি সম্বন্ধে ভবনাথের হুঁশ নেই। কথাটা মোটেই সত্যি নয়। পিকলুর জন্যে ভবনাথ মনে-মনে

অনেক পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন—কোথায় কোথায় ওকে নিয়ে যাবেন, চিড়িয়াখানার কোন্ কোন্ পশুর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেবেন। বোটানিক্যাল গার্ডেন, মিউজিয়ম, প্ল্যানেটোরিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ন্যাশনাল লাইব্রেরি ইত্যাদির লিস্টিও তৈরি করেছিলেন। ভবনাথ ভেবেছিলেন এবার তাঁর নাতির সঙ্গে বাঘা-বাঘা লেখকদের আলাপ করিয়ে দেবেন। দিনকয়েক নাতির সঙ্গে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো কাজই রাখবেন না। দরকার হলে সবাই মিলে লাক্সারি বাসে দিঘাও ঘুরে আসবেন।

কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। গল্পের সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে উঠছে। মেজাজটা যেরকম তিক্ত হয়ে আছে তাতে মাথা দিয়ে কীভাবে মজার গপ্পো বেরুবে তা ভবনাথ বুঝতে পারছেন না। কিন্তু ভবনাথের পণ, এবার কিছুতেই দুঃখের গপ্পো নয়।

আজ সকালে পিকলুর ঠাকুমার সঙ্গে কিছুটা রাগারাগি হল। রাগটা আরও কোথায় গড়াত ঠিক নেই। পিকলুর ঠাকুমা সত্যিসত্যিই হয়তো বউমার বাবা অর্থাৎ রঞ্জন সেনকে খবর দিতেন। পুলিসের হাই-অফিসারের সামনে তিনি স্বামীর সমালোচনা করতেন। শহরের চোর, জোচ্চোর, গুণ্ডা, জালিয়াত ঠগ ইত্যাদি ধরবার কাজে পিকলুর পুলিশ-দাদু সারাক্ষণ ব্যস্ত। রাত্রে শোবার সময়েও ওঁকে বিছানার পাশে টেলিফোন রাখতে হয়। রাস্তায় যখন বেরোন তখনও গাড়িতে একটা বেতার টেলিফোন থাকে। সেবার এখানে রঞ্জনবাবু খেতে এলেন। দশ মিনিট কথাবার্তার পরে সবে রাতের খাবারে হাত দিয়েছেন ভদ্রলোক, অমনি হুকুম সিং এসে খবর দিল পিটার চার্লি ওয়ারলেসে ডাকছে। পিটার চার্লি নিশ্চয় কলকাতা পুলিশের কোনো কোড-ওয়ার্ড। ওয়ারলেসে নিশ্চয় খুবই জরুরী কোনো খবর এল—কারণ খাওয়া শেষ না-করেই রঞ্জন সেন অফিসে ফিরে গেলেন।

পিকলুর ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, "রাত আটটা বেজে গিয়েছে—এখন আবার আপিস কী?"

রঞ্জন সেন দুঃখ করে বললেন, "আমরা হলাম চব্বিশ ঘণ্টার চাকর। আমাদের দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, দুপুর নেই। দুষ্টু লোকরা তো অফিসের ঘড়ি ধরে দুষ্টুমি করে না!"

তবু রঞ্জন সেন আর একদিন পিকলুকে দেখতে এসেছিলেন। এবং বলেছিলেন, তেমন হলে পিকলুর জন্যে তিনি দু একদিন ছুটি নেবেন।

"আপনি কেন শুধু-শুধু ছুটি নেবেন? চিরছুটির লোক তো আপনার সামনেই বসে রয়েছেন। উনি আপিস যান না, রেডিও টেলিফোনে কথা বলেন না। অথচ বড় বড় বিমান-বম্বেটেদের কলমের এক খোঁচায় উনি পাকড়াও করেন, কেউ ওঁর হুকুমে রাজা হয়, কেউ ফকির।" একটু রেগেই কথাগুলো বলেছিলেন পিকলুর ঠাকুমা।

রঞ্জন সেন হেসে ফেলেছিলেন এবং আচমকা বিদায় নেবার আগে বলেছিলেন, "সাহিত্যিকের সঙ্গে কলকাতা ঘুরে বেড়ানো আর পুলিসের সঙ্গে কলকাতা দেখা তো এক জিনিস নয়। আমরা মানুষের খারাপ দিকটাই জানি—কোথায় খুন হয়, কোথায় ছিনতাই হয়, কোন জায়গাটা কোন সময় বিপজ্জনক বলতে পারি। কিন্তু ভবনাথবাবুর চোখে এ-সব জায়গাই অন্যরকম হয়ে উঠবে।"

এরপরেই পিকলুর ছোট দাদু হুড়মুড় করে বিদায় নিয়েছিলেন। ভবনাথের লেখার মস্ত ভক্ত তিনি। আজকাল তিনি ভুলেও বড়দের বই পড়েন না। সময় পেলেই ছেলেদের গপ্পোর বই খুলে বসেন।

ভবনাথ ভেবেছিলেন, দু একদিনের মধ্যেই চমচমের উপন্যাসটার একটা ছক মনে এসে যাবে এবং তখন তিনি পিকলুর ঠাকুমাকে দেখিয়ে দেবেন, কত হৈচৈ তিনি নাতির সঙ্গে করতে পারেন।

কিন্তু আজও ভবনাথের মনের মধ্যে রোদ উঠল না। পিকলুর ঠাকুমা হয়তো আজ আরও রেগে যেতেন, হয়তো তিনি রঞ্জনবাবুকেই ছুটি নেবার জন্যে খবর পাঠাতেন। ভাগ্যে হুকুম সিং এবং চমচম-সম্পাদক হরিময়বাবু প্রায় একই সঙ্গে বাড়িতে হাজির।

হরিময় লোকটি বেশ—ছেলেদের সত্যিই ভালবাসেন। তাঁর সঙ্গে গ্রাম-সম্পর্কে একটা আত্মীয়তাও আছে। যেটা ভবনাথের খুব ভাল লাগে, ছোটখাট সব ব্যাপারেই হরিময়ের উৎসাহ আছে। কোন্ জনপ্রিয় কাগজের সম্পাদক এইভাবে স্রেফ মজার সন্ধানে একটা এগারো বছরের ছেলের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন?

হরিময়বাবু এক কাজে বেরিয়ে একেবারে অন্য কাজে জড়িয়ে পড়তে আপত্তি করেন না। ওই তো উনি এসেছিলেন—ভবনাথের আগামী উপন্যাসের কিছুটা অংশ নেবার জন্যে, কিন্তু ও সম্বন্ধে কোনো কথা না-তুলেই চলে গেলেন পিকলুর সঙ্গে। সেবার আদালতে সাক্ষী দেবার জন্যে বেরিয়ে হরিময়বাবু ভুলে মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সাড়ে-চার ঘণ্টা লাইন দেবার পরে মাঠের মধ্যে ঢুকে ওঁর খেয়াল হল, পকেটে সাক্ষীর সমন রয়েছে। ইতিমধ্যে জজ রেগে গিয়ে ওঁকে ধরে আনবার জন্যে ওয়ারেণ্ট বার করে দিয়েছেন। ভবনাথবাবু ছাড়া কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে, উনি স্রেফ ভুল করে খেলার মাঠে লাইন দিয়ে বসেছিলেন।

আজকে পিকলুর সঙ্গে বেরিয়ে হরিময়বাবু ভুলোমনে কিছু করতে পারবেন না—কারণ সঙ্গে হুকুম সিং আছে। পুলিসের লোকরা ঠিক হরিময়বাবুর উল্টো। কোথায় যেতে হবে, কতক্ষণ থাকতে হবে, কী করতে হবে, সব ওদের নোট-বুকে টপাটপ লিখে নেয়—ভুল হবার কোনো সুযোগই থাকে না। হরিময়বাবু ও হুকুম সিং, এদের দুজনকে নিয়ে এবারের গপ্পোটা লিখতে পারলে কী হয়? ভবনাথ হঠাৎ ভাবলেন।

পিকলুকে নিয়ে হুকুম সিং ও হরিময়বাবু বেরিয়ে যাবার পরেও ভবনাথ সেন নিজের চেয়ারে অনেকক্ষণ হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তারপর ভাবলেন, কিছুক্ষণের জন্যে বাইরের হাওয়া গায়ে লাগানো যাক। মনটা নতুন সৃষ্টির জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পিকলুর ঠাকুমা দূর থেকে ব্যাপারটা দেখলেন। তিনি যে কী ভাবলেন, তা ভবনাথ আন্দাজ করতে পারছেন। ওঁর বক্তব্য, "যদি বেরোবেই, তাহলে নাতিকে সঙ্গে নিয়েই বেরুলে না কেন?"

কিন্তু ভবনাথের এই বেরুনোটা বেরুনো নয়—স্রেফ অশান্ত মনকে একটু শান্ত করবার চেষ্টা। দু'পা গিয়েই হয়তো তিনি ফিরে আসবেন।

হলও তাই। রাস্তায় জনস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েও শান্তি পেলেন না ভবনাথ। মাথায় গল্পটা এখনও পেকে উঠছে না। ঠিক সেই সময় ভবনাথ দেখলেন, একটা লোক মই এবং বালতি হাতে উঁচু জায়গায় পোস্টার লাগাচ্ছে। চমচম পত্রিকার পোস্টার না? হ্যাঁ, তাঁর দেওয়া নামটাই তো বড়-বড় করে ঘোষণা করা হয়েছে। যে উপন্যাসের একটা লাইনও তিনি এখনও লেখেননি। ভবনাথ সেনের মাথাটা বেশ ভারী হয়ে

উঠেছে। কাছাকাছি যে বিরাট গর্ত ছিল ভবনাথ লক্ষ্য করেননি। পা-টা আচমকা সেখানেই পড়ল। আর একটু হলেই ভবনাথ সেন দড়াম করে পড়তেন। বড় রকমের বিপদ হয়নি, কিন্তু পা'টা মনে হচ্ছে মুচকেছে। ভবনাথ যন্ত্রণা সহ্য করে কোনোরকমে বাড়ির দিকে এগোলেন।

ঠিক সেই সময় একজন লোক একগাল হেসে ভবনাথকে বলল, "চমচমের বিজ্ঞাপন দেখলুম। এবারে খু-উ-ব হাসির গপ্পো হবে মনে হচ্ছে!"

হাসতে পারলেন না ভবনাথ—মন এবং পা একই সঙ্গে দপ দপ করছে!

বাড়ি ফিরেই পিকলু ও হুকুম সিংকে ভবনাথ দেখতে পেলেন। ওরা দুজনেই দ্রুতবেগে দুপুরের খাওয়া সেরে নিচ্ছে। ইম্পিরিয়াল গোঁফখানা বাঁচিয়ে খেতে হচ্ছে হুকুম সিংকে—ফলে সে পিকলুর সঙ্গে তাল রাখতে পাচ্ছে না। অন্যদিনে পিকলুর খেতে অনেক সময় লাগে। ওর একটা বদ-অভ্যাস আছে—মাকে এই বয়সেও খাইয়ে দিতে হয়। এখানেও ঠাকুমা প্রতিদিন কাজটা করছিলেন। কিন্তু আজ পিকলু ও হুকুম সিং দুজনেই বোম্বাই মেলের স্পিডে খাচ্ছে। দু'জনের মধ্যে বেশ কমপিটিশন লেগে গিয়েছে। ডালের বাটিতে চুমুক দিতে গিয়ে হুকুম সিংয়ের ইমপিরিয়াল গোঁফের দশ পার্সেণ্ট হলদে হয়ে গেল।

ঠাকুমা বললেন, "ওদের একটুও সময় নেই। এখনই বেরুবে।"

হরিময়বাবুর খোঁজ করলেন ভবনাথ। পিকলু বললে, খাওয়া শেষ করেই রিকশ নিয়ে ওরা হরিময়বাবুর বাড়ি চলে যাবে। ঠাকুমা বললেন, "ওঁকেও নিয়ে এলে পারতিস, যা হয় দুমুঠো খেয়ে নিতেন।" হুকুম সিং বলল, "বুড়া সায়েবের সময় নেই। সাহা সম্পাদকের সঙ্গে জরুরী মুলাকাত করবেন এবং পিকলুবাবুর জন্যে বসে থাকবেন।"

পিকলু হেসে বলল, "সাহা সম্পাদক নয়। যিনি সম্পাদককে কাগজ বার করতে সাহায্য করেন, তাঁর নাম সহ সম্পাদক।"

দাদুকে পিকলু বলল, "দাদু, রাস্তায় আজ অনেক মজা হয়েছে। পকেটমার পর্যন্ত। এর আগে আমি কখনই জ্যান্ত পকেটমার দেখিনি।"

"অ্যা! বেচারা হরিময়বাবুর পকেট নিশ্চয়।" বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন ভবনাথ।

পিকলু হেসে আশ্বাস দিল, "কিছু ভেবো না দাদু। পকেটমারের প্রত্যাবর্তন, ভীষণ মজার ব্যাপার।"

পিকলু এখন বেশ খুশী মেজাজে রয়েছে। হুকুমচাচাকে সে জিজ্ঞেস করল, "এখন কী খাওয়া হলো?" একগাল হেসে হুকুম উত্তর দিল, "খানা! তবে সায়েব বোলেন লাঞ্চ।"

পিকলু বলল, "এর নাম ব্রাঞ্চ—সকালের ব্রেকফাস্ট এবং দুপুরের লাঞ্চের মধ্যে বলে বম্বেতে নাম দিয়েছে, ব্রাঞ্চ!"

পিকলু দ্রুত বেরিয়ে যেতে-যেতে বলল, "আমরা কোথায় যাব, কী করব এসব কিছুই ঠিক নেই। আমরা চলি—হরিময়দাদু নিশ্চয় এতক্ষণ ছটফট করছেন।"

"তোমরা আমাদের জন্যে ভেবো না।" বক্স ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে পিকলু হৈ-হৈ করে উঠল। ওর আনন্দ দেখে ঠাকুমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পিকলুর সঙ্গে হরিময়বাবু ও হুকুম সিং রয়েছে, ভবনাথবাবুর কোনো ভাবনা হচ্ছে না।

ঠাকুমা শুধু বললেন, "তুমি একটা রেনকোট নাও। ঘনঘন তোমার সর্দি হয়। বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা লাগলেই মুস্কিল।"

পিকলু ওসব শুনল না। ক্যামেরা কাঁধে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল।

তাঁর নাতিটিও বেশ ব্রাইট, ভবনাথ মনে-মনে ভাবলেন। রেনকোট না-নিয়ে ঠাকুমাকে কেমন বলে গেল, "সর্দির সঙ্গে ঠাণ্ডার, বৃষ্টিতে ভেজার কোনো সম্পর্ক নেই।"

ঠাকুমা অবাক হয়ে বললেন, "এক রত্তি ছেলে, বলে কী!" জলে ভিজলে নাকি সর্দি হয় না।"

পিকলু বলল, "সর্দি হয় ভাইরাস থেকে।"

ভবনাথ আবার নিজের ভাবনার মধ্যে ডুব দিলেন। হুকুম সিং ও হরিময়বাবু,ক্যারাকটার দুটো বেশ। গপ্পোটা যদি মাথায় এসে যায় তাহলে হরিময়বাবুর নাম পাল্টে করবেন রসময়বাবু।

৪

হুকুম সিংয়ের যা স্বাস্থ্য! রিকশয় উঠলে প্রায় সীটখানাই বোঝাই হয়ে যায়। পিকলু যদি রোগা না-হত তাহলে বেশ মুশকিল হত, একখানা রিকশয় ধরত না।

রিকশওয়ালা সব রকম আইন বাঁচিয়ে রীতিমত জোরে গাড়ি চালাচ্ছে। হুকুম সিংকে দেখেই সে সেলাম করেছে—প্লেন ড্রেস হলেও পুলিশদের চিনতে রিকশওয়ালাদের একটুও সময় লাগে না।

চমচম অফিস ও হরিময়বাবুর বাসস্থান একই ঘরে। বাইরে বড় করে লেখা আছে ঃ ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরী।

কিন্তু হরিময়বাবু বেশ বিপদে ফেলে গিয়েছেন। তিনি আপিসে নেই। ভিতর থেকে একজন বলল, তিনি গড়িয়া গিয়েছেন। ডাকাডাকি করতে হরিময়বাবুর রাঁধুনি, তথা চাকর, তথা চমচম পত্রিকার সহ সম্পাদক বিজয় বেরিয়ে এল এবং হকুম সিংকে দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। এবার কথা পাল্টে সে বলল, "হরিময়বাবু হঠাৎ দমদম চলে গিয়েছেন।"

"সে কী! আমাদের যে এখানে আসবার কথা!" হরিময়বাবু যে বেশ ভুলো তা পিকলু আন্দাজ করতে পারছে।

বিজয় খুব রেগে গেল হরিময়বাবুর ওপর। বলল, "আপনাদের আসতে বলেছেন এখানে? এই রকম ভুলো লোক কীভাবে যে চমচমের মত কাগজ চালান!"

কী করবে পিকলু ভাবছে। বিজয় বলল, "দুঃখু করবেন না। এ তো কমের ওপর দিয়ে গেল। সেবার ওঁর ভাগ্নীকে শ্রীরামপুর নিয়ে যাবেন বলে হাওড়া স্টেশনের টিকিট-ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। এমনি ভুলো লোক যে, টিকিট-ঘর থেকে বেরিয়ে ভাগ্নীকে না-নিয়ে সোজা ট্রেনে গিয়ে উঠলেন। রিষড়া স্টেশন পেরিয়ে শ্রীরামপুরে নামার আগে ওঁর খেয়াল হল ভাগ্নীকে হাওড়া স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছেন!"

পিকলু এসব বিশ্বাস করতে চায় না। হরিময়বাবুকে যতটা দেখেছে সে, তাতে খুবই নির্ভর করা যায় ওঁর ওপর।

হুকুম সিং এবার জেরা করল, "কেয়া হুয়া থা?"

পুলিসী জিজ্ঞাসাবাদে কে না ভয় পায়? বিজয় বলল, "বাবু এসেই বললেন, বেজা, তাড়াতাড়ি ভাত বাড়। আমি এখনই বেরুবো। গোটাকয়েক চিঠি এবং টেলিগ্রাম এসেছিল। সেগুলো দেখতে দেখতে কী যে হল, বাবু বললেন, বেজা, ভাত থাক। আমি একবার এয়ারপোর্ট যাচ্ছি। শিশুবন্ধু পত্রিকা থেকে যদি কেউ খোঁজ করে, তাহলে বলবি আমি গড়িয়া গিয়েছি।"

বুঝতে না-পেরে গোড়ায় বিজয় তাই বলেছিল হরিময়-বাবু গড়িয়া গিয়েছেন।

পিকলুর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে শুনেছে, কলকাতার নতুন বিমানবন্দরখানা দারুণ হয়েছে। এখনও দেখা হয়নি। "হুকুম-চাচা, চলো আমরা ট্রামে চড়ে এরোপ্লেন দেখে আসি।"

হুকুম-চাচা খুব উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। ওখানকার থানা আবার কলকাতা পুলিসের এক্তিয়ারে নয়। তাছাড়া ট্রামে চড়ে দমদমে যাওয়া যায় না।

কিন্তু পিকলু নাছোড়বান্দা। দমদমে বিরাট-বিরাট প্লেন-গুলো সে দেখতে চায়, তারপর বোম্বাইয়ের সান্টাক্রুজের সঙ্গে দমদমের তুলনা করবে।

একখানা মিনিবাস দেখেই হুকুম সিং হাত তুলল। হুকুম সিংকে ইতিমধ্যেই মিনিবাসের ক্লিনার ও কনডাকটর চিনে ফেলেছে। ইঙ্গিতে তারা ড্রাইভারকে সাবধানে বাস চালাতে বলল। ভি আই পি রোড ধরে মিনিবাস-ড্রাইভারের বোধ হয় খুব জোরে গাড়ি চালাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গাড়িতেই পুলিস জানতে পেরে বেচারা মনমরা হয়ে গেল। কনডাকটরকে ডেকে গোঁঞ্জিপরা মিনিড্রাইভার বলল, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়!"

কনডাকটর এসে খোঁজ করল হুকুম সিংজী কতদূর যাবেন। ভেবেছিল দু এক স্টপ পরে নেমে যাবেন। একেবারে দমদম এয়ারপোর্ট শুনে সে দুঃখ করে ড্রাইভারকে খবর দিল, "পুরো সন্ধে।"

পিকলু জিজ্ঞেস করল, "এখানে বাঘের ভয় আছে বুঝি?"

কনডাকটর ফিক করে হেসে বলল, "না, আমরা অন্য বাঘের কথা বলছি!"

এয়ারপোর্টে নেমে বিরাট ইন্দ্রপুরী দেখে পিকলু অবাক হয়ে গেল। হুকুম সিংও একজন প্লেন ড্রেস বন্ধুকে দেখে খুব খুশী হল। পিকলুর পরিচয় দিয়ে হুকুম বলল, "ডি-সি সায়েবের নাতি। হাওয়াই আড্ডা দেখতে এসেছে বোম্বাই থেকে।"

"কেন? বোম্বাইতে এয়ারপোর্ট নেই?" ললিতবাবু জিজ্ঞেস করলেন। ললিতবাবুও কলকাতা পুলিসের কনস্টেবল। কিন্তু এই যে হুকুমচাচা বলল দমদম কলকাতার এক্তিয়ারের বাইরে।

হুকুম ফিসফিস করে বলল, "ওরা সেক্রেটারি কনট্রোলের লোক। যেখানে তোমার দাদু আগে ছিলেন।"

পিকলু হেসে ফেলল, "সিকিউরিটি কনট্রোল! যারা বিদেশীদের ওপর নজর রাখে।"

ললিতবাবুর আদি দেশ নিশ্চয় বাংলাদেশ। উনি বললেন, "আমি এখন হাই-যাঃ ডিউটিতে আছি!"

হাই-যাঃ! সে আবার কী কাজ? পিকলু বুঝতে পারছে না। ললিতবাবু তখন ব্যাখ্যা করলেন, "উচ্চারণটা খটমট—কেউ কেউ বলে হাইজ্যাক! বিমান ছিনতাই।"

সে আবার কী জিনিস?

হুকুম চাচা বলল, "ভি আই পি রোডেও ছিনতাই হয়—পিলেন ছিনতাই। আর এয়ারপোর্টে ইস্পেশাল ছিনতাই।"

"ডেনজারাস জিনিস। বিমানদস্যুরা প্লেনকে প্লেনই ছিনতাই করবার তালে আছে," ললিতকাকা এবার বোঝালেন পিকলুকে।

তারপর ললিতকাকা বললেন, "আমি যখন রয়েছি, তখন এয়ারপোর্টের সবই দেখিয়ে দেব। কেমন করে প্লেন নামে, কী করে ওঠে, কী ভাবে যাত্রীদের সার্চ করা হয়।"

এয়ারপোর্ট ঘুরে দেখতে-দেখতেই, এক সময়, তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল। স্বরটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, অথচ মানুষটা দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। "পিকলু—মিস্টার পিকলু না?"

আরে, এ যে হরিময়বাবু! টাকমাথায় একটা ফরেন টুপি পরায় তাঁকে চেনাই যাচ্ছিল না। টুপিটা খুলে ললিতবাবুর দিকে ইংলিশ স্টাইলে মাথা নত করলেন হরিময়বাবু, তাই পিকলু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল।

হরিময়বাবুর পাশে আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখা গেল। ও'রা দু'জনে এয়ারপোর্ট রেস্তোরাঁয় বসে কোকাকোলা খাচ্ছেন।

হরিময়বাবু ঝটপট পিকলু ও হুকুম সিং-এর পরিচয় দিলেন। ললিতকাকুর পরিচয়টা পিকলু নিজেই দিয়ে দিল।

সঙ্গের ভদ্রলোক রসিকতা করলেন, "ভাগ্যে আমাদের প্লেনটা হাই-যাঃ হয়নি—হলে আপনার কাজ বেড়ে যেত।"

ললিতবাবু হাসলেন বটে, কিন্তু এ-ধরনের অলুক্ষুনে কথা যে তাঁর মোটেই ভাল লাগে না তা ও'র মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

হরিময়বাবু বললেন, "মীট মাই ভাইপো—রামানুজ চৌধুরী। একসময় চমচম পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিল। এখন বহুকাল ধরে ফরেনে আছে।"

নামখানা বেশ নতুন ধরনের মনে হচ্ছে। হরিময়বাবু বললেন, "রামের অনুজ অর্থাৎ ছোটভাই অর্থাৎ লক্ষ্মণ। সুতরাং ভুলে গেলে লক্ষ্মণ বলে ডাকতে পারো, কোনো অসুবিধে হবে না।"

রামানুজবাবু ইতিমধ্যে কখন বেয়ারাকে চোখের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আরও তিনখানা বরফ-ঠাণ্ডা বোতল নিয়ে এসে সে ভটাভট খুলে দিল। হুকুম সিংয়ের আবার পাইপ ঢুকিয়ে কোকাকোলা খাওয়ার অভ্যাস নেই। ফলে বোতল থেকেই খাওয়া আরম্ভ করল সে—এবং ইম্পিরিয়াল গোঁফটার তলার অংশ ভিজে লালচে হয়ে উঠল।

জেনুইন মাল মনে হচ্ছে, কারণ হুকুম সিং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনখানা প্রমাণ সাইজের ঢেকুর তুলে হ্যাটট্রিক করল।

এয়ারপোর্ট রেস্তোরাঁয় ছোট্ট টেবিল ঘিরে ওঁরা কয়েকজন বসে-বসে কোল্ড ড্রিংকস খাচ্ছেন।

রেস্তোরাঁর টেবিলগুলো বেশ গায়ে-গায়ে লাগানো। পাশের টেবিলেও দু'জন লোক বসে আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন ইণ্ডিয়ান হলেও হতে পারেন; আর-একজন কোন্ দেশের তা পিকলু ঠিক বুঝতে পারল না। বিরাট দশাসই চেহারা। গোঁফটাও লেটেস্ট স্টাইলের। মাথা ভরতি কোঁকড়া চুল। কিন্তু ঠিক যেন জঙ্গল—কোনোদিন ওর মধ্যে বোধ হয় চিরুনি ঢোকে না।

হরিময়বাবু এবার লজ্জায় জিভ বার করে ফেললেন। বললেন, "আমি খুবই দুঃখিত। বাড়ি ফিরেই দেখি ভাইপো রামুর টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম দেখে তো আমার বিশ্বাসই হয় না। আমি তো ভেবেছিলুম রামুর সঙ্গে আমার কোনোদিন দেখাই হবে না! কিন্তু সেই ভাইপো রামু চমচমের টেলিগ্রাফিক নম্বরে তার করেছে সে কলকাতার ওপর দিয়ে চলে যাবে। যদি চাই, তাহলে যেন একবার দমদমে চলে আসি।"

রামানুজ চৌধুরীর দাঁতগুলো ঠিক ঝকঝকে মুক্তোর মতন। আর চেহারাটা কালো হলেও ঝকমকে। শরীরটায় বেশ জেল্লা আছে। হরিময়বাবুর শরীরের সঙ্গে ভাইপোর কোনো মিল নেই—হরিময়বাবু বেঁটে, ভাইপো লম্বা। হরিময়ের নাকখানা রিভলবারের নলের মতো, ভাইপোর নাকটা চাপা।

ঠাণ্ডা বোতল শেষ করে ললিতবাবু ও হুকুম সিং কিছুক্ষণের জন্যে ঘুরতে চলে গেল। রামানুজ এবার জিজ্ঞেস করলেন, "এ'রা কারা?"

হরিময়বাবু ভাইপোর কাছে কিছুই চাপলেন না। প্লেন ড্রেসে এরা যে পুলিসের লোক এবং পিকলুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন সব বলে দিলেন। পিকলুর মনে হল পাশের টেবিলের লোকরাও ওদের কথাবার্তা শুনছেন। এবার হাসি-হাসি মুখ করে ওঁরাও কাছে সরে এলেন।

রামানুজবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, "মিস্টার সিঙ্গারা-ভেলু আয়ার—আমার ফ্রেন্ড এবং একই হাওয়াই জাহাজে হংকং থেকে কলকাতায় এসেছেন। আর ইনিই মিস্টার পিক্‌ল।"

"পিক্‌ল নয়—পিক্‌ল মানে তো আচার! ইনি হচ্ছেন পিকলু," সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন হরিময়বাবু। নামের বিকৃতি উনি একদম সহ্য করতে পারেন না।

এ'রা দুজনেই যে সবে ফরেন থেকে নেমেছেন তা এ'দের জামাকাপড় এবং মালপত্তর দেখলেই বোঝা যায়। ভাইপো-গর্বে গর্বিত হরিময়বাবু বললেন, "ফরেনের ব্যাপারই আলাদা। রামু, তোর গা দিয়ে যে সেন্টের গন্ধখানা বেরুচ্ছে না!"

পিকলু লজ্জা পাচ্ছে, দু'জন অতিথি বাংলা কথা বুঝতে পারছেন না। ইংরিজীতে কথা বলাটাই এই অবস্থায় ভদ্রতা। কিন্তু হরিময়বাবু বললেন, "মাইডিয়ার ভাইপোকে আমি কতদিন পরে ফেরত পেয়েছি। এখন দুটো প্রাণের কথা বলে বুক হাল্কা করতে চাই—ইংরিজীর প্রশ্নই ওঠে না। মিস্টার সিঙ্গারাভেলুর জেঠু যদি এখানে আসতেন তাহলে নিশ্চয় ওঁরা ম্যাড্রাসি ভাষায় কথা বলতেন।"

ইস! বেশ লজ্জা করছে পিকলুর। ম্যাড্রাসি বলে কোনো ভাষা নেই।—ওঁর মাতৃভাষা নিশ্চয় তামিল।

মাত্র ফর্টিএইট আওয়ারস—অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে হরিময়বাবুর ভাইপো কলকাতায় এসেছেন। স্রেফ ব্রেক জার্নি। হংকং থেকে জেনিভার পথে কলকাতায়।

পিকলু অবাক হয়ে রামানুজবাবুর জিনিসপত্তর লক্ষ্য করছে। গলা থেকে, কাঁধ থেকে, কোমরের বেল্ট থেকে কত-রকম অজানা জিনিস যে ঝুলছে। অনেকদিন আগে ইলেকট্রিক ট্রেনে পিকলু এরকম এক ফেরিওয়ালা দেখেছিল। তারও চোখে রঙিন চশমা। সেই লোকটার সমস্ত দেহ থেকে মেডেলের মতো নানা রঙের প্লাসটিকের চিরুনি, বুরুশ, ছুরি, পেন, চামচে, চশমা ঝুলছে।

রামানুজ ফস করে চোখের চশমাটা খুলে পিকলুর দিকে এগিয়ে দিলেন। "পরে দেখো। স্পেশাল পোলারয়েড-লেন্স—নিউইয়র্কে সবে বেরিয়েছে।"

চশমাটা পরবার লোভ সামলাতে পারল না পিকলু। আঃ, পরামাত্রই চোখ দুটো কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল—ঠিক যেন চোখ দিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে।

মিস্টার আয়ারের সর্বাঙ্গেও নানারকম অজানা যন্ত্রপাতি। একটা যন্ত্র খুলে হঠাৎ তিনি গালের ওপর বুলোতে লাগলেন। হরিময়বাবু ফিসফিস করে বললেন, "ব্যাটারি-চালিত অটো-মেটিক দাড়িকামানোর কল! উঃ! সাবান নয়, জল নয়, ব্লেড নয়—স্রেফ ম্যাজিকের মতো কামানো হয়ে গেল। পিকলু, তোমার দাড়ি গজালে ওইরকম একটা মেশিন জোগাড় করে ফেলো। আমার মতো খোঁচা দাড়ির খোঁচা খেতে হবে না।"

জেঠুর কথা শুনে রামানুজ বলল, "মোস্ট অর্ডিনারি যন্ত্র। মিস্টার আয়ারকে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াতে হয়, আমিরী কায়দায় দাড়ি কামাবার সময় কোথায়?"

অন্যসব যন্ত্রগুলোও আড়চোখে দেখছেন হরিময়বাবু। টেপরেকর্ডার, টেলিফটো লেন্স, ট্রানজিস্টর রেডিও, কতরকমের ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশ যে রয়েছে। এসব তিনি জীবনে দেখেননি।

হরিময়বাবুর মনে পড়ছে অতীতের কথা। এই রামুর একজোড়া চটির বেশী ছিল না। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় একখানা ফাউনটেন পেনের জন্যে কান্নাকাটি করেছিল রামু। তারপর পাশ-টাশ করে রামু অনেক দিন বেকার বসে ছিল। একটা স্টেশনারি দোকানে শেষ পর্যন্ত কী একটা চাকরি জুটিয়েছিল। কিন্তু থাকা-খাওয়ার খরচ উঠত না। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ একদিন রামু উধাও হল। কোথায় গেল, কী হল, প্রথমে জানাই যায়নি। তারপর রামু বিদেশ থেকে একখানা রঙিন ছবির পোস্টকার্ড পাঠাল। হরিময়বাবু ছবি-খানা আজও যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছেন।

আন্দাজ করেছেন তাঁর ভাইপো এখন বিদেশে কেষ্ট-বিষ্টু হয়েছে।

মালপত্তর নিয়ে ওরা এয়ারপোর্টের গেটের কাছে এসে ট্যাক্সির জন্যে লাইন দিচ্ছেন। হুকুম সিং ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে।

কোঁকড়া-চুলওলা এক মেমসায়েব তাঁর মাল নিয়ে একটা ট্যাক্সি চড়ে ভোঁ করে বেরিয়ে গেল। পরের ট্যাক্সিতে মিস্টার আয়ার তার মালপত্তর তুলে ফেললেন। লম্বা-চওড়া সায়েবটি দূরে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হুকুম সিং দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, তখন মিস্টার আয়ার চিৎকার করে উঠলেন, "মিস্টার চৌধুরী, আসুন। আপনিও তো কর্নওয়ালিস হোটেলে উঠছেন।"

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন হরিময়বাবু। "আমার ভাইপো দু'দিনের জন্যে কলকাতায় এসে কেন হোটেলে উঠবে? চমচম আপিসে দু'জনে কোনোরকমে চলে যাবে।"

মিস্টার আয়ার ততক্ষণে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছেন। কিন্তু কোথায় রামানুজ চৌধুরী? তিনি তখন একটু দূরে পিকলুকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। জিজ্ঞেস করছেন, "এখানে ছবি তোলা যায় তো?"

আজকাল সব জায়গায় ছবি তোলার পারমিশন নেই। তবু হুকুম সিং বলল, "জলদি খোকাবাবুর একটা ছবি তুলে নিন।"

ছবির ফোকাশ করতে যাবার সময়েই মিস্টার আয়ার ও হরিময়বাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন। আয়ার জিজ্ঞেস করলেন, "কী ঠিক করলেন? হোটেলেই তো ভাল ছিল। সারাদিন জেঠুর কাছে থাকুন—রাত্রে চলে আসুন।"

রামানুজ বলল, "আমরা লে-ওভার পাব এরোপ্লেন কোম্পানি থেকে। কর্নওয়ালিস হোটেলে আমার ও মিস্টার আয়ারের জন্যে ঘর ঠিক আছে।"

লে-অফ কথাটা হরিময়বাবু শুনেছেন। কারখানায় লোকে বেকার বসে থাকে, খুব কষ্ট পায়। তিনি ভাবলেন, এরোপ্লেন কোম্পানিতে গোলমাল হয়েছে। রামানুজ হেসে বলল, "জেঠু, লে-অফ নয়—লে ওভার। মানে, জামাই আদর—প্লেন কোম্পানির খরচে আমরা হোটেলে থাকব। পকেট থেকে একটি আধলা খরচ হবে না। এমন কী, এই এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে যাবার ট্যাক্সি-ভাড়াও ওদের।"

রামানুজ বললো, "মিস্টার আয়ার, আপনি এগোন। আমি জেঠুর বাড়িতে একবার দেখা দিয়েই কর্নওয়ালিস হোটেলে যাচ্ছি।"

আয়ারের ট্যাক্সি তীরের বেগে বেরিয়ে গেল। শুধু মিস্টার চৌধুরীর জিনিসপত্র রাস্তায় পড়ে রইল। হরিময়বাবু হন্তদন্ত হয়ে বললেন, "দামী জিনিসপত্তর এভাবে ছড়িয়ে রাখিস না। এর নাম কলকাতা শহর।"

আড়চোখে একবার সব কটা জিনিস দেখে নিল রামানুজ। তারপর একটা ক্যামেরা তুলে নিয়ে পিকলুর কাছে চলে এল।

পিকলু তখনও গেটের কাছে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবি তোলার কথা শুনলেই ও কী-রকম শক্ত হয়ে যায়। অথচ ছবি তোলাতে ওর খুব ভাল লাগে।

নিজের বক্স-ক্যামেরায় সে ইতিমধ্যে এয়ারপোর্টের একটা ছবি তুলে নিয়েছে। হরিময়বাবুকে যে-রকম দেখাবে ওই ছবিতে, ভেবে সে বেশ মজা পাচ্ছে। হরিময়বাবু দেখতেও পাননি যে, পিকলু ছবি তুলে নিয়েছে—তবে মিস্টার আয়ার এবং ওই বিরাট লোকটা আড়চোখে ফটোগ্রাফার পিকলুকে ছবি তুলতে দেখে বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। পিকলুর মনে হল, বিরাট লম্বা চওড়া ওই সায়েব পিকলুকে দিয়ে ছবি তোলানো পছন্দ করেন না। পিকলু শুনেছে, বিনা অনুমতিতে ছবি তুলিলে অনেকে বেশ বিরক্ত হন।

রামানুজ ইতিমধ্যে পিকলুর ছবি তুলে ফেলল, এবং সঙ্গেসঙ্গেই ওই সায়েব হঠাৎ মুখ টিপে হাসতে-হাসতে ওদের সকলের গায়ে সুগন্ধ সেণ্ট স্প্রে করে দিল। হরিময়বাবু বললেন, "আমাদের জন্যে ভদ্রলোক কতখানি সেণ্ট নষ্ট করলেন দেখো। হয়ত ওঁদের দেশে এইরকম সেণ্ট ছড়িয়ে বন্ধুত্ব পাতাতে হয়।"

ইতিমধ্যে আর একখানা ট্যাক্সি এসে থামল। এবং হরিময়বাবুর নির্দেশে পোর্টার রামানুজের জিনিসপত্তর গাড়িতে তুলতে লাগল।

ভবনাথ সেন আরাম-কেদারায় বসে গড়গড়া টানছেন। ঘড়িতে পৌনে আটটা বাজল। পিকলুর ঠাকুমা এর মধ্যে দু'বার ঘড়ি দেখে গেলেন—কারুর জন্যে চিন্তা থাকলে তিনি ঘন-ঘন দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকান। ভবনাথ বলছেন. পিকলুর জন্যে কোনো চিন্তা নেই—সংগে হুকুম সিং এবং হরিময়বাবু রয়েছেন।

এমন সময় হৈ-হৈ করে ওরা তিনজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হরিময়বাবু ছোটছেলের মতো বললেন, "দুর্দান্ত! ভাবা যায় না।"

পিকলু তড়াং করে একটা সোফার ওপর বসে পড়ল। বলল, "উঃ, আজ সমস্ত দিন কলকাতায় ঘুরে-ঘুরে যা হৈ-চৈ হয়েছে না।"

হরিময়বাবু বললেন, "আপনার নাতি একখানা বই লিখে ফেলতে পারে— 'পিকলুর কলকাতা ভ্রমণ—প্রথম পর্ব'।"

প্রথম পর্ব এই কারণে, কাল নাকি আবার দ্বিতীয় পর্ব ভ্রমণ হবে। হরিময়বাবু এবার পিকলুর ঠাকুমাকে বললেন, "আপনার বেয়াইকে একটু বলে দিন, আগামীকালও হুকুম সিংকে আমাদের দলে চাই। হুকুম সিং থাকলে আমাদের কোনো চিন্তাই থাকে না।"

ঠাকুমা বললেন, "বসুন, কিছু খান।"

হরিময়বাবু বললেন, "বসবার উপায় নেই—সর্দিতে নাকটা বুজে আছে।"

ভবনাথ একটু অবাক হলেন। কারণ হরিময়বাবু গর্ব করতেন, তিনি সর্দিকাশিতে ভোগেন না।

রুমালে কয়েকবার নাক পরিষ্কারের চেষ্টা করলেন হরিময়। তারপর বললেন, "হঠাৎ কী যে হল—এখনই ওষুধের দোকানে যেতে হবে।"

ঠাকুমা বললেন, "আমাদের বাড়িতেই নাকের ড্রপ এবং ইনহেলার রয়েছে"

ইনহেলার ব্যাপারটা হরিময়বাবুর কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়। বললেন, "ওই নাকের মধ্যে ফাউনটেন পেন গুঁজে দেবার মতো জিনিসটা? আমি কখনো ব্যবহার করিনি—জিনিসটা দেখলেই কেমন আমার হাসি লাগে। দিন, এখন যখন অসুবিধায় পড়েছি।"

হরিময়বাবু যখন নাকে ওষুধ নিচ্ছেন, তখন ভবনাথ লক্ষ্য করলেন হুকুম সিংও সর্দিতে হাঁসফাঁস করছে।

হুকুম সিংয়ের নাকেও কয়েক ফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিলেন ঠাকুমা। সংগে সংগে এমন জোরে হাঁচল হুকুম সিং, বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল।

ভবনাথ লক্ষ্য করলেন, যার প্রায় সব সময় সর্দি লেগে থাকে. সেই পিকলুর কিন্তু কিছু হয়নি। ব্যাপারটা তাঁর কাছে একটু আশ্চর্যই লাগল।

হরিময়বাবু বললেন, "আজ যা মজা হয়েছে না। শ্যামবাজারের মোড়ে একটা বিরাট পোস্টার দেখে আমার ভাইপো তো তাজ্জব। লেখা আছে : 'খারাপ লোকের খপ্পরে পড়ুন।' সে বেচারা তো রীতিমত নার্ভাস হয়ে গেল। বললে, 'ওয়ার্লডের কোনো শহরে এই ভাবে জনসাধারণকে খারাপ লোকের খপ্পরে পড়বার জন্যে অনুরোধ করা হয় না।"

"তারপর?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

তখন বাধ্য হয়ে ভাইপোর কাছে টপ সিক্রেট ফাঁস করলুম। চমচমের বিশেষ সংখ্যায় স্পেশাল উপন্যাসের নাম 'খারাপ লোকের খপ্পরে'—সেইটাই জনসাধারণকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।"

ভবনাথ সেন হেসে ফেললেন। হরিময়বাবু বললেন, "দাঁড়ান—এখনও হাসির বাকি আছে। আমার ভাইপোর ফ্রেন্ড মিস্টার সিংগারাভেলু আয়ার—কোনো একসময় বোধ হয় ঢাকাতে ছিল। রীতিমত বাঙলা জানে। আমাদের সেকেন্ড পোস্টারখানা দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। ধর্মতলা স্ট্রীটে পরের পর, ল্যাম্পপোস্টে পাবলিসিটি হয়েছে ঃ 'খারাপ লোকের খপ্পরে পড়েছেন? এখনই খোঁজ করুন।' পিকলুটা আবার বোকার মত বলে ফেলেছে, পুলিস থেকে বিজ্ঞাপন দিয়েছে বোধ হয়। জানতে চাইছে, কেউ খারাপ লোকের খপ্পরে পড়েছে কিনা।"

পিকলু হাসতে-হাসতে বলল, "জানো দাদু, মিস্টার সিংগারাভেলুর মুখ শুকনো হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, এখানকার পুলিস খুব সজাগ বুঝি?"

হরিময়বাবু বললেন, "বিদেশীর কাছে স্বদেশী পুলিশের বদনাম আমার সহ্য হয় না। সংগে-সংগে শুনিয়ে দিলাম, পুলিস জানে 'শত্রু নিকটেই আছে।' ভাগ্যে চাইনীজ যুদ্ধের সময় যে-পোস্টারখানা চমচমে ছাপিয়েছিলাম, তার কথাগুলো মনে ছিল।"

হরিময়বাবু নাকে আর-একবার সর্দির ওষুধ গুঁজলেন। কিন্তু জানালেন, নাকটা ক্রমশই বুজে আসছে। "কোনোরকমে নিশ্বাস নিচ্ছি।"

তিনি ও হুকুম সিং এবার উঠে পড়লেন।

পিকলু রাতের খাবার খেতে বসে বলল, "দাদু, অবাক কান্ড।"

অবাক হবার কান্ড বটে। পকেট থেকে একখানা রঙীন ফটো বার করল পিকলু। এ যে পিকলুরই ফটো—এয়ারপোর্টের সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে পিকলু। ঠাকুমা খুব খুশী হলেন।

পিকলু বলল, "হরিময়বাবুর ভাইপো ম্যাজিক দেখিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন, হাসো! আমি হাসলাম, উনি ক্যামেরার বোতাম টিপলেন। তারপর ওয়ান-টু-থ্রি এইভাবে কুড়ি পর্যন্ত গুনলেন।" এবার ক্যামেরার ভিতর থেকে পিকলুর এই রঙীন ছবিটা বেরিয়ে এল। তাজ্জব ব্যাপার।

পিকলু নিজেও ছবি তোলে বক্স ক্যামেরায়। ছবি তোলা হলে ফিলমটা স্টুডিওতে পাঠানো হয়, সেখানে নেগেটিভ ওয়াশ হয়। ডেভেলপ করা নেগেটিভ থেকে এক-একখানা পজিটিভ ছবি অন্য একটা কাগজে ডার্করুমে ছাপা হয়। কত সময় লাগে। কিন্তু রামানুজকাকুর আশ্চর্য যন্তর—বোতাম টেপামাত্রই হাতে-হাতে ছবি।

ভবনাথ বললেন, "পড়েছি বটে। এর নাম পোলারয়েড ইন্‌স্ট্যাণ্ট ক্যামেরা। কখনও দেখিনি। গোড়ার দিকে শুধু সাদা-কালো ছবি উঠত, এখন তাহলে রঙীন ছবি তুলবার ক্যামেরাও হয়েছে।" ভবনাথ মনে-মনে ইংরিজী ইনস্ট্যাণ্টামেটিকের একটা বাংলা নাম ঠিক করে নিলেন ঃ তাৎক্ষণিক ক্যামেরা।

ক্যামেরা থেকে সোজাসুজি রঙীন ছবি বেরিয়ে আসতে দেখেই কেবল পিকলু অবাক হয়নি। আরও একটা ভুতুড়ে ব্যাপার হয়েছে। ছবিখানা যেমনি রামানুজবাবু পিকলুর হাতে দিলেন অমনি হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, আজ সকালে স্নান করা হয়নি। পিকলু বলল, "জানো দাদু, ছবিটায় যেন কেমন ঘেমো ঘেমো গন্ধ পেলাম।"

হা-হা করে হেসে উঠলেন ভবনাথ। "ছবিতে তোর গায়ের ঘেমো গন্ধ ধরা পড়ল বলছিস?"

পিকলু জানাল, হরিময়বাবু এবং হুকুম সিংকেও ছবিটা সে চুপি-চুপি দেখিয়েছিল। কিন্তু দারুণ সর্দিতে ওঁদের নাক বুঁজে গিয়েছে— কোনো গন্ধই ওঁরা পেলেন না। কিন্তু হরিময়বাবু কিছুতেই স্বীকার করবেন না যে, তাঁর নাক দিয়ে কোনো গন্ধ ঢুকছে না।

ছবিটা বার করে পিকলু এবার ভবনাথের হাতে দিলেন। সত্যি ভৌতিক ব্যাপার! তিনিও যেন ঘেমো গন্ধ পাচ্ছেন। ঠাকুমা বললেন, "যত তোদের সব পাগলামি। সারাদিন তোর পকেটে-পকেটে ছবিটা ঘুরছে—তাই তোর ওইরকম মনে হচ্ছে।"

ঠাকুমা ভিতরে চলে গেলেন, কিন্তু পিকলুর সন্দেহ কমল না। সে ছবিটা আবার শুঁকে দেখল। তারপর দাদুকে বলল, "তুমি আমার হাফ প্যাণ্টের ডান পকেটের দিকটা শুঁকে দেখো—পেয়ারার গন্ধ পাচ্ছ না?"

ছবিতে যেখানে পকেট দেখা যাচ্ছে, সেখানে নাক নিয়ে গিয়ে পাকা পেয়ারার কড়া গন্ধ পেলেন ভবনাথ। পিকলু বলল, "আমার ডান পকেটে একটা পেয়ারা ছিল। অথচ বাঁ পকেট শুঁকলাম, কোনো গন্ধ নেই।"

ব্যাপারটা সত্যিই একটু ভুতুড়ে মনে হচ্ছে ভবনাথের। কিন্তু ভূত-পেত্নীতে পিকলুর অত বিশ্বাস নেই। সে বললে, "ভুতুড়ে নয়...রহস্যাবৃত!" শেষ কথাটা ভবনাথ তাঁর গপ্পে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।

ভবনাথ এরপর পিকলুকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় কোথায় গিয়েছিলি তোরা?'

পিকলু হুড়হুড় করে সব বলে গেল। এয়ারপোর্টে হরিময়বাবুর ভাইপো রামানুজকাকু ছাড়াও ওঁর বন্ধু মিঃ আয়ারের সংগে আলাপ হল। সংগে আরও একজন লম্বা-চওড়া বিদেশী ছিল। কোন্ জাত পিকলু ঠিক বুঝতে পারেনি। হয়তো মিশ্র জাতেরও হতে পারেন। দেখলে মনে হয় কুস্তিগির। হুকুম সিংয়ের সংগে আলাপ করেও ওঁরা খুশী। হুকুম সিং না-থাকলে সাহস করে এয়ারপোর্টে কেউ পিকলুর ছবি তুলতেই পারত না। তারপর চমচম অফিস ঘুরে রামানুজবাবুরা নিউ মার্কেটের পিছনে কর্নওয়ালিস হোটেলে উঠলেন।

হরিময়বাবু ভাইপোকে খুব রিকোয়েস্ট করেছিলেন চমচম আপিসে উঠবার জন্যে। রামানুজ রাজী হয়েও ছিলেন, "কিন্তু ওই মিঃ সিংগারাভেলুর চাপে পড়ে রামুকাকু হোটেলেই উঠলেন।"

"খুব পুরনো বন্ধু হয়তো হবেন," ভবনাথ বললেন।

পিকলু বললে, "মোটেই না। হংকং এয়ারপোর্টে আলাপ। দুজনেই খুব গল্প করতে ভালবাসেন।"

ওখানে চা-টা খেয়ে কলকাতা ঘুরে বেড়াবার প্ল্যান হল।

পিকলু বলল, "জানো দাদু, ওঁদের কাছে কত রকমের অদ্ভুত জিনিসপত্তর। ওই লম্বা সায়েবের কাছে একখানা সেণ্ট যা আছে না! এয়ারপোর্টে সরু লম্বা একটা শিশি বার করে আঙুলের একটু চাপ দিতেই স্প্রে হয়ে গেল হরিময়দাদু এবং হুকুম সিংয়ের ওপর। বিলিতী সেণ্টের সেই গন্ধে হরিময় দাদুর খুব আনন্দ—স্বদেশী আন্দোলনের পর এই প্রথম সেণ্ট মাখলেন হরিময়দাদু।"

"সেই সায়েবটা তোদের সংগে কথা বলেছিল?" ভবনাথ জানতে চান।

"মোটেই না। হয়তো ইংরিজী বোঝেন না। তবে আমাদের দেখলেই হেসেছেন—আমরাও হাসিমুখ দেখিয়েছি। ওঁর সঙ্গে রামানুজকাকু বা মিস্টার সিঙ্গারাভেলুর কোনো সম্পর্ক নেই। একই প্লেনে হংকং থেকে এসেছেন এই পর্যন্ত। এবং একই হোটেলে উঠেছেন অ্যাক্সিডেনটালি।"

পিকলু বলে চলল, "হরিময়বাবুর ভাইপোর গপ্পো শুনলে তুমি খুব হাসবে, দাদু। রামানুজকাকু নাকি পড়াশোনায় খুব খারাপ ছিলেন। ছবি তোলায় খুব লোভ ছিল। আর..." এবার পিকলু আর হাসি চাপতে পারল না।

দাদু ওর মুখের দিকে তাকালেন। পিকলু বলল, "খুউব পেটুক ছিলেন। চপ কাটলেট চানাচুর থেকে আরম্ভ করে দই সন্দেশ রসগোল্লা পর্যন্ত সব কিছু খাবার খেতে ভালবাসতেন। দু-একবার হরিময়দাদুর পকেট থেকে পয়সা চুরিও হয়েছে—প্রতিবারেই হরিময়দাদু মিষ্টির দোকানের খালি বাক্স ওয়েস্ট পেপারের বাক্সে পড়ে থাকতে দেখেছেন। কিন্তু প্রমাণের অভাবে হরিময়দাদু কিছু বলতে পারেননি।"

পিকলু বলল, "তারপর রামুকাকুকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হল। রাবড়িচূর্ণ চুরি করে ধরা পড়বার ভয়ে।"

হরিময়বাবুর যে রাবড়িচূর্ণের নেশা আছে তা ভবনাথ জানেন। অন্য লোকেরা বিড়ি, সিগারেট, নস্যি, খৈনির নেশা করে। কিন্তু হরিময়বাবুর স্পেশাল নেশা, বোধহয় ওয়ার্ল্ডে কারও নেই। ট্রামে-বাসে, রাস্তায় যেতে - যেতে মাঝে মাঝে খৈনির মতো মুখে একটু রাবড়িচূর্ণ না ফেললে হরিময়বাবুর মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে। নেশাটা বেশ চেপে বসেছে। রাবড়িচূর্ণ মানে হরলিক্সের গুঁড়ো।

রামুকাকু একদিন দুপুরে হরিময়বাবুর ঘরে ঢুকে পুরো এক শিশি রাবড়িচূর্ণ সাবাড় করে ফেলেছিলেন। তারপর ভয় পেয়ে সেই যে গৃহত্যাগ করেছিলেন—আর কেউ খোঁজ পায়নি। কীভাবে ফরেনে পালিয়েছিলেন রামানুজকাকু, সেটাই নাকি একটা গপ্পো। তবে ওখানে খুব নাম করেছেন রামানুজকাকু, রেডিওতে মস্ত কী এক চাকরি করেন। সেই কাজেই তেহারান এবং জেনিভা যাবার পথে কিছুক্ষণের জন্য কলকাতায় নেমে পড়েছেন।

হংকং-এ মিস্টার সিঙ্গারাভেলুর সঙ্গে খুব আলাপ হল। উনি বললেন, "তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতা ঘুরে আসি।"

"হরিময়দাদু ভাইপোকে কী উপহার দিলেন জানো? এক শিশি রাবড়িচূর্ণ। বললেন, সামান্য এক শিশি চূর্ণের জন্যে তুই সংসার ত্যাগ করলি! খুব হাসলেন রামুকাকু—তিনি এখন ওসব জিনিস খান না।"

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর তোরা কোথায় গেলি?"

পিকলু মুখে একটা জাপানী লজেন্স পুরে বলল, "কর্নওয়ালিস হোটেলে চা টোসট খেয়ে আমরা পাঁচজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।"

পাঁচজন লোককে আজকাল একখানা ট্যাক্সিতে নিতে চায় না। কিন্তু হুকুম সিং থাকায় কোনো অসুবিধে হল না। একজন ট্যাক্সিওয়ালা বেশী ভাড়া চাইতে গিয়ে হুকুম সিংকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটল। ক্ষমা চেয়ে বললে, "স্লিপ অফ টাং, আর কখনও সে বেশী ভাড়া চাইবে না।"

এরপর ভবনাথ ভেবেছিলেন এরা এবার কলকাতার বিখ্যাত জায়গাগুলো, যেমন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, মিউজিয়ম, এই সব দেখবেন।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। ওঁরা প্রথমে গেলেন হ্যারিসন রোডের ওপর বিখ্যাত এক চপ-কাটলেটের দোকানে। এই গন্ধ নাকি

রামুকাকুর নাকে এত বছর পরেও লেগে আছে। ওখানকার চিকেন কবিরাজী কাটলেট নাকি ওয়ার্ল্ডস বেস্ট। দুশ গজ দূর থেকে ভুরভুর করে গন্ধ ছাড়ে। গন্ধ শুঁকে দোকান খুঁজে পাওয়া গেল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে রামুকাকু একটা ছবি তোলালেন। বোতাম টিপলেন মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার।

এরপর বিখ্যাত এক কচুরি-সিঙাড়ার দোকান। সেখানেও খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ প্রাণ মাতিয়ে দিচ্ছে। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে সেই পবিত্র গন্ধনিশ্বাস নিলেন হরিময়বাবুর ভাইপো। ওখানেও ছবি উঠল।

ট্যাক্সি এবার ছুটে চলল এসপ্লানেডের কাছে সেই বিখ্যাত মোগলাই পরোটার দোকানের দিকে। ওখানেও গন্ধ ভুরভুর করছে। রামুকাকু বললেন, "এমন গন্ধটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি—সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।" মোগলাই পরোটা ও কষা মাংস খেতে খেতে ছবি তোলার প্রস্তাব উঠল। এ-অবস্থায় ছবি তুলতে আপত্তি উঠেছিল—অনেক ভদ্রলোক মহিলাদের নিয়ে মোগলাই পরোটা ও কষা মাংস খাচ্ছেন। এ-অবস্থায় ছবি ওঠাতে অবশ্যই আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু হুকুম সিং সঙ্গে থাকায় কেউ আর প্রতিবাদ করল না। রামুকাকু মনের সুখে ছবি তুললেন।

ট্যাক্সিতে চড়ে বড়বাজার সত্যনারায়ণ পার্কের দিকে যেতে যেতে রামুকাকু বললেন, "এইসব দোকান হল কলকাতার অমূল্য সম্পদ। এক-আধখানা মনুমেণ্ট থাকল আর না থাকল! কিন্তু ভীমনাগ, গাঙ্গুরাম, পুঁটিরাম, তেওয়ারি,

গুপ্ত, শর্মা ছাড়া কলকাতা শহর কল্পনাই করা যায় না।"

হরিময়বাবু উৎসাহ পেয়ে বললেন, "নোনতার দিকটাই বা বাদ দিচ্ছ কেন—নানকিং, নিজাম, চাংওয়া, চাচা। আস্বাদের দিকেই বল আর গন্ধের দিকেই বল প্রত্যেকটি দোকানের এক একটি বৈশিষ্ট্য। চোখ বেঁধে দিলেও স্রেফ গন্ধ শুঁকে হাজার-হাজার লোক বলে দেবে কোন্ দোকানে নিয়ে এসেছ।"

মিস্টার আয়ার এই সময় বলে ফেলেছিলেন, "দুর্গন্ধের শহর বলেই লোকে কলকাতাকে জানে—কিন্তু এমন সুগন্ধ পৃথিবীর কোথায় আছে?"

বড়বাজারে তেওয়ারির দোকানে তখন শোনপাঁপড়ি বিক্রি হচ্ছে। ভিড় ঠেলে সেখানে ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু হুকুম সিংয়ের ভয়ে ট্যাক্সিওয়ালা অসাধ্য সাধন করল। শোনপাঁপড়ি খেতে খেতে ওখানেও ছবি তোলা হল। তারপর চিৎপুরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি এবং নেপাল হালুইকরের দোকানের মধ্যে ওঁরা নেপালের দোকানই নির্বাচন করলেন।

হরিময়বাবু পিকলুকে বললেন, "ভাবছি, ভাইপোকে একটা অনুরোধ করব। চমচমের স্পেশাল সংখ্যার জন্যে কলকাতার একটা স্পেশাল খাদ্য-ম্যাপ করে দিতে—কোথায় কোন রাস্তায় কী বিখ্যাত খাবারের দোকান আছে শুধু তাই দেখানো থাকবে।" উৎসাহের সঙ্গে হরিময়বাবু বলেছিলেন, "ভাবা যায় না, কী হবে! প্রকাশের পনেরো মিনিটের মধ্যে সমস্ত চমচম যদি নিঃশেষিত না হয় তাহলে সম্পাদনা ছেড়ে দেব।"

সারাদিন ঘুরে ঘুরে পিকলুর ঘুম পাচ্ছে। বাকি গল্প পরের দিন শোনা যাবে। পিকলু নিজের ঘরে যাবার আগে গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "দাদু, সমস্ত ছবিই তো এই তাৎক্ষণিক ক্যামেরায় তোলা। কী সুন্দর রঙীন সব ছবি। কিন্তু..."

"কিন্তু কেন? বলেই ফেলো," ভবনাথ নাতিকে সাহস দিলেন।

পিকলু বলল, "চাঙওয়ার ছবিটা আমি একবার হাতে নিয়েছিলাম। আমার মনে হল, ছবিটার গা থেকে ভুরভুর করে চিকেন ফ্রায়েড রাইসের গন্ধ ছাড়ছে।"

"হুকুম সিং বা হরিময়বাবু লক্ষ্য করেননি?"

"ওঁরা করবেন কোথা থেকে? ওঁরা তো সর্দিতে হাঁসফাঁস করছেন।"

পিকলু ঘরে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় ভবনাথ ডাকলেন, "পিকলু।"

পিকলু দাদুর কাছে ফিরে এল। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের দলে কার কার সর্দি হয়েছে?"

দাদুর প্রশ্নে পিকলু হেসে ফেলল। ঠাকুমা বললেন, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

পিকলু হিসেব করে বলল, "আমি এবং মিস্টার আয়ার ছাড়া সবার। এমন কী রামুকাকুরও।"

দাদু বললেন, "এই সিঙ্গারাভেলুর কোনো বিশেষত্ব তোর নজরে পড়েছে?"

পিকলু হেসে ফেলল। বলল, "নাকে এবং কানে অজস্র চুল। ঠিক যেন বন হয়ে আছে।"

ঠাকুমা বললেন, "ছিঃ, পিকলু, লোকের শরীর নিয়ে ও-ধরনের কথাবার্তা বলতে নেই। ভগবান যাকে যা দিয়েছেন।"

পিকলুকে নিয়ে ওর ঠাকুমা ঘুমোতে চলে গেলেন। কিন্তু ভবনাথের চোখে ঘুম নেই। গল্পের প্লট এখনও দানা বাঁধেনি। ইতিমধ্যে নতুন উপসর্গ জুটেছে। পিকলুর প্রথম কলকাতা ভ্রমণের ছবিগুলো ও'র চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

আলো নিভিয়ে চোখ বন্ধ করলেন ভবনাথ—কিন্তু গন্ধ আর সর্দি, সর্দি আর গন্ধ—কথা দুটো তাঁর মাথার মধ্যে বারবার দপদপ করে যেন নিয়ন আলোতে জ্বলে উঠছে এবং নিভে যাচ্ছে।

৬

অন্য দিনের থেকে অনেক আগেই পিকলু ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। আজ যে সকাল থেকেই ঘুরে বেড়াবার প্রোগ্রাম। হুকুম সিংও আসছে। লালবাজারের দাদু প্রথমে ওকে দ্বিতীয় দিনের জন্যে ছাড়তে রাজী হচ্ছিলেন না। কিন্তু পিকলু টেলিফোনে এমনভাবে আব্দার করল যে, তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

পিকলু দেখল এ-বাড়ির দাদু অনেক আগেই উঠে পড়েছেন। কলম ও নোটবই নিয়ে তিনি কীসব হিজিবিজি দাগ কাটছেন। অঙ্ক মেলাতে না-পারলে পিকলু অনেক সময় ঐভাবে খাতায় দাগ কাটে।

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, "পিকলু, তুমি নিজের ক্যামেরায় গতকাল কখানা ছবি তুলেছ?"

পিকলু বলল, "ফিল্ম শেষ। এয়ারপোর্টে ওই বিরাট কুস্তিগীর সায়েব থেকে আরম্ভ করে, মিঃ আয়ার, রামুকাকু, হরিময়দাদু সবার ছবি তুলেছি।"

দাদু বললেন, "তা হলে এখনই গুইন স্টুডিওতে ওয়াশিং এবং প্রিন্টিংয়ের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।"

বাড়ির চাকর ভজুকে ডাকলেন ভবনাথ। ভজু এর আগেরবার ছবি নিয়ে বিপদ বাধিয়েছিল। ওয়াশিং শুনে ফিল্মটা সোজা গণেশ ডাইংক্লিনিং-এ দিয়ে এসেছিল। পিকলু বলল, "গুইন স্টুডিও। আজ বিকেলেই প্রিন্ট চাই।"

কিন্তু ক্যামেরা খুলে ফিল্ম বার করতে গিয়ে পিকলু আর্তনাদ করে উঠল। ক্যামেরার মধ্যে কোনো ফিল্ম নেই!

"ফিল্ম পুরেছিলিস তো?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

নিজের হাতে দুদিন আগে পিকলু ক্যামেরা লোড করেছে। ঠাকুমা এসে সান্ত্বনা দিলেন, "মন খারাপ কোরো না, এখনই দুটো ফিল্ম আনিয়ে দিচ্ছি।"

বেবি ব্রাউনি ক্যামেরায় সুন্দর সুন্দর কত ছবি তুলেছিল পিকলু—সব নষ্ট হয়ে গেল।

ভবনাথ গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন, "ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছিলে?"

সকাল থেকে পিকলু ক্যামেরাটা একেবারেই হাতছাড়া করেনি।

"ভাল করে ভেবে দেখো," ভবনাথ বললেন।

"সত্যি একবারও হাতছাড়া করিনি।" শুধু সন্ধেবেলায় ফেরবার পথে কর্নওয়ালিস হোটেলে একবার টয়লেটে যেতে হয়েছিল পিকলুকে। তখন ক্যামেরাটা কয়েক মিনিটের জন্যে বাইরে রেখেছিল।

ভবনাথ ও'র নোটবইতে দু-একটা হিজিবিজি টানলেন। বললেন, "পিকলু, তুমি একবার তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে প্রফেসর মিহির সেনকে ডাকবে?" অন্য সময় হলে ভবনাথ নিজেই যেতেন, কিন্তু গতকালের পদস্খলনের ফলে পা-টা বেশ ফুলে উঠেছে, হাঁটা-চলার উপায় নেই।

মিহির সেনকে নিয়ে পিকলু পাঁচ মিনিটেই ফিরে এল।

সাহিত্যিক ভবনাথ নিজেই ডেকেছেন শুনে মিহিরবাবু খুব খুশী। এই মিহিরবাবুই একবার রাস্তায় ভবনাথকে বলেছিলেন, সর্দি সম্বন্ধে একখানা উপন্যাস লিখুন। ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু যেহেতু মিহিরবাবু সর্দি-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লেগে রয়েছেন, সে-হেতু তাঁর হাসি আসে না। বেথেসডা সর্দি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সাড়ে-তিন বছর কাজ করেছেন প্রফেসর সেন।

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "জলে ভিজলে কতক্ষণ পরে সর্দি হয়?"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রফেসর মিহির সেন বললেন, "একদম বাজে কথা—ঠাণ্ডা এবং জলেভেজার সঙ্গে সর্দির একবিন্দু সম্পর্ক নেই।"

"অ্যাঁ!" ঠাকুমা বিশ্বাসই করলেন না মিহির সেনকে। বললেন, "চিরকাল শুনে আসছি, ভিজে জামাকাপড় পরে থাকলে সর্দি হয়।"

মিহির সেন জোরের সঙ্গে বললেন, "মোটেই ঠিক নয়। পৃথিবীর বড় বড় সর্দি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ঠাণ্ডা লাগিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজিয়ে, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা লোককে ভিজে মোজা পরিয়ে দেখা হয়েছে—একটুও সর্দি হয়নি। সর্দি হয় ভাইরাস থেকে। ভাইরাস সংক্রান্ত যে বিজ্ঞান, তার নাম ভাইরোলজি।"

ভাইরাস কথাটা পিকলু শুনেছে বটে।

মিহিরবাবু বললেন, "অতি খুদে জিনিস এই ভাইরাস—অর্ডিনারি অনুবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখাই যায় না। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে দেখাও অনেক সাধ্যসাধনার ব্যাপার। একইঞ্চি লম্বা জায়গায় কতগুলো সর্দির ভাইরাস লাইন দিতে পারে জানেন?"

পিকলু আন্দাজ করে নিল, "একশ দেড়শ হবে।"

মিহির সেন চোখ বড়-বড় করে বললেন, "পঞ্চাশ হাজার। আমরা বলি ০·০৫ মাইক্রন।"

মিহির সেন ভবনাথকে রিকোয়েস্ট করলেন, "করাইজা সম্বন্ধে একখানা উপন্যাস লিখুন। বছরে একশ কোটি টাকার

বেশী জাতীয় লোকসান হয় এর থেকে, আমরা হিসেব করে দেখেছি। আমেরিকার বছরে ক্ষতি হয় ২৪০০০ কোটি টাকা।"

"করাইজা আবার কী?"

মিহির সেন বললেন, "ওহো! সাধারণ সর্দির ওইটাই বৈজ্ঞানিক নাম—আগে বলত নেজাল ক্যাটার।" মিহির সেন আরও ব্যাখ্যা করলেন, "বছরে ৭৫% লোকের অন্তত একবার সর্দি হয়, আর ২৫% লোকের অন্তত চার-পাঁচবার।"

এই সময় হরিময়বাবু গরম সোয়েটার পরে মাফলার জড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন। গরম কালেও এরকম অদ্ভুত ড্রেস দেখে হাসি আসছে পিকলুর। কিন্তু হরিময়বাবুর মুখটা খুব করুণ হয়ে আছে।

মিহির সেনের কথা শুনে হরিময়বাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "তাহলে চমচম পত্রিকার একখানা করাইজা সংখ্যা বার করা যাক। সেই সঙ্গে ভবনাথ সেনের বিশেষ উপন্যাস 'সর্দি থেকে সাবধান'।"

কথা বলতে বলতে হেঁচে উঠলেন হরিময়বাবু। হাঁচির ধাক্কা সামলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সর্দি কী করে হয়?"

মিহির সেন নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, "সর্দি প্রচারের সবচেয়ে সহজ উপায় হাঁচি। ছোট ছেলেরা আবার বড়দের থেকে অনেক বেশী সর্দি প্রচার করে। সর্দিওলা লোকের খুব কাছে গেলেও সর্দি হতে পারে।" এই বলে তিনি হরিময়বাবুর কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন।

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "সর্দির ভাইরাস কি দেহের বাইরে বাঁচে না?"

মিহির সেন বললেন, "বাঁচে না। তবে মাইনাস ৭৬° সেন্টিগ্রেডে ড্রাই-বরফের মধ্যে এক বছরের জন্যে সর্দি ভাইরাস রাখা যায়। অনেক দেশে মিলিটারিরা সর্দি নিয়ে গবেষণা করছে। যুদ্ধের সময় শত্রুসৈন্যর মধ্যে সর্দি ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা আছে।"

হরিময়বাবু আঁতকে উঠলেন। "ঠিকই তো! রণক্ষেত্রে সৈন্যরা হাঁচি সামলাবে না কামান বন্দুক ছুঁড়বে! আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝছি—কাল থেকে। অথচ এতদিন আমার কখনও সর্দি হয়নি।"

মিহির সেন বললেন, "মানুষ এবং শিম্পাঞ্জী ছাড়া অন্য কোনো জীবের সর্দি হয় না!"

"এতক্ষণ একটু আশার আলো দেখতে পেলাম।" রুমালে নাক মুছতে-মুছতে হরিময়বাবু বললেন, "ইস্কুলের কালীমাস্টার আমাকে যে গাধা বলতেন সেটা তাহলে কিছুতেই সত্যি নয়।"

ভবনাথ ততক্ষণ জানতে চাইছেন, "সর্দির ভাইরাস শরীরে ঢুকবার পরে সর্দির প্রকাশ হতে কত সময় লাগে?"

"ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলছেন?" মিহির সেন হেসে উত্তর দিলেন, "প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা। তবে শুনেছি, দু-চার জায়গায় এদের আরও তাড়াতাড়ি 'মানুষ' করবার চেষ্টা চলছে।"

"তাতে লাভ?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"লাভ, বলে লাভ," মিহির সেন উত্তর দিলেন। "বিশেষ করে সর্দিকে যেখানে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে সেখানে হাতে-হাতে ফল পেলে খুব লাভ।"

হরিময়বাবু করুণভাবে আবেদন করলেন, "সর্দির নাড়ি-নক্ষত্র তো আপনি জেনে বসে আছেন। সর্দি সারে কী করে একটু যদি বলে দেন। আমি খুবই 'সাফার' করছি।"

মিহিরবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "এখনও পর্যন্ত সর্দির কোনো চিকিৎসা বেরোয়নি। ওই যে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে বলে তার কারণ যাতে অন্য লোকের মধ্যে রোগটা না-ছড়ায়। বড়িই বলুন, মালিশই বলুন, নাকের ড্রপই বলুন—এসবে সাময়িক কষ্ট লাঘব হয়, কিন্তু সর্দি সারে না। কড়া ডোজের ওষুধে অনেক সময় ক্ষতি হয়—সর্দি আরও বেড়ে যায়।"

"কেন?" নাকে ওষুধ ঢালতে গিয়ে হরিময়বাবু থমকে দাঁড়ালেন।

মিহিরবাবু বললেন, "সিলিয়ার সর্বনাশ হয় কড়া ওষুধে। নাকের মধ্যে যে ছোট ছোট চুল থাকে তার নাম সিলিয়া। নাকের চুল সর্দি আটকায়।"

চোখ দুটো বড় বড় করলেন হরিময়বাবু। "নাকের চুল থাকলে আজ আমাকে এই কষ্ট পেতে হত না।"

মিহিরবাবু চলে গেলেন। ভবনাথ এবার হরিময়কে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের ওই সিংগারাভেলুর নাকে চুলগুলো কি খুব বড়?"

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে হরিময়বাবু বললেন, "ঠিকই! আপনি জানলেন কী করে? চোখে র‍্যাডার যন্ত্র লাগিয়ে নিয়েছেন নাকি? বাড়িতে বসে-বসেই সব দেখতে পাচ্ছেন!"

হরিময়বাবুকে পিকলুর ক্যামেরার ফিল্ম উধাও হবার ঘটনা বললেন ভবনাথ। হরিময়বাবু রীতিমত আশ্চর্য হলেন। বললেন, "ভৌতিক ব্যাপার মনে হচ্ছে! কালকে আমার ভাইপো একখানা ছবি উপহার দিয়েছিল। ওই আশ্চর্য ক্যামেরায় ছবিটা তুলল নিজামের কাঠি কাবাবের দোকানের সামনে। ছবিখানা আমি ডায়রির মধ্যে রেখেছিলাম। কিন্তু বাড়িতে এসে সহসম্পাদককে ছবিটা দেখাতে গিয়ে বোকা বনে গেলাম। ছবি উধাও।"

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "আর কিছু স্পেশাল ঘটেছে গতকাল?"

হরিময়বাবু টাক মাথা চুলকোতে লাগলেন। তারপর উত্তর দিলেন, "বুড়ো মানুষ তো। রামুর স্পেশাল ক্যামেরাখানা আমার হাতে ছিল। গপ্পো করতে-করতে ক্যামেরাখানা নিয়েই আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা খেয়াল হল মিনিবাস থেকে নামবার সময়। তা ভাবলাম, আজ সকালেই তো দেখা হচ্ছে। তখন দিয়ে দেবোখন।"

"দেখি একবার ক্যামেরাখানা," ভবনাথ বললেন।

হরিময় দুঃখের সঙ্গে বললেন,, "সে-গুড়ে বালি। বাড়িতে পৌঁছবার ঘণ্টা তিনকে পরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে মিস্টার সিংগারাভেলু আয়ার হাজির। ক্যামেরাটা তখনই নিয়ে গেলেন।"

"একলা এসেছিলেন?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

'ট্যাক্সিতে বসে ছিলেন সেই বিরাট কুস্তিগীর সায়েব। তিনি ভিতরেও ঢুকলেন না। হাজার হোক, ভাইপোর বন্ধু। আমি কতবার রিকোয়েস্ট করলাম, ঘরে বসে একটু ঘোল খেয়ে যান। কিন্তু ওঁদের নাকি কর্নওয়ালিস হোটেলেই ডিনার পার্টি আছে—দু-একজন অতিথি আসছেন।"

"আপনার ঘড়িতে তখন ক'টা?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

হরিময়বাবু বললেন, "আপনার মতো আমি সবসময় ঘড়ি ধরে কাজ করি না। তবে অন্তত পৌনে এগারোটা।"

ভবনাথ বললেন, "ওঁরা কর্নওয়ালিস হোটেলে আছেন তো? মিসেস এসকুইথ যে হোটেলটা চালান?"

হরিময়বাবু অত খবর রাখেন না। ভবনাথ এবারে ওঁর খাতায় কী সব হিজিবিজি টানলেন।

পিকলু ইতিমধ্যে কলকাতা-ভ্রমণের জন্যে রেডি হয়েছে।

মাথায় একটা চমৎকার রুশী টুপি পরেছে পিকলু। যা সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

পিকলুর ঠাকুমা এই সময় ঘরে ঢুকে স্বামীকে বকুনি দিলেন। "তোমার সব বাজে-বাজে কোশ্চেন রাখো। হরিময়বাবু, আপনি তো একলা মানুষ। অ্যাদ্দিন পরে ভাইপো ফিরল, তাকে নিশ্চয় খাওয়াতে ইচ্ছে করছে ?"

হরিময়বাবু বুঝতে পারছেন, পিকলুর ঠাকুমা কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন। তিনি একটু হাসলেন।

ঠাকুমা বললেন, "আজ রাত্রে আপনারা সবাই এখানে খাবেন।"

পিকলু জিজ্ঞেস করল, "রামুকাকুর বন্ধু, মিস্টার আয়ার ?"

দিদিমা বললেন, "ওঁকেও বলবে।"

হরিময়বাবু অনুরোধ করলেন, "যদি সম্ভব হয়, একটু গোস্ত-চচ্চড়ি করবেন। আমার ভাইপোটি খুব খেতে ভালবাসত—কিন্তু ক্যালকাটার কোনো হোটেলে আপনি গোস্ত-চচ্চড়ি পাবেন না।"

ভবনাথ সেন এখন আবার গড়গড়ার নল ধরে টানতে শুরু করেছেন। হুকুম সিংও হাজির হয়েছে।

হরিময়বাবু বললেন, "মিসটার আয়ারের ইচ্ছে আজ প্রথমেই ধাপা এবং ট্যাংরা ঘুরে আসবেন। এগুলো কি দেখবার জায়গা! দুর্গন্ধ!"

ভবনাথ বললেন, "যেখানেই যাও, যদি পারো, দুপুরে খাবার সময় একবার ফিরে এস।"

পিকলু বলল, "লাঞ্চের সময় আমরা কোথায় থাকব, কিছুই ঠিক নেই।"

"যদি না আসো, তাহলে একটা ফোন করে দিও," ভবনাথ সেন বললেন।

পিকলুর ঠাকুমা অবাক হয়ে গেলেন। "কর্তার আজ হল কী! নাতির সঙ্গে এত সময় ব্যয় করছেন!"

পিকলুরা বেরোবার সময় হঠাৎ ভবনাথ সেন জিজ্ঞেস করলেন, "পিকলু, ফটোগ্রাফি কে আবিষ্কার করেছিলেন?"

কুইজ মাস্টার জেনারেল পিকলুর এসব উত্তর মুখস্থ। হরিময়বাবুকে অবাক করে দিয়ে পিকলু বলল, "দুজন ফরাসী, গত শতাব্দীতে। একজনের নাম ডি-নিপ্সে। আর একজনের নাম ডাগুরে।"

"আঃ! কী সব নামের ছিরি। অমন সব গুণী লোকের বাপ-মা ছেলের একটা ভদ্র নাম খুঁজে পেল না!" বিরক্তি প্রকাশ করলেন হরিময়বাবু।

ভবনাথ বললেন, "কাছাকাছি ঐ সময়ে একজন ইংরেজও খুব দামী কাজ করেছিল।"

পিকলু চটপট বলল, "ফক্স ট্যালবট। তাঁর মাথায় হরিময়দাদুর মতো টাক ছিল—বুক অব নলেজে টাকের ছবি দেখেছি।"

নাতির সাধারণ জ্ঞানে খুব খুশী হলেন ভবনাথ। হরিময়বাবুও খুশী, তবে অন্য কারণে। তিনি বললেন, "তাহলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, টাক জিনিসটা হাসাহাসির ব্যাপার নয়—বড় বড় লোকের মাথাতেই টাক পড়ে। কী বলো হুকুম সিং ?"

হুকুম সিং ব্যাচারা কী করে! খোদ ডি-সি সায়েবের মাথাতেও টাক আছে। সুতরাং সে সঙ্গে-সঙ্গে হরিময়-বাবুর কথায় সায় দিল।

৭

"হ্যালো, লালবাজার পুলিস স্টেশন?" ভবনাথ টেলিফোনে কথা বলছেন।

বেয়াই মশায়ের গলার স্বর শুনে ওদিক থেকে পুলিশের মস্ত অফিসার এবং পিকলুর মায়ের বাবা মিস্টার রঞ্জন সেন খুব খুশী হলেন।

পিকলু ইতিমধ্যেই বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছে শুনে মিস্টার সেন আরও খুশী হলেন। বললেন, "গতকালই রাত্রে একবার ওখানে যাব ভাবছিলাম।"

"এলেন না কেন?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"আসব কী করে! বেরুতে যাচ্ছি, সেই সময় বিদেশ থেকে খবর এল কয়েকটি খারাপ লোকের কলকাতায় আসবার সম্ভাবনা রয়েছে।" সেই নিয়ে খুবই ব্যস্ত রয়েছেন পিকলুর ছোট দাদু। বিদেশী খারাপ লোকরা কী ক্ষতি করে যাবে কিছুই ঠিক নেই।

পিকলুর ছোট দাদু চমচমের বিজ্ঞাপনও দেখেছেন। সন্দেহ করছেন লেখাটা ভবনাথের। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই কি এবার আমাদের খারাপ লোকের খপ্পরে পড়াচ্ছেন?"

হা-হা করে হেসে উঠলেন, ভবনাথ। তারপর বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "পোস্টার পড়ে গেল—কিন্তু এখনও একটা লাইন লেখা হল না।"

রঞ্জন সেন বললেন, "আপনার কিছু চিন্তা নেই। চরিত্রের অভাব হবে না। আমাদের পুলিশ লাইনে বলে, লোক তিন রকম। কম খারাপ, বেশী খারাপ এবং একেবারে খারাপ! এর বাইরে লোক হয় না!"

কথাটা দ্রুত নোট বইতে লিখে নিলেন ভবনাথ। তারপর রঞ্জন সেনকে একবার দেখা করতে অনুরোধ করলেন। রঞ্জন সেন বললেন, "যদি পারি, দুপুরে কোনো সময়ে টুক করে ঘুরে আসব। বিদেশের গোপন মেসেজ না-পেলে আজ বেশ একটু হাল্কা মেজাজে গপ্পো করা যেত।"

ভবনাথ বললেন, "দুপুরে আসুন, না-আসুন, রাত্রে খেতে আসতেই হবে। গিন্নীর হুকুম। পিকলুর দিদিমাকেও সঙ্গে আনবেন।"

মেয়ের শাশুড়ীকে রাগাবার মতো সাহস নেই মিস্টার সেনের। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন।

ভবনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "ফটোগ্রাফির ব্যাপারে পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে এসব খোঁজখবর রাখে এমন কোনো লোককে জানেন?"

মিস্টার সেন বললেন, "আমার ভাইপো সুখেন্দু রয়েছে। জার্মান ক্যামেরা কোম্পানিতে কাজ করে। দু সপ্তাহের ছুটি কাটাতে এখানে এসেছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবখ'ন।"

এরপর কর্নওয়ালিস হোটেলে ফোন করলেন ভবনাথ। বললেন, "আপনাদের হোটেলে রাত এগরোটার সময় একটা পার্টি দিতে চাই।" ওরা বলল, "অন্য হোটেলে চেষ্টা করুন। এ-হোটেলে রাত দশটার মধ্যে ডাইনিং হল বন্ধ হয়ে যায়।"

৮

কর্ণওয়ালিস হোটেলে রামানুজকাকু ও মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার পিকলুদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

হুকুম সিংয়ের সেলাম পেয়ে মিস্টার আয়ার যে খুব খুশী হলেন, তা পিকলু লক্ষ্য করল। খুশী হবারই কথা —পৃথিবীতে কটা লোকই বা পুলিসের সেলাম পাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে? পিকলু নিজেও তো বোম্বাইতে পুলিস দেখলে ভয় পেত। এবারেই, লালবাজারে দাদুর কাছে কয়েকদিন থেকে তার ভয় ভেঙেছে।

পিকলু দেখল সেই দশাসই সায়েব হোটেল লাউঞ্জে বসে আছেন। ভদ্রলোক লক্ষ্য করছেন, এদের দলে সবাই বারবার রুমাল বার করে নাক মুচছে। রামানুজকাকুও সর্দিতে ছটফট করছেন। সায়েব হঠাৎ পিকলুকে বললেন, "ভেরি ব্যাড প্লেস! এখানে আসা মাত্রই সবার সর্দি হয়।"

বম্বের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার বদনাম পিকলুর ভাল লাগল না। সে প্রতিবাদ করল, "কই? আমার তো হয়নি?"

সায়েব হেসে বললেন, "আই অ্যাম স্যরি। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

এরপর ভদ্রলোক ব্যাগ থেকে সেই সেন্টের স্প্রে বার করলেন। এবং মজা করে পিকলুর গায়ে ফ্যাচ-ফ্যাচ করে স্প্রে করলেন। কী সুন্দর মিষ্টি গন্ধ। আঃ! পিকলু মুহূর্তের জন্যে আনন্দে চোখ বন্ধ করল।

ট্যাক্সির খোঁজে ওঁরা একসঙ্গে চৌরঙ্গীর দিকে বেরিয়ে পড়ল। পিকলু একবার হোটেলের টয়লেটে গিয়েছিল। টয়লেট থেকে বেরিয়ে দেখল, মিসটার আয়ার একটা ছবির প্যাকেট টেবিলে ফেলে গিয়েছেন। গতকালের তোলা ছবি-গুলো মনে হচ্ছে। আলাদা-আলাদা স্বচ্ছ পলিথিন খামে রঙীন ছবিগুলো রয়েছে। ছবিগুলো সে দেখছে, দেখতে দেখতে হঠাৎ সে অবাক হয়ে যাচ্ছে। মিস্টার আয়ার হঠাৎ ফিরে এসে ছোঁ মেরে প্যাকেটটা পিকলুর হাত থেকে নিয়ে নিলেন। বললেন, "মিস্টার পিকলু, চলুন—সবাই আপনার জন্যে ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করছে।"

টিফিন টাইমে পিকলুরা বাড়ি ফিরতে পারল না। ট্যাংরা পুলিস ফাঁড়ি থেকে হুকুম সিং ফোনে পিকলুর সঙ্গে ভবনাথের যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে ভবনাথ চিন্তিত মুখে ফোন নামিয়ে দিলেন।

পিকলুর ঠাকুমা বললেন, "ওরা তো বেশ হৈ-চৈ করছে। তুমি হঠাৎ বাংলা পাঁচের মতো মুখ করলে কেন?"

ভবনাথ আসল কারণটা বললেন না। মেয়েরা অল্পেতেই ভয় পেয়ে যায়। তাছাড়া পিকলু টেলিফোনেই কয়েকবার প্রচণ্ড জোরে হেঁচেছে।

ভবনাথ নিজের নোট বইটা নিয়ে আবার কীসব লিখতে লাগলেন। পিকলু বলেছে, আজ সকালে সায়েব তার গায়ে সেন্ট স্প্রে করেছেন। দু নম্বর ঃ পিকলু বলছে, দাদু তুমি বিশ্বাস করবে না. আমার মনে হল দিলখুশা কেবিনের ছবিটা থেকে কবিরাজী চিকেন কাটলেটের গন্ধ বেরুচ্ছে।

ভবনাথ নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু পিকলুর একটা গুণ—কখনও বানিয়ে কিছু বলে না। তা ছাড়া, বাগবাজার স্ট্রীটের একটা ছবি থেকে খাঁটি সরষের তেলের গন্ধ পেয়েছে পিকলু। ছবিটা তোলা হয়েছিল একটা বেগুনি-ফুলুরির দোকানের সামনে।

দুপুরের ভাত খাবার একটু পরেই পিকলুর ছোট দাদু রঞ্জন সেন রেডিও-টেলিফোনওয়ালা জীপ নিয়ে ভবনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে ক্যামেরাবিশারদ ভাইপো সুখেন্দু।

রঞ্জন সেন যে দু মিনিট গপ্পো করবেন তার উপায় নেই। রেডিও-টেলিফোনে দু' দুবার পিটার চার্লির ডাক পড়ল। মিঃ সেন বললেন, "আর পারা যায় না। দেশের যা অবস্থা। আমাদের দেশ যে এগিয়ে যাক এটা অনেক দেশ চায় না। তারা সব সময় ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, কী করে আমাদের ক্ষতি করা যায়। আমাদের কাজ তাই বেড়ে যাচ্ছে। গতকাল থেকে গোপন মেসেজ পেয়ে সমস্ত জায়গা তন্ন-তন্ন করে খোঁজ করছি।"

"বাইরের লোকরা আর কী করতে পারে?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"পারে না এমন কাজ নেই। এরা আগুন লাগাতে পারে,

পয়সা খরচ করে রায়ট বাধাতে পারে, হাওড়া ব্রীজের ক্ষতি করতে পারে, ট্রেন উল্টোতে পারে, ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন খারাপ করে দিতে পারে।"

আরও কথা হত। কিন্তু রেডিও-টেলিফোনে আবার পিকলুর দাদুর ডাক পড়ল। তিনি বললেন, "সুখেন্দু, তুমি অপেক্ষা করো—আমি মিনিট পনেরোর মধ্যেই আসছি।"

ভবনাথ বললেন, "ফটোগ্রাফির ব্যাপারটা আমি একটু জানতে চাই।"

সুখেন্দু বলল, "মাত্র দেড়শ বছরের মধ্যে এই বিদ্যেটির যা উন্নতি হয়েছে, ভাবা যায় না। ১৮২২ সালে নিপসে প্রথম ফটো তুললেন। তারপর ডাগুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবিষ্কার হল ডাগুরে পদ্ধতি। বাজারে প্রথম ক্যামেরা ছাড়লেন জিরো সায়েব ১৮৩৯ সালে। ১৮৪১ সালে ট্যালবট সাহেব তো ক্যালোটাইপ বার করলেন। তারপর থেকে হুড়-হুড় করে উন্নতি। ১৮৭১ সালে ম্যাডকস সায়েব বার করলেন ড্রাইপ্লেট প্রসেস। তারপর ১৮৮৮ সালে জর্জ ইস্টম্যান বার করলেন রোল ফিল্ম এবং কোডাক ক্যামেরা। এই কোডাক ক্যামেরা থেকেই অবিশ্বাস্য প্রগতি।"

ভবনাথ তাড়াতাড়ি লিখতে লাগলেন : "ফিল্মের পিছনে কালো কাগজ লাগানোর ব্যবস্থা হল ১৮৯৪ সালে, যাতে দিনের আলোতেও ক্যামেরায় ফিল্ম ঢোকানো যায়। বিখ্যাত বেবি ব্রাউনি বেরুলো ১৯০০ সালে।"

ভবনাথ এবার সুখেন্দুর মুখের দিকে তাকালেন। সুখেন্দু বলল, "প্রথম রঙীন ছবি তুললেন লিপম্যান ১৮৯১ সালে। তারপর এই ১৯৪৭ সালে বেরুল বিখ্যাত পোলারয়েড ক্যামেরা—বোতাম টেপার এক মিনিটের মধ্যে ছবি ছেপে ক্যামেরার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে। প্রথমে ছিল কেবল সাদা-কালো ছবি, তারপর বেরুল রঙীন ছবি। এক মিনিট সময় কমে এখন হয়েছে দশ সেকেণ্ড।"

ভবনাথ বুঝলেন, এই রকম ক্যামেরাতেই গতকাল পিকলুর ছবি তোলা হয়েছে।

"এরপর কী?" প্রশ্ন করলেন ভবনাথ

সুখেন্দু বলল, "এখন সবই সম্ভব। ত্রিস্তর ছবির ওপরে কাজ হচ্ছে। আরও কী হতে পারে ভগবান জানেন।"

ভবনাথ এবার সুখেন্দুর কানে-কানে কী এক প্রশ্ন করলেন। প্রশ্ন শোনা মাত্রই সুখেন্দু চমকে উঠল। "আপনি জানলেন কী করে? হায়েস্ট মিলিটারি ডিপার্টমেন্টে এরকম একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু যতদূর জানি এখনও সফল হয়নি।"

ভবনাথ কিছুই বললেন না। সুখেন্দু ভাবল, সাহিত্যিক মানুষ—মাথায় কখনও-কখনও অদ্ভুত খেয়াল চাপে।

একটু পরেই রঞ্জন সেন তাঁর জীপগাড়িতে চড়ে ভবনাথের বাড়িতে ফিরে এলেন। ভবনাথ সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে ঘরের এক কোণে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ওঁদের গোপন কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলছে। পিকলুর ঠাকুমা দূর থেকে ওই দৃশ্য দেখে হেসে ফেললেন। "দুই বেয়ায়ে কী এত গোপন কথা হচ্ছে?"

পিকলুর ঠাকুমা চায়ের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রঞ্জন সেন বললেন, "আমাকে এখনই ছুটতে হবে—এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। প্রতিটা মুহূর্ত এখন মূল্যবান।"

পিকলুর ঠাকুমা একটু বিরক্তই হলেন। রঞ্জন সেন বললেন, "রাগ করবেন না। রাত্রে তো স-গিন্নী আসছিই!"

মাঝখান থেকে সুখেন্দুরও চা খাওয়া হল না। সেও কাকাবাবুর গাড়িতে ফিরে গেল।

সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটার সময় পিকলু ও হরিময়বাবু ফিরল হুকুম সিংয়ের সঙ্গে।

হরিময়বাবুর মুখ চুন। তাঁর ভাইপোর তোলা সমস্ত ছবি চুরি হয়ে গিয়েছে। "বিদেশীদের কাছে কলকাতার কোনো মানসম্মান রইল না," দুঃখ করলেন হরিময়বাবু।

ধাপা, ট্যাংরা থেকে শুরু করে বড়বাজারের ময়লা ডিপোর ছবিও তোলা হয়েছিল আজ। দু একজন পাবলিক আপত্তি তুলতে গিয়েছিল। কিন্তু হুকুম সিং সঙ্গে থাকায় শেষ পর্যন্ত কোনো অসুবিধে হয়নি।

সঙ্গে পুলিস থাকতেও কী করে ছবি চুরি হল কেউ বুঝতে পারছে না। হুকুম সিং বলল, "পকিট মার নয়—ছিনতাই।" একটা পাগলা কোত্থেকে এসে মিস্টার আয়ারের হাত থেকে ছবি নিয়ে ছুট দিল।

রামানুজকাকুর মন খারাপ। কিন্তু সবচেয়ে মুষড়ে পড়েছেন মিস্টার আয়ার।

"সামান্য ক'খানা ছবি গিয়েছে তো কী হয়েছে? কাল সকালে আবার ছবি তোলা যাবে।" রামানুজ বলেছিলেন মিস্টার আয়ারকে। কিন্তু ভদ্রলোক এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ট্যাক্সি চড়ে হোটেলে ফিরে গিয়েছেন। বাধ্য হয়ে রামানুজকাকুও হোটেলে গিয়েছেন। একটু পরেই দুজনে একসঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে আসবেন।

এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা যে হরিময়বাবুর পক্ষে কষ্টকর তা ভবনাথ জানেন। তিনি গিন্নিকে বললেন, "একটু টমাটো জুস দাও।"

টমাটো জুস খেতে খেতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেল। খিদেয় হরিময়বাবু ছটফট করছেন। কিন্তু বিশিষ্ট অতিথিদের এখনও দেখা নেই। কর্নওয়ালিস হোটেলে একবার ফোন করা হল, কিন্তু কোনো খবর পাওয়া গেল না। ওদের নাম করতেই কে যেন টেলিফোন কেটে দিল।

পিকলুর দাদুরও দেখা নেই। যদিও লালবাজারের দিদিমা বিকেলবেলাতেই চলে এসেছেন। তিনি রান্নাঘরে ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করছেন। পুলিশদাদুর ওপর রেগেমেগে দিদিমা বললেন, "ওঁর স্বভাবই ওই। ওঁর সঙ্গে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না এই জন্যে।"

ঠাকুমা এখন কিন্তু রাগ করলেন না। ভবনাথ সম্বন্ধে বললেন, "উনি তো এক কাঠি ওপরে। নেমন্তন্ন করেছে ওঁর টালিগঞ্জের মাসতুতো বোন, উনি ভুল করে আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন শ্রীরামপুরের মেসোর বাড়িতে!"

রাত অনেক হয়েছে। আর অপেক্ষা করা যায় না। পিকলুর ঘুম এসে গিয়েছে। ভবনাথ কোনো কথা বলছেন না। চিন্তিত হয়ে তিনি ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন।

আর দেরি করা সম্ভব নয়। ওঁরা খেতে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময় বাইরে জীপের আওয়াজ হল।

রঞ্জন সেন হাসিমুখে ঘরে ঢুকে বললেন, "বদমাসগুলোকে অ্যারেস্ট করে হাজতে পুরে আসতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল। পুলিশ কমিশনার, হোম সেক্রেটারি এবং চীফ মিনিস্টারকেও ব্যাপারটা জানাতে

হল। সবাই খুব খুশী—ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছে। যদিও খবরের কাগজে এখন কিছু বলা চলবে না—কয়েকটা দিন গোপন রাখতে হবে। আরও অ্যারেস্ট হতে পারে।"

হরিময়বাবু কিছুই বুঝতে পারছেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "কাদের অ্যারেস্ট করলেন?"

রঞ্জন সেন বললেন, "শত্রুভাবাপন্ন এক দেশ পাঠিয়েছিল ওই লয়েড এবং সিংগারাভেলুকে উইথ টপ ডিফেন্স প্রোজেক্ট। ওরা নতুন এক টপ সিক্রেট ক্যামেরা বার করেছে স্মেলোমেটিক ০০১; এই ক্যামেরায় ছবি ছাড়াও গন্ধ ধরা পড়ে। বিজ্ঞানের আশ্চর্য এক আবিষ্কার—কিন্তু ব্যাটারা ওই দিয়ে আমাদের শহরের গন্ধ-ম্যাপ তৈরি করে নিচ্ছিল।"

"অ্যাঁ! বলেন কী।" হরিময়বাবুর ফেণ্ট হয়ে যাবার অবস্থা। "আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি।"

"বুঝতে পারবে কী করে? তোমার নাক তো সর্দিতে বন্ধ!" আচমকা উত্তর দিলেন ভবনাথ।

রঞ্জন সেন ও ভবনাথ দুজনে ফিসফিস করে কথাবার্তা বললেন। তারপর ভবনাথ গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন, "আমি যা ভয় পাচ্ছিলাম—ঠিক তাই। তোমার সর্দিটা সাধারণ সর্দি নয়—ওই দুষ্টু সায়েবটা সঙ্গে করে সর্দির ভাইরাস নিয়ে এসেছিল। স্পেশাল টাইপের ভাইরাস—ছড়িয়ে দেবার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রচণ্ড সর্দিতে তোমার নাক বুজে গেল। তুমি সন্দেহ করতে পারলে না যে, ওরা সিক্রেট ক্যামেরায় গন্ধের ছবি তুলছে। এই সব গন্ধ মারাত্মক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

"অ্যাঁ! আমি যে ভাবলাম সায়েব আমার গায়ে সেণ্ট স্প্রে করল।" হরিময়বাবুর এবার অজ্ঞান হবার অবস্থা।

রঞ্জন সেন বললেন, "সিংগারাভেলু আয়ার ইণ্ডিয়ান সিটিজান, কিন্তু অনেক দিন দেশের বাইরে থেকে স্মাগলিং করছে। এবার এই ক্যামেরার গন্ধ-রঙীন ছবি তোলাবার জন্যে বিদেশী শত্রু অনেক টাকা দিয়ে তাকে নিয়োগ করেছে। তবে পালের গোদা ওই লয়েড।"

"আমার ভাইপো! আমার ভাইপো!" কাতরভাবে কেঁদে উঠলেন হরিময়বাবু। "বংশের মুখ ডোবাল, সেও এর মধ্যে আছে নাকি?"

রঞ্জন সেন বললেন, "ও ব্যাচারা নিরপরাধ। কিন্তু একটুর জন্যে বেঁচে গেল। রামানুজবাবু অর্ডিনারি একটা পোলারয়েড ক্যামেরা নিয়ে এসেছিলেন—ইচ্ছা পুরনো স্মৃতিজড়ানো কিছু জায়গার ছবি তোলা। লয়েডের টপ সিক্রেট ক্যামেরাও একেবারে একই রকম দেখতে। ছবিও একই রকম উঠবে—কিন্তু সঙ্গে ধরা পড়বে গন্ধটা। এয়ারপোর্টে পিকলু এবং হরিময়বাবুর কথাবার্তা শুনেই লয়েড ও সিংগারাভেলু কুমতলবটা আঁটে। ওরা বুঝতে পারে, সঙ্গে হুকুম সিং থাকলে ওদের ছবি তুলতে কোনো রকম অসুবিধে হবে না। যেখানে যা-খুশি তুলে নিয়ে ওরা কলা দেখিয়ে চলে যেতে পারবে। একলা বিদেশীর পক্ষে কলকাতার পথেঘাটে ছবি তোলা একটু শক্ত।"

হরিময়বাবুর গলা দিয়ে ঘড়ঘড় করে আওয়াজ বেরুচ্ছে। "সত্যিই খারাপ লোকের খপ্পরে পড়েছিলাম আমরা!"

রঞ্জন সেন বললেন, "আপনার ভাইপোটিও খুব চালাক-চতুর নয়।"

"সে তো বটেই, সে তো বটেই। চালাক চতুর হলে কখনও নিজের দেশ ছেড়ে চলে যায়!" মন্তব্য করলেন হরিময়বাবু।

রঞ্জন সেন বললেন, "ওরা যে কায়দা করে ক্যামেরাটা পাল্টে নিয়েছে—তা বুঝতে পারেনি রামানুজ। তার ওপর রামানুজের নাকেও প্রচণ্ড সর্দি। ছবির গন্ধ-টন্ধ তেমন পাচ্ছে না—ফলে বেচারার কোনো রকম সন্দেহ হয়নি। সিংগারাভেলু জানত সর্দি কমাবার আগেই ছবিগুলো ওরা হাত সাফাই করবে।"

"সর্দি হয়নি মাত্র দুজনের," চিৎকার করে উঠলেন হরিময়বাবু। "ওই দুষ্টু সিংগারাভেলু আয়ার এবং পিকলুর।"

"সিংগারাভেলু আয়ার নয়—ওর আসল নাম এ বি সি ডি রাও। অনন্ত বাসুদেবন চন্দ্রিকাপুরম দেবরাজ রাও। ভাইরাস ছাড়বার সময় যাতে ওর কিছু না হয়, সে জন্যেই তো নাকে বড়-বড় চুল রেখেছে। আর পিকলুর সর্দি না-হওয়াটা ছোটখাট একটা অ্যাক্সিডেণ্ট। ঘন ঘন সর্দি হয় ওর—হয়তো ওর দেহের ভাইরাস শত্রুপক্ষের ছড়ানো নতুন ভাইরাসকে দেহে সুবিধে করতে দেয়নি। সামান্য ঘটনা। কিন্তু তার থেকেই ওদের বিপদের সূত্রপাত।"

ভবনাথ বললেন, "পিকলু যদি গতকাল ওর ছবিতে ঘেমো গন্ধের কথা না-বলত তা হলে আমার সন্দেহই হত না।"

হরিময়বাবু বললেন, "কী সর্বনাশ বলুন তো! দুর্দান্ত শত্রুপক্ষ আমাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে এভাবে আমাদের দেশের ক্ষতি করছিল। ধন্য আপনাকে—এ-যাত্রায় খারাপ লোকগুলো ধরা পড়ল।"

রঞ্জন সেন বললেন, "ধন্যবাদ আমার একটুও পাওনা নয়। পুরো ক্রেডিট ভবনাথবাবুর। উনিই গত রাত থেকে একের পর এক রহস্যের পয়েন্ট সাজিয়ে যাচ্ছেন। পিকলুর ছবিতে গন্ধ কেন? মিস্টার সিংগারাভেলু রাত এগারোটার সময় কেন হরিময়বাবুর বাড়ি থেকে ছবি ফিরিয়ে নিতে এলেন? ট্যাক্সিতে কেন ওই লয়েড সায়েব? কর্নওয়ালিশ হোটেলে দশটার পরে ডাইনিং রুম বন্ধ হয়ে যায়—অথচ সিংগারাভেলু কেন হরিময়বাবুকে মিথ্যে কথা বলল, হোটেলে রাত সাড়ে এগারোটায় ডিনার পার্টি আছে। পিকলুর ব্রাউনি ক্যামেরা থেকে কেন ফিল্ম উধাও হল? নিশ্চয় এমন কারও ছবি ওর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে যে নিজের প্রচার চায় না। সিংগারাভেলুর নাকে অত বড়-বড় চুল কেন? ওর কেন সর্দি হল না? যে হরিময়বাবুর লাইফে কখনও সর্দি হয় না, হঠাৎ তাঁর কেন সর্দি হল? তাছাড়া ভবনাথবাবু কিছুদিন আগে হঠাৎ স্বপ্ন দেখেছেন ঃ নতুন ধরনের ক্যামেরা বেরিয়েছে যাতে রঙ ছাড়াও গন্ধ ধরা পড়ে। স্বপ্নেই নতুন এই ক্যামেরার নাম দিয়েছিলেন স্মেলোমেটিক! সরল মনে সাহিত্যিক ভবনাথ ভেবেছিলেন, নতুন এই ক্যামেরায় নতুন সম্ভাবনার দিক খুলে যাবে। কেবল সাজগোজ করেই তখন ছবি তোলা যাবে না—সঙ্গে স্নো এবং সেণ্ট মাখতে হবে। সামনে সুগন্ধী ফুলের গুচ্ছ থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু যা মিস্টার সেন ভাবতে পারেননি—তা হলো দুষ্টদের হাতে পড়ে এই আবিষ্কারের অপব্যবহার হতে পারে। বিষাক্ত গ্যাসের ছবি তুলে পাঠালে—সেই ছবি দেখতে গিয়ে মানুষ খুন হতে পারে।"

বিস্মিত হরিময়বাবু উত্তেজনার বশে ঘনঘন টাকে হাত দিতে লাগলেন। তারপর ভবনাথকে বললেন, "এ-সম্মান তাহলে সত্যিই আপনার প্রাপ্য। সময় থাকতে আপনিই মিস্টার রঞ্জন সেনকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাই খারাপ লোকগুলো ধরা পড়ল।"

রঞ্জন সেন বললেন, "দুষ্টুগুলো ধরা পড়ল—কিন্তু

...রটা পাওয়া গেল না। আমার ডিটেকটিভরা ওকে ঘিরে ফেলেছে বুঝতে পারা মাত্রই ওই ব্যাটা লয়েড গোপন ক্যামেরাটা ধড়াম করে মাটিতে ফেলে ভেঙে দিল।"

"ছবিগুলোও তো হাওড়া ব্রীজের সামনে ছিনতাই হয়ে গেল," আফশোস করলেন হরিময়বাবু।

"ছিনতাই নয়। আমার প্লেন-ড্রেস সাব ইনসপেকটর ওটা ওইভাবে ছিনিয়ে নেয়। তারপরেই তো আমি নিজে কর্ন-ওয়ালিস হোটেলে গিয়ে লয়েডকে অ্যারেস্ট করি। আদালতে এইসব ছবি উঠবে—তবে সিক্রেট আদালত, অফিসিয়াল সিক্রেট আইন অনুযায়ী বিচার হবে। বাইরে খুব বেশী জানানো হবে না।"

হরিময়বাবু চোখ বন্ধ করে মা কালীর উদ্দেশে তিনবার প্রণাম জানালেন। ভাইপোটা যে অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছে তার জন্যে তিনি মায়ের কাছে দেড়সের চমচম মানত করলেন। রঞ্জন সেন বললেন, "ও'র জন্যে চিন্তা করবেন না। ও'র স্টেটমেণ্ট এখন থানার অফিসাররা লিখে নিচ্ছে।"

হরিময়বাবু এবার ভবনাথকে বললেন, "আপনাকে একটা ...ত মালা পাঠাব। ঘরে বসে-বসে এত বড় রহস্য উদ্ঘাটন করলেন আপনি।"

ইংগিতে নাতিকে দেখিয়ে ভবনাথ বললেন, "মালাটা পিকলুরই প্রাপ্য। ও যদি এত সজাগ না হত, তা হলে কিছুই ধরা পড়ত না। আজও সে সাহস করে ভোরবেলায় কর্ন-ওয়ালিস হোটেলে অন্য ছবিগুলো শুঁকে ফেলেছিল এবং আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল যে, দিলখুসা কেবিনের ছবি থেকে কবিরাজী কাটলেটের গন্ধ ছাড়ছে। ওর ফোন না পেলে সন্দেহটা আমার মনে দানা বাঁধত না। আমি লালবাজারে খবর দেবার কথা ভাবতেই পারতাম না।"

বেজায় খুশী হয়ে বিদায় নেবার সময় হরিময়বাবু ঘোষণা করলেন, "শুধু মালা নয়—পিকলু যাতে পদ্মশ্রী পায় তার জন্যে আমি চমচমের পরবর্তী সংখ্যায় কড়া সম্পাদকীয় লিখব।"

"সম্পাদকীয় কেন? সোজাসুজি সরকারকে লিখলে হয়," বললেন রঞ্জন সেন।

গম্ভীরভাবে হরিময় বললেন, "যদ্দুর জানি, একুশ বছরের কমে কাউকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয় না। সুতরাং চিঠির জন্মো নয়। বয়সটা কমিয়ে দশে আনতে হলে চমচমের জ্বালাময়ী এডিটোরিয়াল ছাড়া কাজ হবে না।"

ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার

পিসে-পিসী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বড় পিসে
কালো মিশমিশে।
বড় পিসী
টুকটুকে রঙ,
ছিপিখোলা আতরের শিশি।

বড় পিসে
ওজন ভারী সীসে।
মুখ যে বেজার কিসে
বোঝে না তা কেউ মোটে।

ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

মনোজ বসু

ভূতের মাছ-ধরা

মাছের বড় আকাল। ঈশান জেলে যখন-তখন গাঙে গিয়ে পড়ে, নানান কায়দায় জাল ফেলে। ওঠে শেওলা-ঝাঁঝি, ওঠে শামুক-গুগ্‌লি। মাছের আঁশখানা অবধি ওঠে না।

গাঙের ধারে ঘর। চর ধু-ধু করে। জাল শুকোয় সেখানে. পাড়ার ছেলেপুলে সব খেলা করে। পাইকার এসে শুধায় ঃ মাছ-টাছ কী পড়ল গো? ঈশান বুড়ো আঙুল নাড়ে। নিত্যি-দিনের একই জবাব ঃ কিছু না, লবডঙ্কা। গাঙ-খাল ছেড়ে সমস্ত মাছ দেশান্তরী হয়েছে কোথায়।

তা বলে হাত-পা কোলে করে বসে থাকাও যায় না। খাবে কী? সেদিন অমাবস্যা। রাত-দুপুরে ধড়মড় করে উঠে ঈশান বাইরে গেল। কোটালে গাঙের জল বেড়েছে, জল বাড়লে মাছও আসে। আর, গাঙ আজ পুকুরেরই মতন শান্ত। এমনটা কালেভদ্রে কদাচিৎ ঘটে। আশায়-আশায় সে জাল বের করল। খানিকটা বেয়ে দেখবে। কপালে কী ওঠে, দেখা যাক।

জাল ঘুরিয়ে খেওন ফেলতে যাচ্ছে—আরে আরে, কী কাণ্ড! তারার আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে, তালগাছের মতন দীর্ঘ এক ছায়ামূর্তি ওপারের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে জলের উপরে হাঁটতে হাঁটতে মাঝগাঙে এসে দাঁড়াল। থ হয়ে গেছে ঈশান। মূর্তি হঠাৎ পাগলের মতন পা-দাপাদাপি শুরু করল। নিথর গাঙে সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ, ডাঙার উপর আছড়ে পড়ছে। খেওন ফেলবে কি, ঢেউয়ের ধাক্কায় ঈশান খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই পারে না আর। ধনুক থেকে-ছোঁড়া তীরের মতো মূর্তি এইবার গাঙের মাঝখান ধরে ছুটল—ছুটে যায়, পিছনে সঙ্গে-সঙ্গে ঢেউয়ের তোলপাড়। কী সব প্রকাণ্ড ঢেউ—সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙা কোথায় লাগে! মাছ মারার বারোটা বেজে গেল—যত মাছ তাড়িয়ে-তুড়িয়ে দরিয়ায় নিয়ে ফেলবে. মনে হচ্ছে।

সকাল না-হতেই ঈশান দুকড়ি-মাঝির কাছে ছুটল। দুকড়ির বদলে অনেকে বলে তেমাথা-মাঝি। বুড়ো হয়ে গিয়ে মাথা বড্ড কাঁপে, সেজন্য দু হাঁটুর মধ্যে মাথা চেপে দুকড়ি বসে থাকে। দেখায় যেন পাশাপাশি তিনটে মাথা। সেই থেকে নাম ছড়িয়ে গেছে তেমাথা-মাঝি। বাদাবনের সকল খবরাখবর বুড়োর নখদর্পণে। ঈশান তার কাছে গিয়ে পড়ল। "মাছ সব তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উপায় কী হবে বলো মাঝি।"

বৃত্তান্ত শুনে দুকড়ি চমক খেল। "সর্বনাশ, মেছোভূত এসে জুটেছে। মাছ ধরতে গিয়ে যারা ডুবে মরে, তাদের মধ্যে ভূত হয় কেউ কেউ। মানুষের ঘেঁষ সইতে পারে না। সে-কালে বাদাবনে থাকত, প্রাচীন মুরুব্বীদের কাছে গল্প শুনেছি। এখন সুন্দরবন কেটেকুটে প্রায় তো শেষ করে আনল। মাঝি-মাল্লা বাউলে-কাঠুরে সরকারী বাবুরা—মানুষ সর্বক্ষণ কিলবিল করে। মেছোভূতরা তাই বাদাবন ছেড়ে দূর-দরিয়ায় সরে পড়েছে। একটা কী গতিকে এসেছে, বুঝতে পারছি।"

ঈশান সকাতরে বলে, "ভূত তাড়ানোর ফিকির কিছু বলে দাও। নয়তো না-খেয়ে শুকিয়ে গুষ্ঠিসুদ্ধ মারা পড়ব।"

দুকড়ি বলে, "ভূতের ওঝা আমি নই। সে তোমাদের নটবর ওস্তাদ। তাগাতাবিজ বেঁধে ধুনেবাণ-সর্ষেবাণ ছেড়ে ভূতপেত্নী নাজেহাল করে। তার কাছে চলে যাও।"

নটবর তো অঞ্চলছাড়া। তাহলে উপায়?

ঈশান খপ করে দুকড়ির পা জড়িয়ে ধরল, "পাদপদ্মে শরণ নিলাম মাঝিঠাকুর। বাঘ-কুমির সাপ-শুয়োর ভূতপেত্নী দানো-পোড়ো—বাদাবনের সকলের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম। তাড়ানো না-ই হল—ভূতের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে দাও, দু-বেলা পেটে খেয়ে যাতে বাঁচতে পারি।"

"বেশ, ভাব করে ফেল মেছোভূত মশায়ের সঙ্গে। জমে
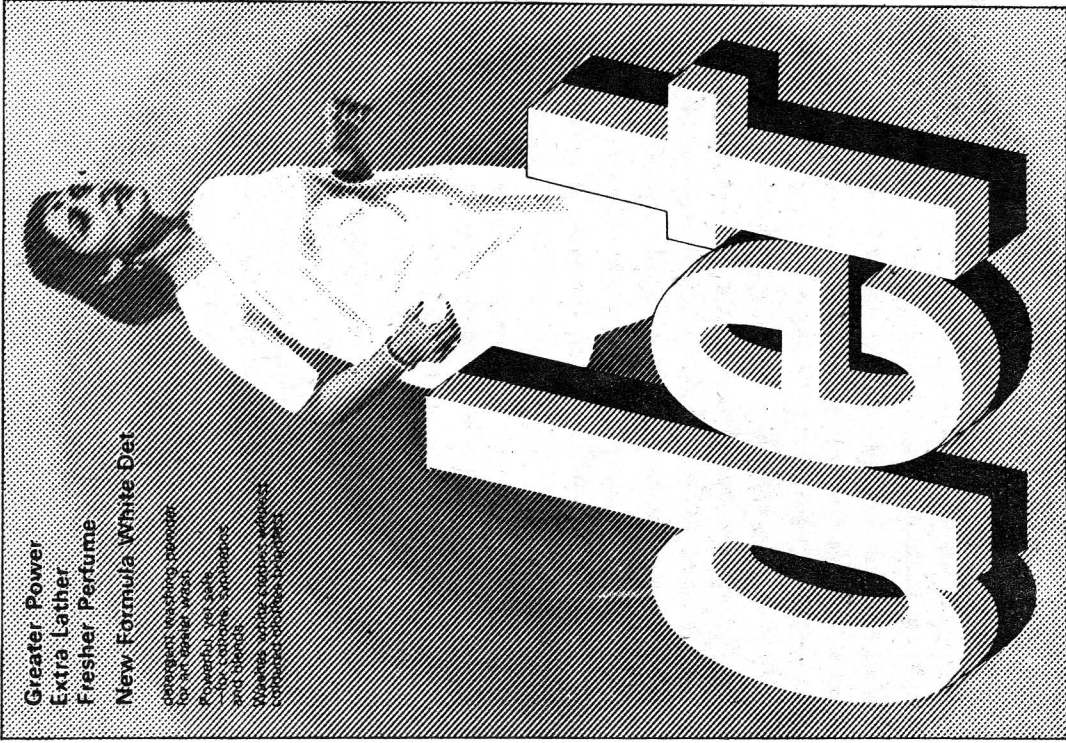
Greater Power
Extra Lather
Fresher Perfume
New Formula White Det
det
সবচেয়ে শক্তিশালী কাপড় ধোয়ার পাউডার
নতুন ফরমুলা ডেট
বেশী শক্তিশালী
অতিরিক্ত ফেনা
সতেজ সুগন্ধ
ধবধবে সাদা, ডেটের সাদা
Shilpi dm 11b/76 ben

হবে তো সুখের অন্ত থাকবে না।”

ভ্রূ কুঁচকে দুকড়ি ভাবছে। বলল, “মাছ ভালবাসেন ওঁরা —আমাদের মত ভাজা-মাছই ভাল খান। অথচ নিজেরা ভেজে নেবেন, সে উপায় নেই। অপদেবতা হয়ে আগুন-লোহা ছুঁতে পারেন না। আমি বলি কি, মেছোভূত মশায়কে যত্ন করে ভাজা-মাছের নেমন্তন্ন খাওয়াও। কী খুশী হবেন দেখো। সর্ষের তেলে নয় কিন্তু—সর্ষেবাণ মেরে ভূত তাড়ায়, সর্ষের নামে ওঁরা বেজার হন। নারকেল তেল কিম্বা তিলের তেলে ভাজা হবে।”

ঈশান বলে, “মাছ খাওয়াব, কিন্তু জালে তো মাছই পড়ছে না।”

“দূরদূরান্তরের হাটেঘাটে গিয়ে কেনো—যে-দাম লাগে লাগুক। কাজ হবে, আমি বলছি। দু-চারখানা মাছে হবে না—ভরপেট খাওয়াতে হবে। দশ-বারো সের অন্ততপক্ষে।”

জাল-দাঁড় বন্ধক দিয়ে ঈশান মাছ কিনে আনল। তাছাড়া উপায় কী? ঝুড়ি-ভরতি ভাজামাছ চরের কিনারে রেখে এসে ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিল।

ভোরবেলা গিয়ে দেখে, বহুদর্শী দুকড়ি ঠিক যেমনটা বলেছিল, ঝুড়ি শূন্য, কাঁটাগুলো পর্যন্ত ফেলে যাননি। দুকড়ির কাছে ঈশান গিয়ে খবর বলল। শুনে সে মহাখুশী, ভূতমশায় পরিতুষ্ট হয়েছেন বোঝা গেল। আজ রাত্রেও খাইয়ে দাও। খরচার ভাবনা করতে গেলে হবে না। মাছের পরিমাণ আরও কিছু বাড়াও। কাল দশ সের ছিল, লাগাও আজ পনের সের।”

তাই হল। পনের সের মাছও মেছোভূত অবলীলাক্রমে শেষ করে গেছে। বুড়ো দুকড়ি আহ্লাদে যেন টগবগ করে ফুটছে। বলে, “আজকে আধমন ভেজে ফেল। তারও এক টুকরো পড়ে থাকবে না দেখো।”

চক্ষু কপালে তুলে ঈশান বলে, “সর্বনাশ! আমি এদিকে ফতুর হয়ে যাচ্ছি সেদিকটা একবার দ্যাখো।”

দুকড়ি হেসে ঈশানের পিঠে থাবা মেরে বলল, “তিনদিন হয়ে যাচ্ছে। আর দিতে হবে না, মজা লুঠবে এইবার।”

ভাজা মাছ খেয়ে খেয়ে মেছোভূতকে লোভে ধরেছে। নিশিরাত্রে দরজায় টোকা।

ঘরের ভিতর থেকে ঈশান বলে, “কে?”

মেছোভূত বলে (নাকি সুরে বলছে, ওদের যা নিয়ম), “মাছ দিঁলিনে আঁজ?”

দুকড়ি যেমন-যেমন শিখিয়ে দিয়েছে—ঈশান সকাতরে বলল, “গাঙের সমস্ত মাছ তাড়িয়ে বের করেছেন, নিত্যি নিত্যি মাছ কোথা পাব হুজুর? মাছ ধরে আমার ভাতের জোগাড় হয়, না-খেয়ে এবারে আমরাই বাড়িসুদ্ধ মারা পড়ব।”

মেছোভূত বলে, “আমি মাছ ধরে দেব, আমায় তুই ভাজা-মাছ খাওয়াবি। রাজী?”

“হ্যাঁ, হুজুর।”

মাছ ধরে জেলেরা হাপরে রাখে। বড় হাপরটা তুলে নিয়ে মেছোভূত অদৃশ্য। অনতিপরে ফিরল, হাপর-বোঝাই মাছ। চরের উপর ঢেলে দিল। বলে, “দাঁড়িপাল্লা বের কর্। সমান দুটো ভাগ হবে, এক ভাগ তোর, এক ভাগ আমার। আমার ভাগ এক্ষুনি কড়াইতে চাপিয়ে দে। খিদে পেয়ে গেছে।”

চক্ষু কপালে তুলে ঈশান বলে, “এত মাছ একলা খাবেন?”

খলখল করে হেসে ভূত বলে, “কটাই বা? খাওয়ার মজাটা দেখিস না তোরা—কেমন করে খাই, কতক্ষণ লাগে।”

ঈশানের বউ রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি মাছ চাপিয়ে দিল। ভাজা-মাছের গন্ধে চারিদিক আমোদ করেছে। কেওড়াগাছের ডালের উপর বসে ছায়ামূর্তি পা নাচাচ্ছে। পাইকার এসে

ইতিমধ্যে ঈশানের ভাগের মাছ কিনে নিয়ে গেল।

চরের উপর আসন-পিঁড়ি হয়ে ভূত গবগব করে খাচ্ছে। মাছের পাহাড় দেখতে দেখতে নিঃশেষ। সামনে দাঁড়িয়ে ঈশান তাজ্জব দেখছে। মেছোভূত মুখ তুলে দরদভরা সুরে বলল, "সবই তো বেচে দিলি। এমন মাছ নিজেরা একটু মুখে দিলিনে?"

ঈশান নিশ্বাস ফেলে বলল, "লোভ তো হয়—কিন্তু না-বেচলে চাল-নুন-তেল কিনি কী দিয়ে? হুজুরের একখানা মাত্র পেট ছেলেপুলে নিয়ে মোটমাট আমার আড়াই গণ্ডা।"

ভূত বলে, "কাল মাছ ধরার সময় তুই সঙ্গে যাবি। হাপরে কতই বা মাছ ধরে—বড় জালা একটা সঙ্গে নিস। আমি জাল ফেলতে ফেলতে যাব, পিছনে থেকে তুই জাল ঝেড়ে ফেলবি। দুনো-তে দুনো ধরা যাবে দেখিস, জালা মাছে ভরে যাবে।"

জালাও জোটানো গেছে—খুব বড় আকারের। জালার মুখে দড়ি বেঁধে ঈশান গাঙের উপর খোঁটার সঙ্গে বেঁধে রাখল। স্রোতের টানে হেলছে-দুলছে জালা। রাত দুপুরে ভূতের ডাক পেয়ে ঈশান জালার কাছে চলে যায়, জালার দড়ি হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ায়।

"আয়।" বলে ছায়ামূর্তি জাল কাঁধে গাঙে নেমে পড়ল। জলের উপর দিয়ে পায়ের পর পা ফেলে যাচ্ছে, আমরা যেমন ডাঙার উপর দিয়ে হাঁটি। পায়ের পাতাটুকুও ডোবে না, আলগোছে কেমন গাঙে ভেসে রয়েছে।

খানিকটা গিয়ে পিছনে তাকিয়ে ভূত দেখে, ঈশান নেই! হাঁক দিল, "ডাঙায় কেন-রে—হল কী?"

"যাই কেমন করে হুজুর?"

"আমি যাচ্ছি দেখতে পাসনে? পিছু পিছু চলে আয়।"

ঈশান বলে, "আপনি আর আমি! ওজন-টোজন নেই—আপনি তো একখানা ছায়া। গাঙে হাঁটতে গেলে আমি জলের নীচে তলিয়ে যাব।"

"তা বটে!" মেছোভূত প্রণিধান করল, "পোড়াকপাল তোমার। দিনরাত গুচ্ছের হাড়মাংসের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। ইচ্ছে হল আমি জলে হাঁটলাম, ইচ্ছে হল আকাশে উড়লাম। তোমার সে-সব হবার জো নেই, তোমার জন্যে চাই শক্ত মাটি।"

তরতর করে কাছে এসে ঈশানের আপাদমস্তক নজর করে দেখল। বলে, "খালি পা কেন? জুতো পরে আয়।"

ঈশান বলল, "পরনের একখানা কাপড়ই জোটাতে পারিনে তা পায়ে জুতো পরে নবাব-আমিরের মতন খটখট করে বেড়াব!"

ভূত শুধায়, "জুতো না থাক পায়ে কী পরে বেড়াস তুই?"

"কিছু না। এমনি, খালি পায়ে—"

একটুখানি ভেবে মেছোভূত বলে, "হাঁড়ি-মালসা-সরা যা হোক কিছু নিয়ে আয় দিকি। এক জোড়া।"

রান্নাঘরে খুঁজে পেতে সরা মিলল। দুটোই আছে। সরা হাতে নিয়ে মেছোভূত থুঃ থুঃ করে জলে ছুঁড়ে দিল। ডোবে না সরা—অবাক কাণ্ড! স্রোতের টানে ভেসেও যায় না। ডাঙার কাছে একটা জায়গায় স্থিরভাবে রয়েছে। ভূতের হুকুমে ঈশান পা দুটো দুই সরায় রাখল। সরার সঙ্গে পা সেঁটে গেল। মেছোভূতের পিছু-পিছু চলল এবার ভাসন্ত-জালা কোমরে-বাঁধা অবস্থায়। কিছুমাত্র অসুবিধে নেই, ঠিক যেন জুতো পায়ে ডাঙার উপর দিয়ে হাঁটছে। দড়ির টানে জালাও ভেসে ভেসে আসছে।

হাঁটছে তো হাঁটছেই। হাঁটা বলা চলে না তাকে, দৌড়ানো। না, তারও বেশী। কী এক অলক্ষ্য আকর্ষণে ভূতের পিছু-পিছু নক্ষত্রবেগে সে ছুটেছে। এ কোথায় নিয়ে এল—মহাসমুদ্র, ঢেউ ভাঙছে। কোন দিকে কিছু নজরে আসে না—খালি জল, জলের ঢেউ। ভূত দ্রুত হাতে খেওনের পর খেওন ফেলছে। জল থেকে জাল তুলে পিঠের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সেখানে ঈশান—বাছাই ভাল মাছগুলো তাড়া-তাড়ি জালের বার করে নিয়ে জালায় ফেলে। জাল থেকে যেই মাত্র হাত সরাল, মেছোভূত সঙ্গে সঙ্গে আবার খেওন ফেলে। অত বড় প্রকাণ্ড জালা দেখতে-দেখতে বোঝাই।

ঈশান বলে, "আর ধরছে না। ঘরে যাওয়া যাক এইবারে হুজুর।"

চরের উপর মাছ ঢেলে ফেলে ভাগাভাগি হল। ঈশানের ভাগ থেকে খাবার মাছ চাট্টি আলাদা রেখে বাদবাকী হাপরে তুলল। মেছোভূতের ভাগ বড় ঝুড়িতে। ঈশানের বউ কড়াইতে তেল চাপিয়ে এসেছে। ঈশান আর সে ঝুড়ি ধরা-ধরি করে কড়াইয়ের উপর উপুড় করে দিল। ভূত মশায়ের চোখের উপর। পাইকারে ইতিমধ্যে ঈশানের হাপর মাছির মতন ছেঁকে ধরল। মহানন্দে ঈশান দর হাঁকিছে। মাছ ভাজার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মেছোভূত অদূরে কেওড়া গাছের ডালের উপর পা দোলাচ্ছে। আহার সাঙ্গ করে তবে গাঙ পার হয়ে যাবে।

সাত-আট দিন খাসা কাটল। মাছ ভেজে ঈশানের বউ পাহাড় বানিয়ে দেয়, মেছোভূত সেই পাহাড় নিমেষে উড়িয়ে দিয়ে হাসি-খুশিতে গাঙ পার হয়ে চলে যায়। আর নিজের ছেলেপুলের পাতে বউ এক-টুকরোর বেশী দু-টুকরো দিতে পারে না। নিজ অংশের মাছ সবই প্রায় বেচে দিয়ে ঈশান গৃহস্থালির আর দশটা জিনিস কেনে। ঝুড়ির দুটো-চারটে মাছ যদি সরানো যায়, ভূতে তা কখনো টের পাবে না। বউ এই সমস্ত ভাবছে। ছেলেপুলেদের তাহলে কিছু বেশী করে মাছ খাওয়ানো যাবে।

চুপিসারে আজ বউ ঝুড়িতে কাঁঠাল আঠা মাখিয়ে রেখেছে। ভাগাভাগির পর ভূতের মাছ যথারীতি ঝুড়িতে তুলে নিয়ে তেলের কড়াইতে ঢালল। কেওড়া-ডালে বসে ভূত মশায় দেখে আর স্ফূর্তিতে পা দোলায়। সব মাছ কিন্তু কড়াইয়ে পড়েনি, কাঁঠাল আঠায় ঝুড়ির সঙ্গে কিছু আটকে আছে। ভূত চলে গেলে মাছগুলো খুঁটে নেওয়া যাবে।

খাওয়া শেষ করে ভূতের খুঁতখুঁতানি যায় না। পেটে একটু যেন খিদে রয়ে গেছে। অথচ পুরো ঝুড়ি মাছ—অন্য দিন যা থাকে আজকেও তাই। যাই হোক, গেল সে-রাত। পরের রাতেও আবার অমনি। রোগে ধরল নাকি ভূত-মশায়কে—ঝুড়ি ভরা মাছে খিদে মরে না, বদ্যি দেখিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে?

ঘরের ছাঁচতলায় ঝুড়িটা উপুড় করা রয়েছে। কী মনে হয়েছে—ভূত গিয়ে ঝুড়ি তুলে ধরল। বটে রে!

ছায়ামূর্তির মুখে চোখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ছুটে গেল সে গাঙে। মাঝগাঙে জলের উপর গিয়ে দাঁড়াল। পায়ে জল ছিটোচ্ছে ডাঙার দিক লক্ষ করে। ঈশানের ঘরের দিকে। একবার ডান পায়ে ছিটোচ্ছে, একবার বাঁ পায়ে।

কী কাণ্ড, জলতলে মেঘগর্জন। রক্ষে নেই কোনমতে, চালাকির পরিণাম। জল উঠছে আকাশমুখো—উঁচু হতে হতে মনুমেণ্টের মতো কুতুবমিনারের মতো হয়ে উঠল। জলের থাম দশ বারোটা লাইনবন্দী। সেই থাম পেঁচিয়ে আরও জল উপর-মুখো উঠছে। মোটা হতে হতে সবগুলো থাম হুড়াস করে এক-সঙ্গে ভেঙে পড়ল ডাঙার উপর। যেখানটা চর ছিল, চরের কিনারে ঈশান জেলের ঘর ছিল, সেখানে আজ অকূল নদী। সুন্দরবনে যদি যাও, জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিতে পারব।

ছবি এঁকেছেন শৈবাল ঘোষ

মেজকর্তার খেরোখাতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র
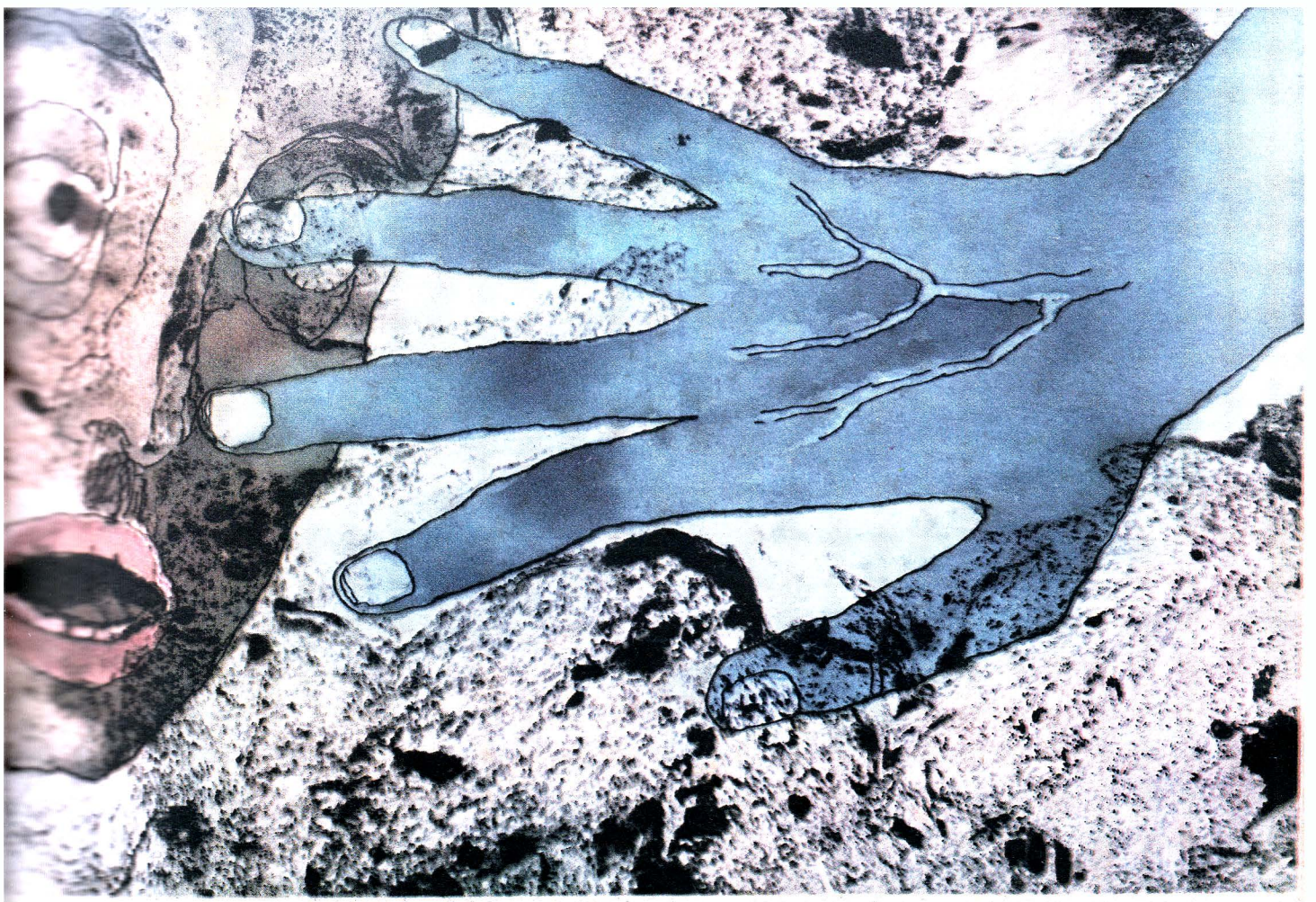
ঠিক পিলপিল করে যেন কালো সুড়সুড়ে পিঁপড়ের সার বেরিয়ে আসছে।

চোখটা একবার, দুবার, তিনবার রগড়ালাম।

না, ভুল কিছু দেখিনি। আলোটা বেশ আবছা গোছের হলেও, যা দেখছি সেটা দৃষ্টিবিভ্রম ধরনের কিছু নয়।

সত্যিই ওদিকের টেবিলে রাখা মোটা সেকেলে বাঁধানো খাতাতে কাচের শেলফের ওই ধরনেরই একটা পুরনো বাঁধানো ঢাউস বই থেকে একসার কালচে পিঁপড়ের মত কী যেন সুড়সুড় করে ঢুকছে।

কী ওগুলো? পিঁপড়ে? কীরকম পিঁপড়ে?

উইপোকা ছাড়া পিঁপড়ে কি পুরনো বইয়ের মধ্যে বাসা বাঁধে, না, এক বই থেকে আরেক বইয়ে অমন পিলপিল করে গিয়ে ঢোকে?

হঠাৎ হাঁফানি রুগীর খনখনে কাসির মত একটা আওয়াজে চমকে উঠলাম।

হাঁফানি রুগীর কাসি নয়, ডান দিকের দেয়ালে ঝোলানো মান্ধাতার আমলের দেয়াল-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার আওয়াজ। কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরের জরায় আওয়াজটা অমন কেসো রোগীর মত হয়েছে।

আওয়াজ যেমনই হোক, ঘড়িটা যে এখনো চলছে এইটেই আশ্চর্য! ও ঘড়ির একটা বাজা মানে অবশ্য প্রায় পৌনে দুটো। দিনে পনেরো মিনিট করে পিছিয়ে পড়া এখন ওর দস্তুর। তিন দিন আগে আমি নিজেই যখন দম দিয়েছি, তখন হিসেব মত পঁয়তাল্লিশ মিনিট পিছনে পড়েছে নিশ্চয়।

পৌনে দুটো!

কিছু রঙরূপ এমনও আছে সময় হার মানে যার কাছে!

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-PS.56-140 BG

মাথার ভেতর যেন একটা বিদ্যুতের চমক লাগল।

হ্যাঁ, এই তো সময়! সমানে তিন রাত্রি জাগার পর ঠিক রাত দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে যা দেখবার দেখতে পাব!

কিন্তু তা কি পেয়েছি?

দেখবার মধ্যে তো দেখেছি এক বই থেকে এক সার খুদে পিঁপড়ের আরেক বইয়ে গিয়ে ঢোকা!

এ ছাড়া আর কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না।

এদিক ওদিক সব দিক তাকালাম। বেশী দূরে তাকাবার তো নেই। প্রায় মান্ধাতার আমলের বাড়ির ছোট্ট একটা ঘর। ছাদের কড়িকাঠগুলো একটু লাফ দিয়ে হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যায়। নেহাত সেকেলে বর্মা টীকের বলে সে-কড়িকাঠ ভেঙে ছাদটা এখনো ধ্বসে পড়েনি। দেয়ালগুলোর কিন্তু যেটুকু দেখা যায়, নোনা লেগে পালিশ-পলস্তরা ঝরে গিয়ে যেন পুরনো ইঁটের দাঁত বের করে আছে।

সে দেয়ালের কতটুকুই বা অবশ্য দেখা যায়। যেদিকে চাও, মেঝে থেকে ছাদ অবধি সব পুরনো বইয়ে ঠাসা কাঠের তাক আর আলমারি।

এই বইয়ের গাদা বাদে ঘরের মধ্যে একটি টেবিল, দুটি টিনের চেয়ার, যেটাতে হেলান দিয়ে বসে আছি সেই একটা সেকেলে আরাম-কেদারা, আর দক্ষিণ দিকের দেয়ালে তিন-কাল-গিয়ে-এক-কালে-ঠেকা দেয়াল ঘড়িটা।

এ ছাড়া ঘরের ছাদ থেকে একটা বিজলী-বাতির ডুমও ঝোলানো আছে বটে, কিন্তু তার ধুলো-জমা কাচের খোলস পেরিয়ে যে মিটমিটে আলোটুকু আসে, তাতে ঘরটা আলো আঁধারির বেশী স্পষ্ট হয় না।

নিজের অজান্তে একটু তন্দ্রার ঘোর কি এসেছিল? আর সেই ঘোরের মধ্যে ঘরের আলো-আঁধারিতে অর্ধ-স্বপ্নগোছের কিছু দেখলাম না কি?

যাই হয়ে যাক, সরাসরি একবার পরীক্ষা না করলেই নয়।

কেদারা থেকে উঠে টেবিলের ধারের চেয়ারটায় বসে তার ওপরকার বইটা খুললাম।

অস্ফুট চিৎকারটা আর চাপতে পারলাম না তারপর!

সেই! সেই ছবি!

আর তার তলায় ছাপার অক্ষরে সেই এক লেখা ......"

ওই পর্যন্ত পড়েই থামতে হল। তার পরে কী আছে তা জানতে হলে খেরোখাতাটার হলদে-হয়ে-আসা পিঁজতে-শুরু করা পাতাটা সন্তর্পণে ওল্টাতে হবে।

পাতা ওল্টাতে সত্যিই ভয় করছে।

ভয়ঙ্কর কী সেখানে লেখা থাকতে পারে শুধু সেই জন্যে ঠিক নয়, মোটেই কিছু পাব কিনা সেই সংশয়ে আর উদ্বেগেও।

এ-খেরোখাতাকে কিছু মাত্র বিশ্বাস নেই। সত্যিই সে-রকম কিছু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

এত ধুকপুকুনি নিয়ে পাতা উল্টে হয়ত দেখব এতক্ষণ যা পড়ছিলাম, পরের পাতায় তা বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেছে।

মহাভারতের মত বিরাট এলোমেলো এই খেরোখাতার যতটুকু পর্যন্ত এখনো হাঁটকাতে পেরেছি, তাতে এরকম হতাশ দু-একবার হতে হয়নি এমন নয়।

হারিয়ে-যাওয়া গল্পের খেই এ-খাতার গোলকধাঁধার মধ্যে আবার আচমকাও যে কখনো-কখনো ফিরে পেয়ে গেছি, সে-কথাও অবশ্য স্বীকার করব।

পাতাটা ওল্টাতে গিয়ে এই থমকে পড়ার মধ্যে এই খেরোখাতার ইতিহাসটাও একটু বোধহয় মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

হ্যাঁ, এই সেই খেরোখাতা, কলকাতার সব চেয়ে লম্বা দৌড়ের পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাসের একটা খালি সীটে যেটা লাল শালুর পুঁটলি বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল। বাসটা তখন ভি আই পি রোড ধরে এয়ারোড্রোমের দিকে যাচ্ছে। পুঁটলি-টার কোনো দাবিদার না পেয়ে টার্মিনাসে পেঁছোবার পর কণ্ডাক্টার সকলের সামনে সেটা খুলে দেখেছে। সোনাদানা গোছের দামী কিছু নয়, ছেঁড়া-খোঁড়া ময়লা বেরঙা কাগজের একটা হাতে-সেলাই পুরনো খেরোখাতা মাত্র পাওয়া গেছে তার ভেতর। একটু উল্টে-পাল্টে কাগজগুলোয় জড়ানো সাবেকী ছাঁদের যে হাতের লেখা চোখে পড়েছে, তা যে দলিল-পত্রের নয় তা বুঝতে দেরি হয়নি। ভাল করে নেড়ে চেড়ে ভেতরে নাম-ঠিকানা কিছু পেলে মালিকের কাছে পেঁছে দেবার কড়ারে খাতাটা আমি চেয়ে নিয়েছিলাম তারপর।

যতটা ঘাঁটাঘাঁটি এ পর্যন্ত করতে পেরেছি, তাতে কোথাও পাঠাবার মত নাম-ঠিকানা এখনো কিন্তু পাইনি। পেয়েছি শুধু মেজকর্তা বলে একটা নাম। তিনি যে কোথাকার কবে-কার কে, কিছুই বলার উপায় নেই। এইটুকু শুধু জানা গেছে যে, বিষয় আশয় কিছু থাকার দরুন অবস্থাপন্ন হলেও সে-সব না-দেখে একটি নেশা নিয়েই তিনি দিন কাটাতেন। সে-নেশা হল ভূত-শিকার! সেই ভূত-শিকারের নেশায় তিনি চারি-দিকে চর লাগিয়ে রাখতেন বলা যায়। কোথাও এতটুকু একটা খবর পেলেই তোড়জোড় করে ছুটতেন ভূতের খোঁজ নেবার জন্যে।

ঢাউস খেরোখাতাটা মেজকর্তার সেই সব ভূত-শিকারের বৃত্তান্তে ঠাসা। কিন্তু তাঁর সাবেকী ছাঁদের লেখা যেমন জড়ানো আর অস্পষ্ট, তাঁর বর্ণনা-টর্নাও তেমনি এলো-মেলো। তার ওপর খাতার অনেক পাতাই ছেঁড়া-খোঁড়া আর আলগা। কোথাকার লেখা যে কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে, খুঁজে পাওয়াই দায়।

তবু পড়তে-পড়তেই যেন একটা নেশা ধরে গেছে। এখন খেরোখাতার মধ্যে কোথাও সঠিক নাম-ঠিকানা খুঁজে পাওয়া-টাই ভয়ের ব্যাপার! নাম-ঠিকানা পেলেও মনের জোর করে খাতাটা এখন ফেরত দিতে পারব কিনা সন্দেহ। কারণ মেজ-কর্তার এই ছেঁড়াখোঁড়া খেরোখাতায় তাঁর জড়ানো অস্পষ্ট সেকেলে হাতের লেখার জঙ্গলে এমন সব অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া ভুতুড়ে গল্প ছড়িয়ে আছে, যা খুঁজে-পেতে উদ্ধার করাটাই এখন আমার ধ্যানজ্ঞান হয়েছে।

এবারের এই বৃত্তান্তটাই ধরা যাক্। জলা জংলা কি অজ পাড়াগাঁর পোড়ো দালান কোঠা-টোঠা নয়, এই কলকাতা শহরেরই একটি পুরনো বাড়ির বইয়ে ঠাসা একটা লাইব্রেরি-ঘর গোছের। সেই ঘরের অদ্ভুত-কিছু ব্যাপার শুনে সেখানে রাত জাগতে গেছেন মেজকর্তা। মেজকর্তা গলির নাম করেননি, কিন্তু গলি আর বাড়িটার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে সেটা উত্তর কলকাতার কোনো আদ্যিকালের ঘিঞ্জি, সিপাইযুদ্ধের আগেকার সব বসতির পাড়া বলেই মনে হয়।

সেই পাড়া, সেই গলি আর সেই বাড়ি বা লাইব্রেরি-ঘরের অস্তিত্ব এখন আর নেই নিশ্চয়। মেজকর্তা যখন সেখানে গেছেন, তখনই বাড়িটার জরাজীর্ণ অবস্থা। আর লাইব্রেরি-ঘরটা তো একটু জোরে নাড়া দিলেই যেন হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়তে পারে।

তবু এমন একটা ঘরে রাত কাটাতে গেছলেন কেন

মেজকর্তা? কীরকম ভূতের সন্ধানে?

মামুলী খোনাগলার কি চোখের পলকে বিদঘুটে চেহারায় দেখা-দেওয়া আর মিলিয়ে-যাওয়া ভূতটুত নয়, তাঁকে নাকি একেবারে উদ্ভুটে এক ভুতুড়ে কাণ্ডের খবর দিয়েছে তাঁর চর।

কী সে কাণ্ড, সে চর তা জানে না, বা বলতে পারেনি, কিন্তু পরপর তিন রাত্তির যে কেউ ওই বইঠাসা ঘরে কাটাতে না পেরে একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে, সে-কথাটা বলেছে জোর দিয়েই।

মেজকর্তা তাই গোঁ ধরে এই ঘরে রাতের আস্তানা করেছেন এ কদিন।

প্রথম দিন কেটেছে, তারপর দ্বিতীয় দিনও। আজ হলেই তিন রাত কাটবে।

কিন্তু কাটবে কী ভাবে!

মেজকর্তা আগের দু রাতের কথা কিছু লেখেননি, শুধু এই ভুতুড়ে লাইব্রেরিতে রাত জাগতে আসার ভূমিকাটুকু করে একেবারে তিন দিনের দিন রাত পৌনে দুটোর ঘটনা দিয়েই শুরু করেছেন।

কিন্তু শুরু করে যতদূর এসেছেন, পরের পাতায় তার জের ঠিকমত টেনেছেন কি?

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধার মধ্যে কাটিয়ে বেপরোয়া হয়ে পাতাটা উল্টেই ফেললাম এবার। সঙ্গে-সঙ্গে আপনা থেকে বেরিয়ে-আসা অস্ফুট চিৎকারটুকুও চাপতে পারলাম না।

ওপিঠে মেজকর্তা আগের পাতার জের টানতে ভোলেননি। কিন্তু প্রথমে যা চোখে পড়ল, তা লেখা-টেখা নয়, একটা ছবি। মেজকর্তার হাত পাকা না হোক, ছবিটার আসল কাজ তাঁর আঁকায় হাসিল হয়েছে।

ছবিটা সামনের দিকে আঙুল-তুলে-দেখানো একটা হাতের কঙ্কালের। এমন ভাবে আঁকা যে, আঙুলটা যেন যে পড়ছে তার দিকেই তোলা মনে হবে।

"হ্যাঁ, সেই ছবি!" এই বলে ছবিটার নীচে থেকে মেজকর্তার হাতের লেখা আবার শুরু হয়েছে, আর তার নীচে ছাপার অক্ষরের সেই শাসানি!

"যে-ই হও, এ-ছবি দেখে এ-লেখা যখন পড়েছ, তখন তোমার আর নিষ্কৃতি নেই। আমি হলধর পাল। নিজের আসল সাধ মিটিয়ে আসতে পারিনি। কিন্তু তুমি, তুমি আমার আশ মেটাবে। না-মেটালে, যেখানেই পালাও না কেন, আমার এই হাত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। ভিড়ের মাঝে থাকবে, তোমার জামার তলায় পিঠের ওপর আঙুল বোলাবে, একলা ঘরে ঘুমের মধ্যে ঝুলবে তোমার চোখের সামনে। লিখতে বসলে তোমার হাতের সঙ্গে কলম চেপে ধরবে, আর আয়নার সামনে দাঁড়ালে দেখবে তার মধ্যে থেকে হাত-ছানি দিচ্ছে। যা বলছি, মন দিয়ে তাই শুনে নাও। উত্তর-পূব কোণের আলমারিটা খোলো। তার নীচের তাকে ছাপানো একটা বইয়ের বাণ্ডিল পাবে। বইয়ের নাম 'বচনামৃত'। কবিতার বই। আমার লেখা। হরচন্দ্র রায়ের বাঙ্গাল গেজেট বইটাকে গাল দিয়েছে। লিখেছে,—"পাল মশাই লাঙ্গল চালাইলেই পারেন, তৎপরিবর্তে কলম চালাইবার নিমিত্ত অমৃত গরল হইয়াছে।" এ-গালাগালের জবাব সমাচার দর্পণে বার
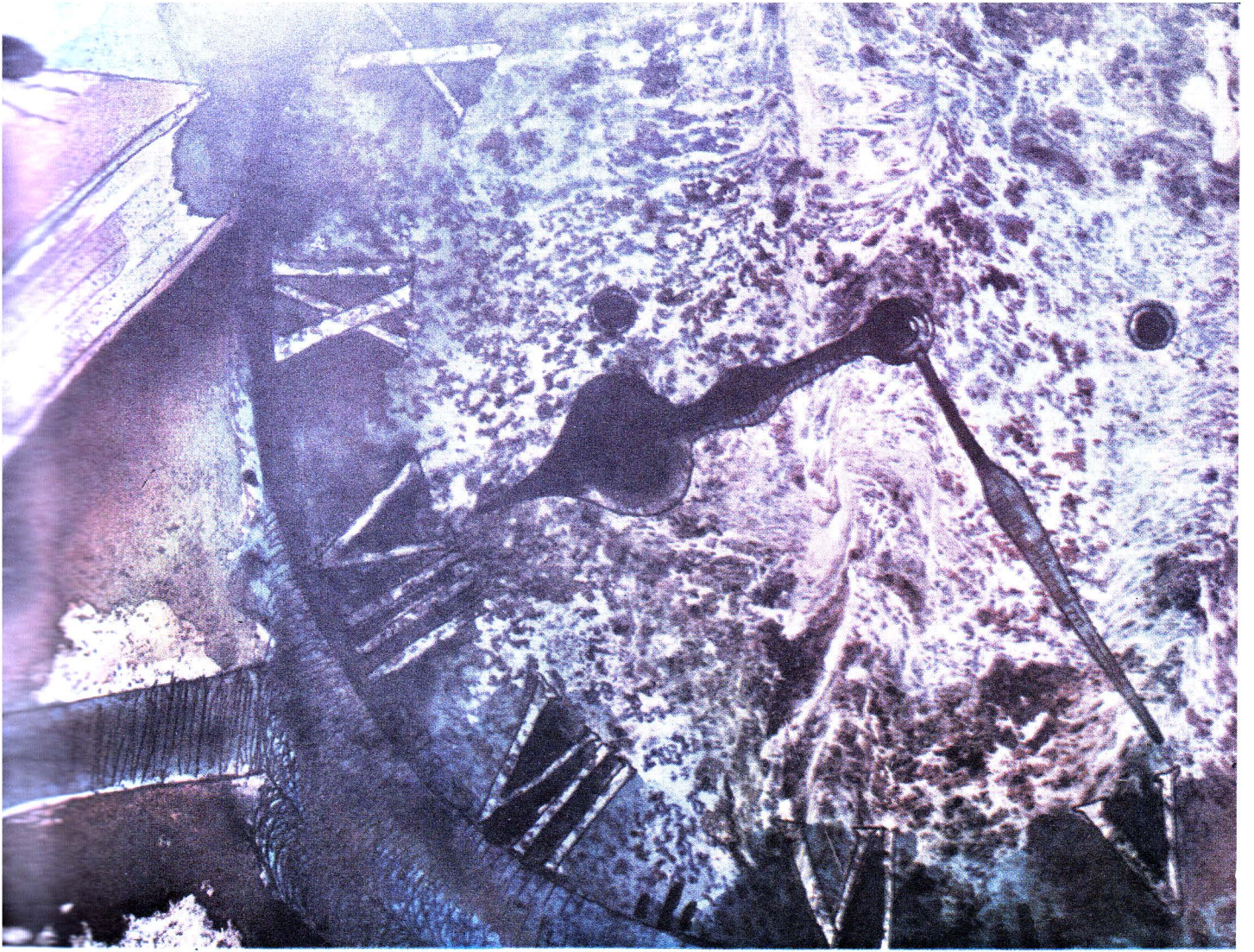
জমাতে হবে। কালই বই নিয়ে গিয়ে দেখা করবে মাশম্যান সাহেবের সঙ্গে। নইলে......"

শাসানিটা সব তুলে দিয়ে মেজকর্তা আবার সেই কঙ্কাল-হাতটা এঁকে তার তলা থেকে লিখেছেন—

"ওপরে নীচে কংকাল-হাত-আঁকা এই শাসানি পড়ে ভয় যত পেলাম, তাজ্জব হলাম তার চেয়ে বেশী।

এ-ছবি আর এ-লেখা আমি আগেও এই পাঠাগারেই দেখেছি। একবার দুবার নয়। বেশ কয়েকবার। আগের দু রাত্রে নানা শেল্‌ফ থেকে যে কটা বইই টেনে বার করেছি, তা খুলে ধরতে প্রথমে এই ছবি-আঁকা এই লেখা-ছাপা পাতাটাই দেখা গেছে।

কিন্তু আজ রাত্রে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বইটায়, এ-লেখা আর ছবি আসে কী করে!

আজ রাত্রে এ ঘরে ঢুকে শেল্‌ফের বইগুলো নাড়াচাড়া করতে-করতে ওই বইটা পেয়েছিলাম্। সেই একেবারে আদ্যিকালের বই, আঠারশো বাইশে ছাপানো সংস্কৃত হাসির নাটকের অনুবাদ 'হাস্যার্ণব'।

বইটা ভাল করে উল্টে-পাল্টে দেখে পরে পড়বার জন্যে টেবিলের ওপর রেখেছিলাম। বইটার কোথাও ও-ছবি বা শাসানির চিহ্নমাত্র ছিল না। তাহলে ও-লেখা ও-বইয়ের মধ্যে এল কী করে?

রাত পৌনে দুটোয় যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখেছি তারই ভেতর কি এ-ব্যাপারের ব্যাখা আছে? পিলপিল করে পিঁপড়ের সারের মত শেল্‌ফের বইটা থেকে এ বইয়ের মধ্যে যা ঢুকতে দেখেছি, তা কি তাহলে এই লেখা আর ছবির ভুতুড়ে অক্ষর? হলধর পাল কি তাঁর 'বচনামৃত'-এর নিন্দের শোধ নেবার জন্যে এমনি করে এখনো মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

কিন্তু আমি কী করতে পারি? ঘরের উত্তর-পুব কোণে কোনো আলমারি আর নেই। হলধর পালের 'বচনামৃত'-এর কোনো কপিও কোথাও খুঁজে পাইনি। আর পেলেই বা করতাম কী? 'বাঙ্গাল গেজেটি'র নামই এখনো শুনি। আসল নাম ছিল 'উইক্‌লি বেঙ্গল গেজেট'। লোকে বলত 'বাঙ্গাল গেজেটি'। সেইটেই নামি প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক। কিন্তু সে-কাগজের একটা নমুনাও কোথাও পাওয়া যায় না।

আর 'সমাচার দর্পণ' আঠারশো আঠারো থেকে মরে-বেঁচে আঠারশো একচল্লিশ পর্যন্ত কোনরকমে টিঁকে থেকে একেবারে শিঙে ফুঁকেছে। সে-কাগজ এখন পেতাম কোথায়?

না, এমন আজগুবী আবদার শুনতে এখানে থাকারই কোনো দরকার নেই।"

মেজকর্তার লেখা ওখানেই শেষ হয়েছে। তাঁর শেষ কথাগুলো পড়ে সন্দেহ হয় যে, তিনি সেই রাত্রেই বোধহয় ও-ঘর থেকে ভয়ে ভয়ে সরে পড়েছেন।

হলধর পালের কঙ্কাল-হাত কি তারপর তাঁর পিছু নিয়েছে? তাঁর খেরোখাতায় এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো হদিশ পাইনি।

ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কোঠারীর বস্ত্রসম্ভার
মজবুত, টেকসই,
আভিজাত্যে মনোহর
কোঠারীর বস্ত্রসম্ভার ঐতিহ্যের সৌন্দর্য ও আধুনিক সুরুচির এক অপূর্ব সমন্বয়। তাইতো আপনি সবসময় সবখানেই অতুলনীয় পোশাকে অনন্য ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল।
কোঠারীর পলিয়েস্টার (কটন মিশ্রিত) শার্টিং ও স্যুটিং (৮০/২০, ৬৭/৩৩ ও ৪৮/৫২ মিশ্রণ) আর সাড়ী।
কোঠারীর রাজেশ্বরী—সুপারফাইন হাই টুইস্ট ভয়েল সাড়ী।
কোঠারীর মলমল, লংক্লথ, পপলিন ও লন ব্লীচড, মার্সারাইসড, ডায়েড ও প্রিন্টেড।
KOTHARI'S FABRICS
কোঠারী [মাদ্রাজ] লিমিটেড
কোঠারী বিল্ডিংস, ২০, নাঙ্গাম্বক্কম হাইরোড, মাদ্রাজ ৬০০ ০৩৪।
হাউস অব কোঠারী—সেরা কাপড় করে তৈরী
national-396 B
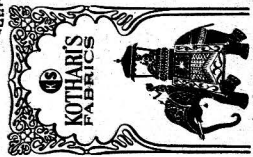
চেতলার কাছে

লীলা মজুমদার

চেতলা, কালীঘাট, আদি গঙ্গা ইত্যাদি যতই পবিত্র স্থান হক না কেন, ও-সব জায়গা মোটে ভালো না। আর লোকের মুখে-মুখে কী-সব অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায়, তার লেখা-জোখা নেই। তাছাড়া মশা-মাছি তো আছেই। চিল্‌তে-চিল্‌তে সব গলি, তাতে মান্ধাতার আমলে তৈরী ঝুরঝুরে সব বাড়ি। তায় আবার প্রায় সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির উঠোন দেখা যায়। এক ফালি উঠোনের মধ্যে এই বড়-বড় সব গাছ,—তালগাছ, আমগাছ, বটগাছ। তাদের ডালপালা বেয়ে, ঝুরি ধরে ঝুলে, যে-কোনো বাড়ি থেকে যে-কোনো বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। বিপদ বুঝলে একটা হাঁক দিলেই হল। সবাই সাত পুরুষ ধরে সবার চেনা। পুরনো সব ঝগড়াও আছে, তার কারণ নিজেরাই ভুলে গেছে, তবু এখনো কথাবার্তা বন্ধ। মুখ-দেখা আর কী করে বন্ধ করে, নড়বড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই, সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির রান্নাঘরের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়, কার বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে সবাই জানতে পারে। একটা টিকটিকি লুকোবার কোথাও জায়গা নেই, চোর-ছ্যাঁচড় খুনে দুষ্কৃত-কারীদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কার ঘরে চুরি করার মতো কী আছে এবং কোথায় আছে তাও সবাই জানে। নেই-ও অবিশ্যি কারো কিছু। সে-দিক দিয়ে জায়গাটাকে চোরদের গোবি মরুভূমিও বলা যায়।

আমার বন্ধু বটুর বড়কাকা ওখানকার থানার মেজ-দারোগা। তাছাড়া ওদের সাত পুরুষের বাড়িও ওখানে। নাকি বাড়ি হবার সময় ক্লাইব্ জন্মায়নি। বটু জায়গাটার নাম দিয়েছে মিসার হতাশা। শুনে বড়কাকা খুবই মুষড়ে পড়েছেন, দুষ্কৃতকারীরাই যদি একটু সুযোগ না পেল, তাহলে ওঁর হেড-আপিসে উন্নতি হয় কী করে? অবিশ্যি ও-সব সাধারণ জিনিসের চাইতেও অন্য এবং আরো ভয়ের জিনিস আছে, ঐ তিনটে পাড়াসুদ্ধ সবাই সন্ধে হতেই যার ভয়ে জুজু। অধিকাংশই ওপর-হাতে এক গোছা শঙ্কট-তারিণী মাদুলি বেঁধে নিরাপত্তা রক্ষা করেন। কারণ পুলিসে আর কী-ই বা করতে পারে?

বটুদের উঠোনের আম পাকলে বটু আমাকে তিন দিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছিল। ঐ তিন দিনে আমি যতগুলো সত্যিকার ভূতের গল্প শুনলাম, সারা জীবন ধরে অত শুনিনি। সবাই সবার পাশের বাড়িতে অশরীরীদের দেখে।

কী বড়-বড় সবুজ রঙের চিংড়ি মাছ নিয়ে একটা লোক বিক্রি করতে এল। চিল-কোঠায় পুজো করতে বসে তাকে দেখেই বটুর ছোট-ঠাকুমা চ্যাঁচাতে লাগলেন, "না বাছা, এখানে ও মাছ কেউ খাবে না। তুমি অন্য জায়গায় দেখ।"

বটু তো চটে কাঁই, কী ভালো ভালো চিংড়িমাছ।

ছোট-ঠাকুমা নেমে এসে বললেন, "ব্যস্, মাছ দেখেছিস তো অমনি হয়ে গেল! আরে ওকি সত্যিকার মাছ? অত বড় চিংড়ি কখনো চার টাকায় দেয় কেউ? আবার বলছে পরে নেবে!"

বটু বলল, "আহা, বলল যে, বিক্রি না-হলে পচে যাবে।"

কাষ্ঠ হেসে ছোট-ঠাকুমা বললেন, "তুই-ও যেমন। তাছাড়া ওগুলো মাছও নয়, ঐ জেলের পো-ও মানুষ নয়, সব ইয়ে।" এই বলে ছোট-ঠাকুমা জল খেতে বসলেন।

বটু-ও বলল, "তা সত্যিও হতে পারে. মুখটা কেমন মিচ্‌কে মতো দেখলি না?"

আমি বললাম, "যাঃ! ভূতের হাঁটু উল্টোদিকে থাকে আর ওদের ছায়া পড়ে না।"

ছোট-ঠাকুমা শুনতে পেয়ে ডেকে বললেন, "হাঁদিকে এখনো রোদ আসেনি বাবা, ছায়া দেখবি কী করে? সে যাই হক, আদিগঙ্গার বটগাছের তলায় যেন কখনো যাস্‌নে। জায়গাটা ভালো নয়।"

গিজগিজে সব বাড়ি, বটগাছ তলায় যেতে হলে সারকাস্ করতে হয়। অথচ সেখানে নাকি কারা কাপড় কাচে, ঝগড়া করে, মাছ ধরে।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, সামনের দোতলার লটখটে বারান্দায় দুজনে গল্প করছি। ছপ্ করে কী-একটা পায়ের কাছে পড়ল। আর সে কী সুগন্ধ ভুরভুর করতে লাগল! তুলে দেখি কলাপাতায় মোড়া বড় বড় চিংড়িমাছ ভাজা। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, সেই মিচ্‌কে লোকটা মিটমিট করে হাসছে। নোটা নোটা কান, নাকে মস্ত আঁচিল। একতলার বৈঠকখানা থেকে বটুর পিসেমশাই ডেকে বললেন, "কে? কে ওখানে?" সঙ্গে-সঙ্গে কেউ কোথাও নেই। খেয়ে ফেললাম দুজনে মিলে সব কটা চিংড়িমাছ। যদি ওগুলো চিংড়িমাছ না-ও হয়, তবু খেতে বেজায় ভালো।

ভিতর দিকের উঠোনে আমগাছের গায়ে লাগা বুড়ো তালগাছ। ছোট-ঠাকুমা সাদা পাথরের রেকাবি করে খোয়া

ক্ষীর, চিড়ের মোয়া আর বড় বড় মনাক্কা নিয়ে, তালগাছের কোটরে রেখে, ভক্তিভরে গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রণাম করলেন। ছোট-ঠাকুমা চলে যেতেই বটু বলল, "ব্রহ্মদৈত্যকে তোয়াজ করা হচ্ছে। তালগাছে সে বাস করে।"

আরও কী বলতে যাচ্ছিল বটু, ছোট-ঠাকুমা পিছন থেকে বললেন, "অমন অছেন্দা করিসনে, বটা। উনি আমার অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের ছোট ভাই। চটিয়ে দিলে সব্বোনাশ করবেন, খুশী রাখলে আমাদের জন্য না-করতে পারেন এমন জিনিস নেই। ঐ বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে যে বছরে বছরে পাস্ করে যাচ্ছিস, সেটা কী করে সম্ভব সে-কথা কখনো ভেবেছিস? হুঃ!" এই বলে ছোট-ঠাকুমা গীতা পড়তে বসে গেলেন। যাবার সময় আরো বলে গেলেন, "তোরা বিশ্বাস না-করতে পারিস, কিন্তু রোজ উনি এই জিনিস গ্রহণ করেন, আর তার বদলে একটি পয়সা আশীর্বাদী—"

আর বলা হল না, কারণ সেই সময় বড়কাকা বাড়ি এলেন।

বড়কাকা খুব চটে ছিলেন। চা আর চিড়ের মোয়া খেতে খেতে বললেন, "এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। বাজারের লোকদের নালিশের জ্বালায় আর টেঁকা যাচ্ছে না। গোলবাড়িতে রাতে তদন্তে যেতে হবে।"

তাই শুনে বড়কাকী এমনি চমকে গেলেন যে, হাতের দুধের হাতা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে পড়ে গেল। চোখ গোলগোল করে ফ্যাকাশে মুখে বললেন, "কিন্তু— কিন্তু—"

বড়কাকা কাষ্ঠ হাসলেন, "কিছু কিন্তু-কিন্তু নয়। এর ওপর আমার প্রমোশন নির্ভর করছে। কোনো ভয় নেই, ছটা ষণ্ডা লোক সঙ্গে থাকবে। হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।"

বটার কাছে শুনলাম যে, বাড়িটাতে একশো বছর কেউ থাকে না। বড়ই দুর্নাম। নাকি ওটা চোরাচালানকারীদের গুপ্ত আড়ত। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে, বুড়ীগঙ্গায় তার মুখ। অনেকে দেখেছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সোনাদানা বে-আইনী জিনিস বস্তা-বস্তা পাচার করা খুব শক্ত নয়। বাজারে নাকি ওদের চর ঘুরে বেড়ায়, কখনো জেলে সেজে, কখনো পুরুতঠাকুর সেজে; এটা-ওটা কিনতে চায়, চা খেতে চায়, অচল পুরনো পয়সা দিয়ে দাম দিতে চায়। তা লোকে শুনবে কেন? দিয়েছে নালিশ করে।

বড়কাকা বলেছিলেন, "লোকটাকে ধরা যায় না, ফুস্‌ফাস্ করে এখান দিয়ে ওখান দিয়ে গলে পালায়। কোনো দোকান-দারের সঙ্গে ষড়ও থাকতে পারে। শুনেছি চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়, কীরকম মিচ্‌কে মতো, নোটা নোটা কান, নাকের ডগায় আঁচিল।"

শুনে আঁতকে উঠেছিলাম, বটা কনুইয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়েছিল। আটটা বাজতেই মহা ঘটা করে আটজন সশস্ত্র লোকজন নিয়ে বড়কাকা তদন্তে চলে গেলেন। ছোট-ঠাকুমা তাঁর গলায় হলদে সুতো দিয়ে একটা বেলপাতা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যস্, আর ভয় নেই। সেখানে গিয়ে কেউ কিছু দিলে খাস্‌নে যেন। দুগ্গা! দুগ্গা!" বড়কাকা চলে গেলে বললেন, "কামান দেগে হাওয়া ধরা। হুঃ!"

আমরা ছাদে গিয়ে বুড়ীগঙ্গায় জোয়ার আসা দেখতে লাগলাম। বটু বলল, "ঐ গোলবাড়িটা আমার ঠাকুরদার অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের ছোট ভাই পেয়েছিল। ব্যাটা মহা লক্ষ্মীছাড়া ছিল, লেখাপড়া শেখেনি, কাজকর্ম করত না, খালি মাছ-ধরার বাই ছিল আর চীনে ব্যবসাদারদের কাছ থেকে চায়ের নেশা ধরেছিল। দুদিনে বাড়ির সব ঝাড়বাতি, আসবাবপত্র, রুপোর বাসন বেচেবুচে সাফ করে দিল। ওর বুড়ী মা নাকি খুচরা পয়সাকড়ি এমনি লুকিয়ে রেখে চোখ বুজেছিলেন যে, ব্যাটা সে-সব খুঁজেই পায়নি। এখনো নাকি খুঁজে বেড়ায়। তাই ও-বাড়িতে কেউ রাত কাটায় না। সেইখানে গেছে বড়কাকা তদন্ত করতে। খুচরো টাকা-কড়ির বাক্সটা পেলে মন্দ হয় না। আমরাই তো ওর ওয়ারিশ। সে ব্যাটা তো বিয়েই করেনি। নাকি বিশ্রী দেখতে ছিল, সুঁটকো, কালো, বড় বড় কান, চাকর-চাকর চেহারা। গেঞ্জি গায়ে ঘাটে বসে অষ্টপ্রহর বুড়ীগঙ্গায় মাছ ধরত— কে? কে ওখানে?"

খচমচ করে তালগাছ থেকে আমগাছ, আমগাছ থেকে নড়বড়ে বারান্দা কাঁপিয়ে মিচ্‌কে লোকটা হাসি-হাসি মুখ করে উঠে এসে, নাকের ফুটো ফুলিয়ে ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস নিয়ে বলল, "চা-চা গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে!"

সত্যিই ছিল চা। দোকানের কেত্‌লিতে একটু চা আর একটা মাটির ভাঁড়, বটু লুকিয়ে এনেছিল সামনের দোকান থেকে। নীচে নামতেও হয়নি, ওদের ছোকরা তেঁতুলগাছে চড়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, রোজকার মতো।

চা পেয়ে লোকটা আহ্লাদে আটখানা, মিচ্‌কে মুখ যেন সাত ভাঁজ হয়ে গেল। বললাম, "পেঁয়াজি খাবে নাকি?"

জিব কেটে বলল, "অ্যাঁ, ছি ছি! ও নাম করবেন না। আমার বরাদ্দ রোজকার মতো খেয়েই এসেছি, চিঁড়ের মোয়া, খোয়া ক্ষীর, মেওয়া—"

বটা আর আমি এ ওর দিকে তাকালাম, কিছু বললাম না। থাক্ না বেচারী।

মিচ্‌কে লোকটি বলল, "বড়-কর্তা আমাদের ওখানে এমন হাঁকডাক লাগিয়েছেন যে, টিঁকতে না-পেরে ওনার এখানে গা-ঢাকা দিতে এসেছি। দেখ দাদা, তালগাছের মুড়োয় তোমাদের জন্য একটা দ্রব্যি রেখে গেলাম। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। সেখানে মা অমৃতি বানায়।"

বটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "কেন চলে যাবে? এখানে বুঝি খেতে পাও না?"

ফিক্ করে হেসে মিচকে লোকটা বলল, "দুবেলা নৈবিদ্যি পাই, আবার কষ্ট কিসের? ঐ এল বলে! আমি উঠি!" বলেই হাওয়া।

নীচে বড়কাকাদের রাগ-রাগ গলায় হাঁক-ডাক শোনা গেল। নিশ্চয় কিছু দুষ্কৃতকারীটারি ধরতে পারেননি। সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড় করে আদ্যিকালের তালগাছটা ভেঙে পড়ল। পোকা-ধরা, পুরনো গুঁড়ি ভেঙেচুরে একাকার! তার মধ্যে দেখা গেল বেশ বড় একটা কাঠের হাতবাক্স, পুরনো টাকাকড়িতে তার অর্ধেক ভরতি। আর চাঁচাপোঁছা নৈবেদ্যের রেকাবিটা, তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বড়কাকার রাগ ঠাণ্ডা।

পরদিন বড়কাকা বললেন, "আশ্চর্যের বিষয়, সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খোপে ঐ বাক্স রাখার স্পষ্ট দাগ দেখলাম। সেই বুড়ী ঠাকরুন তাহলে বাউণ্ডুলে ছেলের হাত থেকে ওটাকে বাঁচাবার জন্য এইখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এটাও তো তাঁদেরই বাড়ি।"

ছোট ঠাকুমা শূন্যে নমস্কার করে বললেন, "কত বাঁচিয়ে-ছিলেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে! ও বটা, নিজে পড়িস দাদু, সে তো গেল।" ফোঁত ফোঁত করে একটু কেঁদেও নিলেন। বড়কাকা তো অবাক!

বিমল কর

রাজবাড়ির ছোরা

কলকাতায় তখনও শীত ফুরোয়নি। মাঘের শেষটেষ। পাড়ায়-পাড়ায় সরস্বতী পুজোর তোড়জোড় চলছে। আর মাত্র দিন দুই বাকী। এমন সময় আকাশ ঘুটঘুটে হয়ে আচমকা এক ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এমন বৃষ্টি যেন শ্রাবণ-ভাদ্রতেই দেখা যায়। এক রাত্রের ঝড়বৃষ্টিতেই কলকাতার চেহারা হল ভেজা কাকের মতন। সরস্বতী পুজোর তোড়-জোড় জলে ভেসে যায় আর কি! ছেলের দল আকাশের এই কাণ্ড দেখে মহাখাপ্পা। কাণ্ড দেখেছ, বৃষ্টি আসার আর সময় হল না! বুড়োরা অবশ্য খনার বচন আওড়ে বলতে লাগল : যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্যি রাজার পুন্যি দেশ।

পুজোর ঠিক আগের দিন দুপুর থেকে আকাশ খানিকটা নরম হল। মেঘ আর তত ঘন থাকল না, হালকা হল, ফেটে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে উড়ে যেতে লাগল। ঝির-ঝির এক-আধ পশলা বৃষ্টি আর হাওয়া থাকল। মনে হল, কাল সকালে হয়তো রোদ উঠবে।

বিকেলের দিকে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে চন্দনরা এল কিকিরার বাড়ি। কিকিরার সঙ্গে চন্দনদের এখন বেশ ভাব। বয়েসে কিকিরা অনেকটাই বড়, নয়ত তিনি হয়ত গলায় গলায় বন্ধু হয়ে যেতেন তারাপদ আর চন্দনের। ঠিক সে-রকম বন্ধু তো কিকিরা হতে পারেন না, তবু সম্পর্কটা বন্ধুর

মতনই হয়ে গিয়েছিল। কিকিরা তারাপদদের স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। আর তারাপদরাও কিকিরাকে যথেষ্ট মান্য করত, পছন্দ করত, রবিবার দিনটা তারা কিকিরার জন্যে তুলে রেখেছিল। বিকেল হলেই দুই বন্ধু কিকিরার বাড়ি এসে হাজির হত, গল্পগুজব, হাসি-তামাশা করে, খেয়েদেয়ে রাত্রে যে যার মতন ফিরে যেত।

দিনটা ছিল রবিবার। চন্দন আর তারাপদ কিকিরার বাড়ি এসে দেখে এক ভদ্রলোক বেশ দামী ছাতা আর কালচে রঙের নাইলনের বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্র-লোকের চোখমুখ দেখলেই মনে হয়, মানুষটি বেশ বনেদী। পুরোপুরি বাঙালী চেহারাও যেন নয়, চোখের মণি কটা, ভুরুর রঙও লালচে, লম্বা নাক, থুতনির তলায় ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

ভদ্রলোক যাবার সময় চন্দনদের একবার ভাল করে দেখে নিলেন।

উনি চলে গেলে দরজা বন্ধ করে কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন। হেসে বললেন, "এসো, এসো—আমি ভাবছিলাম আজ বুঝি তোমরা আর আসবে না।"

চন্দন বলল, "আসব না কেন, আজ আপনি আমাদের আফগান খিচুরি খাওয়াবেন বলেছিলেন।"

কিকিরা বললেন, "আফ্গানি খিচুড়ি, মুলতানি আলুর দম।...বৃষ্টি দেখে আমার মনে হচ্ছিল—তোমরা বোধহয় আফগানি ভুলে গেছ।"

চন্দন বলল, "খাওয়ার কথা আমি ভুলি না।"

কিকিরা বললেন, "ভেরি গুড্। যাও ঘরে গিয়ে বসো, আমি বগলাকে চায়ের জল চাপাতে বলি।"

পায়ের জুতো জলে-কাদায় কদাকার হয়ে গেছে। ছাতা রেখে, জুতো খুলে তারাপদ বাথরুম থেকে পা-হাত ধুয়ে এল। চন্দনও। এই বাড়িতে কোথাও তাদের কোনো সংকোচ নেই। যেন সবই নিজের।

ঘরে এসে বসল দুজনে। বাতি জ্বলছে। যে-রকম মেঘলা দিন, বাতি বিকেল থেকেই জ্বালিয়ে রাখতে হয়। চন্দন কোণের দিকে চেয়ারে বসল। এই চেয়ারটা তার খুব পছন্দ। সেকেলে আর্ম-চেয়ার। বেতের বুনুনির ওপর কিকিরা পাতলা গদি বিছিয়ে রেখেছেন। হাত পা ছড়িয়ে, গা ডুবিয়ে দিব্যি শোয়া যায়। চন্দন বেশ আরাম করে বসে তারাপদকে ডেকে সিগারেট দিল, নিজেও ধরাল। কিকিরাকে যখন চিনত না চন্দনরা, এন্তার সিগারেট খেয়েছে, চেনাজানা হয়ে যাবার পর ওঁর সামনে সিগারেট খেতে লজ্জাই করত—কিন্তু কিকিরা ঢালাও হুকুম দিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন—'নো লজ্জা-সরম, খাও। তোমরা তো সাবালক ছেলে।"

চন্দন আরাম করে সিগারেট টানতে টানতে ঘরের চার-পাশে তাকাতে লাগল। কিকিরার মতন এই ঘরটাও বড় বিচিত্র। পাড়াটাও কিছু কম বিচিত্র নাকি! ওয়েলিংটন থেকে খানিকটা এগিয়ে এক গলির মধ্যে বাড়ি। পার্ক সার্কাসের ট্রামে উঠলেই সুবিধে। কিংবা পঁচিশ নম্বর বালিগঞ্জের ট্রামে উঠতে হয়। নানা জাতের মানুষ থাকে এপাশে। লোকে যাকে বলে অ্যাংলো পাড়া, সেই ধরনের। তবে শুধু অ্যাংলোই থাকে না, চীনে বেহারী বোম্বাইঅলাও থাকে। কিকিরার বাড়ির নীচের তলায় মুসলমান কারিগররা দর্জিগিরি করে, কেউ কেউ টুপি বানায়। পুরোনো আমলের বাড়ি। বোধহয় সাহেব-সুবোতেই তৈরী করেছিল। কাঠের সিঁড়ি, মস্ত উঁচু ছাদ, কড়ি-বরগার দিকে তাকালে ভয় হয়। কিকিরার এই দোতলার ঘরটি বেশ বড়। ঘরের গা লাগিয়ে প্যাসেজ। তারই একদিকে রান্না-বান্নার ব্যবস্থা। কাজ চলার মতন বাথরুম। এক চিলতে পার্টিশানকরা ঘরে থাকে বগলা, কিকিরার সব্যসাচী কাজের লোক।

চন্দনরা যতবার কিকিরার ঘরে এসেছে, প্রায় বারেতে দেখেছে একটা-না-একটা নতুন জিনিস আমদানি করেছেন কিকিরা। এমনিতেই ঘরটা মিউজিয়ামের মতন, হরেক রকম পুরোনো জিনিসে বোঝাই, খাট আলমারি দেরাজ বলে নয়, বড় বড় কাঠের বাক্স, যাত্রা দলের রাজার তরোয়াল, ফিতে-জড়ানো ধনুক, পুরোনো মোমদান, পাদরী টুপি, কালো আলখাল্লা, চোঙঅলা সেকেলে গ্রামাফোন, কাঠের পুতুল, রবারের এটা সেটা, অ্যালুমিনিয়ামের এক যন্ত্র, ধুলোয় ভরা বই—আরও কত কী। কাচের মস্ত বড় একটা বল-ও রয়েছে, ওটা নাকি জাদুকরের চোখ।

চন্দন বলল, "তারা, কিকিরা নতুন কী আমদানি করেছেন বল তো?"

তারাপদ একটা বাঁধানো বইয়ের মতন কিছু নাড়াচাড়া করছিল, বলল, "কী জানি! চাঁদু, এই জিনিসটা কী রে?"

চন্দন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বই বলেই মনে হল তার। চামড়ায় বাঁধানো। তারাপদ মামুলি বই চিনতে পারছে না। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! চন্দন বলল, "কেন, বই।"

মাথা নেড়ে তারাপদ বলল, "বই নয়।"

"মানে?"

"বইয়ের মতনই অবিকল দেখতে। বই নয়। বাক্স।"

"বাক্স? কই দেখি।"

তারাপদ এগিয়ে এসে জিনিসটা দিল। হাতে নিয়ে দেখতে লাগল চন্দন। সামান্য ভারী। একেবারে বাঁধানো বইয়ের মতন দেখতে। আগেকার দিনে মরক্কো-চামড়ায় যেরকম বই বাঁধানো হত, বিশেষ করে বিদেশী দামী বইটই, সেই রকম। বই হলে পাতা থাকত। এর চারদিকই বন্ধ। ঘন কালো রঙের চামড়া দিয়ে মোড়া। আঙুল দিয়ে টোকা মেরে বোঝার উপায় নেই, কাডবোর্ড না পাতলা টিনের ওপর বোর্ড দিয়ে আগাগোড়া বাক্সটা তৈরী করা হয়েছে। কোথাও কোনো চাবির গর্তও চোখে পড়ল না।

চন্দন বাক্সটা নাড়াচাড়া করছে, এমন সময় কিকিরা ঘরে এলেন।

বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে দেখাল চন্দন। "এটা কি আপনার লেটেস্ট আমদানি?"

কিকিরার নিজের একটি বসার জায়গা আছে। নিচু সোফার মতন দেখতে অনেকটা, তার চারধারে চৌকো, গোল, লম্বা নানা ধরনের কুশন। রঙগুলোও বিচিত্রঃ লাল, কালো, সোনালী ধরনের। মাথার দিকে একটা বাতি। গোল শেড, শেডের গায়ে নক্শা।

কিকিরা বসলেন। হেসে বললেন, "ঘন্টা খানেক আগে হাতে পেয়েছি।"

"মানে হয় চোরাবাজার, না হয় চিৎপুর, কিংবা কোথাও পুরোনো জিনিসের নীলাম থেকে কিনে এনেছেন?"

কিকিরা মাথা নাড়তে লাগলেন। তাঁর পোশাক বলতে একটা ঢলঢলে পাজামা, পায়ে চটি, গায়ে আলখাল্লা। আলখাল্লার বাহার দেখার মতন, যেন কম করেও দশ বারো রকমের কাপড়ের ছাঁট সেলাই করে কিকিরার এই বিচিত্র আলখাল্লা তৈরী হয়েছে।

তারাপদ নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসেছে ততক্ষণে।

কিকিরা যেন খানিকটা মজা করার জন্যে প্রথমে কিছু বললেন না—শুধুই মাথা নাড়তে লাগলেন। শেষে মজার গলায় বললেন, "নো থিফ্মার্কেট, নো চিৎপুর। সিটিং সিটিং রিসিভিং।"

চন্দন হেসে ফেলল। বলল, "ইংলিশ রাখুন। এটা কী জিনিস? বাক্স?"

কিকিরা চন্দনের দিকে হাত বাড়ালেন। বললেন, "স্যান্ডাল উড, ওই পদার্থটি নিয়ে আমার কাছে এসো। ম্যাজিক বাক্স।" চন্দনকে মাঝে মাঝে কিকিরা ঠাট্টা করে স্যান্ডাল উড বলে ডাকেন।

উঠে গেল চন্দন। কিকিরা তারাপদকে ডাকলেন, "ওই টিপয়টা নিয়ে এসো তো।"

কিকিরার সামনে টিপয় এনে রাখল তারাপদ। মাথার ওপরের বাতি জ্বালিয়ে দিলেন কিকিরা। বাক্সটা হাতে নিয়ে আরেকবার ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর বললেন, "তোমরা সেকেলে টিফিন-বাক্স কিংবা পানের কৌটো দেখনি? এটাও সেই রকম। তবে এর কায়দা-কানুন খানিকটা আলাদা, একে ম্যাজিক-বক্স বলতে পার।" কিকিরা কথা বলতে বলতে বাক্সর বাঁ দিকের একটা উঁচুমতন জায়গা বুড়ো আঙুলে টিপতে লাগলেন।

তারাপদরা দেখতে লাগল। যদি এটা কোনো বাঁধানো বই হত—তা হলে বলা যেত—বইয়ের যেটা পুটের দিক—যেখানে পাতাগুলো সেলাই করা হয়—সেই দিকে শিরতোলা বা দাঁড়া-ওঠানো একটা জায়গায় কিকিরা চাপ দিচ্ছিলেন। বার কয়েক চাপ দেবার পর তলার দিকে পুট-বরাবর পাতলা কিছু বেরিয়ে এল সামান্য। কিকিরা তার আলখাল্লার পকেট থেকে হাত-ঘড়ির চাবির মতন একটা চাবি বার করলেন। বললেন. "এই দেখ চাবি।"

হাতে একটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস থাকলে হয়ত আলপিনের মাথার সাইজের ফুটোটা দেখা যেত। আশ্চর্য, বাক্সর ডালা খুলে গেল। যেন স্প্রিং দেওয়া ছিল কোথাও। ওপরের ডালা লাফিয়ে উঠল একটু।

চন্দন আর তারাপদ অবাক।

কিকিরা যেন আড়চোখে চন্দনদের মুখের ভাবটা দেখে নিলেন। হাসলেন মিটমিটে চোখে। তারপর ওপরের ডালাটা পুরোপুরি তুলে ধরলেন।

ঘাড় মুখ সরিয়ে নিয়েছিলেন কিকিরা। চন্দন আর তারাপদ প্রথমটায় যেন কিছুই বুঝতে পারল না। কী ওটা? মেয়েদের গয়নার মতন মনে হচ্ছে। চকচক করছে। কত রকমের পাথর! দুজনেই ঝুঁকে পড়ল। বাক্স থেকে বিঘত খানেক তফাতে মাথা রেখে হাঁ করে দেখতে লাগল। ভেলকি না ভোজবাজি? চোখের পলক আর পড়ে না।

ধীরে ধীরে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে আসছিল চোখে, মাথায় ভাসা-ভাসা একটা ধারণা জাগছিল। না, মেয়েদের গয়নাটি নয়। অন্য কিছু। কিন্তু কী?

তারাপদ বলল. "কী এটা?"

কিকিরা বললেন, "একে বলে কিডনি ড্যাগার।"

"ড্যাগার? মানে ছোরা?"

"হুঁ।"

"কিন্তু ছোরা কোথায়? ওটা তো গয়নার মতন দেখতে।"

কিকিরা হাত বাড়িয়ে বাক্সটা তুলে নিলেন। বললেন, "যেটা গয়নার মত দেখছ, সেটা হল, ছোরার বাঁট। দেখেছ একবার ভাল করে বাঁটটা? কত রকমের পাথর আছে জান? [illegible] সবরকম পাথর রয়েছে। বাজারে এর দাম কত হবে আন্দাজ করতে পার?"

চন্দন মুখ তুলেছিল। তারাপদও হাঁ করে কিকিরাকে দেখছে।

কিকিরাও মুগ্ধ চোখে সেই পাথর বসানো, কারুকর্ম করা বাঁটটি দেখছিলেন। নীলচে ভেলভেটের ওপর রাখা রয়েছে বাঁটটা। গয়নার মতনই কী উজ্জ্বল, সুন্দর দেখাচ্ছে।

কিকিরা বললেন, "বাঁটটা দেখছ, ছুরিটা দেখতে পাচ্ছ না তো! ওটাই তো সমস্যা।"

"সমস্যা?" চন্দন বলল।

"ব্যাপারটা তাই। বাঁটটা আছে, ছুরির দিকটা নেই।... ওটা জোগাড় করতে হবে।"

কিকিরার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই তারাপদরা বুঝতে পারল না। কিসের ছুরি, বাঁটটাই বা কোথা থেকে এলো? কিকিরা কত টাকা খরচ করে এটা কিনলেন? অত টাকাই বা পেলেন কেমন করে? বড়লোক মানুষ তো কিকিরা নন।

একেবারে পাগলামি কাণ্ড কিকিরার। পুরোনো জিনিস কেনার কী যে খেয়াল ও'র—তারাপদরা বুঝতে পারে না।

চন্দন বলল, "আপনি এটা কিনলেন?"

"কিনব? এর দাম কত জান? এখনকার বাজারে হাজার ত্রিশ-চল্লিশ তো হবেই—বেশীও হতে পারে।"

"তবে পেলেন কোথায়?"

কিকিরা এবার রহস্যময় মুখ করে বললেন, "পেয়েছি, তোমরা আসার সময় যে ভদ্রলোককে বেরিয়ে যেতে দেখলে. উনি আমায় এটা দিয়ে গেছেন।"

তারাপদ আর চন্দন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ভদ্রলোককে মনে পড়ল। তেমন করে খুঁটিয়ে তো লক্ষ করে নি, তবু চেহারার একটা ছাপ যেন থেকে গেছে মনে।

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, "কে ওই ভদ্রলোক?"

কিকিরা তখনও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলেন ছোরার বাঁটটা, যেন তারিফ করছিলেন। কোনো জবাব দিলেন না।

চন্দন বলল, "কিকিরা স্যার, আপনি দিন-দিন বড্ড মিস্টিরিয়াস হয়ে যাচ্ছেন!"

কিকিরা চোখ না-তুলেই রহস্যময় গলায় বললেন, "আমার চেয়েও এই ছোরার ইতিহাস আরও মিস্টিরিয়াস।"

চন্দন হেসে-হেসেই বলল, "আপনার চারদিকেই মিস্ট্রি, স্যার; একেবারে মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স হয়ে বসে আছেন।"

তারাপদ হেসে ফেলল। কিকিরাও মুখ তুলে হাসলেন।

এমন সময় চা এল। চা আর গরম গরম ডালপুরী।

কিকিরা শুধুই চা নিলেন। তারাপদ আর চন্দন যে যার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে খাবার আর চা নিয়ে বসল। চন্দনদের জন্যে প্রতি রবিবারেই কিকিরাকে কিছু-না-কিছু মুখরোচক খাদ্যের ব্যবস্থা রাখতে হয়। রান্নাবান্নাতেও হাত আছে কিকিরার।

ডালপুরী খেতে খেতে চন্দন বলল, "তা ইতিহাসটা বলুন?"

তারাপদরও ধৈর্য থাকছিল না। বলল, "ভদ্রলোক আপনার চেনা?"

কিকিরা বাক্সটা বন্ধ করে রেখেছিলেন আলগা করে। চা খেতে-খেতে বললেন, "ভদ্রলোক আমার চেনা নন, মানে তেমন একটা পরিচিত নন। গত পরশু দিন আগে এক জায়গায় আলাপ হয়েছিল।"

"কী নাম?" তারাপদ আবার জিজ্ঞেস করল।

"দীপনারায়ণ। দীপনারায়ণ সিং।"

"কোথায় থাকেন?"

"এখন কয়েক দিনের জন্যে রয়েছেন পার্ক সার্কাসে।"

চন্দন বলল, "ভদ্রলোকের চেহারায় একটা আভিজাত্য আছে।"

কিকিরা বললেন, "রাজা-রাজড়ার বংশধর. চেহারায় খানিকটা রাজ-ছাপ থাকবেই তো।"

তারাপদ বলল, "আপনার এই ক্রমশ আর ভাল লাগছে না

কিকিরা, স্পষ্ট করে বলুন ব্যাপারটা।"

কিকিরা আরাম করে কয়েক চুমুক চা খেলেন। তারপর বললেন, "আগে কোন্‌টা শুনবে, বংশের ইতিহাস, না ছোরার ইতিহাস? দুটোই দরকারী, একটাকে বাদ দিলে আরেকটা বোঝা যাবে না। আগে বংশের ইতিহাসটাই বলি, ছোট করে।" কিকিরা একটু থামলেন, তাঁর জোব্বা থেকে সরুমতন একটা চুরুট বের করে ধরালেন। ধোঁয়া উড়িয়ে বললেন, "দীপনারায়ণের চার পুরুষের ইতিহাস শুনে তোমাদের লাভ হবে না। আমার আবার ওই বাবার বাবা তার বাবা—ওসব মনে থাকে না। সোজা কথাটা হল, আগেকার দিনে যারা ধন সম্পত্তি গড়ে তুলতে পারত তারা এক-একজন রাজাগজা হয়ে উঠত সমাজে। দীপনারায়ণের কোনো পূর্বপুরুষ মুসলমান রাজার আমলে এক সেনাপতির সৈন্যসামন্তর সঙ্গে বিহার-বাংলা ওড়িশার দিকে হাজির হন। সৈন্যসামন্তরা যুদ্ধটুদ্ধ সেরে যখন ফিরে যায় তখন আর তাঁকে নিয়ে যায়নি। কেন নিয়ে যায়নি—তা জানা যায় না। হয় কোনো দোষ করে-ছিলেন তিনি, না হয় কোনো রোগটোগ হয়েছিল বড় রকমের। সেই পূর্বপুরুষই ওদিকে একদিন দীপনারায়ণদের বংশ স্থাপন করেন। তারপর দু পুরুষ ধরে মস্ত জমিদারি গড়ে তুলে, জঙ্গলের মালিকানা কিনে নিয়ে অনেক ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বে ছোট বড় রাজার তো অভাব ছিল না বাপু, দীপনারায়ণের বাপ-ঠাকুরদাও সেই রকম ছোটখাট রাজা হয়ে বসেছিলেন। দীপনারায়ণের বাবার আমলে সাহেব কোম্পানিরা কতকগুলো জায়গা ইজারা নেয়। মাটির তলায় ছিল সম্পদ—মিনারেলস। দীপনারায়ণের বাবা আদিত্যনারায়ণ ইজারার টাকাতেই ফুলেফেঁপে ঢোল হয়ে যান। ভদ্রলোক মারা যান শিকার করতে গিয়ে বন্দুকের গুলিতে।...এই ছোরাটা হল তাঁর—আদিত্যনারায়ণের। এ-দেশী ছোরা এ-রকম হয় না, এ-ছোরা বিদেশী। হয় তিনি বিদেশ থেকে তৈরী করে আনিয়েছিলেন—না হয় এদেশের কোনো বিদেশী কারিগর তাঁকে ছোরাটা তৈরী করে দিয়েছিল। আগেকার দিনে য়ুরোপ-টুরোপ-এ যখন তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ হত, তখন এই রকম সব ছোরাছুরি কোমরে গোঁজার রেওয়াজ ছিল। আদিত্যনারায়ণ অবশ্য কোমরে গুঁজতেন না। রাজবাড়িতে নিজের ঘরে রেখে

[illegible]ছিলেন। রাজবংশের ওটা পবিত্র সম্পদ।”

তারাপদ আর চন্দন মন দিয়ে কথা শুনছিল কিকিরার। চন্দন তার ডালপুরী শেষ করে ফেলল। তারাপদ ধীরে-সুস্থে খাচ্ছে।

কিকিরা বললেন, “এই ছোরাটাকে দীপনারায়ণেরা বিগ্রহের মতন মনে করেন, মান্য করেন। তাঁদের বিশ্বাস এই ছোরার [illegible]শক্তি রয়েছে। কিংবা দৈবগুণও বলতে পার। আমরা সোজা কথায় যাকে বলি মন্ত্রঃপূত, এই ছোরাও তাই। দীপনারায়ণ বলেছেন, কখনো কোনো কারণে যদি কেউ প্রতি-হিংসার বশে, কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাউকে এই ছোরা [illegible] আহত করেন, খুন করেন—তা হলে এই ছোরার মুখ থেকে রক্তের দাগ কোনোদিনই, হাজার চেষ্টাতেও উঠবে না। আর প্রতিদিন, একটু একটু করে, ছোরাটা ভোঁতা হয়ে যাবে. ছোট হয়ে যাবে।”

তারাপদ বলল, “সে কী!”

চন্দন অবিশ্বাসের গলায় বলল, “গাঁজাখুরির আর জায়গা হল না। দীপনারায়ণ আপনাকে ব্লাফ ঝেড়েছে।”

কিকিরা চন্দনকে দেখতে-দেখতে বললেন, “সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে। আগে দীপনারায়ণ যা বলছেন সেটা শোনা যাক।”

“কী বলছেন তিনি?” চন্দন তুচ্ছতাচ্ছিল্যের গলায় বলল।

কিকিরা বললেন, “দীপনারায়ণ বলছেন, গত এক মাসের মধ্যে তাঁদের পরিবারে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে। দীপনারায়ণের ছোট ভাই জয়নারায়ণ খুন হয়েছেন।”

তারাপদ আঁতকে উঠে বলল, “খুন?”

কিকিরা বললেন, “এই ঘটনা ঘটে যাবার পর—খুবই আশ্চর্যের কথা—এই ছোরার বাক্স থেকে কেউ ছোরার ফলাটা খুলে নিয়েছে, শুধু বাঁটটা পড়ে আছে।”

চন্দন বলল, “তার মানে আপনি বলতে চান, দীপনারায়ণের ছোট ভাই জয়নারায়ণকে কেউ খুন করেছে এই ছোরা দিয়ে? খুন করে ফলাটা খুলে নিয়েছে?”

মাথা নেড়ে কিকিরা বললেন, “দীপনারায়ণ তাই মনে করেন। তাঁর ধারণা, যে জয়নারায়ণকে খুন করেছে সে এই ছোরা-রহস্যটা জানে। জানে যে, ছোরার ফলা থেকে রক্তের দাগ মুছবে না—হাজারবার জলে ধুলেও নয়। তা ছাড়া ছোরার ফলাটা ক্রমশই ক্ষয়ে আসবে। কাজে...কাজেই পুরো ফলাটাই সরিয়ে ফেলেছে।”

“কিন্তু আপনি কি বলতে চান—এই ছোরার বাঁট থেকে ফলাটা খুলে ফেলা যায়?”

“যায়,” মাথা নেড়ে কিকিরা বললেন, “তোমরা ভাল করে

ছোরাটা দেখলে বুঝতে পারতে বাঁটের নীচের দিকে সরু ফাঁক আছে। ওই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ফলা গলিয়ে—দু দিকের স্প্রিং টিপলে ফলাটা আটকে যায়।"

চন্দন এবার একটু চুপ করে থাকল। চা খেতে লাগল। তারাপদ জিজ্ঞেস করল, "কিডনি নাম হল কেন?"

কিকিরা বললেন, "ছোরার ওপর দিকের গড়নটা মানুষের কিডনির মতন। দু দিকে দুটো বরবটির দানা—বা বিচির মত জিনিস রয়েছে, অবশ্য বড় বড় দানা, প্রায় ইঞ্চিটাক। এটা দু রকম কাজ করে। স্প্রিংয়ের কাজ করে, আবার ছোরা ধরার সময় ধরতে সুবিধেও হয়।"

চন্দন রসিকতা করে বলল, "বোধ হয় মানুষের কিডনি ফাঁসাবারও সুবিধে হয়—কী বলেন কিকিরা? নামটাও তাই কিডনি ড্যাগার।"

কিকিরা কোনো রকম উচ্চবাচ্য করলেন না।

সামান্য চুপচাপ থেকে তারাপদ বলল, "ব্যাপারটা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আর-একটু পরিষ্কার হয়ে নিই। রাজবাড়ির পুরনো ইতিহাস এখন থাক। আসল ব্যাপারটা কবে ঘটেছে, কিকিরা?"

"মাসখানেক আগে।"

"রাজবাড়িতে?"

"হ্যাঁ। রাজবাড়ির লাইব্রেরি-ঘরে।"

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"তা কেমন করে বলব! কেন খুন হয়েছে আর কে খুন করেছে সেটাই তো জানার জন্যে এত—!"

চন্দন পাকা গোয়েন্দার মতন ভুরু কুঁচকে বলল, "রাজবাড়িতে কে কে থাকে?"

"রাজপরিবারের লোকরা। দীপনারায়ণের এক অন্ধ কাকাও আছেন—ললিতনারায়ণ। আদিত্যনারায়ণের বৈমাত্র ভাই।"

"জন্মান্ধ?"

"না, মাস কয়েক হল অন্ধ হয়েছেন। খালি চোখে সূর্য-গ্রহণ দেখতে গিয়ে।"

"বোগাস। ও-রকম শোনা যায়, আসলে অন্য কোনো রোগ ছিল চোখের।"

"কার কেমন বয়েস?"

"ললিতনারায়ণের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। জয়নারায়ণের বছর বত্রিশ।"

"দীপনারায়ণ নিশ্চয় বছর-পঁয়তাল্লিশ হবেন?"

"আর একটু কম। বছর চল্লিশ। দীপনারায়ণের পর ছিলেন তাঁর বোন। তিনি এখন শ্বশুরবাড়ি মধ্যপ্রদেশে থাকেন।"

তারাপদ চা খাওয়া শেষ করে মুখ মুছল। বলল, "ছোরাটা থাকত কোথায়?"

"রাজবাড়িতে, দীপনারায়ণের ঘরে, সিন্দুকের মধ্যে।"

"কবে দীপনারায়ণ জানতে পারলেন ছোরার ফলা চুরি হয়েছে?"

কিকিরার চুরুট নিবে গিয়েছিল। চুরুটটা আঙুলে রেখেই কিকিরা বললেন, "জয়নারায়ণ খুন হবার আট-দশ দিন পরে।"

"কেন? অত দিন পরে জানলেন কেন?"

কিকিরা বললেন, "জয়নারায়ণ যেভাবে খুন হয়েছিলেন, তাঁকে যেভাবে লাইব্রেরি ঘরে পাওয়া গিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল, ওটা দুর্ঘটনা। পরে একদিন আচমকা ছোরার বাক্সটা খুলতেই তাঁর চোখে পড়ে, ছোরার বাঁট আছে, ফলাটা নেই। তখন থেকেই তাঁর সন্দেহ।"

চন্দন বলল, "পুলিসকে জানিয়েছেন দীপনারায়ণ?"

"না। পুলিস দুর্ঘটনার কথা জানে। অন্য কিছু জানে না। দুর্ঘটনায় জয়নারায়ণ মারা গেছেন এই কথাটাই ছড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া ওই জঙ্গল-অঞ্চলে কোথায় পাচ্ছ তুমি থানা পুলিশ কলকাতার মতন। ওসব জায়গায় ডেথ্ সার্টিফিকেটও নেই, পোস্ট মর্টমও নেই। তার ওপর রাজবাড়ির ব্যাপার।"

তারাপদ বলল, "দীপনারায়ণের কথা আপনি বিশ্বাস করেছেন?"

কিকিরা বললেন, "বিশ্বাস-অবিশ্বাস আমি কোনোটাই করিনি। আমার কথা হল, কোনো দলেই ঝুঁকবে না একেবারে মাঝামাঝি থাকবে। যখন দেখবে বিশ্বাসের দিক টানছে তখন বিশ্বাসের দিকে টলবে, যদি অবিশ্বাসের দিক টানে তবে অবিশ্বাসের দিকে ঝুঁকবে। আমার হল চুম্বকের কাঁটা—যেদিকে টানবে সেদিকে ঝুঁকব।"

চন্দন বলল, "আপনি যাই বলুন আমি বিশ্বাসই করি না, কোনো ছোরার ফলার ওসব গুণ থাকতে পারে! এ একেবারে গাঁজাখুরি। ব্লাফ্।"

কিকিরা চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন। আস্তে-আস্তে টানলেন। তারপর বললেন, "স্যান্ডাল উড্, আমাদের এই জগতে কত কী অদ্ভুত-অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে তার সব কি আমরা জানি। জানলে তো ভগবান হয়ে যেতুম।"

"আপনি তা হলে বিশ্বাস করছেন যে এমন ছোরাও আছে যার গায়ে রক্তের দাগ পড়লে মোছে না? আপনি বিশ্বাস করছেন, ইস্পাতেও ক্ষয় ধরে?"

মাথা নেড়ে নেড়ে কিকিরা বললেন, "আমি বিশ্বাস করছি না। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে—তারা কেন করে, সত্যিই তার কোনো কারণ আছে কিনা—সেটা আমি খুঁজে দেখতে চাই।"

চন্দন চুপ করে থেকে বলল, "বেশ, দেখুন।...আপনি তা হলে গোয়েন্দাগিরিতে নামলেন?"

"মাথা খারাপ নাকি তোমার। আমি হলাম ম্যাজিশিয়ান। কিকিরা দি ম্যাজিশিয়ান। গোয়েন্দারা কত কী করে, রিভলবার ছোঁড়ে, নদীতে ঝাঁপ দেয়, মোটর চালায়; আমি তো রোগা-পটকা মানুষ, পিস্তল রিভলবার জীবনে হাতে ধরিনি। ...তা ওসব কথা থাক্। কথা হচ্ছে—আগামী পরশু কি তরশু আমি তারাপদকে নিয়ে একবার দীপনারায়ণের রাজবাড়িতে যাচ্ছি! তুমি কবে যাচ্ছ?

চন্দন অবাক হয়ে বলল, "আপনি যাচ্ছেন তারাপদকে নিয়ে?"

কিকিরা বললেন, "দিন দশ-পনেরো রাজবাড়ির ভাত খেয়ে আসব। মন্দ কী!"

২

তারাপদর আর ঘুম আসছিল না। বটুকবাবুর মেসের কোথাও আর ছিটেফোঁটা বাতি জ্বলছে না—বৃষ্টির দরুন ঠাণ্ডাও পড়েছে খুব, এ-সময় লেপ মুড়ি দিয়ে তোফা ঘুম মারবে কোথায়, তা নয়, মাথার মধ্যে যত রকম এলোমেলো ভাবনা। আগের বার, যখন তারাপদর কপালে ভুজঙ্গ-কাপালিক জুটেছিল, তখন দশ-পনেরোটা দিন মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল তার। তারাপদ নিজেই সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, তার ভাগ্য নিয়ে অদ্ভুত এক খেলা চলছিল, মাথা খারাপ না হয়ে উপায় ছিল না তার। কিন্তু এবারে তারাপদ নিজে কোথাও জড়িয়ে নেই। তবু এত ভাবনা কিসের?

কিকিরা মানুষটি সত্যিই অদ্ভুত। এই ক'মাসের মেলা-

সবাই তারাপদরা বুঝতে পেরেছে, কিকিরা মুখে যত হাসি-তামাশা করুন না কেন, তাঁর একটা বিচিত্র জীবন আছে। খোলাখুলি করে, খুলে কিকিরা এখন পর্যন্ত কোনোদিন সে-জীবনের কথা বলেননি। বলেছেন, সে-সব গল্প পরে একদিন শুনো, সে মহাভারত হবে, তবে বাপু এটা ঠিক—আমি ম্যাজিকের লাইনের লোক। তোমরা ভাবো, ম্যাজিক জানলেই লোকে ম্যাজিশিয়ান হয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। তা কিন্তু নয়, কপালে না থাকলে শেষ পর্যন্ত কেউ দাঁড়াতে পারে না। আমার কপালটা মন্দ। এখন আমি একটা বই লেখার চেষ্টা করছি ম্যাজিকের ওপর, সেই পুরোনো আমল থেকে এ পর্যন্ত কেমন করে ম্যাজিকের ইতিহাস চলে আসছে—বুঝলে?

তারাপদরা অতশত বোঝে না। কিকিরাকে বোঝে। মানুষটি চমৎকার, খুব রসিক, তারাপদদের স্নেহ করেন আপনজনের মতন। সত্যি বলতে কী, এতকাল চন্দন ছাড়া তারাপদর নিজের বলতে কেউ ছিল না, এখন কিকিরাকেও তারাপদর নিজের বলে মনে হয়।

কিকিরা যখন বলেছেন, তখন তারাপদকে সিংভূমের কোন এক জঙ্গলে যেতেই হবে তাঁর সঙ্গে। তবে দীপনারায়ণের ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় তারাপদরা আবার কথাটা তুলেছিল। চন্দন কিকিরাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি যাকে চেনেন না জানেন না, তাঁর কথা বিশ্বাসই বা করছেন কেন আর এইসব খুনখারাপির মধ্যে নাকই বা গলাচ্ছেন কেন?"

কিকিরা তখন যা বললেন, সেটা আরও অদ্ভুত।

এই কলকাতাতেই কিকিরার এক বন্ধু আছেন, যিনি নাকি আশ্চর্য এবং অলৌকিক এক গুণের অধিকারী। কিকিরার চেয়ে বয়েসে সামান্য বড়, নাম রামপ্রসাদ। সন্ন্যাসী-ধরনের মানুষ, কোনো মঠের সন্ন্যাসী নয়, সাত্ত্বিক ধরনের লোক, বউবাজারের দিকে গানবাজনার যন্ত্র সারাবার একটা দোকান আছে তাঁর। একা থাকেন। এই মানুষটির এক অলৌকিক গুণ আছে। অদেখা কোনো কোনো ঘটনা তিনি দেখতে পান। তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বা জানতে চাইলে তিনি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর ওই অবস্থায় যদি কিছু দেখতে পান সেটা বলে যান। যখন আর পান না, থেমে যান। সব সময় সব প্রশ্নের জবাবও পান না। বলেন, তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর এই অলৌকিক শক্তির কথা সকলে জানে না, কেউ-কেউ জানে। মুখে-মুখে তাঁর কথা খানিকটা ছড়িয়ে গেলেও মানুষটি অন্য ধরনের বলে তাঁকে নিয়ে হইচই করার সুযোগ হয়নি। নিজেও তিনি কারও সঙ্গে গলাগলি করতে চান না। একলা থাকতে ভালবাসেন। তবু গণ্যমান্য জনাকয়েক আছেন, যাঁরা রামপ্রসাদবাবুর অনুরাগী। কিকিরা রামপ্রসাদবাবুকে যথেষ্ট মান্য করেন।

রামপ্রসাদবাবুর বাড়িতেই কিকিরা দীপনারায়ণকে দেখেছিলেন। আলাপ সেখানেই। রামপ্রসাদবাবুই কিকিরাকে বলেছিলেন, "কিঙ্কর, তুমি এঁর ব্যাপারটা একটু দেখো তো, আমি ভাল কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

চন্দন জিজ্ঞেস করেছিল, "রামপ্রসাদবাবু চোখ বন্ধ করে কী দেখতে পান?

"ভূত আর ভবিষ্যৎ—দুইই কিছু কিছু দেখতে পান।" বলেছিলেন কিকিরা।

চন্দন ঠাট্টা করে বলেছিল, "দৈবজ্ঞ।"

কিকিরা বলেছিলেন, "যদি দৈবজ্ঞ বলতে চাও বলো, তবে ব্যাপারটা ঠাট্টার নয় চন্দন। তোমায় আগে বলেছি, আবার বলছি, এই জগৎটা অনেক বড় বড়ই অদ্ভুত, আমরা তার কণার কণাও জানি না। তুমি রামপ্রসাদবাবুকে দৈবজ্ঞ বলে ঠাট্টা করছ, কিন্তু তুমি জান না, বিদেশে—যেমন হল্যান্ডে সবচেয়ে পুরোনো যে বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে সাইকলজির ডিপার্টমেন্টে বিশ-বাইশজন এই ধরনের মানুষকে রেখে নিত্যিদিন গবেষণা চালানো হচ্ছে। এই বিশ-বাইশজনকে আনা হয়েছে সারা য়ুরোপ খুঁজে—যাঁদের মধ্যে কমবেশী এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দেখা গিয়েছে যা সাধারণ মানুষের দেখা যায় না। ডাক্তার আর সাইকলজিস্টরা মিলে কত এক্সপেরিমেণ্ট না করছে এদের ওপর। জানার চেষ্টা করছে—কোন্ ক্ষমতা এদের আছে, যাতে এরা যা চোখে দেখেনি তার কথাও কিছু-না-কিছু বলতে পারে।"

কিকিরা যত যাই বলুন, চন্দন বিশ্বাস করেনি কোনো মানুষ অলৌকিক কোনো ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়।

তারাপদ চন্দনের মতন সবকিছু অবিশ্বাস করতে পারে না। বিশেষ করে কিকিরা যখন বলছেন। ব্যাপারটা যদি গাঁজাখুরি হত—কিকিরা নিজেই মানতেন না। ভুজঙ্গর আত্মা নামানো তিনি মানেননি। তারাপদ ঠিক বুঝতে পারছে না, কিন্তু তারও মনে হচ্ছে, কিছু থাকলেও থাকতে পারে, সাধারণ মানুষ সাধারণই, তারা কী পারে না-পারে, তা নিয়ে অসাধারণের বিচার হতে পারে না। রাজার ছেলে রাজাই হয়, এটা সাধারণ কথা, কিন্তু রাজার ছেলে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে গৌতম বুদ্ধও তো হয়।

এই সব দশরকম ভাবতে-ভাবতে শেষ পর্যন্ত তারাপদ কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন বিকেলে সে একাই কিকিরার বাড়ি গিয়ে হাজির। আজ সারাদিন আর বৃষ্টি নেই। তবে মাঝে মাঝে রোদ উঠলেও আকাশটা মেঘলা-মেঘলা। কলকাতা শহরে সব পুজোয়ই হইচই আছে—সরস্বতী পুজোর বেলায় কম হবে কেন! তারাপদর আজ টিউশ্যনি নেই, কালও নয়। ছুটি। দু-চার দিন ছুটি নিতে হবে আরও। তারাপদর একটা চাকরির জন্যে কিকিরাও উঠে পড়ে লেগেছেন। বলেছেন, "দাঁড়াও, তোমায় আমি চাকরিতে না বসিয়ে মরব না।"

কিকিরা বাড়িতেই ছিলেন। বললেন, "এসো এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

তারাপদ বলল, "কেন?"

কিকিরা বললেন, "কালকেই আমাদের যেতে হবে, বুঝলে! টিকিট-ফিকিট দিয়ে গেছে।"

"কালকেই? কখন ট্রেন?"

"রাত্তিরে।"

তারাপদ বসল। কিকিরাকে দেখতে লাগল।

কিকিরা সুটকেসের মতন একটা বাক্সে নানা রকম জিনিস গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। পাশে একটা ঝোলা।

তারাপদ বলল, "আপনার সেই দীপনারায়ণ আজ আবার এসেছিলেন?"

"না। সকালে আমি গিয়েছিলাম," কিকিরা বললেন। "একটা জায়গায় যাব, তার আগে কিছু ব্যবস্থা করা দরকার তো! তার ওপর তুমি সঙ্গে যাচ্ছ, চন্দনও যাবে দু-চার দিন পরে—দীপনারায়ণকে বলে আসা দরকার।"

সামান্য চুপ করে থেকে তারাপদ বলল, "উনি নিজে যাবেন না?"

"আজই ফিরে যাবেন।"

কী মনে করে তারাপদ হেসে বলল, "আমরা তা হলে কাল থেকে রাজ-অতিথি?"

কিকিরা মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে বললেন, "কাল এ-বাড়ি

ছাড়ার পর থেকে।"

"থাকব কোথায়?"

"রাজবাড়ির গেস্ট হাউসে।"

তারাপদ মনে মনে রাজবাড়ির একটা ছবি কল্পনা করবার চেষ্টা করল। দেখল, হিন্দী সিনেমার রাজবাড়ি ছাড়া তার মাথায় আর কিছু আসছে না। গঙ্গাধরবাবু লেনে বটুকবাবুর মেসের বাসিন্দে বেচারী, রাজবাড়ির কল্পনা তার মাথায় আসবে কেন? নিজের মনেই হেসে ফেলল তারাপদ।

কিকিরা নিজেই বললেন, "আমরা রাজবাড়িতে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকব না, বুঝলে!"

তারাপদ বুঝতে পারল না। নিজেদের পরিচয় ছাড়া আর কী পরিচয় আছে তাদের! অবাক হয়ে কিকিরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সুটকেস গুছোতে-গুছোতে কিকিরা বললেন, "দীপ-নারায়ণ চান না যে, রাজবাড়ির লোক বুঝতে পারে আমরা ওঁর হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছি। আমরা যাব পুরোনো বই কেনাবেচার ব্যবসাদার হিসেবে। পুরনো বই, পুরোনো ছবি।"

বুঝতে না-পেরে তারাপদ বলল, "সেটা কী?"

"সেটা ভয়ংকর কিছু নয়। এই কলকাতা শহরে আগে এক শ্রেণির ভাল ব্যবসা ছিল। প্রেস্টিজঅলা ব্যবসা। একশো দুশো দেড়শ বছর আগেকার সব ছবি—সাহেবদের আঁকা—বিলেতে ছাপা হত—নানা জায়গায় বিক্রি হত, এ-দেশেও। ছবিগুলো সব এদেশের মানুষকে নিয়ে, এখানকার নদী পাহাড় বন জঙ্গল নিয়ে। ছবিগুলো মোটা দামে বিকোতো, রাজারাজড়ারা, ধনী লোকেরা কিনত, বাড়িতে লাইব্রেরি বৈঠকখানা সাজাত। ছবি ছিল, বইও ছিল। সেসব বই আর পাওয়া যায় না, ছাপা হয় না। কোনো ধনী লোক মারা গেল, কিংবা রাজা স্বর্গে গেল, দেখাশোনার লোক নেই, তখন সেসব বই ছবি বিক্রি হয়ে যেত। কখনো কখনো নীলামে। আজকাল সে-ব্যবসা নেই। দু-একজন অবশ্য খোঁজে থাকে। তারা কোনো রকমে কেনা-বেচা করে পেট চালায়—এই আর কী।"

তারাপদ বলল, "আমি তো ওসব কিছু জানি না।"

কিকিরা বললেন, "জানবার তোমার দরকার নেই। আমিই কি ছাই জানি! যাদের বাড়িতে যাব, তারাও জানে না। বাপ-ঠাকুরদা ঘর সাজিয়েছিল, তারাও সাজিয়ে রেখেছে। নয়ত হাজার টাকা দামের ছবি একশো টাকায় ছাড়ে, না পাঁচশো টাকার বই পঞ্চাশ টাকায় ছেড়ে দেয়? তুমি শুধু আমার সঙ্গে থাকবে; যা করতে বলব, করে যাবে। বুঝলে?"

তারাপদ মাথা নাড়ল। বলল, "নামটামও পাল্টাতে হবে নাকি?"

"না, মোটেই নয়। ফাদার-মাদারের ডোনেট-করা নাম পাল্টাবে কেন?"

কিকিরা এতক্ষণ পরে একটা রসিকতা করলেন। তারাপদ হেসে ফেলল। বলল, "কিকিরা, আমরা তাহলে সত্যিসত্যি গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছি? শার্লক হোমস আর ওয়াটসন?"

কিকিরা বললেন, "বলতে পার। কিন্তু ওয়াটসনসাহেব, সেখানকার জঙ্গলে তোমার এই ফতুয়া চলবে না। একটা লম্বা গরম কোটটোট—পুরোনো হলেই ভাল—যোগাড় করতে পার না? নয়ত শীতে মরবে।"

তারাপদ বলল, "বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চেয়ে নেব।"

কিকিরা সুটকেস বন্ধ করলেন। বাইরে গেলেন। সামান্য পরে ফিরে এলেন।

তারাপদ যেন কিছু ভাবছিল; বলল, "কাল আমি রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো? রামপ্রসাদবাবুর জন্যেই কি আপনি দীপনারায়ণের এই ব্যাপারটা হাতে নিলেন?"

নিজের চেয়ারে বসে কিকিরা একটা সরু চুরুট ধরাচ্ছিলেন। চুরুট ধরানো হয়ে গেলে বললেন, "খানিকটা তাই।"

"খানিকটা তাই মানে?"

ফুঁ দেবার মতন করে ধোঁয়া ছেড়ে কিকিরা বললেন, "রামপ্রসাদবাবুর কোনো ভৌতিক ক্ষমতা আছে, মন্তর-ফন্তর জানা আছে—তা আমি বিশ্বাস করি না, তারাপদ। তবে আমি পড়েছি এবং দেখেছি এক-একজন মানুষ থাকে যারা সচরাচর না-দেখা জিনিস দেখতে পায়, কিংবা ধরো বুঝতে পারে। রামপ্রসাদবাবু যেটা পারেন সেটা হল, দেখা। যেমন ধরো, একটা ছেলে স্কুলে গেল—বিকেলেও বাড়ি ফিরে এল না, সন্ধেতেও নয়। বাড়ির লোক দুশ্চিন্তায় ভাবনায় ছটফট করছে, ভাবছে কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটল কি না! থানা-পুলিস হাসপাতাল করে বেড়াচ্ছে। এখন তুমি রামপ্রসাদবাবুকে গিয়ে ধরলে। তিনি যদি রাজী হন, তবে চোখ বন্ধ করে বসে থাকবেন কিছুক্ষণ। তারপর হয়ত চোখ বন্ধ করেই বলবেন—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তার মানে—সেই ছেলেটি সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে পারছেন না।...আবার এমনও হতে পারে, তিনি বললেন ঃ ছেলেটিকে তিনি আর-একটি কালো প্যান্ট পরা ছেলের সঙ্গে সাইকেল চেপে রাস্তায় ঘুরতে দেখছেন, কোনো পার্কের কাছে গিয়ে দুজনে বসল, তারপর দুই বন্ধু মিলে আবার সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। হঠাৎ কোনো বাস এসে পড়ল রাস্তায়। সাইকেলটাকে ধাক্কা মারল... তারপর—তারপর আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

তারাপদ শিউরে উঠে বলল, "মানে ছেলেটি বাসচাপা পড়েছে?"

"চাপাই পড়ুক আর ধাক্কা খেয়ে ছিটকেই পড়ুক—সেটা অন্য কথা। মরল, না হাসপাতালে গেল, সেটাও আলাদা কথা। ওই যেটুকু তিনি দেখলেন, মাত্র সেইটুকুই বলতে পারলেন।"

অবাক হয়ে তারাপদ কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "উনি যা বলেন তা কি সত্যি হয়?"

"হতে দেখেছি। শুনেছি।"

"এটা কেমন করে হয়?"

"তা বলতে পারব না। জানি না। কেমন করে হয় তা জানার জন্যেই তো কত লোক, পণ্ডিতটণ্ডিত, দিনের পর দিন মাথা ঘামাচ্ছে। ওই যে তোমাদের প্যারা-সাইকলজি বলে কথাটা আছে, এ-সব বোধহয় তার মধ্যে পড়ে।"

তারাপদর অবাক ভাবটা তখনও ছিল, তবু খুঁতখুঁত গলায় বলল, "কেমন করে এটা হয় তার একটা যুক্তি দেবার চেষ্টাও তো থাকবে।"

সরু চুরুটটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে আবার নামিয়ে নিলেন কিকিরা। বললেন, "বুঝতে পারলে, ধরতে পারলে তবে না যুক্তি। এখন মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় ঃ সিক্সথ্ সেন্স।"

"সিক্সথ্ সেন্স?"

"মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা আমরা জানি। এটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, কিংবা বোধ। কেউ কেউ বলছেন, মানুষ যখন পশুর পর্যায়ে ছিল, আদিম ছিল, তখন তার মধ্যে একটা বোধ ছিল যার ফলে সে অজানা আপদ-বিপদ-ক্ষতি বুঝতে পারত। এখনও বহু পশুর মধ্যে সেটা দেখা যায়। মানুষ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যত সভ্য হয়েছে ততই তার আদিমকালের অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। কিন্তু কখনো-কখনো দেখা যায় যে, সেই হাজার-হাজার বছর আগেকার মানুষের কোনো দোষ বা গুণ

কোটিতে এক আধজনের মধ্যে অস্পষ্টভাবে থেকে গেছে। একে তুমি প্রকৃতির রহস্য বলতে পার। এ ছাড়া আর কী বলা যায় বলো।"

তারাপদ বরাবরই খানিকটা নরম মনের ছেলে। সহজে কিছু উড়িয়ে দিতে পারে না। বিশ্বাস করুক না করুক অলৌকিক ব্যাপারে বেশ আগ্রহ বোধ করে। কিকিরার কথা তার ভাল লাগল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর তারাপদ বলল, "রামপ্রসাদবাবু কি আপনাকে বলেছেন, দীপনারায়ণের সন্দেহ সত্যি?"

"তিনি সত্যিমিথ্যে কিছু বলেননি। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসে থেকেও তিনি কিছু দেখতে পাননি রাজবাড়ির। কাজেই এমনও হতে পারে দীপনারায়ণের সন্দেহ মিথ্যে। বা এমনও হতে পারে সত্যি। রামপ্রসাদবাবুর কাছ থেকে আমরা কোনো রকম সাহায্য এখানে পাচ্ছি না, তারাপদ। কিন্তু আমি ওঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করি। উনি যখন দীপনারায়ণের ব্যাপারটা দেখতে বললেন, আমি না বলতে পারিনি।"

তারাপদ যেন কিছু মনে করে হেসে বলল, "তাহলে ধাঁধার পেছনে ছুটছি?"

"তা বলতে পারো।"

"ওহো, একটা কথা কাল আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি। রাত্রে আমার মনে পড়ল। দীপনারায়ণদের যে ছোরার বাঁটটা আপনি রেখেছেন, সেটার হাজার-হাজার টাকা দাম বললেন। অত দামী জিনিস আপনি নিজের কাছে রাখলেন কেন? দীপনারায়ণই বা কোন বিশ্বাসে আপনার কাছে রেখে গেল?"

কিকিরা এবার মজার মুখ করে তারাপদকে দেখতে-দেখতে হেসে বললেন, "ওয়াটসনসাহেব, এবার তোমার বুদ্ধি খুলেছে। সত্যি ব্যাপারটা কী জানো? ছোরার যে বাঁটটা তোমরা দেখেছ, ওটা নকল, ইমিটেশান। আসলটা রাজবাড়িতে রয়েছে। সিন্দুকের মধ্যেই।"

তারাপদ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

খানিক পরে আবার বললেন, "না, তোমার সঙ্গে মজা করলাম। ওটা আসলই। ও জিনিসের কি নকল হয়! উনি আমায় বিশ্বাস না করলে রাজবাড়িতে নিয়ে যাবেন কেন! যাক্‌গে, যাঁর জিনিস তাঁকে ফেরত দিয়ে এসেছি।"

তারাপদ চিরটাকাল কলকাতায় কাটিয়েছে। একেবারে ছেলেবেলায় অবোধ বয়সে মা-বাবার সঙ্গে কবে এক-আধবার দেশের বাড়িতে গেছে, কবে কলেজ-টলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে দলে ভিড়ে ব্যান্ডেল চার্চ কিংবা বিষ্টুপুর বেড়াতে গেছে, সে-সব কথা বাদ দিলে তার ঘোরা-ফেরার কোনো বালাই কোনকালে ছিল না। ভুজঙ্গভূষণকে দেখতে গিয়েছিল শংকরপুর, আর এবার এল কিকিরার সঙ্গে দীপনারায়ণের রাজত্বে। অবশ্য এখন রাজত্ব বলতে কিছুই নেই, রাজার দল প্রজা হয়ে গিয়েছে। রাজত্ব না থাক, পুরনো সম্পদ-সমৃদ্ধি তো খানিকটা থাকবেই। আর লোকের মুখে রাজা নামটা অত সহজে কি যায়!

রাত্রে হাওড়া ছেড়েছিল যে গাড়িটা, পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ তারাপদদের এক স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। তারাপদর কাছে সবই বিস্ময়। কলকাতায় বাস, ট্রাম, কর্পোরেশানের ময়লা-ফেলা গাড়ি, ঠেলা, রিকশা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। কলকাতা থেকে দশ পা বাইরে গেলেই হয় কলকারখানা, না হয় এঁদো পুকুর, বাঁশঝোপ, কচুরিপানা এদিকে যে-মুহূর্তে এসে পড়ল তারাপদ, ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে জানলা দিয়ে দেখল—সব পালটে গেছে। মাঠের পর মাঠ, কোথাও নিচু, কোথাও বা উঁচু, হিমে কুয়াশায় সাদা চারপাশ, ঝোপঝাড়, বন, পাহাড়ী বা পাথুরে ঢল নেমেছে, বালিয়াড়ি। এ একেবারে আলাদা দৃশ্য। এমনি করেই সূর্য উঠে গেল, বেলা বাড়তে লাগল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, মাটির রঙ পালটে গিয়েছে। বনজঙ্গলের দৃশ্যগুলোও ঘনঘন চোখে পড়ছিল। পাহাড়ের মাথা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলেছে তো চলেইছে, ঢেউয়ের মতন উঁচুনিচু হয়ে।

তারাপদরা যেখানে নামল, তাকে বড় ছোট কোনো স্টেশনই বলা যায় না। তবু রেলগাড়ি যেখানে থামে, কাঁকর-বিছানো স্টেশন পাওয়া যায় দেখতে, তাকে স্টেশন না বলে উপায় কী!

স্টেশনের গায়ের ওপরই যেন জঙ্গল হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তারাপদ গাছটাছ চেনে না, তবু তার মনে হল, নিশ্চয় শাল-সেগুন হবে।

স্টেশনের বাইরে জিপ ছিল। দীপনারায়ণ পাঠিয়েছেন।

কিকিরাকে কিছু বলতে হল না, তাঁদের দেখামাত্র জিপ-গাড়ির লোক এগিয়ে এল। কলকাতার লোক বুঝতে এদের বোধ হয় অসুবিধে হয় না। অন্য যারা পাঁচ-দশজন নেমেছিল—সবই স্থানীয়।

মালপত্র জিপে তুলে নিল যে, তার নাম বলল, দশরথ। বাঙালী। তার বাংলা উচ্চারণে মানভূম-সিংভূমের টান, তারাপদ যা জানে না, কিকিরাই বলে দিলেন।

জিপগাড়ির ড্রাইভারের নাম জোসেফ। মাথায় খাটো, বেঢপ প্যান্ট পরনে, গায়ে কালো সোয়েটার, গলায় মাফলার। মাথায় একটা নেপালী টুপি।

কিকিরা আর তারাপদ গাড়ির পেছনে, সামনে জোসেফ আর দশরথ। গাড়ি চলতে শুরু করল।

কিকিরা আলাপী লোক, দশরথ আর জোসেফের সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। কে কতদিন আছে রাজবাড়িতে, কার কোথায় বাড়ি, জায়গাটা কেমন, এখানকার জঙ্গলে কোন্ কোন্ পশু দেখা যায়—এইরকম সব গল্প। দশরথরা দু পুরুষ রাজবাড়িতে কাজ করে কাটাচ্ছে, তার বাড়ি ঝাড়গ্রামে, দশরথের কাজ হল বাইরের লোকের তদারকি করা, যখন বাইরের লোকজন থাকে না, তখন তার প্রায় কোনো কাজই থাকে না সারাদিন, রাজবাড়ির বাগানের তদারকি করে দিন কাটে।

জোসেফ লোকটা ক্রিশ্চান। আগে কাজ করত চাঁইবাসায়। বছর দুয়েক হল রাজবাড়িতে এসে ঢুকেছে। আগে ট্রাক চালাত, পিঠের শিড়দাঁড়ায় এক বেয়াড়া রোগ হল, ট্রাক চালানো ছেড়ে দিল জোসেফ। তার কোনো দেশ-বাড়ি নেই, আত্মীয়স্বজন নেই।

তারাপদ কিকিরাদের কথাও শুনছিল, আবার চারপাশের বনজঙ্গল গাছপালা দেখছিল। মাইল চল্লিশ যেতে হবে জিপে। রাস্তা সরু, পিচ করা। এক-একটা জায়গায় যেন ঘন জঙ্গলের গা ছুঁয়ে চলে গেছে রাস্তাটা, কখনো-কখনো পাহাড়তলি দিয়ে, মাঝে মাঝে ছোট-ছোট লোকালয় ভেসে উঠছে, পাঁচ সাতটা কুঁড়ে, আদিবাসী লোকজন চোখে পড়ছে, সামান্য কিছু খেত-খামার।

দেখতে-দেখতে জিপগাড়িটা কখন একেবারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বিশাল বিশাল গাছ, বড় বড় ফাটল, পাথর, ঝোপ, সূর্যের আলোও ভাল করে ঢুকতে পারছে না যেন।

তারাপদ কিকিরাকে বলল, "ভীষণ জঙ্গল। ডিপ ফরেস্ট।"

কিকিরা বললেন, "সরকারী জংগল সব, বুঝলে। এখন যত জঙ্গল সব রিজার্ভ ফরেস্ট হয়ে গিয়েছে।" বলে তিনি দশরথকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই জঙ্গলের নাম কী দশরথ?"

"আজ্ঞে, আমরা বেরার জংগল ডাকি," দশরথ বলল, "বিশাল জঙ্গল উত্তরে।"

বেরার জংগলের মধ্যে অবশ্য জিপ ঢুকল না। জঙ্গলের পাশ দিয়ে আরও পুবের দিকে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে এক জায়গায় গাড়ি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। জোসেফ ইশারা করে তার ডান দিকটা দেখাল। জোসেফ বলল, "সাপ।"

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে কিকিরা আর তারাপদ দেখলেন, একটা বিশাল সাপ রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে। একেবারে স্থির। যেন মরে পড়ে রয়েছে।

এত বড় সাপ তারাপদ জীবনে দেখেনি। সাপটা দেখতে-দেখতে হঠাৎ তার গা কেমন গুলিয়ে উঠল।

শীতকালে সাপ বড় একটা বেরোয় না বলে শুনেছিলেন কিকিরা, কিন্তু এ যে মস্ত সাপ।

জোসেফ জিপ নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকল। সাপটা রাস্তা ছেড়ে সরে না গেলে সে গাড়ি নিয়ে এগুতে পারবে না।

দশরথ গাড়ি থেকে নেমে পাথর কুড়িয়ে সাপের দিকে ছুড়তে লাগল, যাতে সাপটা রাস্তা ছেড়ে চলে যায়। তারাপদর এমনই গা ঘিনঘিন করছিল যে, বমি চেপে সে বসে থাকল কোনো রকমে।

কিকিরা আস্তে গলায় বললেন, "সর্পযাত্রা ভাল না মন্দ, তারাপদ?"

তারাপদ কিছু বলল না।

রাজবাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুরই হয়ে গেল প্রায়। তারাপদ কল্পনাই করেনি এই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা রাজবাড়ি থাকতে পারে। চোখের সামনে যেন ভোজবাজির মতন এক বিশাল ইমারত ভেসে উঠল। বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা রাজবাড়ির কম্পাউন্ড। বিশাল ফটক। মূল রাজবাড়িটা সামনে, দোতলা বিশাল বাড়ি, সেকেলে দোতলা, মানে আজকালকার বাড়ির প্রায় চারতলার কাছাকাছি উঁচু। কলকাতার অনেক পুরোনো বনেদী বাড়ির এই রকম ধাঁচ দেখেছে তারাপদ, একটানা বারান্দা, আর ঘর। মাথার দিকে আর্চ করা। মোটা মোটা গোল থাম। মূল রাজবাড়ির মুখেও লোহার ফটক।

রাজবাড়ির মুখোমুখি, খানিকটা তফাতে গেস্ট হাউস। একতলা বাড়ি। উঁচু পাঁচিল দিয়ে কম করেও বিঘে দশ-পনেরো জমি ঘেরা। ফুলের বাগান, পাখিঘর, একদিকে ছোট মতন এক বাঁধানো পুকুর। মন্দিরের মতনও কিছু একটা দেখা যাচ্ছে পশ্চিমে।

দশরথ জিনিসপত্র নামাতে লাগল। জোসেফ গেল জল খেতে।

এখন পাবেন
হাই পাওয়ার সার্ফ

ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে যা নজরে পড়ে !

নতুন হাই পাওয়ার সার্ফের আছে সত্যিকারের ধোওয়ার অনেক বেশী ক্ষমতা, অন্য যে-কোনো ধোওয়ার-পাউডারের চেয়েও বেশী। আর এজন্যেই এর বেশী ক্ষমতার ফেনা থাকে বেশীক্ষণ, ধোয় বেশী গভীরে গিয়ে...আপনার পরিবারের সবার জামাকাপড় হয়ে ওঠে সবচেয়ে সাদা।

নতুন হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা...দেখায় সবচেয়ে সাদা !

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন। কেবলমাত্র কার্টনে আর ছোট প্যাকেটে বিক্রী করা হয়। কখনও খুলে খুচরো বিক্রী করা হয় না   লিনটাস-SU.191-140 BG

তারাপদ চারদিকে তাকাতে-তাকাতে বলল, "এই জংগলের মধ্যে এমন বাড়ি, ভাবাই যায় না।" -

কিকিরা বললেন, "একসময়ে করেছিল, এখন আর ধরে রাখতে পারছে না। দেখছ না, চারদিকে কেমন পড়তি চেহারা। রাজবাড়ির গায়ে ছোপ ধরে গেছে, শ্যাওলা জমেছে, বাগানে ফুলের চেয়ে আগাছাই বেশী। ওদিকে তাকিয়ে দেখো, রাজবাড়ির মাঠে কিছু চাষবাস হচ্ছে। দীপনারায়ণ বলেছিলেন, লাখ পাঁচেক টাকা ধার ঝুলছে মাথার ওপর। দেখছি, সত্যিই তাই।"

কিকিরা খেয়াল করেননি, তারাপদও নয়, হঠাৎ পেছন থেকে কার যেন গলা শোনা গেল। মুখ ফিরিয়ে তাকালেন কিকিরা। তাকিয়ে অবাক হলেন। যাত্রাদলের শকুনির মতন চেহারা, রোগা লিকলিকে শরীর, মাথার চুল সাদা, পাটের মতন দাড়ি তাও আবার বাবরি করা, গর্তে ঢোকা চোখ, ধূর্ত দৃষ্টি, পরনে ধুতি, গায়ে ফতুয়া আর চাদর। খুব বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করে সেই শকুনির মতন লোকটা বলল "আমার নাম শশধর সিংহ। রাজবাড়ির কর্মচারী। আসুন আপনারা, বিশ্রাম স্নান সেরে খাওয়া-দাওয়া করুন। আপনাদেরই অপেক্ষা করছিলাম। আসুন।"

রাজবাড়ির অতিথিশালা; ব্যবস্থা সবই রয়েছে—খাট, আলমারি, আয়না, ড্রয়ার, যা যা প্রয়োজন। এক সময় ঘরের শোভা ছিল, ঝকমকে ভাব ছিল বোঝা যায়—এখন সেই শোভার অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। তবু যা আছে—তেমন পেলেই তারাপদর মতন মানুষরা বর্তে যায়।

পাশাপাশি দুটো ঘর ব্যবস্থা করা ছিল কিকিরাদের। স্নানটানের ঘর সামনেই, শোবার ঘরের গায়েগায়ে। খাবার ব্যবস্থা খাবার ঘরে।

শশধর ছিল না। কিকিরা এক সময়ে তারাপদকে বললেন, "কেমন লাগছে শশককে?"

"শশক? কে শশক?"

"ওই শশধরকে?"

তারাপদ বলল, "সুবিধের লাগছে না।"

"ওর বাঁ হাতে ছ'টা আঙুল লক্ষ করেছ?"

"না।" তারাপদ অবাক হয়ে বলল।

"লক্ষ করো। যতটা পারবে লক্ষ করবে।...বাঁ হাতের আঙুল ছ'টা; কানের লতিতে ফুটো, বোধ হয় এক সময় মাকড়ি পরত।"

"পুরুষমানুষ মাকড়ি পরবে কেন?"

"অনেক জায়গায় পুরুষমানুষও মাকড়ি পরে। এদের বোধ হয় রাজবংশের ব্যাপার—পারিবারিকভাবে পরতে হত আগে, এখন ছেড়ে দিয়েছে।"

"শশধর কি রাজবংশের লোক?"

"পদবী সিংহ বলল, সিং সিংহ হতে পারে। রাজবংশের সরাসরি কেউ নয় হয়ত—তবে সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। যাক গে, নাও; আর দেরি করো না। স্নানটান করে নাও। খিদে পেয়ে গেছে বড়।"

স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে কিকিরা আর তারাপদ যে-যার ঘরে শুয়ে পড়লেন। তখন শীতের দুপুর ফুরিয়ে আসছে।

অবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় গড়ানো মানেই ঘুম। তার ওপর কাল ট্রেনে রাত কেটেছে। কিকিরা যখন তারাপদকে ডাকলেন তখন শীতের বিকেল বলে কিছু নেই, ঝাপসা অন্ধকার নেমে এসেছে।

মুখে চোখে জল দিয়ে চা খেল তারাপদ কিকিরার সঙ্গে। তারপর অতিথিশালার বাইরে এসে পায়চারি করতে লাগল। সন্ধের আগেই শীতের বহরটা বোঝা যাচ্ছিল, রাত্রে যে কতটা ঠাণ্ডা পড়বে তারাপদ কল্পনা করতে পারল না।

এমন সময় শশধর আবার হাজির। পোশাক-আশাক খানিকটা অন্যরকম। লম্বা কোর্তার ওপর জ্যাকেট, তার ওপর চাদর। পায়ে ক্যানভাস জুতো।

শশধর সদালাপী মানুষের মতন হাসল, বিনয় করে জিজ্ঞেস করল, কোথাও কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না! তারপরে বলল, "দু বার এসে ফিরে গিয়েছি, আপনারা ঘুমোচ্ছিলেন। রাজাসাহেব বলেছেন, আপনারা জেগে উঠলে তাঁকে খবর দিতে।"

কিকিরা চুরুট টানতে-টানতে বললেন, "খবর দিন।"

"উনি নীচেই আছেন, দেখা করতে চাইলে চলুন।"

"অপেক্ষা করছেন?"

"না অপেক্ষা করছেন না; শরীর ঠিক রাখার জন্য এ-সময় তিনি ভেতরের লনে একটু টেনিস খেলেন।"

"বাঃ বাঃ! কার সঙ্গে খেলেন?"

"ছেলের সঙ্গে।"

"আচ্ছা—আচ্ছা—। তা চলুন দেখা করে আসি। এখন রাজাসাহেব নিশ্চয় বিশ্রাম করছেন!"

"আসুন।"

শশধরের সঙ্গে কয়েক পা মাত্র এগিয়েই কিকিরা বললেন, "ওহো, একটু দাঁড়ান শশবাবু, আমি আসছি।" বলেই কিকিরা অতিথিশালার দিকে চলে গেলেন।

শশধর কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত; তারপর তারাপদর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওঁর নামটা যেন কী বলেছিলেন তখন—?"

"কিঙ্করকিশোর রায়।"

"আপনার?"

নাম বলল তারাপদ।

শশধর বললেন, "বইপত্রের ব্যবসা করেন আপনারা?"

"ওল্ড বুকস্ অ্যান্ড পিকচার্স।" তারাপদ মেজাজের সঙ্গে বলল।

"দোকানটা কোথায় মশাই?"

তারাপদ ঘাবড়ে গেল। এ-রকম একটা আচমকা প্রশ্ন সে আশাই করেনি। কিন্তু যার দোকান রয়েছে সে দোকানের ঠিকানা বলতে পারবে না—এ কেমন কথা? তারাপদ ধরা পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে সামলে নিয়ে কিকিরার বাড়ির ঠিকানা বলল। নিজের ঠিকানাটাই বলত—শেষ সময়ে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়—গঙ্গাচরণ মিত্তির লেন বললেই কেলেঙ্কারি হত; দোকানের ঠিকানায় 'লেন-টেন' মানে গলি-ঘুঁজি থাকলেই ইজ্জত চলে যেত।

"জায়গাটা কোথায়?" শশধর জিজ্ঞেস করল ছোট ছোট চোখ করে।

"পার্ক সার্কাস।"

"আপনার দোকান? না ওই ভদ্রলোকের?"

"ওঁর। আমি কাজ করি।"

শশধর পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল। চতুর চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, "আপনার মনিব লোকটি ভালই, কর্মচারীকে আদর-যত্ন করে দেখছি।"

তারাপদ বুঝতে পারল গোলমেলে ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে শশধর ধূর্ত, তাকে ধাপ্পা দিয়ে পার পাওয়া সহজ নয়। কথা ঘোরাবার জন্যে সে বলল, "জায়গাটা বেশ ভাল। এদিকে কতদিন শীত থাকে?"

"থাকবে। আরও মাসখানেক।"

কিকিরা আসছিলেন। তারাপদ কিকিরাকে দেখতে পেয়ে

যেন বেঁচে গেল।

কাছে এসে কিকিরা বললেন, "সিংহীমশাই, আপনাদের গেস্টরুমের দরজাগুলো কোন্ কাঠের?"

শশধর ঠিক বুঝতে পারল না। "আজ্ঞে?"

"শাল না সেগুন কোন্ কাঠের বলুন তো?"

"শাল কাঠের। আপনি দরজা দেখতে গিয়েছিলেন?"

"দরজা দেখতে কি কেউ যায়, মশাই? গিয়েছিলুম চশমা আনতে। আমি আবার রাতকানা—নাইট ব্লাইন্ড। সন্ধে হল কি আমি অন্ধ হয়ে গেলুম একরকম।" বলে কিকিরা হাতে রাখা চশমার খাপ দেখালেন।

শশধর বলল, "এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। দেখছেন কেমন করে?"

"কই আর দেখছি! ঝাপসা ঝাপসা দেখছি। আপনাকে ভাসা ভাসা দেখতে পাচ্ছি। এইবার চশমাটা পরব।"

কিকিরা খাপ খুলে একটা নিকেল ফ্রেমের চশমা বের করে পরতে লাগলেন। তারাপদ কোনোদিন কিকিরাকে চশমা পরতে দেখেনি। বুঝতে পারল না কোন মতলবে কিকিরা ঘরে গিয়েছিলেন, কেনই বা চশমা নিয়ে ফিরলেন!

শশধর কোনো কথা বলল না।

তিন জনেই হাঁটতে লাগল আবার। হঠাৎ কোথা থেকে যেন কুকুরের ডাক শোনা গেল। সাধারণ ডাক নয়, গর্জনের মতন। রাজবাড়ির দিক থেকে প্রথমে একটা পরে যেন একদল কুকুরের ভয়ংকর ডাক শোনা যেতে লাগল। তারাপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শশধর বিনীতভাবেই বলল, "ইন্দরবাবুর কুকুর। ভয় নেই।"

৪

কিকিরাদের দীপনারায়ণের কাছে পৌঁছে দিয়ে শশধর চলে গেল।

রাজবাড়ির নীচের তলায় একসারি ঘরের মধ্যে তারাপদরা যে-ঘরটায় এসে বসল সেটা ঠিক বসার ঘর নয়, বসা এবং অফিস করা—দুই যেন চলতে পারে। বেশ বড় মাপের ঘর, মস্ত মস্ত দরজা জানলা, মেঝেতে কার্পেট পাতা, আসবাবপত্র সাবেকী এবং ভারী ধরনের। রাজবাড়িতে ইলেকট্রিক নেই, ডিজ ল্যাম্প, পেট্রোম্যাক্স, হ্যাজাক—এইসব জ্বলে।

দীপনারায়ণ বসতে বললেন কিকিরাদের।

কিকিরা ঘরের চারদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, তারপর বসলেন। তারাপদ বোকার মতন দাঁড়িয়েছিল, কিকিরাকে বসতে দেখে বসে পড়ল।

দীপনারায়ণ বললেন, "গাড়িতে আপনাদের কোনো কষ্ট হয়নি তো?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "না, আরামেই এসেছি। জীপ গাড়িতে খানিকটা সময় লাগল।"

"অনেকটা দূর। জঙ্গলের রাস্তা।"

তারাপদ নজর করে দীপনারায়ণকে দেখছিল। কলকাতায় সেদিন কয়েক মুহূর্তের জন্যে যাকে দেখেছিল—সেই মানুষই সামনে বসে আছেন—তবু আজ অন্যরকম লাগছে। দীপনারায়ণ সুপুরুষ, গায়ের রঙ উজ্জ্বল, চোখমুখ পরিষ্কার, সুশ্রী, মাথার চুল পাতলা, শরীর স্বাস্থ্য দেখলে মনে হয় না চল্লিশের বেশী বয়েস। অথচ কিকিরা বলেছেন, দীপনারায়ণের বয়েস পঞ্চাশ। দেখতে ভাল লাগে মানুষটিকে। ভদ্র, নিরহঙ্কার ব্যবহার।

দীপনারায়ণ কিকিরার সঙ্গে আরও দু একটা কী যেন সাধারণ কথা বললেন, তারাপদ খেয়াল করে শুনল না।

কলকাতায় ঠাকুর বিসর্জন কিংবা মারোয়াড়ী বিয়ে-টিয়েতে তাসা পার্টির সঙ্গে যেমন গ্যাস বাতি নিয়ে আলোর মিছিলদাররা চলে—তাদের হাতে থাকে বাহারী বাতি—সেই রকম একটা বাতি ঘরের একপাশে জ্বলছিল। আজকাল এ-রকম বাতি কলকাতাতেও কম দেখা যায়, আগে যেত কার্বাইডের আলো, কিন্তু অন্য ধাঁচের; চারদিক থেকে চারটে সরু সরু নল বেরিয়ে চারদিক ঘিরে রেখেছে, মুখ খোলা কাচের শেড, আলোর শিখা যেন কাচে না লাগে। মাত্র দুটি নলের মুখে শিখা জ্বলছিল, অন্য দুটো নেবানো। শিখাও কমানো রয়েছে। ঘরে কার্বাইডের সামান্য গন্ধ।

দীপনারায়ণ বললেন, "এবার কাজের কথা হোক কিংকরবাবু!"

"বলুন।"

"আমি আপনাদের কথা বলে রেখেছি। তিন জনের কথাই দু জনে এসেছেন।"

"আর একজন পরশু নাগাদ আসবে।"

"আমারও তাই বলা আছে।...আমি বলেছি, আপনারা এই রাজবাড়ির লাইব্রেরির ছবি আর বইয়ের ভ্যালুয়েশান করতে আসছেন। যদি দর-দস্তুরে পোষায় আপনারা কিছু কিনতে পারেন। নয়ত কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনারা পার্টি যোগাড় করবেন, বিক্রি-বাটা হয়ে গেলে কমিশন পাবেন। ভ্যালুয়েশান করার জন্যে ভ্যালুয়ার হিসেবে আপনারা রাজবাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকবেন, আর কাজ শেষ হয়ে গেলে দু হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাবেন।...বোধহয় ঠিকই বলেছি, কী বলেন?"

কিকিরা বললেন, "ঠিকই বলেছেন।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "শশধরবাবু আমায় কতগুলো কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।"

দীপনারায়ণ তারাপদর দিকে তাকালেন, কিকিরাও।

একটু আগে যেসব কথা হয়েছে শশধরের সঙ্গে, তারাপদ তা বলল।

কিকিরা বললেন, "যা বলেছ ঠিকই বলেছ। আবার কিছু জিজ্ঞেস করলে বলো, হিসেব তৈরী করা—চিঠি লেখা এইসব কাজগুলো তুমিই করো, আমি ও-সব করতে পারি না।"

ঘাড় নাড়ল তারাপদ।

কিকিরা দীপনারায়ণকে বললেন, "আমায় কটা কথা বলতে হবে দীপনারায়ণবাবু?"

"বলুন।"

"তার আগে আরও একটা কথা আছে। কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে রাজবাড়ির ছবি বই—এ-সব কেন আপনি বেচে দিতে চাইছেন তার জবাব কী হবে?"

দীপনারায়ণ তাঁর সিগারেটের কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে কেসটা কিকিরার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

কিকিরা সিগারেট নিলেন না।

দীপনারায়ণ সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, "কেউ জিজ্ঞেস করবে না। বিক্রি করার অধিকার আমার আছে। তবু যদি জিজ্ঞেস করে, তার জবাব আমার তৈরী আছে।"

"সেটা জানতে পারি?"

"পারেন। পুরোনো ছবি কিংবা বই আমি বুঝি না। আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। জয়নারায়ণ কিছু কিছু বুঝত। তার ভালও লাগত। জয়নারায়ণ ছাড়া লাইব্রেরি ঘরে এ-বাড়ির কেউ পা দিত না। সে যখন নেই, ওই লাইব্রেরি সাজিয়ে রাখা অকারণ।" দীপনারায়ণ একটু থেমে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন—দরজার দিকে পরদা নড়ে উঠল। তিনি চুপ করে গেলেন।

মাঝবয়সী একটা লোক এসে কফি দিয়ে গেল।

লোকটা চলে যেতে দীপনারায়ণ বললেন, "জয় নেই এটা একটা কারণ। আর অন্য কারণ হল, আমাদের অবস্থা। আপনাকে আমি আগেই কলকাতায় বলেছি—আমাদের অবস্থা পড়ে গেছে, জমি-জায়গা হাত-ছাড়া হয়েছে আগেই, জঙ্গল-টঙ্গল এখন সরকারী সম্পত্তি, আমাদের একটা ক্লে মাইন ছিল—সেটা নানা ঝামেলায় বেচে দিতে হয়েছে। লাখ পাঁচেক টাকা ধার। মামলা মোকদ্দমায় বছরে হাজার দশ পনেরো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে এখনও।"

তারাপদ বেশ অবাক হচ্ছিল। রাজারাজড়া মানুষ—তারও টাকা-টাকা চিন্তা। তা হলে আর তারাপদ কোন দোষ করল! দীপনারায়ণ মানুষটিকে ভালই লাগছিল তারাপদর, কেমন খোলামেলাভাবে সব কথা বলে যাচ্ছেন।

কফি নিতে বললেন দীপনারায়ণ।

কিকিরা কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে বললেন, "এবার আমায় অন্য কয়েকটা কথা বলুন?"

দীপনারায়ণ জবাব দেবার জন্যে তাকিয়ে থাকলেন।

"রাজবাড়িতে কে কে থাকেন? মানে আপনাদের পরিবারের?"

"আমাদের এই বাড়ির তিনটে মহল। কাকার, আমার আর জয়নারায়ণের।"

"মহলগুলো কেমন একটু বলবেন?"

"কাকা থাকেন পুবের মহলে, জয় থাকত মাঝ-মহলে, আর আমি পশ্চিম মহলে...।"

"নীচের মহলে কারা থাকে?"

দীপনারায়ণ কালো কফিতে চিনি মিশিয়ে কাপটা তুলে নিলেন। "নীচের মহলের এই সামনের দিকটা আমাদের অফিস-কাছারি, বাইরের লোকজন এলে বসাটসা, লাইব্রেরির জন্যে রাখা আছে। বাবার আমল থেকেই। ভেতর দিকে আমরা সকলেই ওপর আর নীচের মহল যে যার অংশ মতন ব্যবহার করি। শুধু নীচের একটা দিক রাজবাড়িতে যারা কাজ করে

তাদের থাকার জন্যে।”

কফি খেতে খেতে কিকিরা বললেন, “আপনার কাকা কি একা থাকেন?”

“না। কাকিমা জীবিত রয়েছেন। কাকার প্রথমা স্ত্রীর ছেলে—আমার খুড়তুতো ভাই এখানে থাকে না। সে আসামে থাকে। ডাক্তার। দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি মেয়ে। সে বোবাহাবা। সে এখানেই থাকে। তার বিয়ে হয়নি। কাকিমার এক ছোট ভাই, সেও থাকে কাকার কাছে।”

“ছোট ভাইয়ের নাম?”

“ইন্দর।”

“কী করে?”

“কিছু করে না। ভাল শিকারী। খায় দায় ঘুমোয় আর কুকুর পোষে।”

“কুকুর পোষে?”

“কুকুরের শখ ওর। পাঁচ সাতটা কুকুর এনে রেখেছে। একেবারে জংলী। চেহারা দেখলে ভয় করে। বুনো কুকুর, অ্যালসেশিয়ান কিংবা টেরিয়ারের চেয়ে কম নয়।”

তারাপদ ভয়ে ভয়ে বলল, “খানিকটা আগে আমরা কুকুরের ডাক শুনেছি।”

“ইন্দরের একটা কুকুর-ঘর আছে। কুকুরদের মাঝে মাঝে হাণ্টার কষায়। বলে ট্রেনিং দিচ্ছে।”

কিকিরা কুকুরের কথা কানেই তুললেন না যেন, বললেন, “আপনার পরিবারের কে কে আছেন দীপনারায়ণবাবু?”

দীপনারায়ণ সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, “আমার মা শয্যাশায়ী, পঙ্গু। স্ত্রী মারা গেছেন। বড় ছেলে দেরাদুন মিলিটারি কলেজে। ছোট ছেলে সিবাস্টিন কলেজে পড়ে, মাদ্রাজের কাছে। এখন সে ছুটিতে। এখানেই রয়েছে।”

“জয়নারায়ণবাবুর কে কে আছেন?” কিকিরা জিজ্ঞেস করল।

“জয়ের স্ত্রী রয়েছেন। একটি ছোট মেয়ে, বছর চার বয়েস। এখন এঁরা নেই, ভুবনেশ্বর গিয়েছেন।”

কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে কিকিরা যেন কিছুক্ষণ কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, “শশধর কি আপনাদের দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়?”

“না,” মাথা নাড়লেন দীপনারায়ণ, “এ-বাড়িতে পঁচিশ ত্রিশ বছর রয়েছে। বাবার আমলের কর্মচারী। অনুগত।”

“এই লোকটাকে আপনার সন্দেহ হয় না?”

দীপনারায়ণ তাকালেন কিকিরার দিকে। সামান্য পরে বললেন, “এত দুঃসাহস ওর হবে? শুনেছি, বাবা ওকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন।”

“কেন?”

“আমি জানি না।”

“ইন্দর লোকটাকে আপনি সন্দেহ করেন?”

“করি। ও একটা জন্তু। অথচ জয় ওকে পছন্দ করত। বন্ধুই ছিল জয়ের।”

কিকিরা আবার চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, “দীপনারায়ণবাবু, আপনি কি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করেন, আপনাদের রাজবাড়িতে যে ছোরাটা ছিল তার কোনো জাদু আছে?”

দীপনারায়ণ বললেন, “করি। হয়ত এটা আমাদের সংস্কার। বিশ্বাস। কোনো প্রমাণ তো দেখাতে পারব না কিংকরবাবু।”

কিকিরা আর কিছু বললেন না।

তিন চারটে দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। চন্দনও এসে পড়েছে। তারাপদরা যেভাবে এসেছিল সেই ভাবেই। জীপ গিয়েছিল চন্দনকে আনতে, সঙ্গে ছিল তারাপদ। দশরথ আর জোসেফের সামনে দুই বন্ধু কেউই মুখ খোলেনি, অন্য পাঁচ রকম গল্প করছিল, কখনো কখনো সাঁটে কথা বলছিল।

চন্দন বুঝতে পারল, কিকিরা কোনো দিকেই এগুতে পারেননি; লাইব্রেরি ঘরে বসে-বসে দিন কাটাচ্ছেন আর চুরুট ফুঁকছেন, কাগজ-পেনসিল নিয়ে অকারণে লিস্টি করছেন। চন্দন মনে মনে একটু যেন খুশীই হল, কিকিরা এবার জব্দ হয়েছেন। বললে শোনেন না, কোথাকার কোন্ দীপনারায়ণ দিয়ে এক গাঁজা ছাড়ল, আর এক অন্তর্যামী রামপ্রসাদ কী বলল—কিকিরা অমনি নাচতে নাচতে ছুটে এলেন। এ-বয়সে এসব পাগলামি করলে কি চলে!

এসব দিকে চন্দনও আগে আসেনি। বেড়াতে আসার পক্ষে জায়গাটা নিঃসন্দেহে ভাল। তবে কখনো-কখনো ঘন জঙ্গল দেখে তার মনে হচ্ছিল, সিনেমার ছবিতে আফ্রিকার জঙ্গল বলেও এটা চালিয়ে দেওয়া যায়।

গেসট হাউসে পেঁছে কিকিরার সঙ্গে দেখা হল। বললেন, "এসো এসো স্যান্ডাল উড, তোমার জন্যেই হাঁ করে বসে আছি।"

চন্দন হেসে বলল, "শুনলাম তাই তারার কাছে, বসেই আছেন, উঠে দাঁড়াতে পারছেন না।"

"এখনো পারিনি।"

"পারবেন বলে মনে হয়?"

"দেখা যাক। তুমি আমার জিনিস এনেছ?"

"এনেছি।" বলে চন্দন চোখের ইশারায় তারাপদকে দেখাল, বলল, "তারা জানে?"

"না।"

চন্দন বলল, "সে কী! তারা জানে না?" তারাপদর দিকে তাকাল চন্দন। "কিকিরা আমায় খানিকটা কুকুর-বিষ আনতে বলেছিলেন। কেমন করে বলেছিলেন—জানিস? সিক্রেট মেসেজ। খামের ওপর ছোট্ট করে লিখেছেন—ব্রিং ডগ্ পয়জেন তার ওপর স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছেন। কার বাবার সাধ্যি ধরে। স্ট্যাম্প না-তুললে দেখা যাবে না।"

তারাপদর মনে পড়ল, হাওড়া স্টেশন ছাড়ার আগে কিকিরা চন্দনকে এই ম্যাজিকটা বলে দিচ্ছিলেন। বলেছিলেন, চিঠি মতন কাজ করো, কোনো স্পেশ্যাল মেসেজ থাকলে ওই কায়দায় জানাব।

তারাপদ কিকিরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, বুঝতে পারল না কুকুর-বিষ কী কাজে লাগবে। কুকুর মারবেন নাকি কিকিরা? কিকিরাও কিছু বললেন না।

স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে চন্দন এসে তারাপদর ঘরে শুয়ে পড়ল। চন্দনের জন্যে একটা বাড়তি খাট তারাপদর ঘরে ঢোকানো হয়েছে। আলাদা ঘর অবশ্য ছিল—কিন্তু চাকর-বাকরকে বলে কয়ে একই ঘরে দু জনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় শুয়ে চন্দন বলল, "বল, এবার তোদের গোয়েন্দাগিরির শুনি।"

তারাপদ রাজবাড়ির একটা বর্ণনা ও বিবরণ দিল। কারা থাকে, কে কী করে, কার কার ওপর আলাদা করে নজর রাখার চেষ্টা করছেন কিকিরা, সে-সব বৃত্তান্তও বলল। শেষে তারাপদ হতাশ গলায় বলল, "আমাদের কী কাজ হয়েছে জানিস এখন?"

"কী?"

"সকাল বেলায় চা-টা খেয়ে এক দিস্তে কাগজ, এক বান্ডিল পুরোনো ক্যাটালগ, গোটা তিনেক ছোট বড় ম্যাগনিফায়িং গ্লাস, কারবন পেপার, পেনসিল নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢোকা। বেলা বারোটা পর্যন্ত ওই ঘরে বসে থাকতে হয়। স্নান খাওয়া-দাওয়ার জন্যে ঘণ্টা দেড়েক ছুটি। আবার যাই, সারাটা দুপুর কাটিয়ে ফিরি।"

"করিস কী?"

"ঘোড়ার ডিম। বইয়ের নাম লিখি সাদা কাগজে। মাঝে মাঝে পাতা ওলটাই। বই ঘাঁটি।"

"কিকিরা কী করেন?"

"বায়নাকুলার চোখে দিয়ে এ-জানলা সে-জানলা করে বেড়ান মাঝে মাঝে। আর মস্ত-মস্ত ছবিগুলো দেখেন কখনো সখনো। চুরুট ফোঁকেন। খেয়াল হলে বই দেখেন।"

"তার মানে—তোরা বসে বসে ভেরাণ্ডা ভাজছিস?"

"পুরোপুরি।...তবে একটা কথা সত্যি চাঁদু, টাকা থাকলে বড়লোকদের শখ যে কেমন হয়—তুই রাজবাড়ির লাইব্রেরি দেখলে বুঝতে পারবি। এক-একটা ছবি আছে—দেখলে মনে হবে দেওয়াল-সাইজের. এত বড়। বইয়ের কথাই বা কী বলব! গাদা গাদা বই নানা ধরনের, অর্ধেক বইয়ের পাতাও কেউ ছোঁয়নি। শুধু শখ করে মানুষ এত টাকা খরচ করে তুই না দেখলে বিশ্বাস করবি না।"

চন্দনের ঘুম আসছিল। জড়ানো চোখে আলস্যের গলায় বলল, "দূর—তোরা ফালতু এসেছিস! একটা অ্যাডভেঞ্চার গোছের কিছু হলেও বুঝতাম।"

তারাপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমাদের ওপর এরা চোখ রেখেছে।"

"কারা?"

"শশধররা। প্রথম দিন আমরা যখন দীপনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে যাই—আমাদের ঘরে কেউ ঢুকেছিল। কিকিরার মনে সন্দেহ হয়, আমরা যখন থাকব না—কেউ ঘরে ঢুকতে পারে। তিনি দরজা বন্ধ করার পর কতকগুলো দেশলাইকাঠি চৌকাঠে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দরজা খুলে ঢুকতে গেলেই পা লাগার কথা। দীপনারায়ণের কাছ থেকে ফিরে এসে আমরা দেখলাম, কাঠিগুলো ছড়িয়ে রয়েছে।" তারাপদর মনে পড়ল, কিকিরা চশমা আনার ছুতো করে সেদিন কেমন ভাবে কাঠি সাজিয়ে এসেছিলেন।

চন্দন ঘুম-ঘুম চোখে বলল, "আর কিছু নয়?"

তারাপদ বলল, "সন্ধের পর এখানে থাকা যায় না। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। শীতও সেই রকম। যত রাত বাড়ে শীতও তত বাড়ে, হাত পা একেবারে জমে যায়। তার ওপর এখানে কত কী যে হয়, চাঁদু! এ একটা ভুতুড়ে জায়গা। পাঁচ সাতটা কুকুর রাত্তিরে মাঠের মধ্যে ছুটে বেড়ায়, একবার ডাকতে শুরু করল তো সে কী ডাক ভাই, বুক কেঁপে যায়। ইন্দর বলে একটা লোক আছে রাজ-বাড়িতে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গাল-ভরা দাড়ি, ছুরির মতন চোখ; সে আবার মাঝে মাঝে ঘোড়া ছুটিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সঙ্গে কুকুর। মোটর-বাইক চালায় ঝড়ের মতন। একদিন তো আমার ঘাড়ে এসে পড়েছিল প্রায়।"

চন্দন কিছুই শুনছিল না। ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দুপুরে কিকিরা লাইব্রেরিতে যাননি, তারাপদও নয়। বিকেলে চন্দনকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন কিকিরা, সঙ্গে তারাপদ। রাজবাড়ির চৌহদ্দিটাই ঘুরে দেখাচ্ছিলেন কিকিরা। সেটা কম নয়। উঁচু পাঁচিল দিয়ে চারপাশ

ঘেরা। একটা মাত্র বড় ফটক। চারদিকে মস্ত মাঠ, বড় বড় গাছ সারি করে সাজানো, একপাশে ফুলবাগান, চৌকোনা বাঁধানো পুকুরটা পশ্চিম দিকে, তারই কাছাকাছি মন্দির। এ-সব হল মূল রাজবাড়ির বাইরে, মুখোমুখি। রাজবাড়িতে ঢোকার মুখে আবার এক মস্ত লোহার ফটক। অবশ্য রাজবাড়ির বাইরের দিকের ঘর, বারান্দা সবই দেখা যায়। বাইরের দিকটায় বাইরের মহল, রাজবাড়ির কাউকে বড় একটা দেখাও যায় না।

বেড়াতে বেড়াতে চন্দন নানারকম প্রশ্ন করছিল। কিকিরা জবাব দিচ্ছিলেন। তারাপদও কথা বলছিল। চন্দন বুঝতে পারছিল এক সময়ে রাজবাড়ির শখ শৌখিনতা কম ছিল না, অর্থব্যয়ও হত অজস্র। এখন পড়তি অবস্থা। যা আছে পড়ে রয়েছে; কারও কোনোদিকে চোখ নেই, অর্থও নেই। যদি অর্থ এবং শখ-শৌখিনতা থাকত, তবে জাল দিয়ে ঘেরা, গোল, অত বড় পাখি-ঘরটায় মাত্র একটা ময়ূর পঁচিশ-ত্রিশটা পাখি থাকত না, আরও অজস্র পাখি থাকতে পারত। অমন সুন্দর পুকুরের কী অবস্থা! পাথর দিয়ে বাঁধানো পুকুরের চারপাশের পথের কী বিশ্রী হাল হয়েছে। বাঁধানো পুকুর, কিন্তু তার জলের ওপর শ্যাওলা আর শালুক-পাতা, জল চোখেই পড়ে না প্রায়। মন্দিরটা অবশ্য কোনো রকমে চকচকে করে রাখা হয়েছে। সকালে পুরোহিত এসে পুজোটুজো করেন, সন্ধেবেলায় আরতি হয়, অন্য সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে।

চন্দনরা যখন পুকুরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আচমকা শশধরকে দেখা গেল। গোলমতন একটা লতাপাতা-ঘেরা জায়গার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল।

নজরে পড়েছিল কিকিরার। দাঁড়িয়ে পড়লেন।

শশধরও এগিয়ে এল।

শশধর কাছে এলে কিকিরা বললেন, "এদিকে কোথায় সিংহীমশাই?"

শশধর বলল, "ওদিকে গিয়েছিলাম। যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে গেলে মেরামতের যা হাল হয়—" বলে শশধর অনেকটা দূরে রাখা একটা ছোট ট্রাকটর দেখাল।

চন্দনের সঙ্গে শশধরের আলাপ করিয়ে দিলেন কিকিরা। "তারাপদর বন্ধু। ওর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি।"

শশধর বলল, "দুপুরে আমি ছিলাম না। উনি আসছেন শুনেছিলাম।"

"ছেলেটি বড় কাজের, সিংহীমশাই! বয়স কম, কিন্তু চোখ বড় পাকা। পুরোনো জিনিস ঠাওর করা মুশকিল, আসল নকল বোঝা যায় না। চন্দন এ-সব ব্যাপারে পাকা লোক। ঠিক জিনিসটি ধরতে পারে। কলকাতার মিউজিয়ামে চাকরি করে করে চোখ পাকিয়ে ফেলেছে।"

শশধর ধূর্তের মতন বলল, "আপনার দলের লোক!"

কিকিরা ঘাড় নেড়ে হাসি মুখে বললেন, "ধরেছেন ঠিক।...আমার যখনই কোনো ব্যাপারে সন্দেহ হয়, ওকে ডেকে পাঠাই, সে ছবিই বলুন বা দু-একশো বছরের পুরোনো কিছু জিনিস হলেই। আপনাদের রাজবাড়িতে কত যে জিনিস আছে সিংহীমশাই যার মূল্য আপনারাও বোঝেন না। চন্দনের আবার এ-সব ব্যাপারে বড় শখ। চোখে দেখলেও ওর শান্তি। বড় গুণী ছেলে।...ভাল কথা, আপনি কি কোনো দৈবচক্ষুর কথা শুনেছেন?"

"দৈবচক্ষু?"

"আছে। এই রাজবাড়িতেই আছে।" কিকিরা বললেন।

শশধর আর দাঁড়াল না। বলল, "উনি আছেন; পরে আলাপ করব। আমি যাই।"

শশধর চলে গেল। কিকিরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর চন্দনদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "এই শশকটাকে আমি প্রায়ই এই পুকুরের দিকটায় ঘোরা-ফেরা করতে দেখি! কী ব্যাপার বলো তো?"

চন্দন বলল, "সে তো আপনিই বলবেন!"

মাথা নেড়ে কিকিরা বললেন, "না, লোকটা মিছেমিছি এদিকে ঘুরে বেড়াবার পাত্র নয়। কিছু রহস্য আছে।" বলে কিকিরা চুপ করে গিয়ে কিছু যেন ভাবতে লাগলেন, চারদিক দেখতে লাগলেন তাকিয়ে-তাকিয়ে।

চন্দন বলল, "কিকিরা স্যার, আমার মনে হচ্ছে আপনিই বেশী রহস্যময়।"

"কেন?"

"আপনি এখানে বসে বসে যে কী করছেন আমি বুঝতে পারছি না। তারা বলছিল, আপনি রোজ সকালে এক দফা, আর দুপুরে এক দফা তারাকে সঙ্গে করে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে থাকেন। মাত্র দু বার দীপনারায়ণের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে এ পর্যন্ত।"

কিকিরা একবার তারাপদকে দেখে নিয়ে চন্দনকে বললেন, "লাইব্রেরিতে আমি বসে থাকি না চন্দন, বসে-বসে দেখি—সব দেখি, অবজার্ভ করি। আমার একটা বায়না-কুলার আছে, তারাপদ তোমায় বলেনি?"

"বলেছে।"

"লাইব্রেরির পজিশনটা খুব ভাল। বড় বড় জানলা, স্কাই লাইট। দূরবীন চোখে লাগিয়ে বসে থাকলে ভেতর আর বাইরের অনেক কিছু দেখা যায়। শশকটাকে আমি এদিকে ঘোরাফেরা করতে যে দেখেছি, সে তো ওই দূরবীন চোখে দিয়েই।"

"বেশ করেছেন দেখেছেন। কিন্তু শশককে দেখেই দিন কাটাচ্ছেন?"

"না," মাথা নাড়লেন কিকিরা, "ব্রেন শেক্ করছি?"

চন্দন হাঁ হয়ে গেল। "সেটা কী?"

"মগজ নাড়াচ্ছি," গম্ভীর মুখে কিকিরা বললেন।

চন্দন প্রথমটায় থমকে গেল, তার পর হো হো করে হেসে উঠল। তারাপদও।

হাসি থামিয়ে চন্দন বলল, "কিছু তলানি পেলেন, স্যার?"

"গট্ অ্যান্ড নো গট্।"

"তার মানে?"

"পাচ্ছি আবার পাচ্ছিও না। চলো, ঘরে ফিরি, তারপর বলব।"

তিনজনে গেস্ট হাউসের দিকে ফিরতে লাগলেন। শীতের বিকেল বলে আর কিছু নেই, অন্ধকার হয়ে আসছিল। আকাশে দু একটা তারা ফুটতে শুরু করেছে। বাতাসও দিচ্ছিল ঠাণ্ডা।

গেস্ট হাউসের কাছাকাছি পৌঁছতেই শব্দটা কানে গেল। রাজবাড়ির দিক থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে আসছে। মোটর বাইক। আলো পড়ল। ভট-ভট শব্দটা কানে গর্জনের মতন শোনাল। যেন ঝড়ের বেগে গাড়িটা রাস্তা ধরে সোজা বড় ফটকের দিকে চলে গেল।

হাত বিশেক দূর থেকে কিকিরা মানুষটিকে দেখতে পেলেন।

ইন্দরের পরনে প্যান্ট, গায়ে সেই চামড়ার কোট, গলা পর্যন্ত বন্ধ। মাথায় একটা টুপি—কালো রঙেরই।

যাবার সময় ইন্দর একবার তাকাল। দেখল কিকিরাদের।

বড় ফটকের কাছে একটু দাঁড়াতে হল ইন্দরকে বোধ হয় ফটক খোলার জন্যে। তারপর বেরিয়ে গেল। তার মোটর বাইকের শব্দ বাতাসে ভেসে থাকল কিছুক্ষণ; শেষে মিলিয়ে গেল।

কিকিরা বললেন, "আজ হল কী? একই সময়ে দুই অবতার?"

চন্দন কিছু বুঝল না। তারাপদও কথা বলল না।

হাঁটতে হাঁটতে কিকিরা বললেন, "ওই যে মানুষটিকে দেখলে চন্দন, ওর নাম ইন্দর। ও শুধু ভটভটি চালাতে পারে যে তা নয়, ওর অনেক গুণ। ঘোড়ায় চড়তে পারে, শিকার করতে পারে, কুকুর পোষে—আবার সার্কাসের রিং মাস্টারদের মতন খেলাও দেখাতে পারে। তবে বাঘ-সিংহর নয়, কুকুরের। ও হল দীপনারায়ণের কাকা ললিতনারায়ণের শ্বশুরবাড়ির লোক। এখানেই থাকে। বছর দশেক ধরে আছে। জয়নারায়ণের চেয়ে বয়েসে ছোট হলেও জয়নারায়ণের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। লোকটাকে দিনের বেলায় দেখলে তুমি বুঝতে পারবে।"

কিকিরার ঘরে বাতি জ্বালা হয়ে গিয়েছিল। কেরাসিনের টেবিল-বাতি, দেখতে কিন্তু সুন্দর, সাদা ঘষা কাচের শেড্ পরানো, সরু মতন চিমনিটা শেডের মাথা ছাড়িয়ে গেছে। গেস্ট হাউসে ঠাকুর চাকর থাকে সব সময়। সন্ধেবেলায় চা দিয়ে গিয়েছে চাকরে।

ঘরের দরজাটা খোলাই রেখেছিলেন কিকিরা, তারাপদকে দরজার কাছাকাছি বসিয়ে রেখেছিলেন পাছে কেউ এসে আড়ি পাতে। মাঝে-মাঝে তারাপদকে দরজার বাইরে গিয়ে দেখে আসতে হচ্ছিল আশেপাশে কেউ ঘোরাঘুরি করছে কিনা!

কিকিরা তাঁর সরু চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, "সমস্ত ব্যাপারটা এবার একবার ভাল করে ভেবে দেখা যাক, কী বল?"

চা খেতে খেতে মাথা হেলাল চন্দন।

কিকিরা বললেন, আস্তে গলায়, "সোজা কথাটা হচ্ছে এই—মাসখানেক আগে জয়নারায়ণ রাজবাড়িতেই মারা গেছেন। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, সেটা দুর্ঘটনা; দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন জয়নারায়ণ। বাইরের লোক এই কথাটাই জানে। কিন্তু জয়নারায়ণের দাদা দীপনারায়ণের পরে সন্দেহ হয়েছে, তাঁর ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ দুর্ঘটনা নয়, কেউ তাকে খুন করেছে। তাই না?"

চন্দন আরাম করে চায়ে চুমুক দিল। দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

কিকিরা বললেন, "প্রশ্নটা হল, জয়নারায়ণকে কেউ খুন করেছে, নাকি তিনি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন? যে মারা গিয়েছে তাকে আমরা চোখে দেখিনি। মানুষ দুর্ঘটনায় মারা গেলে তার পোস্ট মর্টেম হয়, ডাক্তাররা অনেক কিছু বলতে পারে। এখানে কোনটাই হয়নি। কাজেই কিছু জানবার বা সন্দেহ করার প্রমাণ আমাদের নেই। তবু মানুষের মন মানতে চায় না; তার সন্দেহ বলো, ধোঁকা বলো, থেকে যায়। দীপনারায়ণের মনে একটা ঘোরতর সন্দেহ জন্মেছে, জয়নারায়ণকে কেউ খুন করেছিল।"

তারাপদ চন্দনের দেওয়া সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে একবার উঠল; দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল। কাউকে দেখতে পেল না। ফিরে এসে বসল।

কিকিরা চা খাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। বললেন, "দীপনারায়ণের সঙ্গে কথা বলে আমি দেখেছি, এ-রকম সন্দেহ হবার প্রথম কারণ রাজবাড়ির ওই ছোরা, যার নাকি একটা আশ্চর্য গুণ আছে। কী গুণ তা তোমরা শুনেছ। ওই ছোরা দিয়ে কাউকে অন্যায় কারণে খুন করলে ছোরা থেকে রক্তের দাগ কিছুতেই যায় না, তা ছাড়া দিন দিন ছোরাটা ভোঁতা আর ছোট হয়ে আসে।"

চন্দন সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, "গাঁজা।"

"গাঁজা না গুলি—সেটা পরে ভাবলেও চলবে," কিকিরা বললেন, "আপাতত ধরে নাও দীপনারায়ণ যা বলছেন সেটাই সত্যি। যদি তাই হয় তবে জয়নারায়ণকে খুন করল কে? কেনই বা করল?"

তারাপদ মাথা নাড়ল। তাকাল দরজার দিকে। চন্দন চুপ করে থাকল।

কিকিরা বললেন, "আমি একটা জিনিস ভেবে দেখেছি। রাজবাড়ির ওই ছোরার জাদু যাই থাক না কেন—তার বাঁটটার বাজার-দর আছে। দামী পাথর দিয়ে কারুকার্য করে বাঁটটা যেভাবে বাঁধানো—তাতে ওটা যে-কোনো মানুষকে রাতারাতি বেশ কিছু পাইয়ে দিতে পারে। যদি কেউ অর্থের লোভে খুন করে থাকত—তবে বাঁটটা রেখে যেত না। তাই না?"

চন্দন কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন বলল ঠিক কথা।

চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন কিকিরা। "অর্থের লোভে কেউ জয়নারায়ণকে খুন করেনি। কিংবা যদি করেও থাকে—শেষ পর্যন্ত বাঁটটা নিয়ে পালাবার পথ পায়নি। যে অর্থের লোভে ছোরা চুরি করবে, খুন করবে—সে বাঁটটা ফেলে রাখবে এ বিশ্বাস করা যায় না।"

চন্দন বলল, "ছোরাটা না দীপনারায়ণের ঘরে সিন্দুকে থাকত?"

"হ্যাঁ।"

"দীপনারায়ণের শোবার ঘরে ঢুকে কেউ একজন সিন্দুক খুলে ছোরাটা চুরি করবে, সেই ছোরা দিয়ে খুন করবে, আবার সিন্দুকে রেখে আসবে বাঁটটা—এটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কিকিরা?"

মাথা হেলিয়ে কিকিরা বললেন, "হচ্ছে বইকি! খুবই বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

"এ-রকম বোকা লোক কে থাকতে পারে! রাজবাড়ির ছোরা-রহস্যের কথা জেনেও, ধরা পড়ার জন্যে সেই ছোরা বার করে আনবে, আবার খুন করে রেখে আসবে?"

"আমিও তো তাই ভাবছি। জয়নারায়ণ কেমন করে মারা গিয়েছিলেন জান?"

"অ্যাকসিডেন্টে। মাথার ওপর ভারী জিনিস পড়ে।"

"হ্যাঁ। লাইব্রেরি-ঘরে জয়নারায়ণ মারা যান। তাঁর মাথার ওপর একটা বড় সেল্‌ফ বইপত্র সমেত ভেঙে পড়ে, সেই সঙ্গে বড় একটা ছবি, কাচে গলা হাত কেটে গিয়েছিল। মাথায় চোট লেগেছিল, তা ছাড়া রক্তপাত হয়েছিল প্রচুর। গলার নালি কেটে গিয়েছিল, হাত কেটেছিল, মুখের নানা জায়গায় কাচ ঢুকে গিয়েছিল।"

তারাপদ উঠল। বাইরে চলে গেল।

চন্দন বলল, "ঘটনাটা ঘটেছিল কখন?"

"রাত্রের দিকে। আটটা নাগাদ।"

"কোনো ডাক্তার আসেনি?"

"এখানে কোনো ডাক্তার নেই। মাইল কুড়ি দূরে ডাক্তার আছে। রাজবাড়ি থেকে গাড়ি গিয়ে যখন ডাক্তার নিয়ে এল—ততক্ষণে জয়নারায়ণ মারা গেছেন।"

"কাছে পিঠে কোনো হাসপাতাল নেই?"

"না। এ-জঙ্গলে তুমি হাসপাতাল কোথায় পাবে।"

তারাপদ ফিরে এসে আবার বসল।

কিকিরা বললেন, "কাল তোমাকে লাইব্রেরিতে নিয়ে যাব। দেখবে লাইব্রেরির চেহারাটা কেমন। মেঝে থেকে পনেরো আঠারো ফুট উঁচুতে ছাদ। চারদিকে বিরাট বিরাট র‍্যাক। বই পাড়তে হলে সিঁড়ি লাগে। সিঁড়ি রয়েছে কাঠের। র‍্যাকে ঠাসা বই। বিশাল-বিশাল চেহারা। ওজনও কম নয়। জয়নারায়ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেল্‌ফ্ থেকে বই টানছিলেন—এমন সময় হুড়মুড় করে এক তাক বই তাঁর ঘাড়ে-মুখে পড়ে, সিঁড়ি সমেত উলটে মাটিতে পড়ে যান। র‍্যাকটাও ভেঙে যায়।"

"জয়নারায়ণ কি পণ্ডিত লোক ছিলেন?" জিজ্ঞেস করল চন্দন।

কিকিরা বললেন, "দীপনারায়ণ বলেন, লাইব্রেরি-ঘরে প্রায়ই গিয়ে বসে থাকতেন।"

"পড়াশোনা করতেন?"

"হয়ত করতেন, আমি জানি না।" কিকিরা একটু থেমে হঠাৎ বললেন, "তুমি একটা জিনিস মোটেই লক্ষ করছ না। বই

...তে গিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো বই হঠাৎ পড়ে যাওয়া ...ভব। র‍্যাক ভেঙে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু ...ত বড় একটা বাঁধানো ছবি, যার ওজন অন্তত পনেরো ...ড় সের হবে, কেমন করে দেওয়াল থেকে ভেঙে পড়ল ... বলতে পার? দীপনারায়ণকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ...নি বললেন, তাঁদের ধারণা হয়েছিল, জয়নারায়ণ যখন সিঁড়ি ...মেত উল্টে পড়ছিলেন—তখন হয়ত হাত বাড়িয়ে ছবিটা ...বার চেষ্টা করেছিলেন।"

"ছবিটা কি নাগালের মধ্যে ছিল?"

"দুটো পাশাপাশি র‍্যাকের ফাঁকে ছবিটা টাঙানো ছিল। ...ম দিয়ে বাঁধানো ছবি।"

"অত বড় ছবি কেমন করে টাঙানো ছিল?"

"তার দিয়ে।"

"তার ছিঁড়ে গেল?"

"পুরোনো তার ছিঁড়তে পারে। মরচে ধরে ক্ষয় হতে ...রে। কিংবা কোন জায়গায় পলকা ছিল।"

"আমি বিশ্বাস করি না। তবু দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। ঘরের ...নো পাখাও তো মাথায় পড়ে। ছাদ ধসে মানুষ মারা যায়।"

চন্দন কিছু বলল না।

কিকিরা বললেন, "বিপদের সময় মানুষের মাথার ঠিক ...কে না। ছবিটা কেমন করে পড়ল, কেমন করে তার কাচে ...নারায়ণের গলা মুখ হাত কেটে রক্তে সব ভেসে গেল তা কেউ খেয়ালও করল না। জয়নারায়ণ মারা যাবার পর দীপ-নারায়ণ যখন একদিন নিতান্তই আচমকা নিজের সিন্দুকের মধ্যে ছোরাটাকে দেখলেন—তখন তাঁর টনক নড়ল। তখনই তাঁর সন্দেহ হল, ভাইয়ের মৃত্যু দুর্ঘটনা নয়। ছবির ব্যাপারটাও তাঁর খেয়াল হল।"

তারাপদ বলল, "আপনি বলতে চাইছেন, জয়নারায়ণকে আগে খুন করা হয়েছে; তারপর বাকি যা কিছু সাজানো হয়েছে।"

"আমি এখনই কিছু বলতে চাইছি না। যা বলার পরশু রাত্রে বলব, শুধু রাজবাড়ির ছোরা নয়, ওই ছবিও নয়, জয়-নারায়ণ যখন দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন তখন ইন্দরচাঁদের ওই ...কুত্তার মতন কুকুরগুলো কেন তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে ...পাশে ছোটাছুটি করছিল এবং ডাকছিল—সেটাও রহস্য। কুকুরের ডাকের জন্যে আশেপাশের কেউ অনেকক্ষণ কিছু শুনতে পায়নি।"

চন্দন কিছু বলার আগেই কিকিরা আবার বললেন, "কাল আমার অনেক কাজ তোমাদের নিয়ে। চন্দন, কতটুকু ...ক্ পয়জেন এনেছ?"

চন্দন হাত দিয়ে মাপ দেখাল।

পরের দিন সকাল থেকেই দেখা গেল কিকিরা খুব ব্যস্ত। সকালে চা খেয়ে তারাপদদের নিয়ে লাইব্রেরিতে চলে গেলেন, ফিরলেন দুপুরে। তারাপদ আর চন্দনকে দেখলেই বোঝা ...র যত রাজ্যের ধুলো ঘেঁটেছে, মুখে চোখে মাথায় ধুলোর ছাপ।

দুপুরে স্নান-খাওয়ার পর চন্দন আর তারাপদ দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল; কিকিরা সামান্য বিশ্রাম সেরে তাঁর ঝোলা-ঝুলি নিয়ে বসলেন। দরজা বন্ধ থাকল। কী যে করলেন তিনি সারা দুপুর, কেউ জানল না।

বিকেলে চন্দনদের নিয়ে প্রথমে গেলেন দীপনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর দীপনারায়ণের সঙ্গে রাজবাড়ির ভেতর-মহল ঘুরে বেড়ালেন, দেখলেন সব। মায় দীপনারায়ণের ঘরের সিন্দুক পর্যন্ত।

ফিরে এসে আবার দীপনারায়ণের নীচের অফিস-ঘরে বসলেন সকলে।

কিকিরা বললেন, "দীপনারায়ণবাবু, এবার খোলাখুলি কটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"বলুন।"

"এই রাজবাড়িতে আপনার অনুগত বিশ্বাসী লোক ক'জন আছে?"

দীপনারায়ণ কেমন যেন অবাক হলেন। বললেন, "কেন?"

"দরকার আছে। আপনি যাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেন, এমন লোকদের বাদ দিয়ে বলছি।"

সামান্য ভেবে দীপনারায়ণ বললেন, "চার-পাঁচজন আছে।"

"আপনার বাড়িতে বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার নিশ্চয় আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন দীপনারায়ণ।

"কার কার আছে?"

"আমার আর জয়নারায়ণের। কাকারও বন্দুক ছিল।"

"কে কে বন্দুক-টন্দুক চালাতে পারে—আপনারা তিন-জন বাদে?"

"আমার ছেলেরা পারে। ইন্দরও পারে।"

"অন্য কোনো মারাত্মক অস্ত্র আছে?"

"পুরোনো কিছু অস্ত্র ছিল, কৃপাণ-বল্লম গোছের, সে-সব কোথায় পড়ে আছে, কেউ ব্যবহার করে না।"

কিকিরা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "রাজবাড়িতে কাঠের মিস্ত্রী আছে কেউ?"

"কাঠের মিস্ত্রী? কেন?"

"কেউ নেই?"

"আছে।"

"তাদের মধ্যে একজনকে কাল আমার একটু দরকার। সকালের দিকে। আর আপনার বসার ঘরে উঁচু গোল হালকা একটা টেবিল দেখেছি। ওটাও দরকার।"

দীপনারায়ণ অবাক হয়ে বললেন, "কাঠের মিস্ত্রী, টেবিল—এ-সব নিয়ে কী করবেন আপনি?"

কিকিরা মজার মুখ করে বললেন, "ম্যাজিক দেখাব।"

"ম্যাজিক?"

"আপনি তো জানেন, আমি ম্যাজিশিয়ান, কিকিরা দি ওয়ান্ডার...!" কিকিরা হাসতে লাগলেন।

দীপনারায়ণ বিরক্ত বোধ করলেও মুখে কিছু বললেন না। সংযতভাবে বললেন, "কিংকরবাবু, এখন আমার মনের অবস্থা ম্যাজিক দেখার মতন নয়।"

কিকিরা বললেন, "জানি দীপনারায়ণবাবু, কিন্তু কাল সন্ধের পর ওই লাইব্রেরি-ঘরে আমি একটা ম্যাজিক দেখাব। আপনাকে সেখানে থাকতে হবে; শুধু আপনি হাজির থাকলেই চলবে না, ইন্দর, শশধর, আপনার কাকা ললিত-নারায়ণকেও থাকতে হবে।"

দীপনারায়ণ কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। বললেন, "কাকা অন্ধ। তিনি কেমন করে ম্যাজিক দেখবেন?"

"তাঁকে দেখতে হবে না। তিনি হাজির থাকলেই চলবে।" বলে কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন, চোখের ইশারায় চন্দনদের উঠতে বললেন।

দীপনারায়ণ বোবা, বোকা হয়ে বসে থাকলেন।

কিকিরা হেসে হেসেই বললেন, "দীপনারায়ণবাবু, আপনি আপনাদের রাজবাড়ির ছোরার অদ্ভুত-অদ্ভুত গুণের কথা বিশ্বাস করেন। আমার একটা ম্যাজিক আছে—যার নাম দিয়েছিলাম—'মিস্টিরিয়াস আইজ'—এই খেলাটার মধ্যে একটা অলৌকিক গুণ আছে। কাল সেটা দেখাব। ওই খেলা ছাড়া
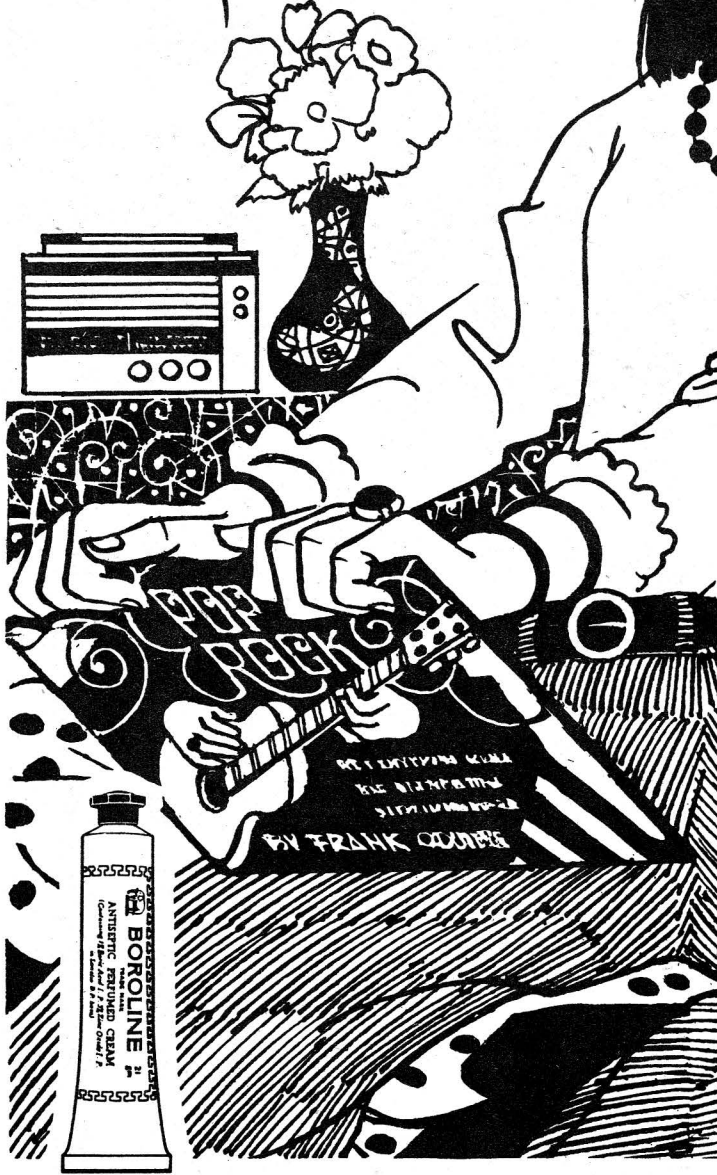
বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড • বোরোলীন হাউস, ৯ গিরীশ এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

জয়নারায়ণের খুনীকে ধরবার আর কোনো উপায় আমার জানা নেই। আপনার দায়িত্ব হল, যাদের কথা বলেছি তাদের প্রত্যেককে ঠিক সময়ে ঠিক মতন লাইব্রেরিতে হাজির করা। আপনার হুকুম সবাই মানতে বাধ্য। আর আমরা যখন লাইব্রেরিতে বসব কাল রাত্রে, তখন আপনার বিশ্বাসী লোক দিয়ে লাইব্রেরি-ঘরের চারপাশে পাহারা বসাবেন। খেলার কথা কাউকে বলবেন না।"

দীপনারায়ণ কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বলার কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষে বললেন, "আপনি এসেছেন পুরোনো বইয়ের ভ্যালুয়ার হিসেবে। লোকে সেটাই জানে। আপনি তাদের ম্যাজিক দেখাবেন?"

কিকিরা বললেন, "আপনি ম্যাজিক দেখানোর কথা বলবেন না কাউকে! অন্য কিছু বলবেন। হুকুম করবেন। ও দায়িত্বটা আপনার।...আর একটা কথা, কাল আপনি যখন লাইব্রেরিতে আসবেন, ছোরার বাক্সটা সঙ্গে রাখবেন। লুকিয়ে।...পারলে একটা পিস্তল গোছের কিছু রেখে দেবেন।"

৭

লাইব্রেরি-ঘরে সবাই হাজির ছিল ঃ দীপনারায়ণ, ললিতনারায়ণ, ইন্দর, শশধর—সকলেই। তারাপদও ছিল। চন্দন ছিল না, সবে ঘরে এসে ঢুকল। কিকিরার সঙ্গে চোখে চোখে ইশারা হল চন্দনের।

সন্ধে উতরে গিয়েছে। রাত বেশী নয়, তবু লাইব্রেরি-ঘরের উঁচু ছাদ, রাশি-রাশি বই, ছবি, নানা ধরনের পুরনো জিনিস, বন্ধ জানলা এবং অনুজ্জ্বল বাতির জন্যে মনে হচ্ছিল রাত যেন অনেকটা হয়ে গিয়েছে।

কালো রঙের পায়া-অলা গোল টেবিল ঘিরে সকলে বসে ছিলেন। টেবিলটা প্রায় বুকের কাছাকাছি ঠেকছিল। টেবিলের ওপর পাতলা কালো ভেলভেটের কাপড় বিছানো। শশধর তার মনিবদের সামনে বসতে চাইছিল না, দীপনারায়ণ হুকুম করে তাকে বসিয়েছেন।

চন্দন ফিরে আসার পর কিকিরা ঘরের চারপাশে একবার ভাল করে তাকিয়ে নিলেন। আজ তাঁর একটু অন্যরকম সাজ। গায়ের আলখাল্লার রঙটা কালো, পরনের প্যান্টও বোধহয় কালচে, দেখা যাচ্ছিল না। চোখে চশমা। কাচটা রঙীন। তাঁর চোখ দেখা যাচ্ছিল না।

কিকিরা তারাপদকে বললেন, দরজাটা বন্ধ আছে কিনা দেখে আসতে।

তারাপদ দরজা দেখে ফিরে আসার পর কিকিরা তাকে বাতিটা আরও কম করে দিতে বললেন।

টেবিল থেকে সামান্য তফাতে উঁচু টুলের ওপর একটা বাতি ছিল। তারাপদ মিটমিটে সেই আলো আরও কমিয়ে দিল। অত বড় লাইব্রেরি-ঘর এমনিতেই প্রায় অন্ধকার হয়েছিল, বাতি কমাবার পর আরও অন্ধকার হয়ে গেল।

টেবিলের চারধারে গোল হয়ে বসে আছেন ঃ কিকিরা, কিকিরার ডান পাশে দীপনারায়ণ, বাঁ পাশে ললিতনারায়ণ, দীপনারায়ণের একপাশে ইন্দর, ইন্দরের পর বসেছে শশধর। তারাপদ আর চন্দন কিকিরার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে।

সকলকে একবার দেখে নিয়ে কিকিরা প্রায় কোনো ভূমিকা না করেই বললেন, "দীপনারায়ণবাবু, আপনি আমাদের একটা কাজের ভার দিয়ে এই রাজবাড়িতে এনেছিলেন। আমরা এই ক'দিন সাধ্যমত খেটে আপনার কাজ শেষ করে এনেছি। সামান্য একটা কাজ বাকি আছে। কাজটা সামান্য, কিন্তু সবচেয়ে জরুরী। আপনাদের সকলকে আজ শুধু সেই জন্যেই এখানে ডেকেছি। হয়ত কেউ-না-কেউ আপনারা আমায় সাহায্য করতে পারেন।"

দীপনারায়ণ তাকিয়ে থাকলেন, ললিতনারায়ণ অন্ধ হয়ে যাবার পর চোখে গগলস পরেন, তাঁর চোখের পাতা খোলা থাকে, দেখতে পান না। ললিতনারায়ণ সামান্য মাথা ঘোরালেন। ইন্দর কেমন অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে থাকল; শশধর ধূর্ত দৃষ্টিতে।

দীপনারায়ণ বললেন, "কী ধরনের সাহায্য আপনি চাইছেন?"

কিকিরা বললেন, "বলছি। তার আগে বলি, এই লাইব্রেরি ঘরের কোনো খোঁজই বোধহয় আপনারা কেউ কোনোদিন রাখতেন না। রাজবাড়ির কেউ এ-ঘরে ঢুকতেন বলেও মনে হয় না।"

দীপনারায়ণ বললেন, "আমরা এক আধ দিন এসেছি; তবে জয়নারায়ণ প্রায়ই আসত।"

"কেন?"

"ওর বই ঘাঁটা, ছবি ঘাঁটা বাতিক ছিল। পুরনো কিছু জিনিস আছে—ওর পছন্দ ছিল।"

কিকিরা যেন দীপনারায়ণের কথাটা লুফে নিলেন। বললেন, "একটা জিনিস দেখাচ্ছি। এটা কী জিনিস কেউ বলতে পারেন?" বলে কিকিরা পকেট থেকে বড় মার্বেল সাইজের কাচের একটা জিনিস বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। "এই জিনিসটা ওঁর কাজ করার টেবিলের ড্রয়ারে ছিল। এই ঘরে।"

দীপনারায়ণরা ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন। আশ্চর্য রকম দেখতে। ঠিক যেন একটা চোখের মণি। অথচ বড়। মণির বেশির ভাগটা কুচকুচে কালো, মধ্যেরটুকু জ্বলজ্বল করছে। কেমন এক লালচে আভা দিচ্ছে। অবাক হয়ে দীপনারায়ণ মণিটা দেখতে লাগলেন। ইন্দর এবং শশধরও দেখছিল। ললিতনারায়ণ পিঠ সোজা করে বসে।

"কী দেখছ তোমরা?" ললিতনারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন।

দীপনারায়ণ বললেন, "চোখের মণির মতন দেখতে। মানুষের নয়। মানুষের চোখের তারা এত বড় হয় না. বিন্দুটাও লালচে হতে দেখিনি।"

কিকিরা বললেন, "মানুষের চোখের তারা ওটা নয়, দীপনারায়ণবাবু।" বলে পকেটে হাত দিয়ে ছোট-মতন একটা বই বার করলেন, পাতাগুলো ছেঁড়া, উঁইয়ে খাওয়া। বইটা টেবিলের ওপর রাখলেন না। শুধু দেখালেন। বললেন, "এই যে চটি-বইটা দেখছেন—এটা ওই মণির পাশে ছিল। বইটা কোন্ ভাষায় লেখা বোঝা মুশকিল। নেপালী হতে পারে। আমি জানি না। তবে এর পেছন দিকে পেনসিলে ইংরেজীতে সামান্য ক'টা কথা লেখা আছে। তাই থেকে আমার ধারণা হল, আপনাদের কোনো পূর্বপুরুষ বইটা পেয়েছিলেন। বই আর মণি। এই বইয়ে ওই মণির কথা লেখা আছে। লেখা আছে যে, মণিটা হিমালয় পাহাড়ের জঙ্গলে পাওয়া হায়না ধরনের কোনো জন্তুর। এই জন্তুদের চোখের অলৌকিক এক গুণ আছে।"

দীপনারায়ণ অবাক হয়ে বললেন, "অলৌকিক গুণ! মণিটার অলৌকিক গুণ কেমন করে থাকবে? এটা তো জ্যান্ত কোনো পশুর নয়?"

কিকিরা বললেন, "আপনি একটু ভুল বললেন। মণিটা জ্যান্ত পশুরই ছিল—এখন সেটা আলাদা করে তুলে রাখা হয়েছে।"

ললিতনারায়ণ বললেন, "আমি কখনো শুনিনি, রাজবাড়িতে এমন একটা জিনিস আছে!"

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "রাজবাড়িতে অলৌকিক কিছু কি নেই রাজাসাহেব?"

দীপনারায়ণ তাড়াতাড়ি বললেন, "থাকতে পারে। কিন্তু মণিটার অলৌকিকত্ব কী?"

কিকিরা বললেন, "এর অলৌকিকত্বর কথা ছোট করে লেখা আছে পেনসিলে। কোনো মানুষ, যে নরহত্যা করেছে, পাপ কাজ করেছে, এমন কি প্রবঞ্চনা করেছে—সে যদি এই মণির ওপরে হাত রাখে মণিটা তার হাতের ছায়াও সহ্য করবে না—ছিটকে বেরিয়ে যাবে।"

দীপনারায়ণ কেমন একটা শব্দ করে উঠলেন। শশধর কিকিরার দিকে তাকাল। ইন্দর কেমন বোকার মতন তাকিয়ে হেসে উঠল। ললিতনারায়ণ মাথা নাড়তে লাগলেন।

"অসম্ভব," ললিতনারায়ণ বললেন, "অসম্ভব। আমাদের বাড়িতে এরকম ভূতুড়ে কোনো জিনিস ছিল না। আমি শুনিনি।"

কিকিরা বিনীত গলায় বললেন, "আপনি শোনেননি. জানেন না—এটাই আমার জানার কথা, রাজাসাহেব। আপনি চোখে দেখতে পান না। মণিটা দেখতেও পাচ্ছেন না। তবু আপনাকে এখানে আনার উদ্দেশ্যই ছিল—যদি সব কথা শুনে কিছু সাহায্য করতে পারেন।"

ইন্দর হাসতে হাসতে বলল, "ভূতুড়ে গল্প শোনার জন্যে আমরা এখানে আসিনি।...শুনে ভালই লাগল। আমি চলি।"

কিকিরা বাধা দিয়ে বললেন, "যাবার আগে চোখে একবার দেখে যাবেন না?"

"কী দেখব?"

"মণিটা সত্যি সত্যি নড়ে কিনা?"

"পাগলের মতন কথা বলবেন না।"

"একটু পরীক্ষা করে দেখলে ক্ষতি কী!...এই লাইব্রেরি ঘরে জয়নারায়ণ মারা গিয়েছিলেন। তিনি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন না কেউ তাঁকে খুন করেছিল—এটা একবার দেখা যেত।"

ঘরের মধ্যে সবাই যেন কেমন চমকে গেল। একেবারে চুপচাপ। শশধর আর ইন্দর কিকিরার দিকে অপলকে তাকিয়ে। চমকটা কেটে গেলে দু জনেই যেন জ্বলন্ত চোখে কিকিরাকে দেখতে লাগল।

ইন্দর বলল, "খুন? কে বলল?"

"কিকিরা বললেন, বলার লোক আছেন।"

খেপে উঠে ইন্দর বলল, "খবরদার, আবার যদি ও-কথা শুনি, জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব! রাজবাড়ির বদনাম করতে এসেছেন আপনি?"

কিকিরা বললেন, "না। আমি রাজা দীপনারায়ণের কথায় এসেছি।"

ইন্দর অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "ননসেন্স। আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি।" বলে সে দীপনারায়ণের দিকে তাকাল। "আপনি কোথা থেকে একটা ইডিয়েট, পাগলকে ধরে এনেছেন? ওকে তাড়িয়ে দিন। কথা বলতে জানে না।"

দীপনারায়ণ গম্ভীর গলায় বললেন, "বসো। চেঁচামেচি করো না। উনি যা বলছেন সেটা আমিও বিশ্বাস করি না। কিন্তু যা বলছেন সেটা পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কিসের? মণিটা যদি বাজেই হয়—বাজেই থাকবে। নিশ্চয় নড়বে না।"

শশধর বলল, "রাজাসাহেব, আপনি ওঁর কথা বিশ্বাস করছেন?"

দীপনারায়ণ কোনো জবাব না দিয়ে কিকিরাকে বললেন, "কেমন করে হাত রাখব আপনি বলুন?"

কিকিরা নিজের ডান হাত মণিটার ওপর বিঘতখানেক উঁচুতে তুলে রাখলেন। মণিটা স্থির হয়ে থাকল। নড়ল না।

দীপনারায়ণ বললেন, "আমি রাখছি।"

দীপনারায়ণ মণির ওপর হাত রাখলেন উঁচু করে, নড়ল না।

নিশ্বাস ফেলে দীপনারায়ণ বললেন, "ইন্দর তুমি রাখো।"

ইন্দর যেন ঘামতে শুরু করেছিল। তার মুখ কঠিন। শক্ত চোখে কিকিরার দিকে তাকাল। বলল, "বেশ, আমি হাত রাখছি। যদি দেখা যায় মণিটা নড়ল না, ওই লোকটাকে আমি দেখে নেব।"

ইন্দর যেন রাগের বশে টেবিলে হাত দিয়ে মণিটা তুলে নিতে যাচ্ছিল। কিকিরা হাত ধরে ফেললেন। বললেন, "না না, ছোঁবেন না। ওপরে হাত রাখুন, আমরা যেভাবে রেখেছি।"

ইন্দরের হাত কাঁপছিল। ডান হাতটা সে তুলে রাখল।

খুবই আশ্চর্যের কথা মণিটা এবার নড়তে লাগল ধীরে ধীরে। ইন্দর অবাক। তার চোখের পাতা পড়ছে না। মুখে আতঙ্ক। হাতটা সে সরিয়ে নিল অন্য পাশে, চোখের মণিটাও গড়াতে গড়াতে তার হাতের দিকে চলে গেল। আবার হাত সরাল ইন্দর, মণিটাও গড়িয়ে গেল।

আচমকা খেপে উঠে ইন্দর চেঁচিয়ে উঠল, প্রায় লাফ মেরে গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল কিকিরার। চন্দনও পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দীপনারায়ণ হাতের ঠেলা দিয়ে ইন্দরকে বসিয়ে দিলেন। বললেন, "গোলমাল করো না। বসো।" বলে পকেট থেকে রিভলবার বার করে সামনে রাখলেন। হাতের কাছে।

ইন্দর রিভলবারের দিকে তাকাল। তার মুখ রাগে ক্ষোভে ভয়ে উত্তেজনায় কেমন যেন দেখাচ্ছিল। ইন্দর থামল না, চেঁচিয়ে বলল, "আপনি আমাকে খুনী বলতে চান? কোথাকার একটা উন্মাদ..."

দীপনারায়ণ ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ করো।"

কিকিরা শশধরের দিকে তাকালেন।

শশধর ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তার ধূর্ত চোখে আতঙ্ক।

কোনো উপায় নেই, শশধর যেন সাপের ফণার দিকে হাত বাড়াচ্ছে এমনভাবে হাত বাড়াল। তার হাত কাঁপছিল থরথর করে।

মণিটা এবারও নড়তে লাগল, গড়িয়ে গেল; শশধর যেদিকে হাত সরায়, সেদিকে গড়িয়ে যায় মণিটা। ভয়ের শব্দ করে হাত সরিয়ে নিল শশধর। চোখ যেন ভয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসছে, দীপনারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলল, "রাজাসাহেব, আমি নির্দোষ; আপনি বিশ্বাস করুন।"

দীপনারায়ণ কোনো কথা বললেন না, রিভলবারের ওপর হাত রাখলেন।

কিকিরা তাঁর বাঁ-পাশে বসা ললিতনারায়ণের দিকে তাকালেন। বললেন, "ললিতনারায়ণবাবু, আপনি কি একবার হাত রাখবেন?"

ললিতনারায়ণ বিন্দুমাত্র উত্তেজনা দেখালেন না। বললেন, "রাখব।"

"আপনার সামনেই টেবিল—হাতটা সামনের দিকে একটু বাড়িয়ে দিন।"

ললিতনারায়ণ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

মণিটার ঠিক ওপরেই হাত রাখলেন না ললিতনারায়ণ, অথচ সামান্য সময় মণিটা স্থির থেকে পরে তাঁর হাতের দিকেই গড়িয়ে আসতে লাগল। দীপনারায়ণ দেখছিলেন।

কিকিরা ললিতনারায়ণকে হাত সরাতে বললেন। ললিতনারায়ণ হাত সরালেন—মণিটাও সরে এল। টেবিলের চারদিকে হাত ঘোরাতে লাগলেন ললিতনারায়ণ—মণিটাও ঘুরতে লাগল।

হঠাৎ বাঁ হাত উঠিয়ে নিয়ে ললিতনারায়ণ ডান হাত দিয়ে কিকিরার বাঁ হাত চেপে ধরলেন। তারপর হেসে উঠে বললেন, "এ-সব জোচ্চুরি কতদিন ধরে চলছে? হাত ওঠাও।"

কিকিরা বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হলেন না। বাঁ হাতটা সকলের সামনে মেলে ধরলেন। বললেন, "দীপনারায়ণবাবু, আপনার কাকা জোচ্চুরিটা ঠিকই ধরেছেন। আমার এই হাতে একটা শক্তিশালী চুম্বক ছিল। আর ওই কাচের মার্বেলটার তলায় লোহা দেওয়া আছে। এই ভেলভেটের তলায় যা আছে—সেটাও পাতলা কাঠ। কোনো সন্দেহ নেই এটা ম্যাজিকের খেলা। ধাপ্পা। কিন্তু রাজাসাহেব, আপনার অন্ধ কাকা কেমন করে আমার হাত নাড়া বুঝলেন সেটা একটু ভেবে দেখুন। আপনারা কেউ একবারও সন্দেহ করেননি—আমার বাঁ হাত নীচে ছিল—টেবিলের তলায়। এবং বাঁ হাতে চুম্বক ছিল। আপনার অন্ধ কাকা কেমন করে সেটা লক্ষ করলেন? আমি একবারও তাঁর পা ছুঁইনি। তাঁর যদি দৃষ্টিশক্তি না থাকত—তিনি কিছুতেই এই অন্ধকারে আমার হাত নাড়া দেখতে পেতেন না। উনি আগাগোড়াই এটা লক্ষ করেছিলেন; এবং আমার জোচ্চুরি ধরবেন বলে ডান হাত না বাড়িয়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উনি কি বাঁ হাতে কাজ করতে অভ্যস্ত? তা নয়। আগেই আমি সেটা লক্ষ করে নিয়েছি। ললিতনারায়ণ অন্ধ নন। অন্ধ সেজে রয়েছেন।"

"কে বলল আমি অন্ধ নয়?" ললিতনারায়ণ বেপরোয়াভাবে বললেন।

কিকিরা বললেন, "আপনি যে অন্ধ নন সেটা আজ স্পষ্ট হল। আরও যদি শুনতে চান—তাহলে বলব, আমি দূরবীন তাগ করে আগেই একদিন দেখেছি, আপনি আপনার মহলে ছাদে দাঁড়িয়ে কোনো চিঠি বা কাগজ পড়ছিলেন। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। আজ তা প্রমাণিত হল। আপনি যথেষ্ট চালাক। সন্দেহ এড়াবার জন্যে আগে থেকেই অন্ধ সেজেছেন।"

কিকিরা চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ঘরের মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থা। দীপনারায়ণ চমকে উঠেছিলেন। তারাপদ আর চন্দন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। ইন্দর যেন কোনো ভূত দেখেছে সামনে। শশধর কাঁপছিল।

দীপনারায়ণ রিভলবারটা তুলে নিলেন।

কেউ কোনো কথা বলছিল না।

ললিতনারায়ণ চোখের গগলস খুলে ফেললেন। বয়স হলেও তাঁর চেহারা এখনও মজবুত। চোখ দুটি তীব্র দেখাল। বললেন, "জয়কে কেউ খুন করেনি। সে অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে।"

কিকিরা বললেন, "খুনের প্রমাণ আছে।"

"কী প্রমাণ?"

"দীপনারায়ণবাবু, ছোরার বাক্সটা একবার দেবেন?"

দীপনারায়ণ চেয়ারের তলায় ছোরার বাক্স রেখেছিলেন। সতর্ক চোখ রেখে বাঁ হাতে বাক্সটা তুলে দিলেন। চাবিও!

কিকিরা বাক্সটা নিলেন। চাবি খুলে ছোরার বাঁটটা বার করলেন। বললেন, "এর ফলাটা কে খুলে নিয়েছে ললিত-নারায়ণবাবু?"

"আমি জানি না।"

বিশেষ বিশেষ সময়ের পোষাক-বিনী

হালকা হালকা রঙ···আর আকর্ষণীয় চেক, আজ পুরুষের পোষাকে এনেছে এক নতুন ধারা! শার্ট আর জ্যাকেট···মনের মত ঢঙে তৈরী ···ফ্ল্যাপ বিহীন অল্প ফ্লেয়ার ওয়ালা সেঁটে থাকা ট্রাউজার!

আর মেয়েদের পোষাকের কথা··· আজ ওঁদের পছন্দ এমন কাপড়, যা পরলে নারীর সকল সৌন্দর্য্য উপচে পড়বে···অবশ্য আপনি যদি পারেন···নিশ্চয়ই তাই পরবেন!

দেখুন দিকি—চওড়া লেপ্‌লওয়ালা পলিয়েস্টার কটনের এই পুরুষালী স্যুট···সঙ্গে চেক শার্ট আর উওভেন সিল্ক টাই!
আর পলিয়েস্টারের তৈরী এই হল্টার গাউনে···মরাল গ্রীবা···বিকশিত··· তাজা কুসুম-তনু···উদ্বেলিত!

"আপনি জানেন। আপনি জানেন, এই ছোরা দিয়ে কাউকে খুন করলে ফলা থেকে রক্তের দাগ যায় না। ফলাটাও ক্ষীণ হয়ে যায়, ছোট হয়ে আসতে থাকে।"

"আমাদের পরিবারের এই ছোরার কথা আমি জানি। আপনি আমায় শেখাবেন?"

"আপনি ভুল জানেন।"

"ভুল?"

"এই ছোরার ফলা থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলা যায়, ফলাও ঠিক থাকে।"

"তা হলে?" ললিতনারায়ণ কেমন চঞ্চল হয়ে পড়ছিলেন।

কিকিরা বললেন, "এই ছোরার যে রহস্যের কথা আপনারা জানেন—সেটা ইচ্ছে করে মানুষকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে তৈরী করা হয়েছে। ছোরার ফলায় কোনো দাগ থাকে না। কিছু বাঁটের মধ্যে থাকে। কাউকে খুন করতে হলে যতটা আঘাত ঘটে, যেভাবে খুনের সময় এবং পরেও ছোরাটাকে নাড়তে হয়—তাতে ফলার মধ্যে দিয়ে কিছু রক্ত এই বাঁটের মধ্যেও চলে যায়। বাঁটের মধ্যে যে রক্ত চলে আসে—সেটা শুকিয়ে খয়েরী বা কালো হয়ে যায়। ওপর থেকে এটা চোখে পড়ার কথা না। এই ছোরার এইটেই রহস্য।" বলতে বলতে কিকিরা ছোরার বাঁটের নানা পাথরের মধ্যে একটা পাথর বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরতেই ছোরার বাঁটের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

দীপনারায়ণ কেমন বিমূঢ়। ললিতনারায়ণও বোকার মতন তাকিয়ে থাকলেন।

কিকিরা পকেট থেকে পেনসিল টর্চ বার করে জ্বালালেন। ছোরার বাঁটটা দীপনারায়ণের দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "দীপনারায়ণবাবু, আমরা ম্যাজিকের খেলা দেখানোর সময় এ-রকম ছোরা ব্যবহার করি। বাঁটের ওপর পাত আর নীচের পাতের মধ্যে স্প্রিং দেওয়া থাকে। আপনি স্বচক্ষে দেখুন—এর মধ্যে রক্তের শুকনো কালো দাগ নেই। এই ছোরা দিয়ে কোনো খুন হয়নি। অন্য কিছু দিয়ে হয়েছে। কিকিরা ছোরার বাঁট আর পেনসিল-টর্চ এগিয়ে দিলেন দীপনারায়ণের দিকে।

তারাপদ আর চন্দন একেবারে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে। ওরা ভাবতেই পারেনি—কিকিরা ছোরা-রহস্যের সব জেনেও ওদের কাছে কিছু বলবেন না। আশ্চর্য লোক কিকিরা।

দীপনারায়ণ কিছু দেখার আগেই শশধর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। হাত জোড় করে বলল, "রাজাসাহেব, আমি নির্দোষ। ছোরার ফলাটা আমি পুকুরে ফেলে দিয়েছি। ও'রা আমায় ফেলতে বলেছিলেন।" বলে হাত দিয়ে ললিত-নারায়ণদের দেখাল।

ইন্দরও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একেবারে খেপে গেছে। চিৎকার করে বলল, "কুত্তা দিয়ে খাওয়াব ওদের। বদমাশ, শয়তান সব...। ধাপ্পাবাজ।"

কিকিরা হেসে বললেন, "কুত্তা দিয়ে পরের জন্মে খাওয়াবেন ইন্দরবাবু, এ-জন্মে আপনার কুত্তারা বিষ খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। দু চারটে মারা যেতেও পারে।" বলে কিকিরা চন্দনের দিকে তাকালেন।

ইন্দর খেপার মতন মাথা ঠুকতে লাগল।

ললিতনারায়ণ এতক্ষণ চুপ ছিলেন। এবার বললেন, "হ্যাঁ, আমি খুনী। জয়কে এই লাইব্রেরি ঘরে আমি খুন করেছি। রাজবাড়ির ওই ছোরা দিয়ে নয়। অন্য ছোরা দিয়ে।"

দীপনারায়ণ ভীষণ চোখে ললিতনারায়ণকে দেখছিলেন। বললেন, "ছোরার ফলাটা তা হলে শশধর কেন ফেলে দিল পুকুরে?"

ললিতনারায়ণ বললেন, "সে অনেক কথা, দীপ। জয় তোমার সিন্দুক থেকে ছোরার বাক্সটা বার করে এনেছিল। ইন্দরকে দেখাবে বলে। ইন্দর দেখতে চেয়েছিল। সেদিন লাইব্রেরি ঘরে যখন জয় ইন্দরকে ছোরাটা দেখাচ্ছিল, তখন সে ছোরার মুখ থেকে ফলাটা খুলে ফেলেছিল। আমি পেছন থেকে গিয়ে জয়কে খুন করি। ইন্দর জয়ের মুখ চেপে ধরে। তারপর যাতে কেউ সন্দেহ না করে, আগের ব্যবস্থা মতন আমরা জয়কে মাটিতে শুইয়ে বইপত্র ফেলে দি, ছবি ভাঙি। পাছে কেউ কোনো শব্দ পায়, শুনতে পায়, ইন্দর তার কুকুরের পালকে নীচে ছেড়ে দিয়েছিল—তাদের চিৎকারে কেউ কিছু শুনতে পায়নি। ছোরার বাঁটটা আমি নিয়ে নিয়েছিলাম। তাড়া-হুড়োয় ফলাটা নিতে পারিনি। নেবার দরকারও ছিল না। লোকজন এসে পড়ার সময় যখন খেয়াল হল—বাঁটটা কার্পেটের তলায় লুকিয়ে ফেলেছিল ইন্দর। পরে শশধর সেটা পুকুরে ফেলে দিয়েছে।"

দীপনারায়ণ রাগে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিলেন। বললেন, "জয়কে আপনারা খুন করবেন এটা অনেক আগেই ঠিক করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমরা ঠিক করেছিলাম জয়কে দিয়েই রাজবাড়ির ছোরাটা আনাব, তাকে খুন করব। ছোরাটা চুরি করব।"

"কেন?"

"লোভ। টাকার জন্যে। ছোরাটার অনেক দাম। আমার খুব টাকার দরকার ছিল। তোমরা আমায় টাকা দিতে না। কোনো দিনই দাওনি। দাদা চিরকাল আমায় অবজ্ঞা করেছে। সমস্ত সম্পত্তি একা ভোগ করেছে। তোমরাও ছিলে বাপকা বেটা। তোমাদের ওপর আমার কোনো মায়া-মমতা নেই। বোধ হয় আমি প্রতিশোধ নিতেও চেয়েছিলাম।"

থমথমে ঘরের মধ্যে কিকিরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "জয়নারায়ণকে খুন করবেন বলেই আপনি অন্ধ সেজে বসে-ছিলেন আগে থেকে?"

"হ্যাঁ। ইন্দর আমায় সেই পরামর্শ দিয়েছিল।"

"ছোরার বাঁটটা আপনি চুরি করেও আবার সিন্দুকে রেখে এলেন কেন?"

ললিতনারায়ণ চুপ। দু হাতে মুখ ঢাকলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, "ছোরাটা আমার ঘরে যে ক'দিন ছিল—আমি ঘুমোতে পারতাম না সারা রাত। ভয় করত। দুঃস্বপ্ন দেখতাম। জয় আমার পাশে-পাশে যেন ঘুরে বেড়াত। তা ছাড়া ইন্দর আমায় শাসাচ্ছিল। বলছিল, ছোরাটা তাকে দিয়ে দিতে। বিক্রি করে সে আমায় অর্ধেক টাকা দেবে। আমি ওকে বিশ্বাস করতাম না। ছোরার বাঁটটা পেলে ও পালাবে। কোনো উপায় না দেখে, মাথা ঠিক রাখতে না-পেরে—বাক্সটা আবার দীপনারায়ণের সিন্দুকে রেখে আসি চুরি করে। আমার পাপ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি।"

ললিতনারায়ণের দু চোখের তলা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন মানুষটা।

ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র

গোয়েন্দা বরদাচরণ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গোয়েন্দা বরদাচরণ একটা লাউ চুরির কেস নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। কে বা কারা পরশু দিন ন'পাড়ার মোক্ষদা দিদিমার ঘরের চাল থেকে একটি নধর লাউ চুরি করে নিয়ে গেছে। মোক্ষদা দিদিমার নাতি নাড়ুগোপাল বাইরে চাকরি করে, সে বড় লাউয়ের ডাল ভালবাসে। নাতির জন্য লাউটা খুব যত্নে রেখেছিলেন দিদিমা। আজকালের মধ্যেই নাড়ু-গোপালের আসার কথা। কিন্তু এর মধ্যেই পরশুদিন লাউটা চুরি গেছে। দিদিমা কেঁদে কেটে এসে পড়লেন বরদাচরণের কাছে। "ও বাবা বরদা, আমার লাউ উদ্ধার করে এনে দাও।"

সেই থেকে বরদাচরণের ঘুম নেই, খাওয়া নেই। সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আর কুকুর নিয়ে সারাদিন আতসকাচ হাতে করে মোক্ষদা দিদিমার সারা বাড়ি, ঘরের চাল, পাড়া-প্রতিবেশীদের আনাচ-কানাচে তন্নতন্ন করে ক্লু খুঁজেছেন। তারপর বাড়ি এসে সারাদিন বসে ভেবেছেন, কাগজ কলমে কী যেন লিখে-ছেন, আর মাঝেমাঝে "হুঁ হুঁ বাবা! নাঃ, হচ্ছে না!" গোছের কথা বলেছেন আপনমনে।

বরদাচরণের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। বাড়িতে বুড়ী মা আছেন, আর আছে তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ভাগ্নে চাক্কু, আর পোষা

কুকুর ডাঙ্ক। বরদাচরণ কিছু মোটাসোটা মানুষ. ঠিক করা শরীর। ভাগ্নে চাক্কু রোগা হলেও জুডো । ডাঙ্ক খুবই ভাল ঘেউ-ঘেউ করতে পারে।

চাক্কু এসে বারবার খোঁজ করে যাচ্ছে, "মামা, কিছু ভেবে ?"

বরদা খুবই অন্যমনস্কভাবে বলেন, "বোঁটা দেখে তো মনে লাউটা বেশ বড়সড়ই ছিল।"

"তা ছিল।"

"লাউটা বোঁটা কেটে নেওয়া হয়নি, মুচড়ে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।"

"হুঁ, ঠিক ধরেছ।"

"টিনের চালের ওপর একটা বড় লাউকে মুচড়ে বোঁটা

ছিঁড়ে নেওয়া হল, অথচ কোনো শব্দ হয়নি। মোক্ষদা দিদিমার ছেঁড়া মশারির মধ্যে প্রচুর মশা ঢুকে পড়েছিল বলে দিদিমার সে-রাতে ভাল ঘুম হয়নি, শব্দ হলে তাঁর টের পাওয়ার কথা।"

চাক্কু চিন্তিতভাবে বলে, "সে ঠিক, তবে মোক্ষদা দিদিমা আবার কানে একটু খাটো কিনা।"

"হুঁ, সেটাও ভাবছি।"

এই সময় বাইরে ডাঙ্ক ঘেউ-ঘেউ করে উঠল, কে একজন চেঁচিয়ে বলল, "কুকুর সামলান!"

চাক্কু ছুটে বাইরে গেল। একটু বাদে একজন বেশ ভাল চেহারার লোক ঘরে ঢুকেই বললেন, "বরদাবাবু, একটা মার্ডার কেস।"

বরদাচরণ গম্ভীরভাবে তাঁকে বসতে বলে কেস ডায়েরির খাতাটা টেনে নিয়ে কলম বাগিয়ে বললেন, "ডিটেলস বলুন।"

"আমার পোষা কাকাতুয়াটাকে আজ সকালে তার দাঁড় থেকে মৃত অবস্থায় ঝুলে থাকতে দেখা গেছে।"

বরদাচরণ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "এটা যে অস্বাভাবিক মৃত্যু তা কী করে বুঝলেন?"

"খুবই স্বাভাবিকভাবে।" ভদ্রলোক উদভ্রান্ত মুখে বললেন, "পাখিটার প্রতি আমার প্রতিবেশী রামচন্দ্রের অনেক-দিনের লোভ। সে প্রায়ই বলত, অম্বুজাক্ষ, তোমার কাকাতুয়াটা বড় চমৎকার হরির নাম করে হে! তখন থেকেই ওর মতলব আমার ভাল ঠেকেনি। আজ সকালে পাখিটাকে ঝুলতে দেখে আমি দাঁড়ে-রাখা জল আর পাখির খাবার পরীক্ষা করি। আমার মনে হচ্ছে, জলে বা খাবারে বিষ মেশানো আছে।"

বরদাচরণ ডায়েরি বন্ধ করে উঠলেন, পিস্তলটা ড্রয়ার থেকে বের করে পকেটে ভরলেন। আতসকাচ, দড়ি, ক্যামেরা, এবং কী ভেবে টেপ-রেকর্ডারটাও সঙ্গে নিলেন। চাক্কু এবং ডঙ্কিকেও তৈরি হতে বললেন। তারপর ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন, "অম্বুজাক্ষবাবু, কেসটা অত সরল নাও হতে পারে। রামচন্দ্রবাবুর যেমন মোটিভ থাকতে পারে, আবার কাকাতুয়াটা সুইসাইডও করতে পারে, কিংবা এর পেছনে হয়তো আরও অনেক গভীর চক্রান্ত হয়েছে।"

বেরোবার সময়ে বরদাচরণের মা ডেকে বললেন, "বরদা, দুটি পান্তাভাত খেয়ে যাবি না?"

কে শোনে কার কথা! বরদাচরণ বেরিয়ে পড়লেন।

অম্বুজাক্ষবাবুর বাড়িটা বেশ বড়। পিছনে একটা ঢাকা

দরদালানে অনেকগুলো খাঁচা, আর দাঁড়ে বিস্তর পাখি চেঁচামেচি করছে।

বরদাচরণ কাকাতুয়ার দাঁড়টা ভাল করে দেখলেন। পাখিটি পায়ে বাঁধা শিকলি থেকে তখনো ঝুলছে। দাঁড়ের দুদিকে দুটি বাটিতে জল আর কাবলি ছোলা। একটা ছোলা তুলে নিয়ে পিছনের উঠোনে ছুঁড়ে দিলেন বরদাচরণ, একটা কাক সঙ্গে-সঙ্গে নেমে এসে সেটা খেয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ বরদা-চরণ কাকটাকে লক্ষ করলেন। না, কাকটা মরল না। তার অর্থ ছোলায় বিষ নেই। জল থেকে খানিকটা ড্রপারে তুলে নিয়ে বরদাচরণ এদিক ওদিক তাকিয়ে অম্বুজাক্ষবাবুদের পোষা কাবলি বেড়ালটাকে একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গিয়ে আচমকা চেপে ধরলেন সেটাকে। অম্বুজাক্ষ হাঁ-হাঁ করে এগিয়ে এসে বাধা দেওয়ার আগেই বরদাচরণ বেড়ালকে অদ্ভুত কৌশলে হাঁ করিয়ে ড্রপারের জল তার মুখগহ্বরে ফেলে দিলেন। বেড়ালটা বারকয় খুব আপত্তিকর শব্দ করল বটে, কিন্তু মরল না।

বরদাচরণ গম্ভীরভাবে বললেন, "হুঁ।"

ওদিকে অম্বুজাক্ষবাবু একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি থেকে কয়েকটা বড়ি খেয়ে আপনমনেই বললেন, "গায়ে হাতে বড্ড ব্যথা।"

ওদিকে চাক্কু ডঙ্কির বকলস ধরে বাড়ির চারদিক ঘুরে ঘুরে ক্লু খুঁজছিল। হঠাৎ সে দৌড়ে এসে বরদাচরণের কানে-কানে বলে গেল, "লাউয়ের খোসা! রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির পিছন দিকে লাউয়ের খোসা পড়ে আছে, মামা।"

বরদাচরণ বিদ্যুৎবেগে উঠে পড়লেন।

বুড়ো মানুষ রামচন্দ্রবাবু ঘরে বসে রামায়ণ পড়ছিলেন বরদাচরণকে দেখে যেন একটু চমকে উঠে বললেন, "আরে, আসুন আসুন বরদাবাবু! বিখ্যাত লোকদের দেখা পাওয়া এক মস্ত সৌভাগ্য।"

বরদাচরণ বসলেন। স্থির চোখে কিছুক্ষণ রামচন্দ্রবাবুকে স্টাডি করে দেখলেন তিনি।

রামচন্দ্রবাবু রামায়ণ বন্ধ করে বললেন, "ভাবছিলাম, আজই আপনার কাছে একবার যাব। আমার উঠোনের নারকোল গাছ থেকে কাল রাতে ছটা নারকোল কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। খুবই রহস্যময় ব্যাপার। বাইরে থেকে কারো পক্ষে উঠোনে আসা খুবই শক্ত। তবে—"

বলে রামচন্দ্রবাবু খুবই ইংগিতপূর্ণভাবে চুপ করে গেলেন।

বরদাচরণ ডায়েরিতে কেসটা লিখে নিতে-নিতে বললেন— "কিছু গোপন করবেন না রামচন্দ্রবাবু।"

রামচন্দ্রবাবু লাজুক হাসি হেসে বললেন, "না, গোপন করে লাভ নেই। আপনার চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া সম্ভব! বলেই ফেলি।" বলে গলাটা নিচু করে বললেন, "পাশের বাড়ির অম্বুজটা মহা নারকোল-খোর। দুবেলা নারকোল খায়। বড়া করে খাচ্ছে, নাড়ু বানিয়ে খাচ্ছে, মুড়ি দিয়ে খাচ্ছে, অমন নারকোল খেতে আমি কাউকে দেখিনি। প্রায় সময়েই আমাকে বলে, রামচন্দ্রবাবু, আপনার গাছে বিস্তর নারকোল হয়েছে দেখছি! আমার সন্দেহ, কাল রাতে—"

"হুঁ।" বরদাচরণ খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু আগেই তিনি অম্বুজাক্ষবাবুকে গায়ের ব্যথার জন্য হোমিও-প্যাথিক ওষুধ খেতে দেখেছেন। গায়ের ব্যথা তো হবেই। এই বয়সে যদি অত উঁচু নারকোল গাছে কেউ ওঠে তবে ব্যথা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু খুঁজেপেতেও অম্বুজাক্ষবাবুর বাড়িতে নারকোল

না নারকোলের ছোবড়া পাওয়া গেল না। এটাও রহস্যজনক। কারণ, নারকোল খাওয়া যার নেশা, তার বাড়িতে নারকোলের চিহ্নও খুঁজে না-পাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক।

কিন্তু রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির পিছনে চাক্কুর কথামত লাউয়ের খোসা ঠিকই পাওয়া গেল। পরিষ্কার ক্লু।

কিন্তু বরদাচরণ চট করে কিছু করেন না। অপরাধীকে সময় দেন। তাকে যে সন্দেহ করা হচ্ছে, তা টেরও পেতে দেন না।

মোক্ষদা দিদিমাকে লাউয়ের ব্যাপারে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করবেন বলে বরদাচরণ ভরদপুরে দিদিমার বাড়ি এলেন। প্রশ্নগুলো এরকম,—লাউয়ের রংটা কীরকম ছিল, গাঢ় সবুজ না হালকা? লাউয়ের গায়ে এক জায়গায় একটা পোকার গর্ত ছিল কিনা! বোঁটার কাছে এক জায়গায় একটা নখ বসানোর দাগও পাওয়া যাচ্ছে। রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির পিছনের আস্তাকুঁড় থেকে সবকটা লাউয়ের খোসা কুড়িয়ে এনে বরদাচরণ তার মধ্যে এইসব অকাট্য চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন।

যখন মোক্ষদা-দিদিমাকে জেরা করছিলেন বরদাচরণ, তখনই হঠাৎ চাক্কু এসে চুপিচুপি কানে কানে খবর দিয়ে গেল, "মামা, মোক্ষদা দিদিমার ভাঁড়ার ঘরে এক বস্তা নারকোলের ছোবড়া। আর ছ'টা খোসা-ছাড়ানো নারকোল।"

মাথাটা ঘুরে গেল বরদাচরণের। কেসগুলো খুবই জড়িয়ে যাচ্ছে। অসম্ভব জটিল হয়ে উঠছে। মোক্ষদা-দিদিমার বাড়িতে নারকোল গাছ নেই, তবে ছোবড়া বা নারকোল আসে কোত্থেকে? ওদিকে রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির চুরি-যাওয়া নারকোল অম্বুজাক্ষবাবুর বাড়িতেও পাওয়া যায়নি। নারকোলের সংখ্যাটাও আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যাচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে বরদাচরণ উঠে পড়েন। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে দেখে নেন ছ'টা চেম্বারেই গুলি ভর্তি আছে কিনা। আছে।

রাস্তায় পা দিতেই একটা গাড়ি সামনে ঘ্যাঁস করে থামল। গাড়ির ভিতরে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। তিনি হাতজোড় করে বললেন, "আসুন, বিখ্যাত গোয়েন্দাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ধন্য হই।"

বরদাচরণ উঠলেন। চাক্কু আর ডিঙ্কও উঠল সামনের সীটে। অচেনা ভদ্রলোক গলা নিচু করে বরদাচরণকে বললেন, "একটা খুবই রহস্যময় কাণ্ড ঘটে গেছে। কাল আমার একটা পোষা কাকাতুয়া মারা গেছে। খুবই প্রিয় পাখি ছিল আমার। ঠিক করেছিলাম পাখিটার মৃতদেহ একটা ভাল জায়গায় কবর দিয়ে ওপরে একটা চমৎকার সমাধি তৈরী করে দেব। কিন্তু বিপদ হল, কাকাতুয়াটার মরদেহ একটা নাইলনের ব্যাগে ভরে বাইরের বারান্দায় রেখে গতকাল আমি ড্রাইভারকে গাড়ি বের করার কথা বলতে গিয়ে ফিরে এসে দেখি, ব্যাগটা নেই। কী সাংঘাতিক কাণ্ড বলুন! কেসটা যদি আপনি নেন!"

বরদাচরণ সবই টুকে নেন ডায়েরিতে। গম্ভীরভাবে বললেন, "হুঁ, কাকাতুয়ার কেস দুটো হল তা হলে! আশ্চর্য!"

বলে দুশ্চিন্তিত বরদাচরণ বাড়ির সামনে নেমে গেলেন।

দুপুরে খুবই অন্যমনস্কভাবে খেতে বসেছেন বরদাচরণ। কী খাচ্ছেন তা বুঝতেই পারছেন না। লাউ, কাকাতুয়া, নারকোল, সব জট পাকিয়ে আছে মাথায়। তাঁর মা বললেন, "ও বরদা, লাউঘণ্ট দিয়ে আর দুটো ভাত মাখ্।"

লাউঘণ্ট কথাটা বরদাচরণের মাথার মধ্যে দু-একবার টংটং শব্দ করল। প্রায়ই তিনি লাউঘণ্ট খান, কাজেই বিস্মিত হবার কিছু নেই।

হঠাৎ বরদাচরণ চমকে উঠে বললেন, "লাউঘণ্ট! লাউ এল কোথা থেকে? আমি তো আজ বাজার থেকে লাউ আনিনি!"

মা বলেন, "তুই আনবি কেন? কাল চাক্কু লাউটা হাতে করে এনেছে, ওর কোন্ বন্ধুর বাড়িতে নাকি অনেক লাউ হয়েছে, তারা দিল।"

নিজের পাতের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন বরদাচরণ। লাউঘণ্টের পাশে দুটো বড়া পড়ে আছে। উঠে গিয়ে আতসকাচ নিয়ে এসে বড়াটা নিবিষ্টভাবে দেখেছেন, মা বললেন "দেখছিস কী! ও তো নারকোলের বড়া। ছটা নারকোল এনেছিল চাক্কু, কোন্ গাছ থেকে নাকি পড়ে গিয়েছিল বাতাসে। তার দুটো ভেঙে ঐ বড়া করেছি।"

বরদাচরণ বাকি সময়টা ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন। চাক্কু অনেক আগেই খেয়ে-দেয়ে কোন্ মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে পড়া বুঝতে গেছে।

বরদাচরণ পিস্তল আর আতসকাচ নিয়ে ডিঙ্কর শেকল ধরে ঘর থেকে বেরোলেন। তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন চারদিক। অবশেষে ডিঙ্ক ইংগিত বুঝতে পেরে তাঁকে গোয়ালঘরে টেনে আনল। সেখানে একটা সদ্য-কেনা দাঁড়ে জলজ্যান্ত একটা কাকাতুয়া বসে আছে। বরদাচরণকে দেখেই বলে উঠল "হরি বল, হরি বল ভাই, হরি ছাড়া গতি নাই।"

বরদাচরণ টেপ-রেকর্ডার নিয়ে এসে পাখিটার কথা টেপ করতে লাগলেন।

তারপর সারা দুপুর আর সন্ধে, আর্কিমিডিস যেমন স্নানের চৌবাচ্চায় ডুব দিয়ে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির চিন্তা করেছিলেন, তেমনি এক চিন্তার চৌবাচ্চায় ডুবে থেকে বরদাচরণও লাউ, কাকাতুয়া আর নারকোলের রহস্যে মগ্ন রইলেন। তারপর আর্কিমিডিস যেমন 'ইউরেকা' বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি তিনিও লাফিয়ে উঠলেন। সমস্ত রহস্যটাই তাঁর কাছে জল হয়ে গেছে।

বস্তুত তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন, যে-লোকটা মোক্ষদা দিদিমার লাউ চুরি করেছে, সেই একই লোক গতকাল গাড়িওলা ভদ্রলোকের মৃত কাকাতুয়াটা হাতসাফাই করে অম্বুজাক্ষবাবুর জ্যান্ত কাকাতুয়ার দাঁড়ে ঝুলিয়ে রেখে হরিনামপরায়ণ জ্যান্ত কাকাতুয়াটাকে সরিয়ে ফেলে। আবার সেই লোকটাই কোনো এক অজ্ঞাত কারণে রামভক্ত রামচন্দ্রবাবুর নারকোল গাছের ছটা নারকোলও গোপনে নামিয়ে নেয়। এবং ঐ একই অপরাধী প্রমাণ লোপের চেষ্টায় এবং তদন্তকে বিভ্রান্ত করার জন্য বরদাচরণকে রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির পিছনে লাউয়ের খোসার সন্ধান দেয়, এবং মোক্ষদা-দিদিমার বাড়িতে নারকোল-ছোবড়ার অস্তিত্বের কথা ফাঁস করে দেয়।

বেশ রাত হয়ে গেছে। সবাই গভীর ঘুমে। বরদাচরণ পিস্তল হাতে নিয়ে চুপিসাড়ে পাশের ঘরে এসে অন্ধকারে চেয়ে রইলেন। আবছা দেখা যাচ্ছে, দিদিমার বুক ঘেঁষে শুয়ে চাক্কু ঘুমোচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গোয়েন্দা বরদাচরণ। না, এক্ষুনি তিনি কিছু করবেন না। অপরাধীকে তিনি সবসময়ে আরও সুযোগ দেন। তাতে অপরাধীকে যে সন্দেহ করা হচ্ছে, তা সে বুঝতে পারে না। এবং এইভাবেই সে একদিন নিজের অপরাধের জালে ধরা পড়ে যায়।

পিস্তল নামিয়ে গোয়েন্দা বরদাচরণ ফিরে এলেন নিজের ঘরে। তিনি এখন নিশ্চিন্তভাবে জেনে গেছেন, কে অপরাধী। অপরাধী আর কেউ নয়, অপরাধী হল......?

ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

মা-দুগ্‌গার হাসি

গিজ্‌তা গিজাং, গিজ্‌তা গিজাং
বোল বাজছে ঢাকে,
কাঁই-নান্না, কাঁই-নান্না
সঙ্গে কাঁসর হাঁকে।
ছেলেবুড়োর নাচের চোটে
পুজো-প্যাণ্ডেল কেঁপে ওঠে
সন্ধি-পুজোর মাতামাতি
দোলায় পাড়াটাকে।

জড়িয়ে গায়ে রেশমী জামা
নাচায় ভুঁড়ি টাক্‌কু-মামা,
নাকী সুরে ন্যাকা নেপো
পোঁ ধরেছে নাকে।
হঠাৎ সেই ফাঁকে
ফটাস দুড়ুম ভুঁই-পট্‌কা
ফাটল মামার টাকে!
সিঙ্গি-অসুর জড়িয়ে গলা
ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে,
মা-দুগ্‌গাও পারেন নাকো
চাপতে হাসিটাকে।

To Aveek Sarkar
with all best wishes,
Hergé

টিনটিন কি কলকাতায় আসবে?

টিনটিনকে এক ডাকে সবাই চেনে। এইটুকু ছেলে, কিন্তু কত বড় ডিটেকটিভ বল তো! বিরাট-বিরাট রহস্যের সমাধান করেছে একা-একা। বিপদে পড়েছে অসংখ্যবার, গা-ছমছম-করা ঝুঁকি যে কতবার নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক জিতে গেছে। অথচ টিনটিনকে দেখলে একবারও মনে হয় না যে, ওর গায়ে অত জোর! মাথায় এত বুদ্ধি! ওর মাথায় ছোট্ট-ছোট্ট করে ছাঁটা চুল, শুধু সামনের দিকটা উঠে আছে ঝুঁটির মতো। পরনে হাতা-গোটানো ফুল শার্ট আর ট্রাউজার্স, পায়ে জুতো-মোজা। পোশাক-আশাক সাধারণ, স্বাস্থ্য মাঝারি, অথচ এই টিনটিনই শত্রুদের কাছে একাই এক হাজার।

টিনটিন কিন্তু একা নয়, ওকে সবসময় সাহায্য করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে পুলিশের দুজন হোমরা-চোমরা অফিসার, জনসন আর রনসন। দুজনের মাথায় টাক, টাকের ওপর গোল টুপি, নাকের নীচে ঝোলানো মস্ত গোঁফ, আর হাতে ছড়ি। দুজনে চলতে-ফিরতে যে কতবার আছাড় খায় আর মাথায় গুঁতো খায়, তার ঠিক-ঠিকানা

নেই। কথাবার্তা, চাল-চলন ভীষণ ভারিক্কি, কিন্তু উল্টোপাল্টা কাজে আর গোলমাল পাকানোয় এদের জুড়ি মেলা ভার। তবে লোক দুটো খুব ভাল, টিনটিনকে ভালবাসে বন্ধুর মতো। বন্ধুর কথা উঠলেই টিনটিনের প্রিয় বন্ধু হ্যাডকের কথা মনে পড়ে যায়। সেই যে কারাবুজান জাহাজের ক্যাপটেন হ্যাডক, যাকে উদ্ধার করে টিনটিন লাইফবোটে চড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ক্যাপটেন খুব মজার লোক, ওর গালাগালি শুনলে পর্যন্ত হাসি পায়। কী সব গালাগালি, "জেবরা...জিরাফ... নারকোল ... তরমুজ...বোম্বেটে...ভূত" —মনে আছে?

টিনটিনের জগৎ আশ্চর্য জগৎ। এই জগতে জড়ো হয়েছে নানা দেশের মানুষ-জন। টিনটিনও গেছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে। সমতল, পাহাড়, আকাশ, সমুদ্র আর মরুভূমিতে ছড়িয়ে আছে বিচিত্র তার কীর্তিকাহিনী। এই-যে টিনটিন, একে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর নাম জর্জ রেমি, তবে হার্জ নামেই ইনি বেশি পরিচিত। হার্জ বেলজিয়ান, বয়স ৬৯। কিন্তু কে বলবে তাঁর এত বয়েস হয়েছে! চেহারা, চাল-চলন দেখে মনে হয় বড় জোর পঁয়তাল্লিশ, কথাবার্তা শুনলে মনে হয় আরও কম। টিনটিন জনপ্রিয় সেই ১৯২৯ সাল থেকে, গত ৪৭ বছরে টিনটিনের জনপ্রিয়তা বাড়লেও বয়েস বাড়েনি একটুও। আজও টিনটিন সেই সেদিনের মতো এইটুকুন ছেলে। হার্জও মনে হয়

de dos
PAN
20 ans
18
Mais nous allons
Arranger quoi ?
41

টিনটিনের মতো তাঁর নিজের বয়েসকে বাড়তে দেননি।

হার্জ মজার-মজার ছবি ও গল্প তৈরি করছেন ছোটবেলা থেকেই। তখন তাঁর অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না, কাজ নিয়েছিলেন এক পাদরী-সাহেবের কাগজে। এখানেই তিনি ব্যঙ্গ-চিত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সারা পৃথিবী তাঁকে বুকে তুলে নেয়।

হার্জের স্টুডিও ব্রাসেলসে। তাঁর স্টুডিওতে ঢোকার মুখেই গা শিরশির করে ওঠে। র‍্যাকে ঝোলানো ওগুলো কী? দুটো গোল টুপি আর দুটো ছড়ি, ভীষণ চেনা-চেনা! জিজ্ঞেস করতেই হার্জ বললেন, "চুপ! ওগুলো হচ্ছে জনসন আর রনসনের, ওদের একদম বিরক্ত কোরো না। ওরাই তো আমাদের পাহারা দিচ্ছে।" শুধু টুপি আর ছড়িই নয়, টিনটিনদের আরও অনেক-কিছুই ছড়িয়ে আছে স্টুডিওতে। হার্জ আঁকা ও লেখার সব কিছু নিজেই করেন, অবশ্য তাঁকে সাহায্য করার জন্যে স্টুডিওতে আরও অনেকে আছেন। খুব ব্যস্ত মানুষ তিনি, কিন্তু টিনটিন যার ভালভাবে পড়া আছে, তার সঙ্গে গল্প করতে তিনি সবসময় তৈরি। একবার গল্প জুড়লে সে-গল্প চলতে থাকে অনেকক্ষণ।

হার্জ গল্প এবং গল্পের চরিত্র সৃষ্টিতে কল্পনার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেন, তবে কিছু-কিছু চরিত্রের চেহারায় বাস্তবের আভাস থেকে যায়। তাঁর গল্পের এক বিখ্যাত চরিত্র জেনারেল আলকাজার। সম্প্রতি একটি বইতে তিনি এই জেনারেলের বিয়ে দিয়েছেন। বউয়ের স্বভাব যেমন দেখতেও তেমন, দেখলেই যে-কারও বুক ধড়াস্-ধড়াস্ করে উঠবে। এই-রকম বউয়ের পাল্লায় পড়ে দুঁদে জেনারেলের অবস্থা কী করুণ হয়ে উঠেছিল, বইটা হাতে এলে পড়ে দেখো। এই মহিলার ছবিটা কিন্তু বানানো নয়, সত্যি। একদিন হার্জ বসে-বসে টি ভি দেখছিলেন, হঠাৎ দেখলেন ভয়ংকর চেহারার এক ভদ্রমহিলার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি খাতা-পেনসিল নিয়ে মহিলার ছবি এঁকে ফেললেন। এই ছবির মহিলাই হল জেনারেলের বউ।

গল্প-রচনায় হার্জ সমস্ত রকম স্বাধীনতা নিলেও কখনোই খেয়াল-খুশিমতো পটভূমিকা তৈরি করেন না। তাঁর ছবিতে মরক্কো ঠিক মরক্কোর মতো, তিব্বত তিব্বতের মতো, মরুভূমি মরুভূমির মতো। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি তাঁর ছবিতে খুঁটিনাটি নিয়ে হাজির হয়। হার্জ কিন্তু এইসব তথ্য সংগ্রহের জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াননি। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন-এর আলোকচিত্র থেকে সব কিছু পেয়ে গেছেন। তিনি বলেন, "আমার বয়েস হয়েছে, এত ঘোরাঘুরি করা কি আর পোষায়! টিনটিনের অল্প বয়েস, ওই ঘুরে বেড়াক।" হার্জের যখন ইচ্ছে, টিনটিন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছে মনের আনন্দে।

"তিব্বতে টিনটিন" বইতে দিল্লির কয়েকটি দৃশ্য আছে। চমৎকার এই দৃশ্যগুলি ওই পত্রিকার সাহায্যে তৈরি। হার্জ অবশ্য অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে একবার দিল্লিতে নেমেছিলেন। সামনের বছর তিনি চীনে যাবেন, যাবার পথে ভারত দেখার ইচ্ছে আছে তাঁর। চীনে যাবেন চ্যাং-য়ের সঙ্গে দেখা করতে। চ্যাং তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং তাঁর বইয়ের একটি প্রিয় চরিত্র। এত ভালবাসা, এত যত্ন নিয়ে তিনি বোধহয় আর কোনও চরিত্র সৃষ্টি করেননি। "তিব্বতে টিনটিন" বইটি যারা পড়েছে তারা জানে, এই চ্যাং-য়ের জন্যে টিনটিন কী না করেছে, খুঁজতে-খুঁজতে শেষকালে তাকে পেয়েছে ইয়েতির গুহায়।

হার্জের যখন অল্প বয়েস, তখন সত্যিকারের চ্যাং-য়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ। অল্পদিনের মধ্যে তাঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। যুদ্ধের সময় তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। হার্জ কতভাবে বন্ধুর খোঁজ করেছেন, কিন্তু কেউ তার খোঁজ দিতে পারেনি। অনেকদিন পরে ব্রাসেলসের এক চীনা রেস্টুরেন্টের

টিনটিনের স্রষ্টা হার্জ বিশ্ববিখ্যাত ব্যঙ্গ-চিত্রী। টিনটিন এ-পর্যন্ত মোট ২৩টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় টিনটিনের অনুবাদ হয়নি। আবার বাংলা অনুবাদের কাজ করেছে একমাত্র মাসিক আনন্দমেলা। সম্প্রতি শ্রীঅভীককুমার সরকার ব্রাসেলসে গিয়ে হার্জ-এর সঙ্গে দেখা করে-ছিলেন। টিনটিন তোমাদের ভাল লেগেছে জেনে হার্জ তো মহা খুশি। তিনি শুধুমাত্র তোমাদের জন্যে আলাদা করে ছবি এঁকে দিয়েছেন, শুধুমাত্র তোমাদের জন্যে বলেছেনও অনেক কথা। আবার এই লেখাটি পড়ে তাঁর সম্পর্কেও অনেক অজানা-কথা তোমরা জানতে পারবে।

ওয়েটারের কাছ থেকে চ্যাং-য়ের ঠিকানা পাওয়া যায়। চ্যাং একটি মিউজিয়ামের কিউরেটর, থাকেন সাংহাইয়ে। বহুকাল পরে চিঠিপত্রে দুই বন্ধুর আবার যোগা-যোগ হয়। এরকম বন্ধুত্ব সত্যিই খুব কম দেখা যায়! নিজের বইয়ের মধ্যে হার্জের সব চাইতে প্রিয় বই "তিব্বতে টিনটিন"।

হার্জকে কেউ-কেউ ভুল বোঝে। তারা ভাবে, ছবি আঁকার আড়ালে হার্জ বুঝি তাদের ওপর কিছু-একটা চাপিয়ে দিতে চাইছেন। এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়, তাঁর হাসিতে একটুও ময়লা নেই। তিনি বলেন, পৃথিবীটা কেমন যেন গোমড়ামুখো, তাই একটু মজা করে সবকিছু হালকা করে দিতে চাই। আমার লেখায় মজা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

"আপনি ভারতবর্ষের ওপর একটা বই করুন না, এই ধরুন কলকাতায় টিনটিন।" উত্তরে হার্জ বললেন, "দেখি। নতুন কোনো বই তৈরি করতে আজকাল অনেক সময় লেগে যায়। এই দেখো না, সেই ফ্লাইট ৭১৪-র পরে আর-একটা বই করতে প্রায় সাত বছর লেগে গেল। হাজার হোক, বয়েস হয়েছে তো!"

সামনের বছর হার্জের ভারতে আসার কথা। তখন তিনি যদি একবার কলকাতায় আসেন, এই অনুরোধের কথা তাঁর কি একবারও মনে পড়বে না! শুধু অনুরোধ বলে নয়, কলকাতায় কী না আছে বলো? মজার ছবি তৈরি করার উপকরণ কি কম? ভেবে দেখ তো, টিনটিন আর দুধের মতো সাদা কুট্টুস আমাদের চৌরঙ্গী, কালীঘাট, বড়বাজার আর শিয়ালদায় ছুটে বেড়াচ্ছে!

আশাপূর্ণা দেবী

হরিণের দুধ

হরিণের দুধ!

দিন আধসের করে।

বটু কবরেজের প্রেসকৃপশন শুনে নালু বিশ্বাসের ছেলে-দের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। পড়বে না ভেঙে, জোগাড় করতে হলে তো তাদেরই করতে হবে।

অথচ হরিণের যে আবার দুধ হয়, এ-কথা তারা ইহজীবনে এই প্রথম শুনল। গরুর দুধ, মোষের দুধ, ছাগল-দুধ এসব তো জানা কথা। সত্যি বলতে কী. গাধার দুধের কথাও শুনেছে। কানাই স্যাঁকরার 'পুঁইয়ে পাওয়া' ভাইপোটা তো গাধার দুধ খেয়ে-খেয়েই মানুষ হয়েছে। কারণ তার পিলে-ভর্তি পেটে ছাগলদুধ পর্যন্ত সইত না। অবিশ্যি গাধার দুধের প্রকোপে বুদ্ধিটা তার গাধা-গাধাই হয়ে গেছে। তা যাক, কত লোকের তো মুরগীর ঝোল খেয়ে মানুষ হয়েও গাধার মতন বুদ্ধি হয়।

সে যাক! ছেলেবেলায় এ-কথাও শুনেছে নালুর ছেলেরা যে, সেকালের কলকাতায় নাকি পয়সা ফেললে অর্ধেক রাত্রেও বাঘের দুধ মিলত। কিন্তু হরিণের কথা শোনেনি কস্মিনকালেও।

নাঃ, জীবনে শোনেনি নালু বিশ্বাসের দুই ছেলে ন্যাড়া আর পটলা। তাই তারা বলেই ফেলল, "হরিণের দুধ! বলেন কি কবরেজ মশাই! হরিণের আবার দুধ হয়?"

বটু কবরেজ অনেকক্ষণ থেকে একটিপ নস্যি দু আঙুলে টিপে বসে ছিলেন, এখন সেটি সবেগে সতেজে নাকে গুঁজে দিয়ে কাপড়ে ঝরে পড়া নস্যির গুঁড়ো ঝাড়তে-ঝাড়তে খোনা-খোনা গলায় বলেন, "হয় না তো হরিণছানারা মানুষ হয় কী খেয়ে?"

পটলা চমকে বলল, "মানুষ হয়?"

ন্যাড়া দাবড়ানি দিয়ে বলল, "তুই থাম তো, মানুষ না-হয়ে নয় হরিণই হল, কিন্তু কথা তো তা নয়, বনের হরিণ, বনের ছানাকে খাওয়াচ্ছে, সে-দুধ মানুষের ঘরে আসবে কী করে?"

বটু কবরেজ রাগ-রাগ গলায় বলেন, "না আসতে পারলে

তোমার বাপের ব্যায়রামও রইল জেঁকে বসে।"

ছেলেরা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "আজ্ঞে না না, সে-কথা বলছি না, আসবে না তো কী, আলবত আসবে। তবে শুনিনি তো কখনো—"

বটু আরও একবার কৌটো খুলে নস্যির টিপ ধরে বসে ছিলেন। এখন আবার নাকে ঠুসে ফেলে বলেন, "তা তোমাদের বাপের রোগের মত রোগই কি শুনেছ কখনো?"

তা বটে।

দুই ভাইকেই মাথা নেড়ে স্বীকার করতে হল, দেখেনি, শোনেনি।

নালু বিশ্বাসের যে রোগটা কী, তা নালু বিশ্বাসই জানে অথবা সেও জানে না। লোকে দেখে, মিনিটে মিনিটে তার রোগের লক্ষণ পালটাচ্ছে। এই এক্ষুনি পেট গুড়গুড় তো সেই তক্ষুনি পেট ভুটভুট। এই বুক ধড়ফড় তো সেই বুক কনকন। এই মাথা ঝিমঝিম তো সেই গা হিমহিম।

তা ছাড়া মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বত্রই নালুর ব্যাধির প্রকোপ। পা টনটন, মাথা বনবন, ঘাড় মড়মড়, নাক সড়সড়, কান কটকট, হাড় মটমট। পিঠ শিরশির, হাত থিরথির, চুল গরগর, নখ দপদপ, সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে এই সব হচ্ছে নালুর। যে নালুর দোকান-অন্ত প্রাণ ছিল; সেই নালু তার সাধের দোকনপাট সর্বস্ব ছেলে-দের হাতে সঁপে দিয়ে বিছানায় শুয়ে কাটাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন জোড়া চৌকিতে একটি গন্ধমাদন গড়াচ্ছে। অ্যালো-প্যাথি, হোমিওপ্যাথি, টোটকা, ঝাড়ফুঁক সব শেষ করে এখন বটু কবরেজের শরণ নিয়েছে নালু।

চুপচাপ শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ কবরেজের বাক্যসুধা পান করছিল, এখন চিঁচিঁ করে বলে উঠল, "বটু ভাই, ওসব হ্যাংগামের জিনিসের ব্যবস্থা ছাড়ো। ও জোগাড় করা আমার ছেলেদের কম্মো নয়, তার থেকে বরং আমায় একটু বিষ দাও, খেয়ে মরি, এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

ন্যাড়া পটলা ভারী মুখে বলে, "ছেলেরা বলেছে, ওটা তাদের কম্মো নয়?"

নাল্টু বলে, "তোমরা বলনি, তোমাদের মুখের চেহারাই বলছে।"

নালুর স্বর আরও চিঁচিঁ করে।

ন্যাড়া বাপের ধিক্কারে দুঃখে অপমানে মুখটা গামলা করে বসে থাকে। কিন্তু পটলা হচ্ছে কটকটে ছেলে, তাই পটলা বলে ওঠে, "কিন্তু রোগটা আসলে কী, তা তো বললেন না কবরেজ মশাই?"

"বললাম না?"

কবরেজ খোনা গলায় খেঁকিয়ে ওঠেন, "বললে তুমি বুঝবে? আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে এ রোগের নাম হচ্ছে মজ্জা নিমজ্জিত—সুপ্ত শোণিত।' বলি বুঝলে কিছু?"

পটলা গম্ভীর ভাবে বলে, "সংস্কৃতয় আমি চিরদিন কাঁচা, বাঙলায় বললেই বুঝতে পারি।"

বটু কবরেজও পটলার চেয়ে কিছু কম কটকটে নয়, তাই তিনিও কটকটিয়ে বলেন, "বাঙলায় বলতে হবে? ওঃ এবার থেকে তোদের বাড়িতে আসতে হলে একটা 'সরল বাংলা অভিধান' নিয়ে আসতে হবে। বাঙলায় বললে বলতে হয় রক্তঝিমুনি রোগ। মানুষ যেমন তন্দ্রা থেকে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যায়, এ তেমনি, রক্তরা ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে মজ্জার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। বুঝলে? সেই কারণেই না হরিণের দুধের ব্যবস্থা। হরিণের রক্তের গুণ সর্বদা লাফানি-ছটফটানি। তা দুধেও সেই গুণ ঘটবে। কাজেই দিনে দুবার ওই কস্তুটি দিয়ে স্বর্ণভস্ম মকরধ্বজ বটি মেড়ে খেতে পারলেই তোদের বাবা তিনদিনে লাফালাফি শুরু করবে।"

কথাটা পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে ন্যাড়া পটলার মা, মানে নালুগিন্নি ঘোমটা টানতে টানতে বেরিয়ে এসে উচ্চস্বরে ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে, "তবে আর দ্বিরুক্তি কেন কবরেজ মশাই? ওই হরিণ-বটি না কী বললেন তাই দিয়ে দ্যান, বুড়োর চিঁচিঁ আর শুনতে পাচ্ছিনে।"

বটু কবরেজ মাথায় হাত দিয়ে বলেন, "হরিণবটি? ও ন্যাড়া, তোর মা কী বলে রে?"

ন্যাড়া উদাস গলায় বলে, "মায়ের ওই রকমই কথা। আরো যত যা বলে, শুনলে আপনি মায়ের জন্যেও দাওয়াই খুঁজতেন।"

কেন? কথাটার কী দোষ হল? ন্যাড়া-পটলার মা ঘোমটা আর গলা দুটোই আরো খানিক বাড়িয়ে বলে, "কবরেজ মশাই নিজেই বললেন না স্বন্নভস্ম মকরধ্বজ দিয়ে হরিণ মেড়ে খেলে, তিনদিনে তোদের বাবা হরিণের মতন লাপালাপি করবে। এখন কিনা মা যত যা বলে—"

কিন্তু কথা শেষ করতে হল না নালুগিন্নীর, নালু চিঁচিঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে, "লাফালাফি? কবরেজ তার চে' তুমি আমায় একটু বিষ দাও, খেয়ে বাঁচি! লাফালাফি, ওরে বাবারে, গেলাম, গেলাম, মরে গেলাম। তোল তোল, ধর ধর টান টান, কিলো কিলো, টেপ টেপ, খামচা খামচা, ওরে চিমটি-চিমটি...সুড়সুড়ি সুড়সুড়ি...আঁহা হাঁ হাঁ।"

এই!

এই হচ্ছে রোগ নালু বিশ্বাসের।

ছটফটানির সময় এই সবই করতে হয় ওকে। পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিতে হয়, কানের পিঠে চিমটি কাটতে হয়, পেটের মাংস খামচে-খামচে দিতে হয়, হাঁটুর মালাইচাকি টিপে দিতে হয়, টাকের পাশে যে কটি চুল আছে, মুঠোয় চেপে ধরে টানতে হয়। পিঠের মাঝখানে কিল বসাতে হয়। খাট থেকে গড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষে করতে চেপে ধরতে হয়। আর মিনিটে মিনিটে তুলে বসাতে হয়।

এসব না করলে?

ওঃ, মানে না করলে যে কী হয় তা কে জানে? কে দেখতে গেছে? কার এত সাহস?

বাবা চেঁচালেই দুই ছেলে লেগে যায়—ধরতে, টিপতে, টানতে, খামচাতে, চিমটি কাটতে, কিল মারতে, সুড়সুড়ি দিতে।

নালুগিন্নী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, "দেখলেন তো কবরেজ মশাই?"

বটু কবরেজ মদগর্ব-চালে বলেন, "দেখবার দরকার নেই, যা বোঝবার বুঝেছি। এখন উপায় শুধু হরিণ।"

বলে চলে যান কবরেজ।

উপায় শুধু হরিণ!

এতবড় একখানা রোগের সমাধান মাত্র এইটুকুতে? নালু-গিন্নী এখন ঘোমটা খুলে চেঁচায়, "ওরে তোরা দুজনে দুদিকে যা। ছোট্ একজন হাটের দিকে, একজন বাজারে। হাতবাক্সয় নোট আছে গোছা-গোছা, পকেট ভরে নিয়ে যা।"

ন্যাড়া তাড়াতাড়ি হাতবাক্স হাতাতে ছোটে, তবে পটল পটপটিয়ে বলে ওঠে, "এ কি তোমার চাল ডাল, না মাছ তরকারি যে, বাজারে ছুটলেই পাওয়া যাবে?"

মা-ও ছেলের থেকে কম যায় না, সেও তেমনি কটকটিয়ে বলে, "তুই আমায় বোকা বোঝাতে এসেছিস পটলা? এত বড় রানাঘাট শহরে পয়সা ফেললে একটা হরিণ মিলবে না? বলে রাত্তিরদিন লোকে হাঁস-মুরগী, ছাগল-ভেড়া, গরু-মোষ কী না কিনছে!"

তবে আর কী করা?

দুই ভাই দুদিকে ছোটে।

ছোটে! রোজই ছোটে। শুধু রানাঘাট শহরেই নয়, ছোটে চাকদা, পায়রাডাঙা, হাঁসখালি, কেষ্টনগর, বলতে গেলে জেলার এমুড়ো ওমুড়ো। ব্যবসা-বাণিজ্যর জন্যে এ সব তল্লাট চষে বেড়াতে হয় নালু বিশ্বাসকে, সবই জানা, তাই ছেলেদের হদিস দেয়। কিন্তু কোন্ বাজারে হরিণ কিনতে পাওয়া যায় সে-হদিস দিতে পারে না, কাজেই ছোটাছুটিই সার।

একদিন তো ন্যাড়া হরিণের বদলে একটা বিশালকায় মোষই কিনে এনে হাজির করল। বলল গিয়ে, "কবরেজ মশাই, হরিণ তো মিলছে না, তা মোষও তো বেশ জোরালো প্রাণী, তার দুধে হয় না?"

"কী বললি? মোষও জোরালো প্রাণী?"

রাগের চোটে বটু কবরেজ আঙুলে টেপা নস্যির টিপ নাকের বদলে কানে গুঁজে বলে ওঠেন, "যেমন তোমার মোষালো বুদ্ধি!...তোমার বাপের ব্যাধির সৃষ্টিটাই ওই মাল থেকে, বুঝলে চাঁদু! দৈনিক তিন চার সের করে মোষের দুধ পেটে চালান করেছে তোর বাপ—দুধে, ক্ষীরে, দৈয়ে, ছানায়! বলি পয়সাটা না হয় নিজের, পেটের কলকব্জাগুলো তো ভগবানের! জোর খাটালেই হল? পেটের ভারে ভারে রক্তে ঝিমুনি ধরেছে। আমার এই সোজা কথা, হরিণ হলে হবে, নচেৎ নয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পষ্ট করে লেখা আছে।"

টাকা-পয়সার শ্রাদ্ধ করে এগ্রাম-ওগ্রাম ঘুরে এসে এসে ওরা, হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে, আর ওদের মা কেঁদে কেঁদে বলে, "কী আমার কপাল রে! আকাশের চাঁদ চাইনি, বাসুকীর মাথার মণি চাইনি, সাগরছ্যাঁচা রতন চাইনি, চেয়েছি শুধু একটা হরিণ! তাও তোরা জোটাতে পারলিনে?"

কথাটা একদিন গুপের কানে পৌঁছল।

কথাটা, মানে কান্নাটা।

গুপে নালুগিন্নীর দূর সম্পর্কের ভাইপো। মাঝে মাঝে আসে এদিকে।

কান্না শুনে মাথায় হাত দিয়ে বলল, "বল কী পিসী? ...র ছেলেরা রাজ্য উটকে বেড়াচ্ছে, আর একবারের জন্যে ...কেতায় যেতে পারেনি? বলে কলকেতায় পয়সা ফেললে ...হের দুধ মেলে তো তুচ্ছ হরিণ! চিড়িয়াখানায় দেখগে যাও ... হরিণের বিন্দাবন।"

পিসি কপালে হাত চাপড়ে বলে, "ওদের দোষ কী? কল-...র রাস্তা কেমন, তা ওরা জানে? তোর পিসে ছেলেদের ...খো হতে দিয়েছে? বলে কলকেতা মানেই তো কল আর ...! ওর মাটিতে পা দিলেই কায়দা-কেতা শিখবে, আর ...র সুখ বুঝবে। কাজে পড়লে নিজে যায়, ওরা চোখেও ...খনি কলকেতা কী!

গুপে বলে, "ঠিক আছে, পিসের যখন নিষেধ। তা আমায় কিছু টাকা ছাড়ো দিকি, চিড়িয়াখানার জমাদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এনে দেব একটা।"

পিসী চমকে বলে, "জমাদারের সঙ্গে? জমাদার-ছোঁয়া পেরানির দুধ খাবে তোর পিসে? বলে মোষের গায়ে গোবরজল ঢেলে তবে তার দুধ দুইয়েছে।"

গুপে ছটফটিয়ে বলে, "ঠিক আছে বাবা, আমি নয় তাকে একবার গঙ্গায় চুবিয়ে নিয়ে আসব। বাবাঃ! বার করো, বার করো, টাকা বার করো।"

"দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি। তা' কত টাকা গুপে?"

গুপে তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, "কত আর? হাজারখানেক দাও এখন, লাগে তো পরে আবার চেয়ে নেব।"

নালু শুনতে পেয়ে আঁতকে উঠে বলে, "বলিস কী

গ'পে? হাজার টাঁকা?" আতঙ্কে ওর স্বর নাকী হয়ে যায়।

গ্নপে আরো অবহেলায় বলে, "জীবনে কত হাজার-হাজার টাকা রোজগার করলে তুমি পিসে। আর তোমার জন্যে হাজার টাকাটা খুব বেশী হল? তোমার প্রাণের দামটা কি তাহলে তেরো টাকা তেইশ পয়সা?"

নালু এই অকাট্য যুক্তিতে হঠাৎ চুপ করে যায়।

আর তার পরই চিঁচিঁ করে বলে ওঠে, "ও'রে বাবারে গেলাম গেলাম। তোল তোল, টান টান, টেপ টেপ, ধর ধর, খামচা খামচা, চিমটি কাট, চিমটি কাট, কিল মার, কিল মার..."

গ্নপে চলে যেতেই গুপের পিসী সিন্নি মানল, যাতে নির্বিঘ্নে এসে যায় ছেলেটা। আর ন্যাড়া আর পটলা হাত উল্টে বলল, "ও আর এসেছে।" বলল অবশ্য চুপিচুপি। মার কানে গেলে রক্ষে থাকবে না।

কিন্তু ক্রমশই মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে ন্যাড়া পটলার মায়ের। কোথায় গুপে? নো পাত্তা। না চিঠি, না পত্তর, না গুপে নিজে।

নালু বিশ্বাস চিঁচিঁ করে বলে, "তোমার কবরেজের হরিণের দুধে মকরভস্ম মেড়ে, আসছে জন্মে খাব, বুঝলে? এ জন্মে নয়।"

আরো চিঁচিঁ হয়ে গেছে।

না খেয়ে-খেয়ে সেই গন্ধমাদন পর্বতের মত বিশাল দেহখানা নালুর স্রেফ তালপাতার সেপাইয়ের মত হয়ে উঠছে।

নালুগিন্নী রোজ রোজ নতুন ঠাকুরের পুজো মানছে। আর ন্যাড়া পটলা রোজ রোজ নতুন নতুন ভঙ্গিতে হাত ওলটাচ্ছে।

এমন সময়—

এমন সময় একদিন অকস্মাৎ গুপের আবির্ভাব। একা নয়। সঙ্গে হরিণ!

"অ্যাঁ—অ্যাঁ!"

ন্যাড়া পটলা চমকে গিয়ে উঠোনে আছাড় খেল, ন্যাড়া-পটলার মায়ের হাত থেকে খুন্তি পড়ে গেল ঝনঝনিয়ে, আর নালু বিশ্বাস আচমকা নিজে-নিজে ছিটকে বিছানায় দাঁড়িয়ে উঠল।

খুন্তি রেখে নালুগিন্নী ভাইপোকে বলল, "তাহলে এলি?"

"আসব না? আসব না মানে?"

"কী জানি, আমি ভাবলাম এখনো বুঝি বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিস হরিণ খুঁজে-খুঁজে!"

গ্নপে অম্লানবদনে বলে, "তা বলেছ মিথ্যে নয় পিসী। ওই কম্মই করতে হয়েছে এতদিন। চিড়িয়াখানার হরিণ এক-কথাতেই পেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যাটারা সব না খেয়ে-খেয়ে চিমড়ে। তাই বন থেকে তাজা জিনিস নিয়ে এলাম। এখন আর শ' পাঁচেক টাকা ছাড়ো দিকিন।"

পিসী বিনা বাক্যে এনে দেয়!

বাড়তি আরো দুশ দেয়, 'তুই সন্দেশ খাস' বলে।

দেবে না? দেখে যে সন্দেশ খাওয়াতে ইচ্ছেই করে।

হরিণ বটে একখানা।

হরিণের মত হরিণ। ঠিক যেমনটি ছবিতে দেখা যায়। যেমন সোনার মত রং, তেমনি গায়ে গোল-গোল কালো ছাপ, আর তেমনি শিঙের বাহার। যেন মাথার দুধারে দুটি গাছের ডাল বসানো। যাকে বলে জাত-কুলীন।

নিয়ে আসতেও তো কম ব্যবস্থা করতে হয়নি। ইয়া বড় এক কাঠের ফ্রেমের বাক্স, চারদিকে মিহি তারের জালে মোড়া। সেই জালে চোখ রেখেই দেখা যাচ্ছে কত রূপ! ভয় খেয়েছে একটু, চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে, 'হরিণনয়ন' মেলে।

বাতাসে খবর রটে।

খবর পেয়েই বটু কবরেজ এলেন।

দেখে শুনে বললেন, "যাক, এতদিনে আশা হচ্ছে, পটলা তোর বাবা সেরে উঠবে।"

পটলা বলে, "উঠবে কী। উঠতে শুরু করেছে। হরিণের খবর শুনেই হঠাৎ স্প্রিঙের মত লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আঠারো মাস কাল দাঁড়ায়নি বাবা।"

"তাহলে বোঝ! অকারণ এতদিন ভুগিয়ে মারলি বাবাকে।"

যাক। মিটলো সমস্যা। হলো সমাধান। কিন্তু আর-এক সমস্যা, দুধটা দুইবে কে? বাড়ির রাখাল-ছেলেটা গরু মোষ ছাগল সব দুইতে পারে, দরকার হলে গাধাও। কিন্তু একে না বাবা! ওর গায়ে হাত দেবার কথা ও ভাবতে পারে না।

শুনে গুপে এগিয়ে এসে রাগরাগ গলায় বলে, "ভাবতে হবেও না। ওটা স্রেফ আমার হাতে ছেড়ে দাও পিসী। ওর যা করবার আমিই করব। এখন একটি অন্ধকার-অন্ধকার নির্জন ঘর সাপ্লাই কর দেখি। তোমার গ্রামসুদ্ধু লোক যেভাবে এসে গুলতানি করছে, ও বেচারা তো ভয়েই মরে যাবে। জানো না হরিণ ভিতু প্রাণী!"

নালুগিন্নী বলেন, "অন্ধকার ঘর? তাহলে সিঁড়ির তলার চোরকুঠুরিই ভাল।"

সেকেলে বাড়ি, চোরকুঠুরি, চিলেকোঠা, সিন্দুকঘর অনেক কিছুই আছে।

ঘর দেখে গুপে দারুণ খুশী।

বলে, "গুড্! ঠিক এই রকমটিই চাই। তবে বলে দিও পিসী, কেউ যেন উঁকি দিতে না আসে। আর খাওয়াতে হবে একটু ভালমন্দ!"

পিসী বলে, "তোর পিসের গোয়ালে আবার ভালমন্দ খাবারের অভাব? কত বস্তা-বস্তা খোল-ভুষি, কত গাড়ি-গাড়ি খড়বিচুলি, কত জালা-জালা ছোলা কলাই—"

ছোলা কলাই!

খোলভুষি!...খড়বিচুলি!

হাহাহা!

গুপে হাসতেই থাকে, হাসি আর থামে না।

পিসী ভয় পেয়ে বলে, "অ গুপে, অমন পাগুলে হাসি হাসছিস কেন বাবা? খ্যামা দে।"

তখন গুপে খ্যামা দিয়ে বলে, "তা পাগল-বানিয়ে-দেওয়া কথাই যে বললে পিসী। আসল রাজপুতানার হরিণ, সে খাবে খোল বিচুলি?"

পিসী সমীহ-সমীহ মুখে বলে, "তবে কী খান ওনারা?"

"কী খায়? খায় বাদাম পেস্তা, কাজু মনাক্কা, কিসমিস, কাশীর পেয়ারা, সিঙাপুরী কলা, খাসা মণ্ডা, আর বাটি বাটি মধু।"

পিসী হাঁ হয়ে বলে, "তা হ্যাঁরে, বললি যে জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছিস। বলছি কী, বনে-অরণ্যে এত সব পায়?"

গুপে আরো হাঁ হয়ে বলে, "পাবে না? বলি বনটা কার? রাজার না? রাজভাণ্ডার থেকে নিত্য সাপ্লাই হয় না এসব?"

পিসী ভয়ে ভয়ে কাকে যেন নমস্কার করে। কে জানে রাজাকে, না হরিণকে, না গুপেকেই।

"তুমি চটপট খাওয়ার ব্যবস্থা করো।"

বলে গুপে সাবধানে হরিণের সেই চার চাকার ওপর বসানো বাড়িই বল, আর গাড়িই বল, কিম্বা খাঁচাই বল, সেইটিকে আস্তে আস্তে ঠেলে-ঠেলে সেই চোরকুঠুরিতে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে।

মনের উৎসাহে পটলাই চলে যায় শিল নোড়া নিয়ে বাদাম

পেস্তা বাটতে। নালু বিশ্বাসের বাড়িতে তো এসব মজুত হচ্ছে. সকাল বেলা ওই সবই তো ব্রেকফাস্ট ছিল নালুর। এখন সেই বন্ধ। কবরেজের কড়া হুকুম।

এখন ব্রেকফাস্ট হল ওই স্বর্ণভস্ম মকরধ্বজ। একটি পোয়া হরিণদুগ্ধ দিয়ে মেড়ে মেড়ে একটি পাথরবাটি ভর্তি করে চেটে চেটে খেয়ে নেওয়া। সকাল বিকেল দুবেলা।

নালু বিশ্বাস চাটে আর বলে, "হরিণ-দুগ্ধ যে এমন মিঠে, তা তো কখনো জানতাম না। আহা যেন মধু। আসল খাঁটি ক্ষীরের খোসবাই খেলছে যেন। চাটছি, আর গায়ে বল পাচ্ছি।"

নালুগিন্নী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে, "হবে না? খাচ্ছোটা কী তোমার হরিণ তা জানো?"

কী খাচ্ছে সেটা নালুগিন্নী ফিরিস্তি দিতে থাকে আর নালু বিশ্বাস তিড়িং তিড়িং লাফিয়ে ওঠে, "অ্যাঁ! কী বললে? দৈনিক আড়াইশো পেস্তা। পাঁচশো কাজু? অ্যাঁ! সেরটাক কিসমিস! ন্যাড়া! পায়ের কাছ থেকে জিনিস সরা, আমার দোকান পাচ্ছে।"

দেখে পটলা ছোখ ছানাবড়া করে ছুট মেরে সো-জা বটু কবরেজের বাড়ি।

"কবরেজ মশাই! গুণ ধরেছে। এই দুদিন খেয়েই বাবা লাফাতে চাইছে।"

"চাইবেই তো।"

বটু নাকে নস্যি ঠুসে ধীরেসুস্থে বলেন, "ও তো জানা কথা। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র তো আর মিথ্যে হবার নয়। মিথ্যে এতদিন ভুগল লোকটা।"

তা সত্যিই বটে চিকিৎসা একখানা।

নালু বিশ্বাস সত্যিই ক্রমশ হরিণছানার মতন লাফাতে থাকে, ঝাঁপাতে থাকে, দাওয়ার খুঁটি ধরে চক্কর খেতে থাকে, আর হাঁক পাড়তে থাকে "ন্যাড়া পটলা, এখনো বাড়ি বসে? দোকানটা কি লাটে তুলবি?"

চিঁচিঁ করে নয়, চিহিহিহি করে।

ন্যাড়া পটলার মা বলে, "তাই তো বাবা! আর তো এখন তোদের বাপকে ধরতে হয় না, তুলতে হয় না, থামচাতে হয় না, কিলোতে হয় না, দোকানটা দেখগে যা।"

গুপে বলে "আমিও তাহলে চলি পিসী। হরিণটা তো আর তোমার কাজে লাগবে না। বাড়িতে সাজিয়ে রাখিগে। অনেক তরিবত করে কেষ্টনগর থেকে গড়িয়ে নিয়ে এসেছিলাম।"

গড়িয়ে?

নালু বিশ্বাস বোঁ বোঁ করে পাক খেয়ে বলে, "অ্যাঁ! কেষ্ট-নগর থেকে? তার মানে মাটির হরিণ? গুপে, এইভাবে দিনে ডাকাতি করেছিস তুই? পিসির কাছে হাজার দু হাজার বাগিয়ে একটা মাটির—"

গুপে খাঁচাটাকে চার চাকায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসে বলে, "বলি, রোগটা তোমার সেরেছে কিনা? সেটাই দরকার ছিল কিনা? লাফাই-ঝাঁপাই করছ কিনা?"

ন্যাড়া-পটলা দুই ভাই মাথায় হাত দিয়ে চুপি চুপি বলে, "ইস, গুপের বুদ্ধিটা আমাদের মাথায় খেলেনি কেন রে!"

পিসী ডেকে বলে, "কিন্তু গুপে? দুধটা কিসের?"

"হরিণঘাটার পিসী! একটু গা-ঢাকা দিয়ে আনা এই আর কী। আর তোমার গিয়ে তফাতই বা কতটুকু? হরিণ আর হরিণঘাটা। মাত্র দুটো অক্ষরের এদিক ওদিক। আচ্ছা চলি।"

ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র
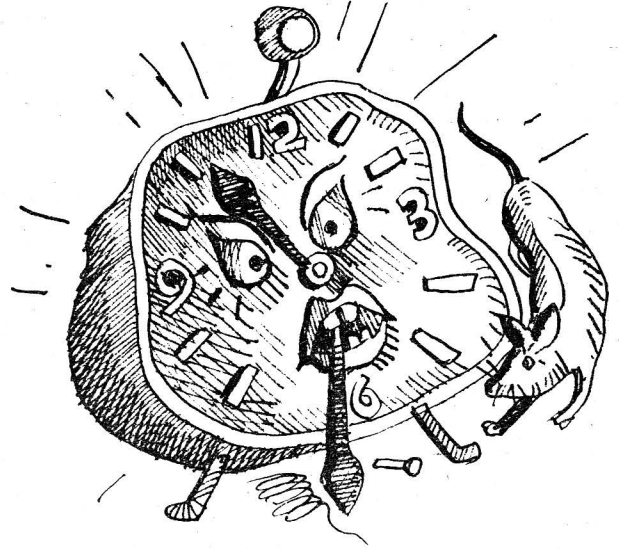
ঘড়ি যখন ঘোড়া

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

ঘড়ি যখন ঘোড়া হল
ঘোড়া তখন খোঁড়া হল
কব্জা নাড়াচাড়া হল
কাঁটা আবার জোড়া হল
ঘোড়া আবার ঘড়ি হল।

ঘোড়া যখন ঘড়ি হল
সকাল তড়িঘড়ি হল
বেদম হুড়োহুড়ি হল
আটটা বেজে কুড়ি হল
ঘড়ি আবার ঘোড়া হল।

ছবি এঁকেছেন অসিত পাল
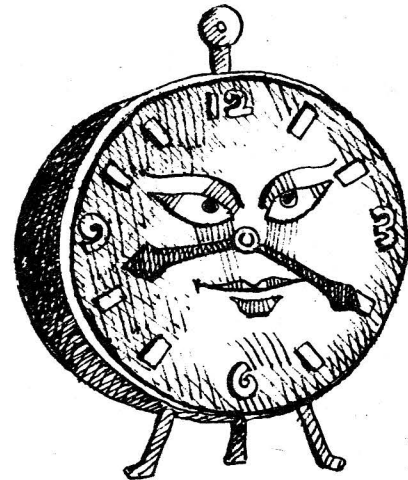
সুন্দরবনে হঠকারিতা

শিবশঙ্কর মিত্র

"স্যাক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্‌, কামারের এক ঘা"—এই দাপটি-কথা বাবার মুখেই শুনত নিতাই তার কাঁচ বয়সে। সে-সব দিনের অনেক কথাই নিতাই ভুলে গেছে, কিন্তু 'কামারের এক ঘা' আজও ভোলেনি। শুধু ভোলেনি না, কথাটি তাকে পেয়ে বসেছে তার সর্বকর্মে।

কিশোর বয়সে নিতাই বাবাকে দাপটি করে বলত, "অত বুঝি না. সারাদিন ধরে ধানের আঁটি বইতে পারব না। বলো, কত আঁটি আমার আনতে হবে; তাই নিয়ে এলেই হলো তো!"

কথায় যেমন, কাজেও তেমনি। দিনভোর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবে কিন্তু হঠাৎ একবার এসে অন্যের চার ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় সেরে ফেলবে। যেমন ডবল-ডবল বোঝা ঘাড়ে তুলে নেবে, তেমনি ঘোড়ার মত ছুটে দেখতে-দেখতে সে কাজ শেষ করবে।

'কামারের এক ঘা' নিতাই ভুলবে কী করে! বাবার সঙ্গে হাটে যাবার বয়স হলে সে একবার হাড়োয়ার হাটে যায়। খুবই বড় হাট। সে-হাটের কীই বা মনে আছে তার। কিন্তু মনে আছে কামারের চালাটির কথা। হাপরের হাঁফানিতে দমকে-দমকে আগুনের ফুল্‌কি ছিটকে পড়ছে তারাবাজির মত। আর নেহাইয়ের ওপর তপ্ত লোহাপিণ্ডের রক্তাভ ছটা ছড়িয়ে পড়ছে যেন ফিন্‌কি দিয়ে। তারই সামনে ঘর্মাক্ত মানুষটির উত্তোলিত বলশালী দুই বাহু, আর ঈষৎ কুব্জ দেহের সর্বশক্তি মুষ্টিবদ্ধ হাতুড়ির মাথায় নিবদ্ধ। ভারী হাতুড়ির এক ঘায়ে লোহাপিণ্ড নিমেষে পিষ্ট হয়ে যাবে অতি সহজে। রক্তাভ আলোর ঝলকে উদ্ভাসিত সেই শক্তির প্রতীক বালকের মনে চিরতরে যেন খোদিত হয়ে রইল।

নকুল যে নিতাইকে অমন ভালবাসবে আর মনে-মনে শ্রদ্ধা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। নকুল ছিল ঢিলে-ঢালা গোছের। তার দেহে অমন শক্তিও ছিল না, মনে অমন রোখও ছিল না। নকুল নিতাইয়ের শুধু আত্মীয় নয়, বন্ধুও বটে। পাশাপাশি সংসারে দুজনে লালিত। নিতাইও নকুলকে ছাড়া এক পা-ও চলত না; নকুল যে তার প্রতি কাজের একজন বড় সমঝদার।

নিতাই ও নকুল দুই বন্ধুই এখন বড় হয়ে উঠেছে, বলতে গেলে যৌবনের কোঠায়। আবাদ অঞ্চলে যৌবনের পরীক্ষা কিন্তু বাদায়; সুন্দরবন যেন যৌবনকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না দাঁড়ালে যৌবনের কোনও মর্যাদা নেই বনাঞ্চলে।

অনেকদিন ধরে ওরা বনে যাব-যাব করছে, কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। অভিজ্ঞ কাঠুরিয়ারা হঠকারী যুবকদের সহসা সঙ্গে নিতে চায় না। অদ্ভুত এই বন, এখানে যেমন ভিতু মানুষের স্থান নেই, তেমনি হঠকারী ও একরোখা মানুষেরও এখানে নিস্তার পাওয়া দায়। এখানকার বনের রাজা দুর্দান্ত সাহসী, কিন্তু ঝোঁকের মাথায় কখনও সে কিছু করে বসে না। ধীর স্থির,—হঠকারী নয়। যখন সে আক্রমণ করবে, ধীরস্থির ভাবে সবকিছু বুঝে নিয়ে আক্রমণ করবে—হঠাৎ দেখা হলে, হঠাৎ আক্রমণ সে করে না। তেমনি তার রাজ্যে যে দাপটি করতে আসবে, তাকেও সমভাবে সাহসী ও ধীরস্থির হতে হবে, নইলে নিস্তার নেই।

শেষ পর্যন্ত বনে উঠবার এক সুযোগ আসে। ফাল্গুন মাসের হাল্কা দিনগুলিতে কিছু বাড়তি আয়ের আশায় এক দল কাঠ কাটতে যাবে। দলের অনেকেই নিতাইকে জানে ও চেনে। হাড়োয়াহাটের হাটুরে নৌকোয় এখন নিতাই ও নকুল এদের সঙ্গী।

বনে যাবার কথা উঠতেই নিতাইয়ের উৎসাহের সীমা নেই—"চলো না মামু, এবার আমাকে নিয়ে চলো।"

মামাবাড়ির গ্রামের লোক বলে নিতাই রসিদ গাইনকে 'মামু' বলেই সম্বোধন করে। বাঙলাদেশের মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনাত্মীয়কে অতি সহজে আত্মীয় বানিয়ে ফেলে আত্মীয়তার সম্বোধন করে। সুন্দরবনেও তার ব্যতিক্রম নেই।

রসিদ গাইন মাঝারী বয়সের লোক। সবল দেহে আর প্রশান্ত মুখমণ্ডলের আধাপাকা দাড়িতে তাকে বেশ মানায়। দলের নেতা বলেই সহসা সকলে তাকে মেনে নেয়। ধীরস্থির ভাবে কথাগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আমাদের লাওখানাও বেশ একটু বড় হয়ে গেছে......ভাবছিলাম, জনে একটু ভারী হলে ভালই হত......তাড়াতাড়ি লাও ভরাট করা যেত......দুজনে যাচ্ছি, আরেকজন হলে মন্দ হত না।"

পাশেই নকুল ছিল। এমনিতে ঢিলেঢালা হলে কী হবে, কোথায় কখন কী ঘটতে চলেছে তা চট্ করে ধরে ফেলে। রসিদমামুর কথা শেষ না-হতেই নিতাইকে নকুল আড়ালে চিমটি কাটল।

ইঙ্গিত পেতেই নিতাই খানিকটা আব্দারের সুরে বলল, "দেখো মামু, আমি তো যেতেই চাই ; ভারি মজা হবে। কিন্তু একটা কথা কী, তোমরা সবাই হলে কিনা আমাদের বুড়োজন......তাই বলি কী......নকুলকে সঙ্গে নিয়ে চলো......ও অমন দেখতে হলে হবে কী, কাজে কিন্তু নকুল ভারি পটু...আমরা হলাম কিনা দুজনেই সমবয়সী।"

"তা তুই ঠিক বলেছিস... কিন্তু কথা হল কী, আবার একজন মন্ত্রপড়া বাউলেও তো নিতে হবে ! অত লোক নাওয়ের খুপরিতে ধরবে তো ?"

"তা মামু, অত শত দরকার নেই। বাউলে তোমার নিতে হবে না। আমিই তোমার বাউলের কাজ করে দেব। বনবিবিকে পুজো দিয়ে 'মা' বলে ডাকলেই মা সাড়া না দিয়ে যাবে কোথায় ! দেখো তুমি !"

কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে যায়। সবাই মিলে মাস-খানেকের মতো খোরাকি আর মিঠে পানি নিয়ে বন-কর অপিসে নৌকো নিয়ে হাজির। কাঠ কাটার পাশ নিতে হবে। এমনি ধারা দু-দশখানা নৌকো এ-সময়ে রোজই বন-কর অপিসে আসে ! আর তখনই তারা দল বেঁধে নৌকোর বহর বানিয়ে বনের ভিতর প্রবেশ করে।

চামটার বন। এবার এখানেই 'ঘের' পড়েছে। 'ঘের' ছাড়া অন্য কোথাও কাঠ কাটা সুন্দরবনে বে-আইনী। বন যাতে উজাড় না হয়ে যায়, তার জন্যই এমনি ধারা আইন।

চামটার বন আসতেই নিতাই বহর থামিয়ে সবার আগে মাটিতে পা দিল। সবাইকে হাত উঁচু করে চিৎকার করে বলল, "এবার মায়ের পুজো হবে ! তোমরা সবাই নেমে এসো।"

বন-কর অপিস থেকেই নিতাই একজন কেউ-কেটা হয়ে উঠেছে। আমোদে-ফুর্তিতে, হাসি-ঠাট্টায়, নতুন নতুন ফন্দি-ফিকিরে সবারই মন জয় করে ফেলেছে।

সঙ্গে ছিল নকুল। তার হাতে গামছায় বাঁধা একটি

আতাচোরা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আতাচোরা পাখি রে
কোন্ তুলিতে আঁকি রে
—হলুদ ?

বাঁশবাগানে যাইনে
ফুল তুলিতে পাইনে
—কলুদ

হলুদ বনের কলুদ ফুল
বটের শিরা জবার মুল
পাইতে

দুধের পাহাড় কুলের বন
পেরিয়ে গিরি গোবর্ধন
নাইতে

ঝুমরি তিলাইয়ার কাছে
যেই নদীটি থমকে আছে
তাইতে

আতাচোরা পাখি রে
কোন্ তুলিতে আঁকি রে
—হলুদ ?

ছবি এঁকেছেন কুশল চক্রবর্তী
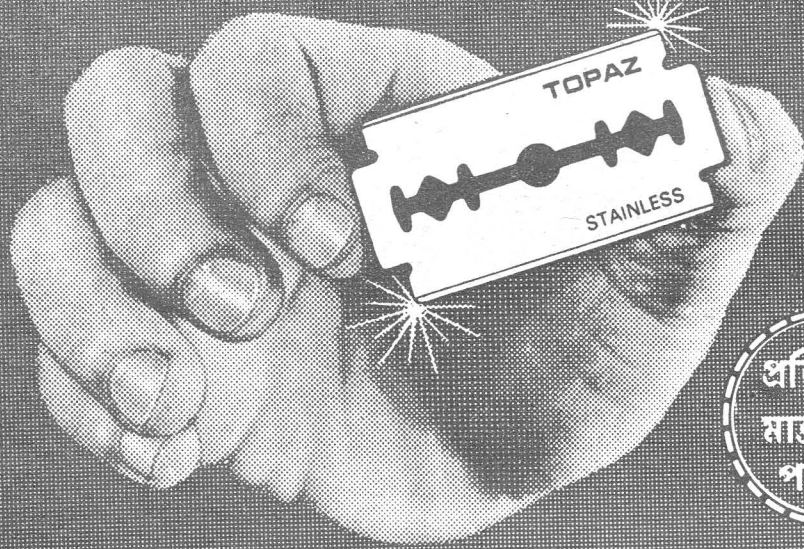
মোরগ। আর নিতাই মাথায় করে এনেছে একটি ছোট মাটির মূর্তি।

অনেকে এসে জড় হলে মূর্তিটি মাটিতে রেখে নিতাই বলে উঠল, "ব-ন-বি-বি-র পুজো! মা! মা! মা!"

এমন জোরে 'মা' ডেকে উঠল যে, গোটা চামটা বনের মুখটা বুঝি গম্ গম্ করে ওঠে। সবাইকে এবার 'মা' বলে একত্রে ডাকিয়ে মোরগটি জবাই করল। মোরগটি বেশ বড়ই ছিল। তা হলেও অত লোকের ভাগে কীই বা পড়বে! সেদিকে বিশেষ কারও মনও ছিল না; নিতাই যে একটা কাজের কাজ করেছে তাতেই সবাই খুশী।

ঝাড়-বাছাই করে কাজকর্ম শুরু হয়েছে। কাঠও বোঝাই হচ্ছে নৌকোয়-নৌকোয়। নকুলও সাধ্যমত কাজ করে চলেছে। যতো পারে সে নিতাইয়ের কাছে-কাছে থাকে। কথা নেই মুখে, কাজ করে চলে চুপচাপ। তবু নিতাই তাকে কথা বলিয়ে আর উদ্ভট সব প্রশ্ন করে মুখর করে রাখতে চায়। একদিন রসিদমামু কয়েকজনকে একপাশে ডেকে বলে, "দেখো, আমার মন কিন্তু ভাল বলছে না। তোমরা দেখেছ নকুলকে? দেখছ না! গুঁড়িতে একটা করে কোপ মারে আর এদিক-ওদিক তাকায়! গুঁড়ির ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে কিছু আছে কি না! আমার মন কিন্তু ভাল বলছে না।"

তখন বেলা দুটো। একটু পরেই বনে অন্ধকার নেমে আসবে। দিনের কাজও শেষ হয়ে যাবে। বাদায় আবাদের অনেক আগেই দিনের আলো নিস্তেজ হয়ে আসে।

রসিদমামু কাজ শেষ হবার অপেক্ষা না করে নকুলকে সঙ্গে নিয়ে আগেভাগেই নৌকোয় চলে গেল। নকুল অবশ্য প্রথমে যেতে চায়নি, বিশেষ করে নিতাইকে ফেলে রেখে। তাহলেও এটা-সেটা অজুহাত দিয়ে মামু প্রায় হাত ধরেই টেনে নিয়ে গেল।

সেদিন মাঝ-রাতে নকুল সহসা ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে ওঠে, "একটু সামলে নেও, সামলে নেও!"

চিৎকারে নিতাই হুড়মুড় করে উঠে নকুলকে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ মামু চাপা গলায় সাবধান করে, "খবরদার! কেউ ওকে খোয়াবের কথা জিজ্ঞেস করবি না। ভরসা দিবি, আর-কিছু বলবি না।"

নকুল ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠলেও বন্ধুর হাসি আর ভরসার কথা শুনে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সবাই মিলে নাস্তা খাবার পর রসিদমামু বুঝিয়ে বলল,—"দ্যাখ্ নকুল, তোর ব্যামো হয়েছে। তুই কদিন মালে উঠিস্ না। শেষে ব্যামো বাড়াবাড়ি হলে তো হেথায় ঝাড়ফুক দেবার মতো ফকির পাওয়া যাবে না!"

নকুলের বেজার মুখ দেখে মামু মিষ্টি করে আশ্বাস দেয়, "কতক্ষণ আর! পহর-টেক খুপরির মধ্যে ছাপরা বেঁধে শুয়ে থাকবি; আমরা তো কাছেই থাকব। আর দুপুরে সেলেই তো কেউ না কেউ গুঁড়ি এনে ফেলতে থাকবে এ-নৌকোয় না হয় ও-নৌকোয়।"

হাজার হোক, নকুলের মন যুবকের মন। কদিন আর এমনভাবে নৌকোর খুপরিতে বন্দী হয়ে থাকা যায়। প্রথম দিন নিজেকে অসুস্থ মনে করে ঘুমুবার চেষ্টা করেছিল; ঘুমিয়েও পড়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন আঁকুপাকু করতে থাকে।

খুপরিতে বন্দী হয়ে যত সব আজে-বাজে ভয়-ভীতির কথা মনে হতে থাকে। কোথাও একটু শব্দ হলেই সচকিত হয়ে ওঠে। একটা পাখি ডাকলেও, কী পাখি তা দেখবার উপায় নেই নৌকোর খুপরির থেকে।

তার উপর বিকেলে সবাই বন থেকে উঠে এসে যখন কাঠ কাটা নিয়ে হাসি-ঠাট্টার গল্প করতে থাকে, তখন নকুলের টেকাই দায় হয়।

পরদিন সাত-সকালে ঘুম থেকে উঠে নকুল সোজা জানিয়ে দেয়, না, সে আজ বনে উঠবেই, ব্যামো-ট্যামো তার সেরে গেছে।

অত আগ্রহ দেখে কেউ আর বাদ সাধেনি।

বনে কিছুক্ষণ কাজ করার পর নকুলের বড় জল তেষ্টা পেয়েছে। সে-কথা জানতে পেয়ে মামু বলল,—"না, তাই বলে একা একা এখন নৌকোয় যাবি না, পরে ব্যবস্থা হবে।"

সবাই পাল্লা দিয়ে গুঁড়ি কাটছে। কারুরই আর সময় হয় না দেখে নকুল সবার অজানিতে কুড়ুলখানা কাঁধে ফেলে একা-একাই চলে যায় জলের তেষ্টা মেটাতে। যেতে আসতে ওর বেশী সময় লাগে না। দু'পাশে গোলঝাড়, মাঝে আগাছা কেটে 'সড়' বানানই আছে আগে থাকতে। শুধু নিজে জল খায়নি, অন্যদের জন্য এক ভাঁড় নিয়ে আসছে দেখতে পেয়ে মামু তো অবাক। "তোকে বারণ করলাম, শুনলি না! নতুন এসেছিস, অমন করিস না।"

নকুল মিচ্‌কি হেসে তেষ্টার জল মামুর দিকে এগিয়ে ধরে।

ছিটকে পড়ল তেষ্টার জল! যেন বজ্রপাতের বিদ্যুৎ! মেঘ গর্জনে গোলগাছের ঊর্ধ্বমুখী পাতাগুলি বিদীর্ণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুন্দরবনের হিংস্রতম জানোয়ার। মুহূর্ত-মধ্যে নকুলকে ধরাশায়ী করে মুখে তুলে উধাও।

মামু যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি ভাবেই হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশের সবাই মামুর 'কোলে' এসেছে। নিতাই কিছুটা দূরে ছিল। ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হয়নি তারও। ছুটে এসেছে ঊর্ধ্বে উত্থিত দু-বাহুতে কুড়ুল ধরে। সে যে নিজেই এ-দলের বাউলে বনেছে, রুখে দাঁড়াতে হবে সকল বিপদের সামনে। "কী হল! কী হল!"—চিৎকার করে যেন হরিণের মত ছুটে এসেছে।

কেউ কিছু বলে না। মামু শুধু বলল, "নকুল...নকুল!"

কোন-কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। গোলঝাড় ভেদ করে নিতাই যেন তীরের মত ঝাড়ের ওপারে হাজির। দু-হাতে বাগানো কুড়ুল তখনও উদ্যত। শত্রুকে সামনে পেলে গুঁড়িয়ে দেবে যেন কামারের এক ঘায়ে। না, কিছুই দেখতে পায় না। বজ্রপাতের কোন চিহ্নই যেন নেই। দাঁড়িয়ে পড়ে। কী করবে? কোন্ দিকে যাবে? দূর থেকে মামুর ডাক, "নিতাই এগুবি না, দাঁড়া, আসছি!"

ভীতি-বিহ্বল মানুষগুলির দিকে একবার তাকিয়ে মামু বলল, "চল্ তোরা, নিতাইয়ের কাছে চল্!"

ওদের কাছে পেতেই নিতাই গর্জে ওঠে, "চলো, নকুলকে বাঁচাতে হবেই! বাঁচাতে হবেই!"

নিতাইয়ের রোখ্ ঠেকান দায় দেখে মামু ধমক্ দেয়, "দাঁড়া, যাই বললেই বড়মেঞার মুখে যাওয়া যায় না! দাঁড়া, সবাই মিলে ডাল কাট্, বড় বড় লাঠি বানা।"

লাঠি বানানো হলে মামু একখানা শুকনো ডালের মাথায় গামছা বেঁধে মশাল জ্বালিয়ে দিল। এবার সে নিজেও ব্যস্ত। "চল্ তোরা, নোড়াবি না, চেল্লা, একনাগাড়ে চেল্লা, গালি দে! মার্, মার!!"

নিতাই কিন্তু লাঠির ধার ধারেনি। উদ্যত কুড়ুল তুলে সবার আগে আগে চলল। মুখে গালি।

থাবার খোঁচ দেখে দেখে ওরা এক ঝোপে এসে গেছে। মামু উঁকি মেরে দেখতে চায়—নরখাদক আছে কি নেই। নিতাই ততক্ষণে ঝোপের ফাঁকা চত্বরে এসে গেছে।

এসেই ভীষণ চিৎকারে আপ্রাণ ডাক দেয়, "নকুল !" অর্ধভুক্ত লাশ কিই বা সাড়া দেবে। নিতাই দেহের সর্বশক্তি দিয়ে হাতের উদ্যত কুড়ুল বসিয়ে দিল মাটিতে। বনের সিক্ত মাটিতে ফলক বসে গেল হাতল অবধি। মুহূর্তের জন্য উঠে দাঁড়াল। তারপর কোমর থেকে একটানে গামছা খুলে অতি দ্রুত হাতে রক্তাক্ত অর্দ্ধভুক্ত লাশ বেঁধে ফেলল।

মামু কিন্তু চিন্তান্বিত। ধারেকাছে বাঘ না থেকে পারেই না। মুখে শুধু, "চেল্লা, তোরা চেল্লা !"

হাতের মশালে গামছা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পোড়া ডাল থেকে ধিক্ ধিক্ করে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। দ্রুত আরও কিছু ডাল মশালে বেঁধে নিল।

নিতাই কারও মতামতের অপেক্ষা না রেখে একাই ঝমাৎ করে লাশ কাঁধে তুলে আদেশের সুরে বলল, "জলদি !" বলেই জোর কদমে ঝোপের বাইরে এসে গেল।

জলদি ওরা ফিরবেই তো, কিন্তু মামুর চিন্তা,—বাঘ ধারেকাছে না-থেকেই যায় না, নিশ্চয় ওঁত পেতে আছে কোথাও; মুখের খাবার কেউ কেড়ে নিতে দেয় ! রাগত ভাবেই চিৎকার দিল, "দাঁড়া নিতাই ! দাঁড়া ...চল তোরা, জড় হয়ে চল, আস্তে আস্তে, নোড়াবি না !! নোড়াবি তো মরবি। চিল্লানো থামালেই গেছিস !!"

নৌকোর ধারে ফিরে আসতেই মামুর আরেক ভাবনা.— এবার কী করা ? লাশ পোড়াবে না মাটি দেবে ? সুন্দরবনে যে জীবন দেয়, তার দেহও সুন্দরবনে রেখে যাওয়াই কড়া রীতি।

কিন্তু নিতাইয়ের মতলব নিতাইয়ের কাছে। এখনও তার মাথায় রোখ্ চেপে আছে। সোজা ছোট্ট ডিঙিটার গলুইতে লাশ তুলে বোঠে হাতে বসে গেছে। সবাই তো অবাক !

নিতাইয়ের রুদ্ধ কণ্ঠ এবার ফেটে পড়ে, "নকুলকে নিয়ে যাবই...নকুলের মাকে কাঁদতে দিতে হবে...কাঁদতে দিতে হবে !"

প্রাণপণ জোরে বোঠের খোঁচায় ডিঙি ছুটে চলে। ও একাই নিয়ে যাবে। এক জোয়ারের পথ ও বুঝি একাই মুহূর্তে ঠেলে নিয়ে যাবে !

সবাই চুপচাপ, মামু কোন পথ না-পেয়ে একবার শুধু চিৎকারে টেনে টেনে বলল, "পেছন নেমে, সাবধানে যাস্, তুরন্ বড় গাঙে পড়বি ! পেছন নেবে !"

মামু মিথ্যা বলেনি। কিছুদূর এগুতেই দেখে একপাল হরিণ এপার থেকে সাঁতরে পার হয়ে গেল। বাঘের গন্ধ না পেলে অমন করে হন্তদন্ত হয়ে ওরা পালাত না। ইঙ্গিত পেয়ে নিতাই মাঝ-নদী ছেড়ে ওপারের কূল ঘেঁষে সাঁই সাঁই করে চলল।

রোখের মাথায় নিতাইয়ের বড় গাঙে পড়তে দেরি হয়নি, কিন্তু হাঁপাচ্ছে, দম ফুরিয়ে গেছে। জোয়ারের স্রোতের শিরায় ডিঙি ভাসিয়ে এবার দম নিতে চায়। দম নেবে কী ! রুদ্ধ অশ্রু বাধা মানে না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। মাকে কাঁদতে দেবে কী, নিতাই নিজেই কেঁদে আকুল।

ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

নীহার নলিনী

লক্ষ্মী মেয়ে খৈরী

১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বন্যজন্তু সম্পর্কে আমার আগ্রহ স্প্রিং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শিকারীদের গুলিতে আহত জন্তুদের খুঁজে বার করাকে স্প্রিং বলে। এই বিদ্যা আমি প্রথম শিখি লর্ড বেডেন পাওয়েলের বই পড়ে। ওড়িশার গার্ল গাইডদের এস ও সি-র পদে থেকে আমি এই বিষয়ে শিক্ষাদান করতাম।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে কোরাপুট জেলার রামগিরি অরণ্যে একটি নরখাদক বাঘকে খোঁজার কাজে আমি শ্রীসরোজ-রাজ চৌধুরীকে সাহায্য করি। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে আমরা দুর্গম গিরিপথ, ঘন অরণ্য, নির্জন প্রান্তর, পাহাড়ী নদীর তীরে ও ঝোপ-ঝাড়ে ঘুরে বেড়াই। এই সময় অরণ্যের সৌন্দর্য এবং বন্যজন্তু আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৩-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত, প্রায় চার বছর আমি, শ্রী চৌধুরী ও তাঁর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশান (বন্যজন্তু সংরক্ষণ বিদ্যায়) শিক্ষানবিশরা দেশের বিভিন্ন জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন থেকেই স্বপ্ন দেখতাম সিংহ-শিশু "এলসা"র মতো একটা বাঘের বাচ্চাকে আমি পোষ মানাব। খৈরীকে পেয়ে আমার সেই স্বপ্ন সত্যি হল।

১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে শ্রীসরোজরাজ চৌধুরী "সিমলি-পাল প্রোজেকট টাইগারের" প্রথম ফিল্ড ডাইরেকটররূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। এই প্রোজেকটের আয়তন ২.৭৫০ বর্গ কিলোমিটার।

১৯৭৪ সালের ৫ অকটোবর স্থানীয় রেন্‌জ্‌ অফিসার ছোট্ট খৈরীকে সঙ্গে নিয়ে যশীপুরের ফরেসট বাংলোয় এসে পৌঁছলেন। বাচ্চাটার গলায় দড়ি বাঁধা। খৈরী তখন এত রোগা ছিল যে, ওর শরীরের সব কটা হাড় দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার। আমরা ওর মায়ের ডাক নকল করে ওকে আমাদের আদর ও ভালবাসা জানালাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর বিশ্বাসভাজন হয়ে গেলাম আমরা। ওর গলা থেকে দড়ি খুলে দেওয়া হল। সেই দড়ি কিংবা শেকল আর কোনদিন ওর গলায় পরাতে হয়নি।

কোলেপিঠে করে খৈরীকে বড় করতে লাগলাম আমরা। স্বাস্থ্যবতী খৈরীকে দেখলে আজ আমাদের ভীষণ আনন্দ হয়। সেদিনের সেই ছোট্ট খৈরীকে বড় করতে আমাদের খুব ধকল গেছে। ও আজ আমাদের পরিবারের খুব আপনজন। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর ছেলে বাবলুকে খৈরী খুব ভালবাসে। বাবলু যখন ছুটিতে যশীপুরে আসে তখন খৈরী সব সময় ওর সঙ্গেই খেলাধুলা করে। ওর সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমোয়। বাবলুও খৈরীকে ছোট বোনের মতো ভালবাসে।

খৈরী আমাদের কাছে আসার প্রায় এক সপ্তাহ পরে ওকে

(উপরে) মানুষ-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে খৈরী (নীচে) ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত, এখন একটু বিশ্রাম চাই

খৈরী বলছে, মা, তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো

বাঃ, কী চমৎকার দাঁত! ভয় নেই, কামড়াবে না।
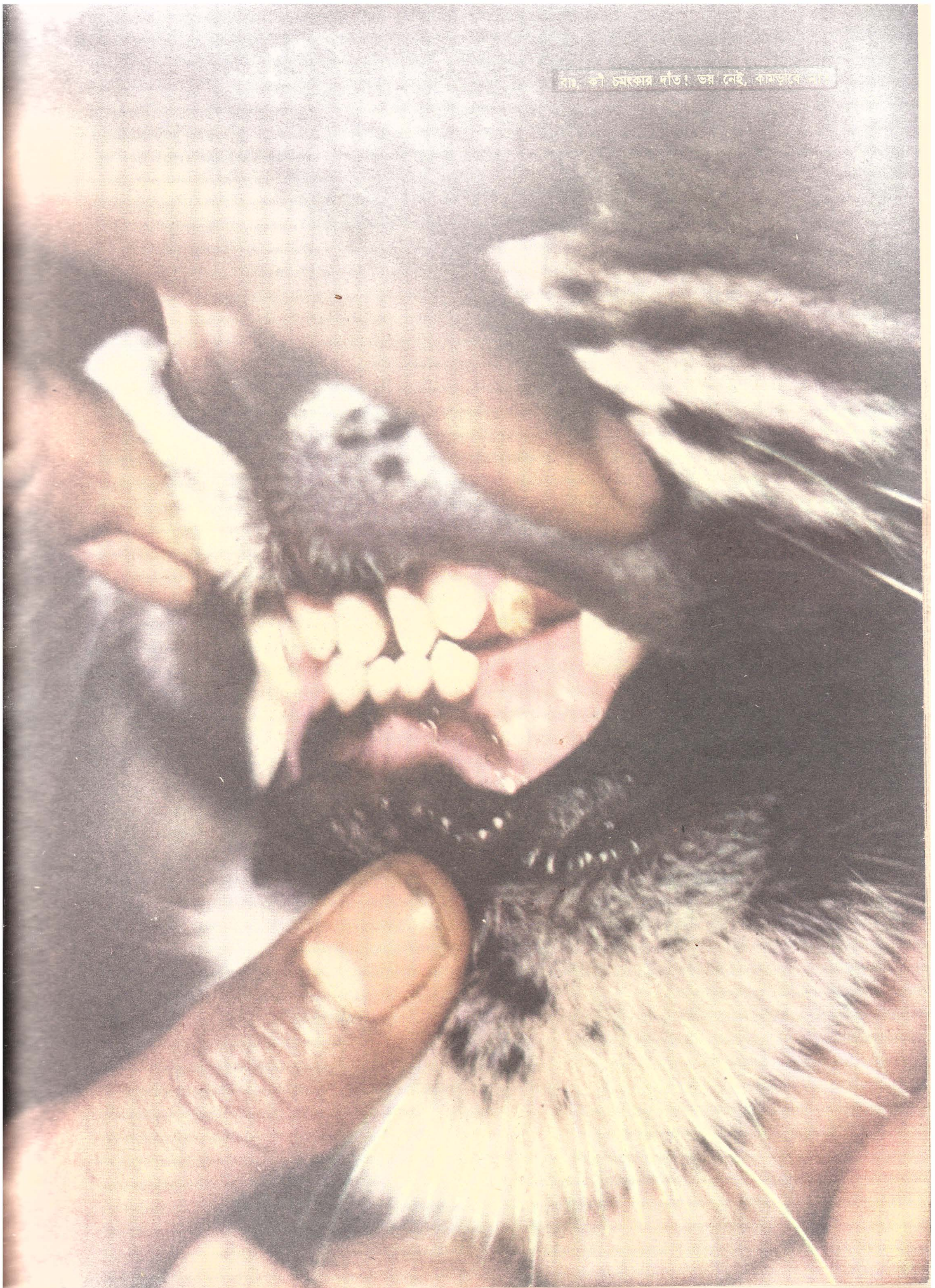
নিয়ে আমরা ভুবনেশ্বর গেলাম। সেখানে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি ওকে দেখে খুব খুশী। খৈরী নদীর উপত্যকা থেকে ওকে পাওয়া গেছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী ওর নাম দিলেন "খৈরী"। সেইদিন থেকেই সবাই ওকে ওই নামেই ডাকে। খৈরীও কান দুটো খাড়া করে বা একটু নেড়ে সাড়া দেয়।

প্রথম দিন যশীপুর বাংলোয় ডাইনিং রুমে ঢুকেই খৈরী চারদিকে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু যেন ওর ভীষণ চেনা হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করার পরে মাঝেমধ্যে আমার কাছে এসে ও চিত হয়ে শুয়ে পড়ত, আমি তখন ওর পেটে হাত বুলিয়ে আদর করতাম। একদিন ডাইনিং টেবিলের চারিদিকে আমার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করার পর ক্লান্ত হয়ে খৈরী শোবার ঘরে গিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা আমার একটা শাড়ির ওপর ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে খাটে উঠে আমার সঙ্গে ঘুমোল।

তারপর থেকে খৈরী বাংলোর ডানলোপিলোর বিছানা ছাড়া ঘুমোতেই চায় না। ওকে কোনোদিন বাথরুম ব্যবহার করতে শেখাইনি, কিন্তু ও নিজেই একদিন বাংলোর বাথরুম খুঁজে বার করে। এখন ও বাথরুম ব্যবহার করতে রীতিমত অভ্যস্ত।

দেখতে দেখতে খৈরী বড় হয়ে উঠল। রাত্তির বেলা মাঝে-মধ্যে আমাকে খাট থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, তারপরে হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে ঘুমোয়। বড় হয়েছে তো! এইটুকু খাটে দুজনে ঘুমোলে বোধ হয় ওর অস্বস্তি হয়।

খৈরীকে সঙ্গে নিয়ে একবার ভুবনেশ্বরের স্টেট গেসট্ হাউসে ছিলাম। সেদিন খৈরী সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এয়ার-কনডিশনারের পাশেই ওর বিশ্রাম করার জায়গা বেছে নিয়েছিল।

খৈরী প্রকৃতিকে উপভোগ করতে জানে। আমরা যখন সিমলিপাল পর্বতে ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই, তখন ও মাঝে-মধ্যে উঁচু পাহাড়ের চুড়োর ওপর বসে দূরের সবুজ উপত্যকার দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। কখনও আবার আকাশে ভেসে-যাওয়া টুকরো-টুকরো মেঘের দিকে তাকায়। অসহ্য গরমের পর যখন প্রথম বৃষ্টি নামে, খৈরী তখন বৃষ্টির মধ্যে নেচে বেড়ায়।

ছোট্ট খৈরী যখন আমাদের কাছে প্রথম এসেছিল, তখন তার ওজন ছিল মাত্র ছ কিলো দু শো গ্রাম। লম্বায় ছিল ৮৫ সেন্টিমিটার। আস্তে আস্তে ও বেশ বড় হয়ে উঠল। বছর-খানেক পরে ও যখন পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াত, তখন ওর মাথা আমার মাথা ছাড়িয়ে যেত। খৈরী এখন লম্বায় ২৬৮ সেন্টিমিটার আর ওর ওজন প্রায় ১৬৫ কিলোগ্রাম।

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অ্যানড্রোক্লিসের গল্প পড়েছ। আফ্রিকার জঙ্গলে একটা সিংহের পা থেকে কাঁটা বের করে অ্যানড্রোক্লিস সিংহটির ভালবাসা আদায় করেছিল। একদিন রাজার আদেশে একটি সিংহের সামনে অ্যানড্রো-ক্লিসকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সিংহটি কিন্তু অ্যানড্রোক্লিসকে খেল না, উলটে ওর পায়ের কাছে বসে ওর হাত চেটে আদর করতে লাগল। বনের পশুপাখিকে ভালবাসলে ওরাও প্রতিদান দেয়। এই ঘটনা দেখে রাজা খুব খুশি হয়ে অ্যানড্রোক্লিসকে মুক্তি দিয়ে দেন।

খৈরী একদিন বাংলোর চারপাশে কাঁটাতারের বেড়ায় পা ঢোকাতে গিয়ে কাঁটা ফোটায় পায়ে। বেচারা ওইখানেই আটকে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর অন্য একটা পা নেড়ে চৌধুরীকে ইশারা করে ডাকে। চৌধুরী ওকে ছাড়িয়ে দিলে ও চৌধুরীর পা চেটে কৃতজ্ঞতা জানায়।

মাঝেমধ্যে দাঁতের গোড়ায় মাংসের হাড় আটকে গেলে খৈরী উঁ-উঁ করতে করতে চৌধুরীর কাছে ছুটে যায়। চৌধুরী ওর মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হাড় বের করে দিলে ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

খৈরী যখন আমাদের বাড়িতে প্রথম আসে, তখন আমাদের পোষা কুকুর ব্ল্যাকির বয়স সবে দশ মাস। এক সপ্তাহের মধ্যেই ওদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ব্ল্যাকির প্রথম বাচ্চা "বাঘা"র জন্মের দিন তিনেক পরে একদিন সকালে খৈরী খুব আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করে ব্ল্যাকি কী যেন একটা অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে রাখছে। এই সময় চৌধুরী এসে বাঘাকে খৈরীর কাছে ছেড়ে দেয়। খৈরী ওর থাবা দিয়ে বাঘাকে কিছু-ক্ষণ ওলট-পালট করার পরে হঠাৎ ওর কানে খুব আস্তে একটা কামড় দেয়। বাঘা চিৎকার করে উঠলে খৈরী বেশ মজা পায়। পরে এই বাঘার সঙ্গেই খৈরীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল ভীষণ। বাঘাকে আমরা কখনো ধমক দিলে বা মারলে খৈরী ছুটে এসে ওর পাশে দাঁড়ায়, আর উহুঁ উহুঁ করে সমবেদনা জানায়। কখনো আবার বাঘার শরীর চাটতে-চাটতে আদর করে।

খৈরী খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। ব্ল্যাকি ও বাঘার চেয়েও ওর বুদ্ধি অনেক বেশি। আমাদের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় ব্ল্যাকি ও বাঘা ওদের চেহারা দেখলে চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু খৈরী কখনোই তা করে না। ও যখন তিন মাসের বাচ্চা তখন আয়নায় ওর প্রতিবিম্ব দেখে। দেখে একবারও ঘাবড়ায়নি, বরং আয়নার পেছন দিকটা দেখে এসে জানিয়ে দেয় যে, আসল ব্যাপারটা ও ধরতে পেরেছে। জঙ্গলে মায়ের সঙ্গে ঝর্ণা বা নদীতে জল খেতে গিয়ে খৈরী ওর প্রতিবিম্ব বোধ হয় অনেকবার দেখেছে, তাই আয়না ওকে ঠকাতে পারে না। তবে টেপ রেকরডারে ধরে রাখা ওর বিভিন্ন রকমের গর্জন ও শব্দগুলো যখন ওকে আমরা প্রথম বাজিয়ে শোনাই তখন ও খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। একবার ঘরের বাইরে গিয়ে দেখেও এসেছিল আর কোনও বাঘ এসেছে কি না। তারপর সব বুঝে ফেলে টেপ রেকরডারের দিকে তাকিয়ে মেঝের ওপর শুয়ে থাকল চুপচাপ।

ছেলেবেলা থেকে খৈরীকে আমরা শিখিয়েছি যে, কাউকে আদর করার সময় ও যেন দাঁতের চাপ না দেয়, আর নখগুলো থাবা থেকে বার না করে। ও নখ বার করলে আমরা বলতাম, "না খৈরী, নখ নয়, নখ নয়।" খৈরী সেই কথা শোনামাত্রই নখ থাবার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখত। আজকাল খৈরী আর মোটেই থাবা থেকে নখ বার করে না। "না খৈরী দাঁত নয়, না খৈরী দাঁত নয়" বারবার বলে দাঁতের সংযত ব্যবহার করতেও ওকে শেখানো হয়েছে।

কিছুদিন আগে "নওনা" ডাকবাংলোর কাছে খৈরী একটা গরুকে ফেলে দিয়ে থাবা দিয়ে ওর ঘাড় চেপে ধরেছিল; দূরে দাঁড়িয়ে ফরেসট গারড ত্রিলোচন গরুকে নিয়ে খৈরীর খেলা দেখছিল। হঠাৎ বাংলোর ভেতর থেকে চৌধুরী ছুটে এসে ত্রিলোচনের হাত থেকে লাঠি নিয়ে খৈরীর নাকের ডগায় খুব জোরে মারলেন। উনি ভেবেছিলেন, খৈরী বোধ হয় গরুটাকে জখম করেছে। কিন্তু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল গরুর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। কারণ, খৈরী থাবা থেকে এক-বারও নখ বার করেনি। ওদিকে মার খেয়ে খৈরী সুড়সুড় করে ঘরে এসে সোজা আমার আঁচলের তলায় আশ্রয় নিল। ও বুঝতে পেরেছিল এই ধরনের কাজ চৌধুরী মোটেই পছন্দ করেন না।

একবার একজন বনকর্মী যশীপুরের একটি নতুন লোককে ডেকে এনেছিল খৈরীর খাবার তৈরি করে দেবার জন্যে। লোকটা যখন বাংলোর রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল, খৈরী তখন ওকে দেখতে পায়। নতুন লোক দেখে খৈরী আস্তে আস্তে ওর দিকে এগুতে লাগল। হঠাৎ বাঘ দেখে লোকটার সে কী কাঁপুনি! একজন বনকর্মী ওকে সাহস দিয়ে বলল, ভয় পেয়ো না, ও কিচ্ছু করবে না। তাই শুনে লোকটা কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে থাকল। খৈরী ওর পাশে গিয়ে ওকে একবার শুঁকল, তারপর ছাগলটার দিকে তাকাল। ও বুঝতে পেরেছিল নতুন লোকটা ওরই জন্যে দুপুরের খাবার তৈরি করছে। তারপর খৈরী আবার ফিরে গেল বাংলোর আমবাগানে।

বাংলোর আশেপাশে প্রায় ডজন খানেক ছাগল-ভেড়া প্রতিদিনই ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু খৈরী কোনোদিন ভুলেও ওদের গায়ে থাবা তোলেনি।

একদিন সিমলিপালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পক্ষী-বিজ্ঞান-বিশারদ ডাক্তার সলিম আলির শিবিরে রাখা একটা পাত্র থেকে এক টুকরো কাঁচা মাংস তুলে নিয়ে খৈরী পালিয়ে যায়। তাই দেখে চৌধুরী রেগে গিয়ে ওকে মারেন। মারের চোটে খৈরীর মুখের কাছে একটুখানি কেটে যায়। তখন ও মাংসের টুকরোটা ফেলে দিয়ে আমার কাছে ছুটে এসে উহুঁ-উহুঁ করে চৌধুরীর নামে নালিশ করে। আমি চৌধুরীকে বললাম, "কেন আমার মেয়েকে এমনভাবে মারলে!" চৌধুরী তখন খৈরীর ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে তারপর সেই মাংসের টুকরোটা নিজের হাতে ওকে খাইয়ে দিল। খৈরী বুঝতে পারল যে, ওর মাংস নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। এরপর থেকে ও আর কোনোদিনও চুরি করেনি। বাংলোয় মাংসের পাত্র পড়ে থাকে, খৈরী আশেপাশে চলাফেরা করে, কিন্তু একদিনও ও নিজে থেকে নিয়ে খায়নি।

আমাদের কোনও কষ্ট হলে খৈরী ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আমার ফোড়া অপারেশনের সময় খৈরী ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই ধরনের ঘটনা থেকে বোঝা যায় আমাদের ওপর ওর কত টান!

খৈরীর মেজাজ বেশ ঠান্ডা। চৌধুরী যখন রাগ করে ওকে মারেন, তখন বনকর্মীরা ভয় পায়। ভাবে, এই বুঝি খৈরীও রাগ করে চৌধুরীকে পালটা আক্রমণ করে বসল। কিন্তু খৈরী কক্ষনো তা করে না। মার খেয়ে গোঁ-গোঁ করে বেড়ালদের মত পেট দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করে। আর রেগে গেলে ও মুখ গোমড়া করে বসে থাকে, আমাদের একটা কথাও শোনে না। আমরা তখন কিছুক্ষণ ওকে একা থাকতে দিই। রাগ পড়ে গেলে ও কাছে এসে আমাদের গায়ে, গালে ও ঘাড়ে ওর গা ঘষতে শুরু করে। এইভাবে ও জানিয়ে দেয় যে ওর আর রাগ নেই। "কিঁয়া, কুঁ-কুঁ" শব্দ করে আমাদের কাছে আদর খেতে চায়। নানা ধরনের শব্দ করে খৈরী আমাদের সঙ্গে কথা বলে। ওর অনেক কথা আমরা টেপ রেকরডারে ধরে রেখেছি। ভাব ভঙ্গি, চলাফেরা, শব্দ ও ধ্বনির সাহায্যে খৈরী আমাদের সঙ্গে সব রকম কথা বলে।

বনকর্মীরা খৈরীর মেজাজ ও চলাফেরার ওপর সব সময় নজর রাখছেন। ও কখন কী করছে সব টুকে রাখছেন এই কর্মীরা। খৈরীকে নিয়ে গবেষণা চলছে। নানা তথ্য চৌধুরীও তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখছেন।

ছড়া

শঙ্খ ঘোষ

গন্ধমাদন পর্বতে
ফলত না কি বরবটি?

এই-না ভেবে জাম্ববান্
কিষ্কিন্ধ্যায় গম বানান।

সীতাও ছিলেন দুঃখিনী
কেননা কী কুক্ষণে

সমস্ত বরবাদ হল
হিঞ্চে খাবার সাধ হল!

লংকাতে কি হিঞ্চে নেই?
ওসব ওজর শুনছি নে—

বলতে বলতে লংকারাজ
দেখতে গেল কুচকাওয়াজ।

খেপলে কিন্তু সত্যি সে
মারবে ছুঁড়ে শক্তিশেল

ফুটিয়ে দেবে জোরসে হুল
দেখবি চোখে সর্ষেফুল

সর্ষে হলে ধানগাছে
করবে না আর দাঙ্গা সে।

খান না চিনি-গুড় সীতা
শাকের শোকে মূর্ছিতা!

কাজেই তখন সবাই ধায়
চাষ করতে অযোধ্যায়!

ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ছেলেধরা

সন্দীপ উধাও

ধনকুবের শিল্পপতি শ্যামলালবাবু একেবারে যেন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন চিঠিটা পেয়ে।

চিঠিটা ভৃত্য সাধুশরণ লেটার-বক্স থেকে এনেছে। ডাকে আসেনি চিঠিটা, কেউ ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। সংক্ষিপ্ত চিঠি। একটা বেলে কাগজে আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে চিঠিটা লেখা। উপরে একটা লাল কালিতে আঁকা খাঁড়া।

শ্যামলালবাবু সমীপেষু,

আপনার একমাত্র পুত্র সন্দীপকে যদি জীবিত ফিরে পেতে চান, তাহলে আগামী শনিবার অমাবস্যার রাত্রে বেহালার ট্রাম-ডিপো থেকে মাইল দেড়েক দূরে পথের পাশে যে বটগাছটা আছে সেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা তোড়া ঝুলিয়ে রেখে আসবেন। রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে চলে আসবেন। রাত্রি শেষ হবার আগেই তাহলে সন্দীপকে জীবিত ফিরে পাবেন। পুলিশের সাহায্য নেবার চেষ্টা করলে কিন্তু ছেলের মৃতদেহটা আপনার কাছে পাঠানো হবে। ইতি দীনহীন

মাকালীর সেবক।

গতকাল বিকালবেলা শ্যামলালবাবুর একমাত্র ছেলে আট বছরের সন্দীপ ঐ ভৃত্য সাধুশরণের সঙ্গে ময়দানে বেড়াতে গিয়েছিল। রাত আটটা নাগাদ পুরাতন ভৃত্য সাধুশরণ কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো। খোকাবাবুকে সে খুঁজে পাচ্ছে না, একটা ব্যাট্‌বল নিয়ে আপন মনে ময়দানে বসে খেলছিল, খেলতে-খেলতে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে। দু'ঘণ্টা ধরে পাগলের মত আশেপাশে অনেকটা আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও না-পেয়ে শেষটায় সাধুশরণ ফিরে এসেছে।

শ্যামলালবাবু একটু আগে তাঁর অফিস থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি সাধুশরণকে নিয়ে আবার নিজেই খুঁজতে বের হলেন।

রাত বারোটা পর্যন্ত অনেক জায়গায় খুঁজেও না-পেয়ে লালবাজারে মিসিং স্কোয়াডে গিয়ে খবরটা জানান এবং তাদেরই কথামত নিকটবর্তী থানায় ডায়েরি করিয়ে তাঁর ছেলের একটা ফটো ও সেই সঙ্গে ছেলের চেহারার বর্ণনা দিয়ে ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে আসেন।

শ্যামলালবাবুর স্ত্রী ইন্দুমতী দেবী কাঁদতে-কাঁদতে শয্যা নিয়েছেন। কেউ তাঁকে জলও স্পর্শ করাতে পারেনি।

লীলা আর শীলা সন্দীপের দুই দিদি। সন্দীপ তাদের একমাত্র ভাই। তার জন্য লীলা ও শীলা সেই রাত থেকেই কাঁদছে।

চিঠিটা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন শ্যামলালবাবু। মাথার মধ্যে তাঁর অজস্র চিন্তা একই সঙ্গে যেন কিলবিল করছে। একবার ভাবছেন, পুলিশে এক্ষুনি খবরটা দেবেন। আবার পরক্ষণেই মনে হয়, তাতে করে যদি সত্যি-সত্যিই সন্দীপকে তারা মেরে ফেলে। তার চেয়ে বরং যা চেয়েছে, সেই টাকাটাই সামনের শনিবার পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তাতে যে ছেলেকে ফিরে পাবেন, তেমন ভরসাই বা কোথায়? টাকা পেয়েও হত্যা করেছে দুর্বৃত্তেরা, এমন নজিরও ত দু-একটা আছে। আর ইদানীং এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে।

ভেবে-ভেবে কোন কূলকিনারাই পান না। তাঁর একমাত্র ছেলের ব্যাপার। তাঁর সন্দীপ। অবশেষে মনে হল, না, পুলিশে খবর দেবেন না, তবে একজনকে তিনি জানেন, তাঁকে ব্যাপারটা বলবেন। তিনি হয়ত একটা ভাল পরামর্শ দিতে পারেন।

বিরূপাক্ষ সেন।

হ্যাঁ ঠিক। তাঁকে আগে বলবেন।

শ্যামলাল উঠে গিয়ে ফোন করলেন বিরূপাক্ষকে।

"মিঃ সেন..."

"হ্যাঁ, বলুন।"

"আমি শ্যামলাল আগরওয়ালা।"

"কী খবর মিঃ আগরওয়ালা?"

"একটিবার দয়া করে এখুনি আসতে পারেন আমার বাড়িতে?"

"খুব জরুরী?"

"হ্যাঁ, বিশেষ জরুরী। প্লিজ, যত তাড়াতাড়ি পারেন আসুন।"

বিরূপাক্ষ মিতুলবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করছিল। সেদিন শুক্রবার। কী একটা পর্ব উপলক্ষে মিতুলবাবুদের স্কুল ছুটি। ফোনটা রেখে গায়ে একটা জামা চড়াতে লাগল বিরূপাক্ষ।

"কোথাও বেরুচ্ছ বুঝি বিরুকাকু?"

"হ্যাঁ, লাউডন স্ট্রীট, শ্যামলাল আগরওয়ালার ওখানে যাচ্ছি, জরুরী তলব। জানো মিতুলবাবু, ঐ শ্যামলালবাবু, যাকে তোমরা বল ক্রোড়পতি, তাই। বিরাট ধনী।"

মিতুলবাবু বললে, "তার মানে কিছু ঘটেছে। না হলে তোমাকে ডাকবেন কেন, এত 'জরুরী'ই বা বলবেন কেন?"

"মনে হচ্ছে সেইরকমই। যাবে নাকি আমার সঙ্গে মিতুলবাবু?"

"কোথায়?"

"আগরওয়ালার ওখানে?"

"কিন্তু বিরুকাকু..."

"আরে চলই না, আজকে তো তোমার ছুটি। তাছাড় তুমি তো আমার খুদে এক সহকর্মী।"

"বেশ চলো।" গম্ভীরভাবে বলে মিতুলবাবু।

'মা কালীর খাঁড়া'র চিঠি

"কী ব্যাপার মিঃ আগরওয়ালা?" বসবার ঘরে মিতুলকে নিয়ে ঢুকে আগরওয়ালাকে প্রশ্ন করল বিরূপাক্ষ। মনে হল, আগরওয়ালা খুবই চিন্তিত।

"বসুন মিঃ সেন। এটি, এই ছেলেটি কে?"

"মিতুলবাবু, আমার খুদে এসিসট্যান্ট, অত্যন্ত সার্প ব্রেন।"

"হুঁ।"

"বলুন এত জরুরী তলব কেন?"

"আমার একটিমাত্র ছেলে সন্দীপ, আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তার—"

"দুর্বৃত্তরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

"সে কী, কখন? জানতেই বা পারলেন কী করে?"

সংক্ষেপে তখন ঘটনাটি বলেন শ্যামলালবাবু। চিঠিখানাও বিরূপাক্ষের হাতে তুলে দেন।

বিরূপাক্ষ গভীর মনোযোগ সহকারে চিঠি ও চিঠির খামটা পরীক্ষা করে পড়ল। তারপর মিতুলবাবুর হাতে চিঠিটা দিয়ে বলল, "এই চিঠি আপনি সকালে ডাক-বাক্সে পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"পুলিশে খবর দিয়েছেন?"

"থানায় ডাইরি করেছি। মিসিং স্কোয়াডেও জানিয়েছি। তবে চিঠির কথা তাদের এখনো জানাইনি। আপনার সঙ্গে পরামর্শ না-করে কিছু করব না—এখন আপনি যে পরামর্শ দেবেন, সেই মতই করব।"

বিরূপাক্ষ যেন কী ভাবল কিছুক্ষণ। গোটা দুই চার্মিনার শেষ করল নিঃশব্দে। তারপর বলল, "আপনার ভৃত্য সাধুশরণ কতদিন এ-বাড়িতে কাজ করছে?"

"তা বছর বারো তো হবেই। খুব বিশ্বাসী। রোজ সে-ই সন্দীপকে নিয়ে ময়দানে বেড়াতে যেত।"

"একবার ডাকতে পারেন সাধুশরণকে?"

মিতুলবাবু চুপিচুপি বিরূপাক্ষকে বললে, "সাধুশরণ নিশ্চয়ই কিছু জানে বিরুকাকু।"

"আমারও তাই ধারণা।"

"ছেলেটি কী বলছে মিঃ সেন?"

"কিছু না। আপনি সাধুশরণকে ডাকুন একবার এ-ঘরে।"

সাধুশরণ এল। পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি বয়স হবে সাধুশরণের। ফরসা গায়ের রঙ। বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা। চোখ দুটো বর্তুলাকার, তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি। পরনে ধুতি ও শার্ট। পায়ে চপ্পল।

"তোমার নাম সাধুশরণ?"

"আজ্ঞে স্যার।"

"কাল ঠিক-ঠিক ব্যাপারটা কী ঘটেছিল বলো তো।"

"আজ্ঞে স্যার রোজ যেমন যাই, পাঁচটার কিছু আগে গাড়িতে করে খোকাবাবুকে খেলাতে ময়দানে গিয়েছিলাম।"

"তুমি ড্রাইভিং জানো?"

"আজ্ঞে না, রামচরণ ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিল।"

"বেশ, তারপর?"

"আমি একটা গাছতলায় বসে ছিলাম স্যার। আরও দু-চারজন চাকর ছিল, তাদের সঙ্গে রোজ যেমন গল্প করি গল্প করছিলাম, আর খোকাবাবু কয়েকটি ছেলের সঙ্গে ব্যাটবল নিয়ে খেলা করছিল।"

"তারপর?"

"হঠাৎ খেয়াল হতে দেখি, দুজন ছেলে ব্যাটবল নিয়ে খেলা করছে, কিন্তু খোকাবাবু নেই।"

"নেই? সন্দীপকে দেখতে পেলে না?"

"আজ্ঞে, স্যার, না। তাড়াতাড়ি উঠে তাকে খুঁজতে শুরু

হবি। ঐ ছেলে দুটিকে জিজ্ঞেস করি, আমাদের খোকাবাবু কোথায়?"

"তারা কী বলল?"

"তারা তখন চোর-চোর খেলছিল, হঠাৎ যে সন্দীপ কোথায় লুকলো, তারা আর খুঁজে পায়নি।"

"আচ্ছা, আশেপাশে তার আগে কাউকে দেখেছিলে ময়দানে?"

"এক আলুকাবলিওয়ালা আর এক আইসক্রিমওয়ালাকে দেখেছিলাম। খোকাবাবুকে একটা আইসক্রিম কিনে খেতেও দেখেছি।"

মিতুলবাবু ফিসফিস করে আবার বললে, "ঐ আইসক্রিমের মধ্যেই কিছু ছিল মনে হচ্ছে বিরুকাকু। আইসক্রিম খাইয়েই হয়ত সন্দীপকে—"

"হুঁ, হতে পারে।" বিরূপাক্ষ বলল।

"কী বলছে ও?" শ্যামলাল জিজ্ঞেস করলেন বিরূপাক্ষকে।

"কিছু না। আচ্ছা সাধুশরণ, আইসক্রিম কখন খেয়েছিল সন্দীপ?"

"আজ্ঞে খোকাবাবু যে নেই, তা বুঝতে পারার মিনিট কুড়ি আগে।"

"বিরুকাকু, ওকে জিজ্ঞেস করো তো ড্রাইভার তখন কোথায় ছিল। সে হয়ত দেখতে পারে কাছাকাছি থাকলে।"

"ঠিক। আচ্ছা সাধু, ড্রাইভার তখন কোথায় ছিল?"

"হাত দশেক দূরে, গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।"

"আপনার ড্রাইভারকে একবার ডাকুন শ্যামলালবাবু, যে কাল ময়দানে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। আছে সে এখন?"

"হ্যাঁ, নীচেই আছে। ডাকছি।"

একটু পরেই ড্রাইভার রামচরণ এল। বয়েস সাতাশ-আঠাশ হবে। পরনে খাকি ইউনিফর্ম, বেঁটেখাটো কিন্তু পাতলা চেহারা, মুখে একজোড়া পাকানো গোঁফ, মাথায় টেরি।

"তুমহারা নাম রামচরণ?" বিরূপাক্ষের প্রশ্ন।

"জী সাব্।"

"সন্দীপবাবুকো বারে মে তুম কুছ জানতা হ্যায়?"

"সাব্, হাম তো গাড়িকো সামনেমে খাড়া থা। ম্যায় কুছ নেহি দেখা।"

"কুছ নেহি? খোকাবাবুকো আইসক্রিম খানে দেখা?"

"নেহি সাব্।"

"ও মিথ্যা বলচে," ফিসফিস করে মিতুলবাবু বললে, যা কেবল বিরূপাক্ষ শুনতে পেল। "মনে হচ্ছে, বিরুকাকু, ও কিছু দেখেছে।"

"সাচ্-সাচ্ বাতাও রামশরণ। নেহি তো তুমে থানেমে ভেজা যায়েগা।"

"থানেমে কিউ? হামে ক্যা কুছ গল্‌তি হুয়া সাব? খোকাবাবু তো হামারা পাস নেহি থা। সাধুকো সাথ বরাবরই থা।"

"উয়ো বাত তো ঠিক হ্যায়, আবভি তুমে কুছ নেহি মালুম, ইয়ে বাত বিশোয়াস নেহি হোতা।"

"হাম কেয়া ঝুটা বোলতা হ্যায় সাব? আগর দেখনেসে হাম কিউ নেহি বাতায় গা?" বেশ উদ্ধত গলার স্বর রামচরণের।

"ও নিশ্চয়ই কিছু দেখেছে বা জানে বিরুকাকু।" মিতুলবাবু আবার ফিসফিস করে বললে বিরূপাক্ষকে।

"রামচরণ, ইয়ে কেয়া সাচ্ হ্যায়—তুমে লেটার-বকসসে চিঠিটো লাকে সাধুচরণকো দিয়া থা?"

"সাচ্ হ্যায় সাব।"

"কিসিকো তুম লেটার বকসমে চিঠ্‌ঠি ডালনে দেখা?"

"নেহি সাব্।"

"তব্ সুবে-সুবেই তুম্ লেটার-বকসমে কোই চিঠ্‌ঠি হ্যায় কি নেই দেখনে গিয়া কিঁউ?"

"এইসাই দেখা থা।"

ঘটোৎকচের ফোন

"ঠিক আছে," বিরূপাক্ষ বলল, "তোম দোনো যা সেক্‌তা।"

রামচরণ আর সাধুশরণ, মনে হল, ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মিতুলবাবু ওদের চলে যাবার ভঙ্গিটা দেখে মিটিমিটি হাসতে থাকে।

"শ্যামলালবাবু—"

বিরূপাক্ষের ডাকে মুখ তুললেন শ্যামলাল আগরওয়ালা, "কিছু বলছেন মিঃ সেন?"

"ও'দের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এইটুকু বুঝলাম, যতটা ওরা অজ্ঞতা বা কিছু না-জানার ভান করছে, সেটা কেবল ওদের নিজেদেরই স্বার্থে।"

"মানে?"

"মানে ওরা যতটুকু বলছে, তার চাইতে বেশী কিছু জানে।"

"তবে কি মিঃ সেন," আগরওয়ালা এবার বললেন, "ওরা এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত?"

"অতটা হলফ করে আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, তবে দুজনের একজনও যে ধোয়া - তুলসীপাতাটি নয়, সে-ব্যাপারে আমার কিন্তু কোন সন্দেহই নেই। এবং সেটা আমার একার মত নয়, মিতুলবাবুরও মত।"

এতক্ষণে যেন ভাল করে বিরূপাক্ষর পাশেই নিরীই শান্ত-শিষ্ট মিতুলবাবুর দিকে তাকালেন শ্যামলাল। এবং মিতুলবাবুকেই বোধহয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু তার অবকাশ পেলেন না, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের এক যুবক হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে সোজা শ্যামলালকে প্রশ্ন করলেন, "শ্যামলালবাবু, এ কি সত্যি? সন্দীপকে নাকি কাল থেকে কোথায়ও পাওয়া যাচ্ছে না?"

বিরূপাক্ষ যুবকটি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তার দিকে তাকিয়েছিল এবং আপাদমস্তক তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল।

রোগা লম্বাটে ধরনের চেহারা। গায়ের রং টক্‌টকে ফর্সা। পরনে দামী টেরিকটের প্যাণ্ট ও গায়ে টেরি সিল্কের স্ট্রাইপ দেওয়া হাওয়াই শার্ট—দু হাতের আঙুলে অন্তত গোটা চারেক আংটি, তার মধ্যে একটা মনে হয় হীরার।

"হ্যাঁ, ঘনশ্যাম।" একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শ্যামলাল বললেন।

"কিন্তু কেমন করে? এই বাড়ি থেকে তো সে আর ম্যাজিকের মত উবে যেতে পারে না।"

"বাড়ি থেকে তো নয়।"

"তবে?"

"ময়দানে খেলা করতে গিয়েছিল, সেখান থেকে।"

"কিন্তু ঘনশ্যামবাবু," বিরূপাক্ষই এবারে প্রশ্ন করল, "আপনি সংবাদটি পেলেন কোথা থেকে? কার কাছে শুনলেন?"

"ইনি কে শ্যামলালবাবু?" বিরূপাক্ষের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ঘনশ্যাম এবারে প্রশ্নটা করলেন শ্যামলালকেই।

শ্যামলাল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর দিকে চেয়ে বিরূপাক্ষ চোখ টেপায় সামলে নিলেন নিজেকে, বললেন, "আমার একজন বিশেষ পরিচিত বন্ধু, মিঃ সেন, সন্দীপ হারিয়ে গেছে শুনে এসেছেন।"

"কিন্তু আপনি তো আমার কথাটার জবাব ছিলেন না। কার কাছে শুনলেন কথাটা উনি, জিজ্ঞাসা করুন না শ্যামলালবাবু।"

"জগবন্ধুবাবু, অফিসের হেড ক্লার্ক। তাঁর মুখে কথাটা শুনেই ছুটে আসছি আমি, শ্যামলালবাবু। তা পুলিশে বা থানায় খবর দিয়েছেন তো?"

আবার বিরূপাক্ষ চোখের ইঙ্গিত করে শ্যামলালের উদ্দেশে।

"না।"

"কেন?"

"পুলিশে খবর দিলে যারা সন্দীপকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, তারা তাকে প্রাণে মেরে ফেলবে বলে শাসিয়েছে।"

"সে কী?"

"পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবি তাদের।"

"পঞ্চাশ হাজার?"

"হ্যাঁ, টাকাটা পেলে তারা তাকে ছেড়ে দেবে জীবন্ত।"

"বলেন কী! তা আপনি টাকাটা দেবেন?"

"ভেবে দেখি।"

"আরে, শ্যামলালবাবু, এতে ভাবাভাবির কী আছে?" পঞ্চাশ হাজার কেন, এক লাখ টাকাও তো আপনার কাছে সামান্য। দিয়ে দিন, দিয়ে দিন, একমাত্র ছেলে আপনার—"

"কিন্তু টাকাটা পেলেই যে তারা সন্দীপকে জীবন্ত ছেড়ে দেবে, তারই বা কী গ্যারাণ্টি আছে ঘনশ্যামবাবু?" প্রশ্ন এবারে বিরূপাক্ষই করল।

"বাঃ, টাকার জন্যই যখন চুরি করে নিয়ে গিয়েছে সন্দীপকে, তখন টাকা পেলেই দেখবেন ছেড়ে দেবে।"

"লোভ বড় সাংঘাতিক বস্তু ঘনশ্যামবাবু, চক্রবৃদ্ধি হারে এক-এক সময় ওটা বেড়েই চলে।"

"মিঃ সেনের কথা শুনবেন না, শ্যামলালবাবু, আপনি দিয়ে দিন টাকাটা, বলেন তো আমিই না হয় দিয়ে দেব।"

"দেখি ভেবে।" শ্যামলাল বললেন বিরূপাক্ষর চোখের ইঙ্গিতমতো, "তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না ঘনশ্যাম, আমিই দেব, এখনও তো সময় আছে, দেখি আর-একটু ভেবে।"

"যা করবার তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিন শ্যামলালবাবু, ব্যাপারটা হেলাফেলা বা গড়িমসি করার নয়।"

ঘনশ্যাম যেমন এসেছিলেন হন্ত-দন্ত হয়ে, তেমনিই যেন হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন।

"এ-ভদ্রলোকটি কে শ্যামলালবাবু, মনে হল আপনার বিশেষ পরিচিতজন?" বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, আমার কারবারের একজন পার্টনার, অংশীদার, ⅓ অংশের।"

"আর ঐ জগবন্ধুবাবু, উনি সংবাদটা পেলেন কোথা থেকে? আপনি কি তাঁকে কিছু বলেছিলেন?"

"খেপেছেন মিঃ সেন? এসব খবর সাতকান করতে আছে? তবে ভদ্রলোক মস্ত বড় তান্ত্রিক জ্যোতিষী। গণনা করে কিছু জেনেছেন।"

"হুঁ।" বিরূপাক্ষ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

মিতুলবাবু ফিসফিস করে বললে, "বিরুকাকু, লোকটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।"

"কী বলছে মিতুলবাবু মিঃ সেন?"

"না এমনিই, যাবার কথা বলছিল। আমরা তাহলে উঠি।"

"বসুন বসুন, এক কাপ করে চা খেয়ে যান। তা ছাড়া কোন পরামর্শই তো এখনো দিলেন না।"

একটু পরে ভৃত্য ট্রেতে করে খাবার ও চা নিয়ে এল। পেসট্রি, সিঙ্গারা, কালাকান্দ ইত্যাদি।

চা পান করতে করতে যখন ওরা ঐ ব্যাপারই আলোচনা করছেন, ঘরের মধ্যে ফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল।

শ্যামলাল গিয়ে ফোন ধরলেন। "হ্যালো, শ্যামলাল আগরওয়ালা বলছি..."

"শ্যামলালবাবু, আমি কালী মায়ের সেবক ঘটোৎকচ বলছি, বিরূপাক্ষ সেনকে ডেকেছেন, ভালই, কিন্তু ঐ হস্তী-মূর্খের পরামর্শ নিলে ছেলেকে হারাবেন। নিজের মঙ্গলটা না বুঝবার মত আপনি ছেলেমানুষ নন।"

ফোন কেটে গেল।

শ্যামলাল ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

"কার ফোন, শ্যামলালবাবু?"

"ঘটোৎকচের।"

"সে আবার কে?"

"সে মায়ের সেবক, আমাকে সাবধান করে দিল।"

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিঠি

"শাসাল ফোনে।" বিরূপাক্ষ বলল।

"হ্যাঁ। বলল, আপনার কথা শুনে টাকা না-দিলে আমার ছেলেকে ফিরে পাব না।"

"আমার এখানে আসার ব্যাপারটাও তাহলে ওরা জেনেছে।"

"তাই তো দেখছি।"

"শুনুন শ্যামলালবাবু, আজকের দিনটা আমাকে চিন্তা করতে দিন। আজ তো বৃহস্পতিবার, এখনো হাতে অনেক সময় আছে। ভেবে দেখি, তারপর শনিবার সকালে জানাব।"

"কিন্তু মিঃ সেন—"

"এ-সব ব্যাপারে নার্ভ হারালে তো চলবে না শ্যামলাল-বাবু, চুপচাপ বসে থাকুন। আর হ্যাঁ, এ দুটো দিন অফিস যাবেন না।"

"কেন?"

"আমার ধারণা, আরও চিঠি আসবে।"

"চিঠি!"

"হ্যাঁ।"

শ্যামলাল-ভবন থেকে বের হয়ে বিরূপাক্ষ সোজা লাল-বাজারে গেল। সেখানে একজন বড় অফিসারের সঙ্গে কিছু-ক্ষণ কথাবার্তা বলে, শ্যামলালবাবুর এলাকার থানা-অফিসারকে ফোন করাল।

অফিসার বলে দিলেন বিরূপাক্ষের নির্দেশমত তাঁকে কী করতে হবে।

লালবাজার থেকে বের হয়ে বিরূপাক্ষ বাসায় গেল। মিতুল চলে গেল, বিকেলে আবার আসবে বলে। দুপুর দুটো নাগাদ বিরূপাক্ষ বেরুল অন্য এক বেশে। ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়ি থুতনিতে, সাজানো গোঁফ, মোটা জুলপি, দামী সুট পরনে। বাঁ গালে একটা তিল, প্রায় মটরের দানার সাইজের। নিজের গাড়ি নিল না, রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি নিল।

সোজা একেবারে শ্যামলালবাবুর অফিসে। লিফটে করে চারতলায় অফিসে চলে গেল। এনকোয়ারিতে জিজ্ঞাসা করল, জগবন্ধু মৈত্র অর্থাৎ অফিসের হেড ক্লার্কের সঙ্গে একটিবার দেখা হতে পারে কি না। বিশেষ জরুরী। এনকোয়ারি কাউণ্টার থেকে ফোন করা হল। জগবন্ধুবাবু বললেন, পাঠিয়ে দিতে।

বিরূপাক্ষ গিয়ে বেয়ারার সঙ্গে একটা টেবিলের সামনে দাঁড়াল। নাদুসনুদুস গোলগাল চেহারা জগবন্ধু মৈত্রের। কপালে সিঁদুরের টিপ এবং সাদা পাঞ্জাবির ফাঁক দিয়ে একট সোনার চেন ও রুদ্রাক্ষের মালা গলায় নজরে পড়ে। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া বাবরি চুল। কানে অজস্র লোম।

"নমস্কার স্যার!"

"কী চান, বলুন।" রুক্ষ কর্কশ গলা।

"আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম।"

"কী দরকার?"

"একটু প্রাইভেট, মানে গোপনে কথাটা বলতে চাই।" বলে বিরূপাক্ষ একবার চারদিকে তাকাল।

"ঠিক আছে, চলুন, বড়সাহেবের অফিস-ঘরে।"

"বড়সাহেবের অফিস-ঘরে?"

"হ্যাঁ, বড়সাহেব আজ আসেননি, ঐ ঘরটাই নিরিবিলি হবে।"

"কিন্তু বড়সাহেবের ঘরে গিয়ে বসাটা কি ঠিক হবে?"

"আরে মশাই, আমার সঙ্গে যখন যাচ্ছেন ভয়টা কী? চলুন।"

এয়ার কন্ডিশন-করা চমৎকার সাজানো ঘর। দারোয়ান টুলে ছিল না দরজার গোড়ায়। সে বোধহয় আগরওয়ালার অনুপস্থিতিতে হাওয়া খেতে গিয়েছে।

দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে জগবন্ধু বললেন, "বলুন, কী ব্যাপার?"

"আমি এসেছি ঘটোৎকচের কাছ থেকে।"

চমকে উঠলেন যেন জগবন্ধু। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললেন, "কী? কী নাম বললেন?"

"বললাম তো ঘটোৎকচের কাছ থেকে।"

"সে আবার কে?"

"তাঁকে চেনেন না? তিনি তো বললেন আপনাকে চেনেন, তাই পাঠালেন।"

"কী বলেছেন তিনি?"

"আপনিই তো জগবন্ধু মৈত্র?"

"হ্যাঁ, তা কী বলেছেন তিনি?"

"আজ সন্ধ্যায় অতি অবিশ্যি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

"বেশ। বলবেন, যাব।"

"আমি তাহলে চলি?"

"আসুন।"

"আচ্ছা, ঘনশ্যামদাস আছেন?"

"তাঁর কাছেও কোন মেসেজ আছে নাকি?"

"তাঁর কথাও বলছিলেন কিনা ঘটোৎকচ, তাই ভাবছিলাম একবার দেখা করে যাব।"

"ও, তা তিনি তো আজ অফিসে এখনো আসেননি।"

"তবে আর কী হবে, চলি।"
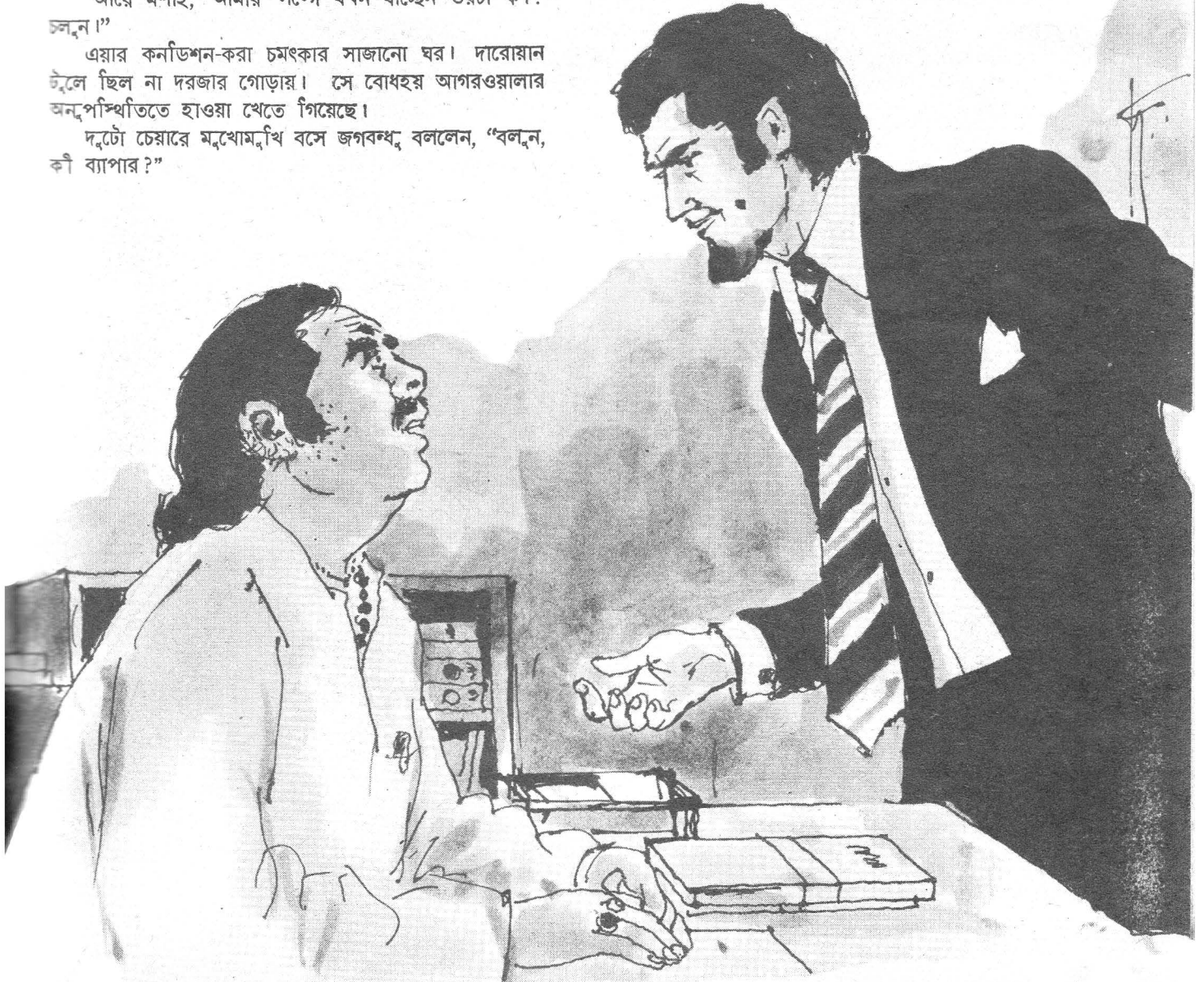
সন্ধ্যার পর আবার বিরূপাক্ষ গিয়ে হাজির হল শ্যামলাল-ভবনে। চিন্তাগ্রস্ত বিষণ্ণ শ্যামলাল একা-একা বসে ছিলেন নিজের ঘরে। বিরূপাক্ষ ঘরে ঢুকতেই বললেন, "এসেছেন, বসুন।"

"কী ব্যাপার? অত জরুরী তলব কেন আবার?"

"আবার চিঠি।"

"আবার চিঠি? কার চিঠি, দেখি।"

সেই হলদে তুলোট কাগজে লেখা। উপরে লাল কালিতে আঁকা একটা খঙ্গ। চিঠির বিষয়বস্তু প্রায় একই। সকালের ফোনের মত। "বিরূপাক্ষ সেন একটি আস্ত মর্কট। সে আপনাকে ডোবাবে। তার কথায় ছেলে হারাবেন না। সাবধান। ইতি ঘটোৎকচ।"

চিঠিটা পড়ে বিরূপাক্ষ মৃদু হাসল।

"হাসছেন যে?"

"এ চিঠিটাও বোধ হয় লেটার বক্সেই পাওয়া গিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কে দিল? সাধুশরণ?"

"হ্যাঁ। অন্যান্য ডাকের চিঠির সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আগে।"

"আচ্ছা শ্যামলালবাবু, রামচরণ ড্রাইভার আপনার এখানে কতদিন কাজ করছে?"

"বছরখানেক হবে। লোকটা সত্যিই ভাল গাড়ি চালায়। গাড়ির যত্নও নেয়।"

"কে দিল ওকে?"

"ও ঘনশ্যামদাসের ওখানে আগে কাজ করেছিল, তারই রেকমেনডেশন নিয়ে এসেছিল। পুরনো ড্রাইভারটা কিছুদিন আগে মারা গেছে, তাই—"

"হুঁ। রামচরণকে একবার ডাকুন তো!"

কিন্তু রামচরণকে পাওয়া গেল না। সাধুশরণ বললে, দুপুরে সে বের হয়েছে, এখনো ফেরেনি।

"কাউকে কিছু বলে গেছে?" বিরূপাক্ষের প্রশ্ন।

"তা বলতে পারি না।"

"ঠিক আছে, তুমি যাও।"

সাধুশরণ চলে যাবার পর বিরূপাক্ষ বললে, "পাখি পালিয়েছে, শ্যামলালবাবু। আর ফিরবে না।"

"মানে?"

"একটা বিরাট ষড়যন্ত্র আপনার বিরুদ্ধে হচ্ছে। কিছুদিন ধরে চলছিল এবং রামচরণও তাদের একটি হাতিয়ার। সন্দীপকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই ষড়যন্ত্রে।"

"বলছেন কী?"

"ঠিকই বলছি, খুব সম্ভব ঐ রামচরণের হাত দিয়েই চিঠি চালাচালি হয়েছে। আমি যে রামচরণকে প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম, রামচরণ সেটা বুঝতে পেরেই চম্পট দিয়েছে।"

"কিন্তু—"

"আমার সকালের প্রশ্নেই ও বুঝতে পেরেছিল।"

"কী?"

"ওকে আমি সন্দেহ করছি। মিতুলবাবুও ঠিকই অনুমান করেছিল।"

"ছেলেটি তো দেখছি তাহলে বেশ চালাক-চতুর, আর বুদ্ধিও রাখে।"

ওদের কথার মধ্যে বাড়ির এক ভৃত্য একখানা মুখবন্ধ খাম এনে দিল। ওপরে শ্যামলালের নাম। "স্যার, এই চিঠি একজন লোক আপনাকে এক্ষুনি দিয়ে গেল।"

বিরূপাক্ষ শুধায়, "কে সে?"

"তা তো বলল না। কেবল বলল, চিঠিটা জরুরী, এক্ষুনি যেন সাহেবের কাছে পোঁছে দিই।"

"লোকটা দেখতে কীরকম?"

"ফরসা মোটাসোটা নাদুস-নুদুস চেহারা। পরনে ছিল একটা প্যান্ট আর খাকী বুশ শার্ট।"

"হুঁ, আচ্ছা যাও। দেখুন চিঠিটা খুলে শ্যামলালবাবু। আবার বোধহয় মা কালীর খাঁড়ার পত্রাঘাত।"

সত্যিই তাই, সেই হলদে কাগজের উপরে লাল কালিতে একটি খাঁড়া আঁকা, হাতের লেখা আঁকাবাঁকা।

"শ্যামলালবাবু, আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলবার চেষ্টা করছেন জেনে দাবি আমাদের আরও পনের হাজার—সন্দীপকে জীবিত পাবেন—ইতি কালী মায়ের সেবক ঘটোৎকচ।"

"হুঁ, এবারে দাবি তাহলে পঁয়ষট্টি হাজার।" বলে বিরূপাক্ষ হাসল। "ক্রমশ আরও বাড়বে শ্যামলালবাবু।"

মুখোমুখি ঘটোৎকচ

শনিবার অমাবস্যার রাত্রি। ঘন অন্ধকারে চারিদিক যেন কী এক ভৌতিক বিভীষিকায় থম-থম করছে।

জায়গাটা সত্যিই নির্জন। সোজা পাকা রাস্তা চলে গেলেও দুধারে প্রায় কোন জনবসতিই নেই বলতে গেলে। মাঝে-মাঝে কিছু খেজুর গাছ, তালগাছ, কিছু শূন্য খাঁ-খাঁ করা মাঠ।

বটগাছটার আশেপাশে কিছু বুনো ঝোপঝাড়। জোনাকির আলো অন্ধকারে সেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে জ্বলছে-নিভছে আগুনের ফুলকির মত। একটানা ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। সেই অন্ধকারে এক সময় দেখা গেল একটা টিমটিমে সাই-কেলের আলো ক্রমশ ঐ বটগাছটার দিকেই সড়ক ধরে এগিয়ে আসছে।

হাত দশেক দূরে আর-একটা গাছ। বিরূপাক্ষ ও কিছু আরম্ড পুলিশ সেখানে আত্মগোপন করে ছিল। তারা দেখতে পেল দূর থেকে ঐ আলোটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ আগে তীব্র হেডলাইট জ্বালিয়ে বোধকরি শেষ বাসটা বজ-বজের দিকে চলে গিয়েছে। এ রাস্তায় যানবাহন খুব কম।

সাইকেলটা আরও কাছে এলে দূরে থেকেই দেখা গেল, তার আরোহী হাতে একটা টর্চ নিয়ে সাইকেল চালাতে-চালাতেই এদিক-ওদিক আলো ফেলে দেখছে। রেডিয়াম ডায়াল দেওয়া হাতঘড়িটার দিকে তাকাল বিরূপাক্ষ। রাত বারোটা বাজতে আর মিনিট কুড়ি বাকী।

পাশের পুলিশ অফিসারটিকে বিরূপাক্ষ বলল, "মনে হচ্ছে টাকা নিতে এসেছে। আমি ঐ গাছটায় গিয়ে উঠব।"

ওদিকে সাইকেল-আরোহী আবার যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই ফিরে গেল। বিরূপাক্ষ তক্ষুনি চট্‌পট্ গাছটা থেকে নেমে যে-বটগাছে একটা থলি ঝোলান ছিল সেই গাছটায় উঠে পড়ল। যেন একটা কাঠবিড়ালীর মতই সে দ্রুত। বিরূপাক্ষর গায়ে কালো শার্ট। পরনে কালো প্যাণ্ট। মাথায় কালো টুপি।

কিন্তু বসে থেকে-থেকে ওরা ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পুলিশ অফিসার পাশের একজন অফিসারকে বললেন, "বেটা গাছের মধ্যে আমাদের দেখতে পায়নি তো?"

"না স্যার, পাতার আড়ালে দেখবে কী করে? ভাল কামুফ্লাজ হয়েছে।"

এল এবার, সাইকেল না, একটা ছোট মটরকার। কিছুদূরে এসে থেমে গেল। একটা লোক গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির

বনেট খুলে কী সব দেখতে লাগল টর্চ জেবলে। বিরূপাক্ষ কিন্তু শ্যেনদৃষ্টি মেলে চেয়ে ছিল পথের দিকে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল অন্ধকারে কে যেন একটা শিয়ালের মত চুপি চুপি এগিয়ে আসছে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে ঐ বটগাছটার দিকে। লোকটাকে আর কেউ দেখতে পায় না, কারণ তাদের সকলের নজর তখন রাস্তার উপরে দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে নিবদ্ধ।

ঝুপ করে একটা ভারী কম্বল বটগাছ থেকে পড়ল নীচে, সঙ্গে সঙ্গে বিরূপাক্ষও ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ল। অতর্কিতে অন্ধকারে কম্বলের তলায় চাপা পড়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে লোকটা। বিরূপাক্ষ তাকে জাপটে ধরে বাঁশিতে ফুঁ দিল। গাড়িটা অমনি বোঁ করে স্টার্ট দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেল।

গাছতলা থেকে টেনে এনে লোকটাকে আলোতে দাঁড় করাল তিনজন সেপাই।

"লোকটা কে মিঃ সেন, চেনেন নাকি?" বলে অফিসার লোকটার মুখে টর্চের আলো ফেললেন।

বিরূপাক্ষ বলল, "চিনেছি বই কী। আগরওয়ালা কম্পানির বড়বাবু জগবন্ধু মৈত্র। ঘটোৎকচের প্রধান চেলা।"

"বলেন কী?"

"হ্যাঁ। কী জগবন্ধুবাবু, এবারে বলবেন কি সন্দীপকে কোথায় রেখেছেন?"

"কে সন্দীপ?"

"চেনেন না? নামটাও বোধহয় শোনেননি জীবনে? তাই না?" ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বিরূপাক্ষ বলল, "সন্দীপকে না হয় না চিনলেন, কালী মায়ের সেবক ঘটোৎকচটি কে?"

"আমি কিছু জানি না।"

"তা এই মধ্যরাত্রে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে বটগাছটার তলায় গেছিলেন কেন?" বিরূপাক্ষর প্রশ্ন।

"পায়ে একটা চোট লেগেছিল। তাই জিরোতে গিয়েছিলাম।"

"তা হাতে আপনার ইটভরা থলিটা এল কী করে?" হাসতে-হাসতে আবার প্রশ্ন করে বিরূপাক্ষ।

"থলি?"

"হ্যাঁ, যেটা পুলিশ আপনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। জগবন্ধুবাবু, আর অস্বীকার করে কোন লাভ নেই, সেদিন আপনার অফিসে গিয়ে আপনার শিকারী-গোঁফ আর কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা দেখেই চিনতে পেরেছিলাম আপনাকে। বলুন এবারে, সন্দীপ কোথায়। কথা দিচ্ছি, সন্দীপকে সুস্থ জীবিত পেলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

বিরূপাক্ষর কথা শেষ হল না, একটা গুলি এসে হঠাৎ জগবন্ধুবাবুকে ধরাশায়ী করল। কিন্তু আততায়ী পালাতে পারল না শেষ পর্যন্ত। সেও ধরা পড়ে গেল। পুলিশ তাড়া করে তাকে ধরে ফেলল।

দুই জনকে নিয়ে আসা হল থানায়। আর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত জগবন্ধুকে অ্যামবুলেন্সে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ঘনশ্যামদাস।

"তারপর ঘনশ্যামবাবু, সন্দীপ কোথায়?"

"তা আমি কী জানি!"

"জানেন মিঃ চৌধুরী, শ্যামলালবাবুকে ফোন করে দিন, এখুনি যেন চলে আসেন।"

থানা অফিসার মিঃ চৌধুরী ফোন করে দিলেন শ্যামলালবাবুকে।

"ঠিক আছে," বিরূপাক্ষ বলল, "শ্যামলালবাবু আসুন, তারপর দেখব ঘনশ্যামদাস মুখ খোলে কি না।"

ঘনশ্যাম কিন্তু শ্যামলালের কাছেও মুখ খুলল না।

কিন্তু জগবন্ধু মরবার আগে যে শেষ জবানবন্দি দিয়ে গিয়েছিল, তারই সাহায্যে বজবজের একটা পোড়ো বাড়ির অন্ধকার ঘর থেকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় সন্দীপকে পুলিশরা উদ্ধার করে আনল। কয়দিনের অনাহারে ও বন্দী থেকে সন্দীপ ধুঁকছে তখন। সে একটি দানাও দাঁতে কাটেনি।

শ্যামলালবাবুকে বলল বিরূপাক্ষ, "প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, সন্দীপকে চুরি করেছে আপনার জানাশোনা কোন লোক, যার আপনার গৃহে অবাধ গতিবিধি ছিল ও যে জানত সন্দীপ রোজ ময়দানে বিকেলে খেলতে যায়। শুধু তাই নয়, রামচরণ ড্রাইভার বাড়ির সব খবর সাধুশরণের মারফত জেনে ঘনশ্যাম দাস অর্থাৎ ঘটোৎকচকে সরবরাহ করত। আমার যতদূর অনুমান সব প্ল্যানটাই ঘনশ্যাম ও জগবন্ধু একত্র মিলে করেছিল। ইদানীং বাজারে ঘনশ্যামদাসের বেশ কিছু দেনা হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, ঘনশ্যাম আপনার কাছে বিনা সুদে হাজার পঞ্চান্ন টাকা দু মাসের জন্য ধার চেয়েছিল। শ্যামলাল-বাবু, আপনি টাকাটা দেননি, তাই না?"

"না, দিইনি।"

"সেই আক্রোশেই ও সন্দীপকে সরিয়েছিল, এবং ওর মতলব ছিল আপনার কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা বাগিয়ে নেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর, আমাকে আপনি ডাকলেন। সেদিন ঘনশ্যাম খোঁজ নিতে এসেছিল সকালে। আপনি কী করবেন ঠিক করেছেন, আর আপনি টাকা দেবেন কিনা জানতে। কিন্তু আমাকে দেখে সে কিছুটা ভড়কে গিয়েছিল। ব্যাপারটা বুঝেছিলাম সে আমাকে না-চেনার ভান করতে, কারণ ইতি-পূর্বেই ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছিল।"

"কী ব্যাপার?"

"একটা চোরাই মালের ব্যাপার। কিন্তু সেবার সে ফসকে পালায়, পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি।"

"বলেন কী?" শ্যামলাল বললেন।

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি ঘনশ্যামের চেহারাটা ভুলিনি, যদিও তখন সে অন্য বেশে ছিল। ঘনশ্যামের একটা মুদ্রাদোষ সে-সময় আমার চোখে পড়েছিল। আপনি শুনলে অবাক হবেন শ্যামলালবাবু, মিতুলবাবু কিন্তু আমাকে প্রথম দিনই বলেছিল সে কথা।"

"তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার যা পারিশ্রমিক আপনাকে তো দেবই মিঃ সেন, আপনার ছোট্ট সাকরেদকেও আলাদা একটা পাঁচশো টাকার চেক দেব, দেবেন তাকে।"

"তাকে নিয়ে আসব। আপনি নিজের হাতেই দেবেন শ্যামলালবাবু।"

"সেই ভাল, কালই নিয়ে আসুন না।"

গোয়েন্দাগিরি করে মিতুলবাবুর জীবনে সেই প্রথম পুরস্কার—পাঁচশো টাকা।

ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র

জরাসন্ধ নামের দৌলতে

সবদিক-ঘেরা কালো পুলিসভ্যান একদল কয়েদী নিয়ে জেলের সামনে এসে দাঁড়াল। এক পাশের ছোট গেটটা খুলে ধরল গেটকীপার। কয়েদীরা একজন-একজন করে ঢুকছে আর সে গুনতি করে-করে জোড়ায়-জোড়ায় বসাচ্ছে এক, দো, তিন, চার...।

এবার ভর্তির পালা। কোর্ট থেকে প্রত্যেকের জন্যে এক-খানা ওয়ারেণ্ট এসেছে। তার মধ্যে রয়েছে তার নাম, বাপের নাম, কী কেস-এ কত সাজা হল, কী করত বাইরে, এই সব। একজন জেল-অফিসার ওদের ডেকে-ডেকে সেগুলো মিলিয়ে নিচ্ছেন, আর ঐ ওয়ারেণ্টের পিঠে লিখে রাখছেন তার কাপড়-জামা জিনিসপত্রের লিস্টি। খালাস যাবার সময় ওগুলো তারা ফেরত পাবে।

তিন-চার জনের পর যার ডাক পড়ল, সে এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

কী নাম জিজ্ঞেস করতে বলল, মিস্টার জি এফ ডেভিড-সন। গায়ের রঙ এক সময়ে হয়তো ফর্সাই ছিল, এখন তামাটে, মাথা-জোড়া টাক, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরনে ময়লা পেণ্টু-লুন, হাঁটুর কাছটা ছেঁড়া, শার্টের পাশটায় তালি। তবে টাই আছে এবং সেটা গলা থেকে বেশ খানিকটা নেমে এসেছে। কালিঝুলি-মাখা হ্যাট, জুতোজোড়াও ছেঁড়া, এবং বহুদিন কালির মুখ দেখেনি।

কোন কেসএ জেল হল? জানতে চাইলেন জেল অফিসার।

ডেভিডসন উত্তর দেবার আগেই কয়েদীদের মধ্য থেকে কে বলে উঠল, পকেট মারা।

"নো," গর্জে উঠল ডেভিডসন, এবং ইংরেজীতে বলল, "আমি কখখনো পকেট মারিনি। পুলিস মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে। হাকিম আমার কথা না শুনেই জেল দিয়ে দিল।"

অকুপেশন কী, অর্থাৎ কী কাজ কর?

ডেভিডসন গম্ভীর ভাবে বলল, বিজনেস।

কয়েদীদের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠল। অফিসার তাদের একটা ধমক লাগালেন এবং ওয়ারেণ্টের সঙ্গে যে কাগজ থাকে, সেটা উলটে দেখলেন, লেখা আছে ভ্যাগাবণ্ড (ভবঘুরে)। একটু ভাল করে তাকালেন 'সাহেবে'র দিকে। মনে পড়ল চৌরঙ্গীর মোড়ের কাছে আলো থেকে কিছুটা দূরে একেই টুপি উলটে ভিক্ষা করতে দেখেছেন।

ডেভিডসন তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ নিচু ক্লাসের কয়েদী। মস্তবড় ব্যারাকে পাশাপাশি সাধারণ চোর-ডাকাত-পকেটমার-দের সঙ্গেই তাকে থাকতে দেওয়া হল। বিছানা বলতে শুধু দুটো কম্বল। আর পোশাক জেলে-বোনা ডোরাকাটা মোটা কাপড়ের জাঙিয়া, কুর্তা, গামছা আর টুপি। ডেভিডসন তার 'স্যুট' ছাড়তে রাজী নয়। কিন্তু কাপড়-গুদামের মেট (কয়েদী সর্দার) কড়া লোক। তার ধমক খেয়ে গজগজ করতে করতে ওগুলোই পরে নিল।

পরদিন সকালবেলার খাবার নিয়ে বাধল গণ্ডগোল। কয়েদীরা ব্যারাকের বারান্দায় লাইন করে বসেছে, সামনে একখানা করে অ্যালুমিনিয়াম থালা। একটা মস্ত বড় ডেক থেকে বড় এক হাতা লপসি পড়ছে তার উপর। লপসি আসলে খিচুড়ি, তাতে চালের ভাগ বেশী, ডালের ভাগ কম। লোহার ডেকচিতে রান্না হয় বলে চেহারাটা কালো।

ডেভিডসনের কাছে আসতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "নেহি খায়গা। ব্রেকফাস্ট লেয়াও।"

"সেটা কী জিনিস?" জানতে চাইল রান্নাঘরের মেট।

"ব্রেড, বাটার, ফ্রায়েড এগস অ্যান্ড টী।"

মেটটি বেশ রসিক। বলল, "বিলেতে অর্ডার গেছে, সাহেব। ততক্ষণ খেয়ে লাও।"

ডেভিডসন থালাটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

দুপুর বেলার খাবার এল মোটা চালের ভাত, ডাল, নানারকম সবজি ঘেঁটে লাবড়া-মতো একটা তরকারি আর তেঁতুলের চাটনি। সেটাও ছুঁল না ডেভিডসন। জানিয়ে দিল জেলে যে-সব সাহেব অর্থাৎ ইওরোপিয়ান কয়েদী আছে, তাদের মত লাঞ্চ চাই। সন্ধ্যাবেলায় ঐ খাবারই এল, শুধু ভাতের বদলে আটার রুটি। ডেভিডসন ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "ডিনার লেয়াও।"

তখন ইংরেজের আমল। জেলার ছিলেন লড়াই-ফেরত ইংরেজ। তাঁর কাছে রিপোর্ট গেল, একজন কয়েদী খাচ্ছে না। জেলের আইনে সেটা বড় অপরাধ। ডেভিডসনকে তাঁর কাছে হাজির করা হল। তিনি ওর পূর্বপুরুষের ইতিহাস শুনলেন। ওর ঠাকুরদা নাকি খাঁটি ইংরেজ ছিলেন। বিয়ে করেছিলেন এ দেশী মেয়ে। তার পর এখানেই থেকে গিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন এঞ্জিন ড্রাইভার। সে নিজে চাকরি বাকরির দিকে না-গিয়ে বিজনেস নিয়ে আছে।

কী বিজনেস সেটা আর বলল না। তবে জেলের পুরনো কয়েদীরা কেউ কেউ ওকে চিনত। তাদের উক্তি অন্যরকম। গোড়াতে ডেভিডসনের বিজনেস ছিল চুরি। ক্যানভাসার সেজে কোন বাড়িতে ঢুকেছিল। টেবিলের উপর থেকে একটা ঘড়ি সরাবার চেষ্টা করতেই ধরা পড়ে গেল। তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে পড়ে গেল নর্দমায়। সেখান থেকে পা ভেঙে হাসপাতাল। সেই থেকে খুঁড়িয়ে চলে। এখন তার পেশা হল কখনো ভিক্ষা, কখনো সুযোগ পেলে বাস-এ উঠে পকেট কাটা!

জেলার সাহেব বললেন, "তুমি কোর্টে একটা দরখাস্ত করো যে 'আমার পূর্ব পুরুষ খাঁটি ইংরেজ ছিলেন এবং আমি বিলিতী ধরনের খাওয়া-পরা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণী কয়েদীর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হোক।"

জেলে একদল লেখাপড়া জানা কয়েদী থাকে। তাদের নাম 'রাইটার', কাজ কয়েদীদের চিঠিপত্তর-দরখাস্ত লিখে দেওয়া। তারই একজনকে ডেকে পাঠালেন জেলার সাহেব। দরখাস্ত লেখা হল এবং 'জরুরী' ছাপ দিয়ে তখনই পাঠিয়ে দেওয়া হল। ঐদিনই সন্ধ্যাবেলায় ফেরত এল দরখাস্ত। প্রেসিডেনসি ম্যাজিসট্রেট তার উপরে মোটা লাল পেন্সিল দিয়ে নিজে হাতে লিখে দিয়েছেন—রিজেকটেড অর্থাৎ না-মঞ্জুর।

জেলার তখন ডেভিডসনকে নিয়ে গেলেন বড় সাহেব অর্থাৎ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে। তিনিও লড়াই-ফেরত। মিলিটারী মেডিক্যাল সারভিসে উঁচু পদে ছিলেন। লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল, আই এম এস। দেশী সাহেব। ইংরেজ জেলারের কথায় ওঠেন বসেন। তিনি আবার জেলের মেডিক্যাল অফিসারও বটে।

জেল আইনের কোন এক ধারায় তাঁকে ক্ষমতা দেওয়া আছে, তিনি যদি মনে করেন, জেলের সাধারণ কয়েদীকে যে খাবার-দাবার কাপড়-চোপড় দেওয়া হয় এবং যে-অবস্থার মধ্যে রাখা হয় সেটা কোনো কয়েদীর শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহলে তিনি তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারেন।

তখনই হুকুম হয়ে গেল। ডেভিডসনের জায়গা হল আলাদা সেল বা ছোট কামরায়, এল চেয়ার, টেবিল, গদিওয়ালা লোহার খাট, চাদর, বালিস। জাঙিয়া কুর্তার বদলে তাকে দেওয়া হল সাদা ড্রিলের প্যাণ্ট, টুইলের শার্ট, নতুন জুতো মোজা। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ইউরোপিয়ান বন্দীদের যে-সব খাবার দেওয়া হয়, তার জন্যেও সেগুলো মঞ্জুর হল। সেই ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, আফটারনুন টী আর ডিনার।

তারই ক্লাসের অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর নেটিভ কয়েদীরাই সে-সব বয়ে এনে পৌঁছে দিল তার ঘরে।

ডেভিডসনের বাপ-ঠাকুরদা তাদের এই বংশধরটির জন্যে কোনো সম্পত্তি রেখে যেতে পারেননি, শুধু দিয়ে গিয়েছিলেন একটা নাম। তারই জোরে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হয়েও গদি-আঁটা খাটে শুয়ে, নতুন তৈরী সাহেবী স্যুট পরে, ব্রেড-বাটার কোর্মা কারি চপ কাটলেট চিবিয়ে পুরো তিনটি মাস রাজার হালে কাটিয়ে দিল খোঁড়া পকেটমার জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ডেভিডসন।

ছবি এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত

ভ্যাঁপ্‌পো, ভ্যাঁপ্‌পো, ভ্যাঁপ্‌পো। তাক-তুড়া তির-তুড়া...

ঝম্‌ ঝমাঝম। বাজছে গড়ের বাদ্যি। লাইনবন্দী কুলিদের মাথায় ঢেউখেলানো গ্যাসের ঝাড়বাতি। বিয়ের মিছিল। গাড়ির পর গাড়ি। ফুলের ছড়াছড়ি। বর চলেছে ঘোড়ায়।

আর ঐ ছেলেটা? ড্রাম বাজাতে বাজাতে চলেছে? খালি পা। কিন্তু পরনে জরিদার মখমলের পোশাক। মাথায় রংচঙে জমকালো টুপি। ঠিক যেন রাজপুত্তুর। কে ও?

দাঁড়াও, মিছিলটা চলে যাক—বলছি।

রাজপুত্তুর না ছাই। থাকে ফুটপাথে। পোশাকটা ওর নিজের নয়। ব্যান্ড পার্টিতে যেদিন কাজ থাকে শুধু সেইদিন ঘণ্টাকয়েকের জন্যে পরতে পায়। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ আর মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে রোজ সকালে হোসপাইপে জল

ইয়াসিনের কলকাতা

দেবার শব্দে ধড়মড় করে ও যখন ফুটপাথ থেকে উঠে পড়ে, তখন ওকে তুমি দেখলে চিনতেই পারবে না। রুক্ষ চুল, ছেঁড়া উলিডুলি গেঞ্জি, ময়লাচিট জাঙিয়া, বুকের হাড়গুলো গোনা যায়।

ইয়াসিন ব'লে ডাকলে যদি সাড়া দেয়, তাহলে বুঝবে—হ্যাঁ, এই সেই বিয়ের মিছিলে ড্রাম-বাজানো রাজপুত্তুর। কিন্তু চুপিচুপি তোমাকে বলছি, ওটা ওর বাপের দেওয়া নাম নয়। ওর আদত নাম ফটিক কিংবা ঝড়ু। ব্যান্ড পার্টিতে ঢোকার জন্যে নিজের নামটাকে বদ্‌লে নিয়েছে। ও বুঝে নিয়েছে—শিউপুজনই বলো আর ইয়াসিনই বলো, ওসব নামেটামে কিছু আসে যায় না।

গ্রামে প্রাইমারি অব্দি পড়েছিল। তারপর বাপের মুদির দোকানে কাজ করতে করতে সৎমার অত্যাচারে বাড়ি থেকে পালায়। পুরুলিয়া থেকে রেলে বিনা টিকিটে সটান কলকাতায়। এখন কলকাতার ফুটপাথই ওর ঘরবাড়ি। রাস্তার লোকেরাই এখন ওর আপনজন।

গোড়ায় গোড়ায় গ্রামের জন্যে মন কেমন করত। কিন্তু আস্তে আস্তে কলকাতার শানবাঁধানো ফুটপাথ তার বুকেপিঠে যেন হাত বুলিয়ে হারানোর ব্যথা ভুলিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার রাত্তিরগুলোর কথা চোখ বুঁজেও এখন আর সে মনে করতে পারে না। সাপ আর শাঁখচুন্নির ভয়ে, মনে আছে, আগে তার গা ছমছম করত। আর সেই কোথা থেকে বাঁকে ক'রে তাকে

← রাস্তায় বাঁদর-নাচ

গাড়ি এখন জলের আয়নায় মুখ দেখছে

বয়ে আনতে হত জল। সেদিক থেকে শহরে এসে ইয়াসিন বেঁচেছে। আলাদীনের আলোয় রাতও এখানে প্রায় দিনেরই মত। আর কল খুললেই জল।

কলকাতাকে একটু জেনেবুঝে নিতে পারলে অনেক মুশকিলেরই আশান হয়। গরমে যখন রাস্তার পিচ গলে যায় তখন জানতে হয় কোথায় কোন্ গাড়িবারান্দার তলায় গেলে ছায়া পাওয়া যাবে। সন্ধেবেলা কোন্ গলির দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে হাওয়া বয়। শীতকালে কোন্ ফাঁকফোকর দিয়ে রোদ আসে, সন্ধেবেলা আগুন পোহানোর কাঠকুটো কোথায় গেলে জোটানো যায়। বর্ষাটা যত কষ্টেরই হোক, তার মধ্যেও মজা আছে। রাস্তায় থৈ থৈ করে জল। তাতে গা ডুবিয়ে ঝাঁপুই খেলা। কাগজের নৌকো ভাসানো। আর বিশ্বাস করো, দমকলের সামনের রাস্তা থেকে ইয়াসিন আর তার সংগীসাথীরা একবার জল ছেঁকে চুনোচানা মাছও বেশ কিছু ধরেছিল।

ইয়াসিন এ ক'বছরে কলকাতার এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো চষে বেড়িয়েছে। রাস্তা থেকে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে এ-শহরের যতটা যা দেখা যায় সবই সে দেখেছে। দুপাশে এই যে সব বড় বড় বাড়ি, তার ভেতরগুলো ঠিক কী রকমের সে জানে না। ফুটপাথে থাকে যেসব ছিঁচকে চোর, যারা পাইপ বেয়ে ওপরে ওঠে—তাদের কাছে কিছু-কিছু যা শুনেছে তাতে সত্যি তাজ্জব হওয়ারই কথা। বড় বড় লোকের বাড়ির মেঝেগুলো নাকি এমন যে তাতে আয়নার মত মুখ দেখা যায়। আর আছে কত রকমের সব কল। কোনোটাতে ঘর ঠাণ্ডা হয়, কোনোটাতে গান বাজানো হয়, কোনোটা কাপড় কাচে কিংবা ঘর ঝাঁট দেয় কিংবা মশলা পেষে, কোনোটাতে ভিজে চুল শুকিয়ে নেয়, গা দলাইমালাই করে কিংবা খাবারদাবার বাসি ক'রে রাখলেও টকে যায় না। ইয়াসিন ভাবে, ওরা হয়ত চাল মারার জন্যে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলে।

ভেতরে যাওয়ার চেয়েও ইয়াসিনের বেশি লোভ উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর ছাদে ওঠার। ওর খুব ইচ্ছে করে খুব উঁচু থেকে তলাকার রাস্তাঘাট মানুষজন দেখতে। নিশ্চয় খুব খুদে খুদে দেখায়। মোটাসোটা যে পাহারাওলাটা মাঝে মাঝে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে, তাকে ইয়াসিন উঁচু বাড়ির ছাদের ওপর থেকে একবার দেখতে চায়। ওকে নিশ্চয় একটা পিঁপড়ের মত দেখাবে।

ইয়াসিন সেইসংগে খোলামেলা আকাশটাকে একটু দেখবে। কলকাতার এই একটাই দোষ। কিছুতেই পুরো আকাশটাকে দেখতে দেয় না। সত্যি বলতে কী, চোখের বার হয়ে গিয়ে আকাশ যেন এখন তার মনেরও বার হয়ে যাচ্ছে। এখন রাস্তায় ঘুড়ি কেটে এসে পড়লে তখন তার আকাশের কথা মনে পড়ে। একবার একটা ডাস্টবিনের কাছে সে দেখেছিল একটা মরা কোকিল মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দেখে তক্ষুনি আকাশের কথা তার মনে পড়ে গিয়েছিল। তার চেয়েও বেশি মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল একবার একটা গলির খোদলে তার ঠিক পায়ের কাছে ময়লা জলের মধ্যে মেঘসুদ্ধ এক টুকরো আকাশকে পড়ে থাকতে দেখে।

থাকতে-থাকতে কলকাতাকে ইয়াসিন অসম্ভব ভালবেসে ফেলেছে। হাতে আকাশের চাঁদ দিতে চাইলেও এ-শহর ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে সে থাকতে চাইবে না।

এ-শহরে কাজের জন্যে যখন সে হন্যে হয়ে ঘুরেছে, কাজ না পেয়ে যখন খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখছে, তখন তার হাতে খাবারের ঠোঙা গুঁজে দিয়েছে ছোট মিষ্টির দোকানের কোনো মালিক। ছা-পোষা গেরস্থ, ছোট হোটেল রেস্টুরেন্ট চালায় এমন কেউ তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে রুটিতরকারি খাইয়েছে।

এ-শহরে গুণ্ডাবদমাশ, ঠকজোচ্চোর চোর-পকেটমারের অভাব নেই। এর সংগে যদি পরগাছা হিসেবে ভিক্ষুকদের ধরা হয়, তাহলেও এদের মোট সংখ্যা খুব বেশি হবে না।

এ শহরে ইয়াসিনের কম দিন হল না। দশ বছর তো বটেই।

ট্রেনে করে আসবার দিনটার কথা এখনও তার স্পষ্ট মনে আছে। দুপাশের সবুজ মাঠগুলো এক সময়ে ফট করে কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর পুরনো বাড়ি, এঁদো পুকুর, গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া-ছাড়া চিমনি এইসব দেখতে দেখতে ইয়াসিনের খুব ভয় করতে লাগল। কলকাতায় তো তার কেউ নেই। কোথায় থাকবে। কেই বা তাকে খেতে দেবে।

কিন্তু তার কপাল ভালো ছিল। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ার জন্যে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশ তাকে বাঁচিয়ে দিল। দু সপ্তাহের জন্যে তার আর খাওয়া-থাকার কোনো ভাবনা রইল না।

জেলে গিয়ে ইয়াসিন জেনেছে এই প্রকাণ্ড শহরের মধ্যেও আবার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দুটো একটা শহর আছে।

হ্যাঁ, শহরই তো। তার ভেতর গিজগিজ করছে লোক। রাস্তা আছে কিন্তু মাঝে মধ্যে মাল-বওয়া দুটো একটা লরি ছাড়া কোনো গাড়িঘোড়া চলে না। তাই ফুটপাথ নেই। সন্ধে হলে সবাইকে সুড় সুড় করে ঘরে ঢুকতে হয়। গরাদ-দেওয়া বড় বড় দরজায় তালা পড়ে। কাজেই ফুটপাথে থাকবে কে?

ভোর হলে শহরে যেমন লোকে কাজে যায়, জেলেও ঠিক তাই। জেলে আছে নানা রকমের কাজের জায়গা। কোথাও চলছে তাঁত, কোথাও পাকানো হচ্ছে দড়ি, কোথাও হচ্ছে বেতের, বাঁশের বা কাঠের কাজ। ছাপাখানাও আছে। আর আছে চৌকা, যেখানে রান্না হয়।

জেলে যারা থাকে, তারাও সাধারণ মানুষ। সবাই যে দোষ করে জেলে এসেছে এমন নয়। দোষী বলে সাব্যস্ত হয়নি এমন লোকদেরও জেলে রাখা হয়।

তবে থাকার মেয়াদ সকলের সমান নয়। বিনা টিকিটে রেলে চড়তে গিয়ে কিংবা লুকিয়ে চাল আনতে গিয়ে যারা ধরা পড়ে তারা কমদিন থাকে। খুনী, ডাকাত, দাগী চোর—এরা থাকে অনেক বেশিদিন।

পার্কে, বিকেলবেলা

জেলে থেকে ইয়াসিন জেনেছে, খুন করে কেউ সাজা খাটছে বলে এটা ভাবা ঠিক নয় যে খুন করাই তার স্বভাব। জেলের বেশিরভাগ খুনীই গ্রামের লোক। জমিজায়গা নিয়ে ঝগড়া হতে হতে হঠাৎ রাগের মাথায় কাউকে খুন করে ফেলেছে। পরে জীবনভোর তারা অ্যাপশোস করে।

খুব ছোটবেলা থেকেই ইয়াসিন দেখে এসেছে গাঁয়ের লোকদের একটু রাগ বেশি। লেখাপড়া জানা না-জানার সঙ্গে নিশ্চয় এর একটা সম্পর্ক আছে। লেখাপড়া বলতে শুধু পাশ-করা বিদ্যে নয়। তার মানে, চোখে যেটা দেখছি, কানে যেটা শুনছি শুধু সেইটুকু নয়—তার বাইরেও কী আছে না আছে, কী ঘটছে না-ঘটছে জানা। যে আমটা হাতে পাই না সেটা যেমন আঁকশি দিয়ে পাড়ি—লেখাপড়া ব্যাপারটাও তাই। জানবার আঁকশি।

এসব কথা ইয়াসিনের নিজের নয়। জেলে বসেই এই ধরনের কথা সে একজন বুড়ো কয়েদীর কাছ থেকে শুনেছিল। লোকটা ছিল খুব ধার্মিক। প্রথম জীবনে ছিল দুর্দান্ত ডাকাত। লোকটা একেবারে বদলে গেল জেলে এসে। লেখা-পড়া কিছুই জানত না। সব জেলে এসে নিজের চেষ্টায় শিখেছে।

বুড়ো বলত, কিসে শুধু নিজের ভালো হবে এ যারা ভাবে তাদের কান্ডাকান্ড জ্ঞান থাকে না। তাতে আখেরে হয় নিজেরই মন্দ।

ইয়াসিন জেলে যাদের দেখেছে তারা সবাই এ শহরের নয়। যারা পকেটমার, যারা গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট করে সাজা খাটছে—তারা অবশ্য সবাই কলকাতার। কিছু আছে তারা ওপরতলার লোক। কারো নোট জালের ব্যবসা, কেউ তহবিল তছরুপ করেছে, কেউ সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সরিয়েছে। জেলে গিয়েও তারা বেশ ভদ্দরলোক সেজেই থাকে। জেল আপিসে তাদের দেওয়া হয় লেখাপড়ার হালকা কাজ।

কয়েদী বুড়ো ইয়াসিনকে বলত, লেখাপড়াটা হল সিঁড়ি, এই সিঁড়ি বেয়ে তুমি যেমন অনেক ওপরে উঠতে পারো, তেমনি অনেক নীচেও নামতে পারো।

বলত, যারা ধরা পড়ে তারা সবাই দোষী নয়—যারা দোষী তারা সবাই ধরা পড়ে না।

জেল থেকে বেরিয়ে খুব আতান্তরে পড়েছিল ইয়াসিন। এই বিরাট শহর। সে এখন কোথায়ই বা যাবে?

মনে মনে ভাবল, ও তো আর কোথাও থাকে না, ওর হারিয়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই। কাজেই ওর পা দুটো যেদিকে নিয়ে যায় ও যেতে পারে।

সামনে ঘোলাজলের একটা খাল। সেটা পেরিয়ে দেখল ডানদিকের একটা রাস্তায় লোকের খুব ভিড়। ইয়াসিন-- তখনও কিন্তু তার নাম ইয়াসিন হয়নি—সেই রাস্তা ধরে এগোতে লাগল।

দুপাশে সারবন্দী দোকান। শাঁখা লোহা চুড়ি সিঁদুরের কৌটো। প্ল্যাস্টিকের রকমারি খেলনা। কাঠের বারকোষ। পাথরের খলনুড়ি। পেতলের কোশাকুশি। ফটো তোলার দোকান। ভাতের হোটেল আর মিষ্টির দোকান।

এখানেই যে কালীঘাটের মন্দির তা সে জানত না।

প্রথম একটা বছর এখানেই সে কাটিয়েছিল। মন্দিরের চত্বরে থাকবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পাঁঠাবলির জায়গায় চাপ চাপ রক্ত দেখে তার কী যে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলবার নয়। আর ঠিক সেই একই জিনিস তাকে বেশ কয়েক-বার দেখতে হয়েছে কলকাতার রাস্তায়।

কিন্তু ফুটপাথেরও যে আমার-তোমার আছে, ইয়াসিনের সেটা আগে জানা ছিল না। একজনের জায়গা রাত্তিরে যদি আরেকজন এসে বেদখল করে তাহলে রক্তারক্তি হয়ে যেতে পারে।

ইয়াসিনের কপাল ভালো, তাই হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল জেলখানার আলাপী এক পকেটমার ছোকরার সঙ্গে। ফুটপাথের একটা ধারে একফালি জায়গা পাইয়ে দিয়েছিল সে ইয়াসিনকে।

কালীঘাটের এই তল্লাটে কাঙালীদের ভিড় সবচেয়ে বেশি। যারা তীর্থযাত্রী, তাদের মধ্যে শাঁসালো লোকও থাকে। পয়সা আছে এটা আঁচ করতে পারলে ঠক জোচ্চোর আর পকেটমার

তাদের পিছু নেয়। যারা ভিক্ষে করে তাদের অত বাছাবাছি নেই। অত লোক দুটো-একটা করে দিলেও পয়সা নেহাত কম হয় না। আসল কথা হল, দেখলে যাতে লোকের দয়া হয়। যে যত পঙ্গু, যে যত রুগ্ণ তার আয় তত বেশি।

ওখানে থাকতে থাকতে ইয়াসিন জেনেছে, কলকাতায় ভিখিরিদের নিয়ে একদলের একটা বড় ব্যবসা আছে। নিজেরা তারা ভিখিরি নয়। দেখলেই মায়া হয় এই রকমের সব লোক নানা জায়গা থেকে ধরে ধরে এনে পেটভাতায় তাদের ভিক্ষের কাজে লাগায়। রাস্তায় রাস্তায় ভিখিরিদের বসানো আর তোলার জন্যে তাদের মাইনে করা লোক থাকে। আর এ থেকে তারা বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা কামায়।

কালীঘাটে যারা পুজো দিতে আসে তারা জানে যে, ভিখিরিকে পয়সা দিলে পুণ্য হয়। কাজেই কাউকে দেখে দয়া না-হলেও পুণ্যের লোভে তারা পয়সা দেয়। কাঙালীদের দিক থেকে এটাও একটা কম সুবিধের নয়।

মন্দির থেকে কেওড়াতলার শ্মশান খুব দূরের পথ নয়। বৃষ্টিবাদলার দিনে কোনো রাত্তির ইয়াসিন শ্মশানেও কাটিয়েছে।

এই জায়গাগুলোতে সাধুবাবাদের খুব কদর। সারাদিন তারা কিচ্ছু করে না। গাঁজায় দম দিয়ে বোম হয়ে শুধু বসে থাকে। মাঝে মাঝে সারা গায়ে খানিকটা করে ছাই মেখে নেয়। একেকজনের একেক রকমের ভড়ং। কেউ আছে কোনো কথা বলে না। লোকে তাকে মৌনীবাবা বলে খাতির করে। কেউ আছে সমানে কেবল হেঁয়ালি করে কথা বলে, মাঝে মাঝে অং বং আওড়ায়। শোক-পাওয়া দুঃখ-পাওয়া লোকজনেরা ভক্তিভরে তাদের ঘিরে বসে থাকে। সাধুবাবার পায়ের কাছে হাতের সব পয়সা ঢেলে দিয়ে যায়।

যারা সাধুবাবা হতে পারে না, তারা গণৎকার হয়ে বসে যায়। লোকে যা শুনতে চায় সেই কথাগুলো যে যেমন তাকে তেমন করে বলে।

ক'বছর আগে ইয়াসিন এক মৌনীবাবাকে দেখে চম্‌কে উঠেছিল—তার স্পষ্ট মনে আছে, লোকটাকে সে জেলখানায় কয়েদীর পোশাকে দেখেছিল।

যারা ভিক্ষে করে আর যারা সাধুবাবা হয় বা হাত দেখে, তাদের মধ্যে কী যে তফাত ইয়াসিন বুঝতে পারে না।

শ্মশানে রাত্তিরে যখন ফটো তোলে তখন ইয়াসিনের দেখতে খুব মজা লাগে। মশালের মত একটা জিনিস। তার মধ্যে কী যেন মশলা থাকে। সেটাতে একটু আগুন ছোঁয়ালেই ফস্ করে জ্বলে ওঠে। সেই আলোয় তক্ষুনি ফটো তোলা হয়ে যায়।

ইয়াসিনের শুধু মনে হয়, বেঁচে থাকতে কারো ফটো তুলে রাখার কথা কেন লোকে ভুলে যায়?

কালীঘাটের এক ফটোঅলার কাছে একবার সে কিছুদিন কাজ করেছিল। রাস্তা থেকে লোক ধরে আনা, সিনসিনারি

খাটানো। এই ছিল তার কাজ। মেলার মরশুম এসে যেতেই মালিক চলে গেল শহরের বাইরে। ইয়াসিনের কাজটাও চলে গেল।

বলতে গেলে কলকাতার সব ফুটপাথই ইয়াসিনের জানা। সে জানে কখন এবং কেন হঠাৎ-হঠাৎ কলকাতায় লোক বেড়ে যায়। বর্ষা একবার এলে হয়। যেখানে-যেখানে ইস্টিশান আছে তার ধারেকাছে ফুটপাথে আর পা পাতা যাবে না। গাঁয়ের গরিবেরা এই সময় কাজ পায় না। চালের দাম বাড়ে। তখন তারা শহরে ছোটে।

ইয়াসিন দেখেছে ফুটপাথে যারা থাকে, তাদের মধ্যে অর্ধেকের মত লোক চব্বিশ পরগনার। বাংলাদেশ থেকে যত না এসেছে তার তিনগুণেরও বেশি এসেছে বিহার থেকে। যারা চব্বিশ পরগনা থেকে এসেছে, তাদের যে-কোনো তিন-জনকে জিগ্যেস করলে দেখা যাবে হয়ত জয়নগরের লোক।

ফুটপাথে একেবারে একা থাকে এমন লোক দশ জনে একজন। ফুটপাথেই সংসার পেতে বসেছে এমন লোকই সংখ্যায় বেশি। রাস্তার মধ্যেই এরা যাহোক করে মাথা গোঁজার একটু জায়গা করে নেয়। পুলিশের হল্লা এসে ঝুপড়িগুলো ভেঙে দিলে দিন কতক পরে কাঠকুটো দিয়ে পাখির বাসার মত আবার একটা বানিয়ে নেয়। ফুটপাথেই এরা ইঁট সাজিয়ে উনুন করে ভাত ফুটিয়ে নেয়।

এরা রাস্তায় থাকে, কিন্তু ভিখিরি নয়। সকাল হলে সবাই কোনো-না-কোনো কাজে বেরিয়ে পড়ে। কেউ মোট বয়, কেউ রিকশা টানে, কেউ কাগজ কুড়োয়, কেউ ডাস্টবিন ঘেঁটে বেচবার মতন জিনিস খোঁজে, কেউ দিনমজুরি করে। টানা কাজ সকলের সব সময় থাকে না। মেয়েরা কেউ ঘুঁটে দেয়, কেউ করে গেরস্থবাড়িতে ঠিকে-কাজ, কেউ কাঠকুটো বেচে। কেউ ফুটপাথে বেচে বাজারের ঝড়তিপড়তি—তরিতরকারি মশলাপাতি।

ইয়াসিন গাঁয়ের এমন অনেক পরিবারকে দেখেছে, যারা অভাবের তাড়নায় এসেছে, আবার মাঠের ধান ওঠার সময় ফিরে গেছে। কখনই আর ফিরে যায়নি, শহরেই কোনো কাজ জুটিয়ে নিয়ে থেকে গেছে এমনও সে দেখেছে। শহর যে কীভাবে গ্রামের মানুষকে ধরে টান দিচ্ছে ইয়াসিন তা হাড়ে হাড়ে জানে।

আরেক দল আছে যারা মরশুমে আসে আবার মরশুম ফুরোলে চলে যায়। নানা রাজ্যের লোক তারা।

গঙ্গার ধারে গিয়ে ইয়াসিন দেখেছে সেখানে মাঝে-মাঝে তাঁবু করে থাকে একদল বেদে। কেন তাদের ইরানী বলা হয় তা সে জানে না। ওদের সঙ্গে থাকে একপাল কুকুরের বাচ্চা। কুকুর বেচে ওরা মোটা টাকা পায়।

ইয়াসিন কখনও-কখনও ময়দানে যায়। সেখানেও দেখা যাবে বেদের দল হাজির। তারা গাছগাছড়া শেকড়বাকড় আর রকমারি দাওয়াই সাজিয়ে বসে যায়। কেউ জ্যান্ত গোসাপ বেঁধে রেখে কড়াইতে তেল ফোটায়। সামনে ছড়িয়ে রাখে জন্তুজানোয়ারের খুলি হাড়গোড় দাঁত। সে-সব নাকি শক্ত-শক্ত অসুখের জবরদস্ত দাওয়াই। কেউ দাঁতের পোকা তোলে, কেউ কানের খোল বার করে।

আসে সাপুড়ে। বদ্যিগিরি তারাও করে। ঝাড়ফুক করে, শেকড় দেয়। বাত ভালো করে। এদের কেউ কেউ শহরের কাছেপিঠে আস্তানাও গাড়ে।

আসে বাজিকরের দল। অলিগলিতে খেলা দেখায়।

ইয়াসিন জানে এ-শহরের প্রচুর লোকেরই অসুখ হল একটা বাতিক। অবশ্য শরীর খারাপ হওয়ার কারণও আছে।

বেলুন কিনবে? আমার কাছে এসো
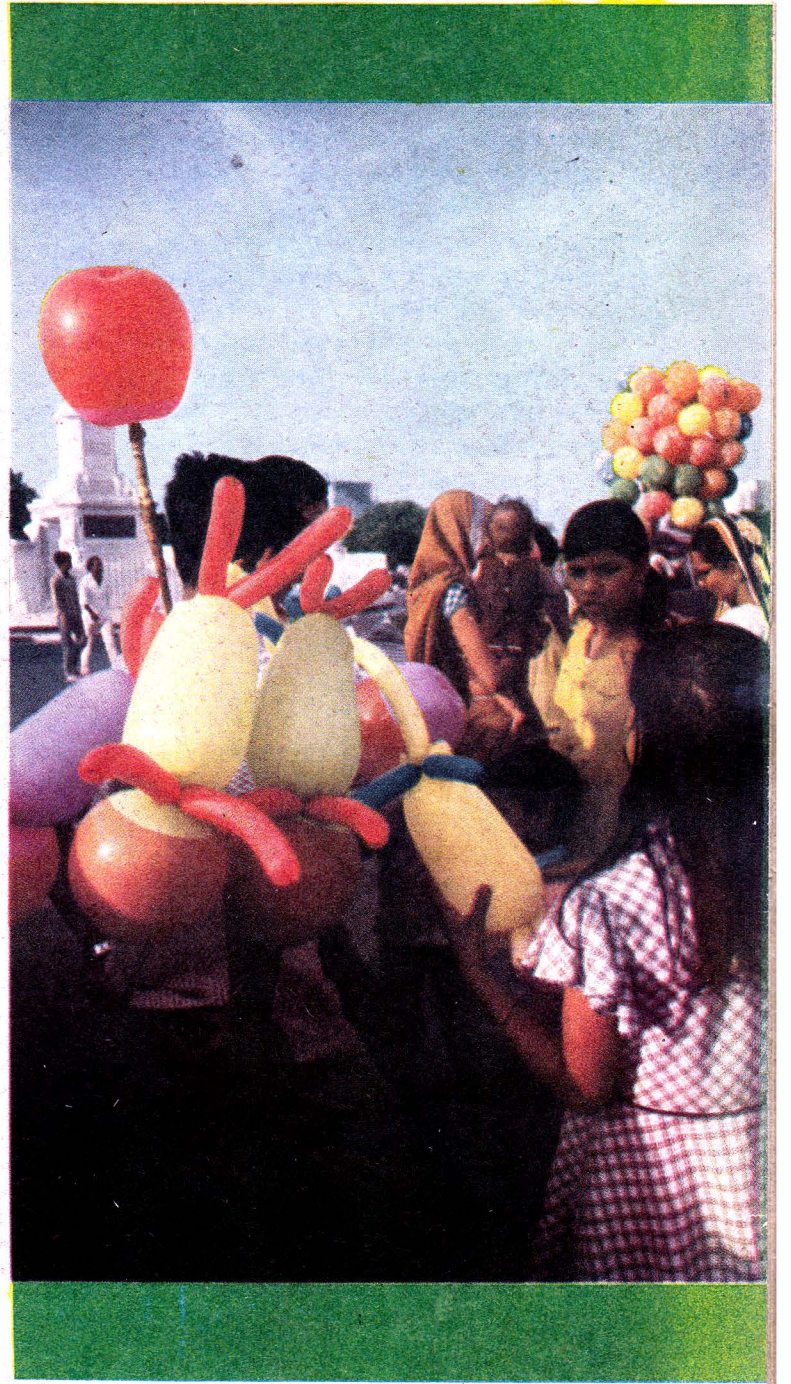
দূষিত জল, বদ্ধ হাওয়া—এসব তো আছেই। তার সঙ্গে আছে ধোঁয়া আর ধুলো। ডাক্তার হাসপাতাল ওষুধ, সব কিছুতেই তো গুচ্ছের খরচ। গরিব মানুষ তাই খোঁজে সস্তার ওষুধবিদ্যি। তাছাড়া সাধারণ সব লোকেরই বিশ্বাস তুকতাক আর মন্ত্রতন্ত্রে। কাজেই শহর জুড়ে এখন এদের বারোমাস পশার।

ইয়াসিন রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে দেখেছে—যেখানে ভেল্কি সেখানেই দাওয়াই, যেখানে দাওয়াই সেখানেই ভেল্কি।

ইয়াসিনের সব চেয়ে ভালো লাগে রবিবারের ময়দান। ডোরাকাটা পাজামা আর একটা রঙীন গেঞ্জি—তার শখের জিনিস বলতে এই দুটো। ভালো করে কেচে শুকিয়ে রবি-বারের জন্যে এ দুটো সে তুলে রাখে।

সারা শহরে ছড়িয়ে আছে তার যেসব বন্ধু, তারাও আসে ময়দানে। বিনা পয়সায় গরিবদের আনন্দ পাবার এই একটাই জায়গা।

যেদিকটাতে ওষুধ বেচে, ভেল্কি দেখায় সেদিকটাতে ইয়াসিন বড় একটা যায় না। তার টান যেদিকে ঢোলক বাজিয়ে গান হয় সেই দিকটাতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে তন্ময় হয়ে শোনে। কোথাও সুর করে পড়া হয় তুলসীদাসের রামায়ণ। কোথাও কেউ ছড়া কেটে কেটে আওড়ায় এ কালের কাহিনী। ধর্মের কাছে অধর্মের, ন্যায়ের কাছে অন্যায়ের, গরিবের কাছে বড়লোকের হেরে যাওয়ার মনগড়া গল্প।

কখনও কখনও রাস্তা পেরিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে বসে। বড় বড় পালোয়ানেরা এসে কুস্তি লড়ে। ভিক্টোরিয়ার কাছ বরাবর গেলে দেখা যায় বড় বড় লাটাই হাতে বাবুদের দুই ঘুড়ির প্যাঁচখেলা।

রবিবারে শহরটার চেহারাই আলাদা।

একেবারে ভোরের দিকটা অবশ্য সব দিনেরই মত। যাদের বসে কাজ, একটু বয়স হচ্ছে কিংবা ভুঁড়ি বেড়ে গেছে—তারা গড়ের মাঠে, লেকে কিংবা পার্কে হেঁটে বেড়ায়। যাদের ভুঁড়িগুলো একটু বেঢপ, তাঁদের হাঁটার রকম দেখলে ইয়াসিনের অনেক সময় হাসি পায়। অনেকে হাঁটবে বলে গাড়ি করে আসে।

একদল আরও হিসেবী। তারা বাবুঘাটে গিয়ে তেল দিয়ে ভালো করে আগে নিজেদের দলাইমলাই করে নেয়। তারপর বুক জলে দাঁড়িয়ে ডুব দেয়। তেল মালিশ করতে করতে পাশের লোকের সঙ্গে তারা অনেক সময় ব্যবসার কাজ গুছিয়ে নেয়। এদের সময়ের দাম আছে বলে সকালের স্নানের সঙ্গে স্বাস্থ্য, ব্যবসা আর পুন্যিকে মিলিয়ে দেয়। একই সঙ্গে ইহকাল আর পরকালের ব্যবস্থা করে।

ইয়াসিন সারা শহরে ঘুরে ঘুরে দেখেছে রবিবার হলে মুটে আর ঠেলাঅলাদের নতুন রকমের কাজ জোটে। নিলামের জায়গাগুলো থেকে কেনা জিনিস বাড়িতে পেঁাছে দেওয়া হয় মুটের মাথায়, নয় ঠেলাগাড়িতে।

আরও এক ব্যাপার আছে এ-শহরে। ভাড়াটেদের বাড়ি বদ্‌লানো। যারা পয়সাওয়ালা তারা ডাকে লরি। বাকিরা টেম্পো কিংবা ঠেলা।

ইয়াসিন দেখেছে কেউ কেউ বাড়ি বদ্‌লায় খুব হাসি-মুখে। কেউ কেউ খুব দুঃখ পায়। কাঁদেও। কার কেমন অবস্থা লরি বা ঠেলাগাড়ি দেখেই ইয়াসিন আঁচ করতে পারে। ঠাণ্ডাকল কিংবা যদি আলমারির মত কলের গান থাকে, তাহলে ধরেই নেওয়া যায় যে, ভাড়াটে হলেও তাদের অবস্থা ভালো। তাদের লরিতে মালপত্তর যা থাকে সবই হয় নতুন, নয় নতুনেরই মতন। খুব ছিমছামভাবে সাজানো।

ফ্ল্যাট। এই কথাটা ইয়াসিন তার রাস্তার বন্ধুদের কাছে শুনেছে। যাদের অবস্থার উন্নতি হয়, তারা ছোট থেকে আরও বড় ফ্ল্যাট কিংবা আরও ভালো পাড়ায় উঠে যায়। কেউ কেউ ভাড়াটে নাম ঘুচিয়ে বাড়িওয়ালা। তবে সে রকম ঘটনা এ শহরে খুব বেশি ঘটে না।

তবে ওপরে ওঠার চেয়ে ধাপে ধাপে নীচে নামার ব্যাপারটাই ইয়াসিন বেশি দেখেছে। তিনটে ঘর থেকে দুটো ঘর, দুটো থেকে একটা। বড় রাস্তা থেকে এঁদো গলি। পাকাবাড়ি থেকে বস্তি। আর তারপর বস্তি থেকে ফুটপাথ। বাড়ি বদলের এই হল মোটামুটি ধরন। ওঠবার উল্টো ধারাটাও সে দেখেছে। তবে খুব একটা চোখে পড়বার মতন নয়।

খালপাড়ে থাকতে ওয়াগন-ভাঙার দলে তার চেনা এক ছোকরা ছিল। ফুটপাথে থাকতেই তার শার্ট পাতলুন আর হাতঘড়ি হয়েছিল। ইলেকশনের পর তাকে আর ফুটপাথে দেখা যায়নি। সে নাকি এক লাফে উঠে গিয়েছে বেলেঘাটার কোন্ এক দু-কামরার ফ্ল্যাটে।

অবস্থাপন্ন লোকেরা যখন বাড়ি বদল করে ইয়াসিন তাদের লরিগুলোর দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে। লরির জিনিস-গুলো দেখে ও একটু আঁচ করতে চায় বড় বড় বাড়ির ঘরের ভেতরগুলো কী রকমের দেখতে হয়। কিন্তু লরিগুলোর তিন দিকেই কপাট ওঠানো থাকে। আশপাশের কোনো বাড়ির ওপরে উঠতে পারলে লরির ভেতরটা সে দেখতে পেত। ফুটপাথ থেকে শুধু লম্বা জিনিসের মাথাটুকু ছাড়া আর কিছুই তার নজরে আসে না।

সেদিক থেকে ঠেলাগাড়িগুলো একদম খোলামেলা। সব কিছুই দেখা যায়। ভাড়াটে গেরস্থরা বাড়ি বদলের সময় সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে যায়। দেয়ালে লাগানো আলনা, ক্যালেণ্ডার, ছেঁড়া জুতো, মাটির তোলা উনুন, রোঁয়া-খসা পাপোশ, পুরনো কেরোসিনের টিন, শিশিবোতল, পুরনো খবরের কাগজ, তুলসীর টব, জুতোর বাক্স। কিছুই ফেলে যায় না। তাছাড়া ভাঙা তক্তাপোষ, রং-চটা টিনের তোরঙ্গ, ফটো, বিছানা বালিশ, ছেঁড়া মাদুর—এসব তো আছেই।

যাবার সময় রিকশাতে ওঠার আগে পাড়ার মেয়েবউদের হাত ধরে কাঁদে। কতদিনের সব চেনাজানা। আর তাছাড়া বাড়ির কেউ-না-কেউ এখানেই মারা গেছে। এ যেন সেই না-থাকাদের ফেলে চলে যাওয়া। কাজেই কান্না পায়। যারা থেকে যায়, তারা ওদের নতুন বাড়ির ঠিকানা টুকে নেয়। এরা কথা দেয় যাব। ওরা কথা দেয় আসব। কিন্তু পরে কোনোদিন আসেও না, যায়ও না।

বাড়ি বদলের ভেতর দিয়ে কলকাতা শহরটা তার মানুষ-গুলোকে অনবরত চালাচালি করছে। এক জায়গায় কাউকে সে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।

ইয়াসিন নিজের কথা ভাবে। তাকেও তো ফুটপাথ কম বদল করতে হয়নি।

বাড়ি বলতে যেমন সবাই চায় বালিগঞ্জ, তেমনি ফুটপাথের বালিগঞ্জ হল নিউ মার্কেট। ফুটপাথে থাকার এত সুবিধে আর কোথাও নেই। জল বলো, আলো বলো, দরকারে অদরকারে মাঠঘাট—ফুটপাথের কাছে মজুত। এত সুবিধে আর কোথাও নেই।

বাজার আছে, হোটেল আছে। তার চেয়েও বড় কথা, ও রাস্তায় যারা যায় তাদের পয়সা আছে। ইয়াসিন এই এলাকায় ফুটপাথ বদল করার চেষ্টা কম করেনি। কিন্তু যারা কায়েমী হয়ে আছে, তারা তাকে ঘেঁষতে দেয়নি।

ফুটপাথ থাকলেই যে মানুষ থাকবে এমনও কোনো কথা নেই। আসলে হতে হবে জুতসই জায়গা। যেখানে আছে রোজগার করে বাঁচার সুবিধে। যেমন ইস্টিশান, বাজার। লোকের ভিড় আছে এমন চৌরাস্তা, খালপাড়, জেটি, শ্মশান, মন্দির—এই রকম সব বাছা বাছা জায়গা।

কলকাতা আড়েবহরে যত বাড়ছে, ফুটপাথের বাসিন্দারাও তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। যার যেমন কাজ তার তেমনি অঞ্চল।

ইয়াসিন এক সময়ে ছিল অরফ্যানগঞ্জ বাজার এলাকায়। খিদিরপুর ব্রিজের খুব কাছে। তখনও ইয়াসিনের নাম ইয়াসিন হয়নি। জেলে গিয়েছিল যে নাম নিয়ে, সেই নামেই চলছিল। তার জেলের নাম ছিল ফটিক। বাড়িতে তার বাবা ডাকত ঝড়ু বলে।

সে অরফ্যানগঞ্জে কাজ করত একটা মিষ্টির দোকানে। সেই সময় মাঝে মাঝে খুব ভয় পেত। যখন বাঘের ডাকে ঘুম ভেঙে যেত। দুপুরবেলায় হল্লাবাজ বাঁদরগুলো হুক্কু হুক্কু করে ডাকত। পঞ্চাশ পয়সার টিকিট কেটে চিড়িয়াখানায় একবারই সে গেছে। দেখে তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল জঙ্গল দেখবে। তা নয়, গিয়ে দেখে জন্তুজানোয়ারের জেলখানা।

মানুষ যে জেল থেকে পালায়, এ কথা সে জেলে গিয়ে শুনেছে। কিন্তু আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে বাঘ পালানোর সত্যিকার গল্প শুনেছিল সে একজন বুড়ো কসাইয়ের কাছ থেকে। তারও নিজের দেখা নয়। বাপের মুখে সে শুনেছিল। তার বাপ চিড়িয়াখানায় মাংসের জোগান দিত।

বুড়ো বলেছিল ঃ

"ঘড়িতে তখন ছ'টা। শীতের সন্ধে। হঠাৎ বাঘের ঘরের জমাদার ছুটতে ছুটতে টিকিটঘরে এসে খবর দিল—বাবু, সর্বনাশ হয়েছে! এক জোড়া বাঘ খাঁচা থেকে পালিয়েছে।

"শুনে সকলের তো মাথায় হাত। এক জোড়া বাঘ! খাঁচার বাইরে! তাহলে উপায়?

"তখন উপায় একটাই। রাতটুকু যেভাবে হোক একটু চোখে চোখে রাখা। যাতে চিড়িয়াখানার বাইরে যেতে না পারে। তারপর সকাল হলে একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে কোনো-রকমে তাড়িয়ে আবার ওদের খাঁচার মধ্যে পুরে ফেলা যায় কিনা।

"খাঁচা থেকে বাঘ বেরিয়েছে! তাও একটা হলেও কথা ছিল, একেবারে এক জোড়া! সে খবর শহরময় রাষ্ট্র হতে দেরি হল না। সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট হাটবাজার ফটাফট বন্ধ। রাস্তায় জনমনুষ্য রইল না। সবাই দরজাজানলা এঁটে আলো নিবিয়ে বাড়ির মধ্যে বসে থাকল।

"ততক্ষণে ফাঁড়ির বন্দুকধারী পুলিশে বাইরে থেকে গোটা বাগান ঘিরে ফেলেছে। বাঘ যাতে বাইরে না বেরোয় তার জন্যে সারা রাত তারা হল্লা করে বাগানটাকে চক্কর দিয়ে বেড়াল।

"বাঘ দুটো বেশ সজ্জন ছিল বলতে হবে। বেরোবার কোনো চেষ্টাই করেনি। এমন কী, ছাড়া হরিণগুলোকে হাতের কাছে পেয়েও কিছু বলেনি। আসলে খাঁচার বাইরে এসে ওরাও একে-বারে হকচকিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ওরা বেরিয়েছিল খাঁচার ভেতর ভরপেট খাওয়াদাওয়া সেরে। পেট ভরা থাকলে শিকারে ওদের তেমন গা থাকে না।

"আকাশে সেদিন ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। মাথায় ছোট বলে গাছগুলোরও তেমন ছায়া নেই। দরমার বেড়া-দেওয়া টিকিট ঘর। তার ভেতর চিড়িয়াখানার বড়কর্তা স্বয়ং ব'সে। তার পাশ দিয়ে বার দুয়েক টহল দিয়ে বাঘদুটো চলে গেল। তারপর রাত দুপুরে বার কয়েক হাই তুলে তারা শেষ পর্যন্ত একটা জায়গা দেখে শুয়ে পড়ল।

"ভোরবেলায় কলকাতা পুলিশের বড়সায়েব এলেন। তিনি দেখলেন ফাঁকতালে বাঘ শিকারের এই হল মওকা। কাজেই, কাছাকাছি একটা বাড়ির ছাদে উঠে নিরাপদে ঘুমন্ত বাঘ-দুটোকে তিনি গুলি ক'রে মারলেন। কলকাতা শহরে বাঘ শিকার সেই প্রথম। মরা বাঘদুটোকে দেখবার জন্যে শহর ভেঙে লোক এসেছিল।

"পরে জানা গেল, বাঘের ঘর সারানো হচ্ছিল ব'লে রাজ-মিস্ত্রি অন্দর মহলের খিড়কির দরজাটা খুলে রেখেছিল। জমাদার সেটা জানত না। বাঘদুটোকে রোজকার মত অন্দর মহলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাতেই এই বিপত্তি।"

ইয়াসিন এরপর চলে গিয়েছিল গার্ডেনরীচে। থাকত ফুট-পাথে। কাজ করত একটা চায়ের দোকানে। এইখানে সে শিখে-ছিল ডিশের ওপর উপুড় ক'রে আট-দশটা কাপ সামলেসুমলে নিয়ে যাওয়ার কায়দা। একটু ফাঁক পেলেই সে চলে যেত একে-বারে ডকের মধ্যে। মাঝনদীতে কিংবা ডাঙার ধারে বড় বড় জাহাজ সে কম দেখেনি। জাহাজের তল অব্দি দেখেছে শুখা ডকে। কিন্তু চলন্ত জাহাজ জীবনে সে মোটে একবারই দেখেছে।

আর সেই দেখতে পাওয়ার ফল তার পক্ষে খুব ভালো হয়নি।

একবার ডকের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে দুপুরের রোদে তার চোখদুটো ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছিল। একটা বড় জাহাজের পাশে নোঙর ক'রে রেখেছিল মাল-বওয়া একটা নৌকো। একটু ঘুমিয়ে নেবে বলে ছইয়ের ভেতরে সে ঢুকে পড়েছিল। যখন তার ঘুম ভাঙল, দেখে যার ওপর শুয়ে আছে সেটা বেজায় দুলছে। ভূমিকম্প নয় তো? বেরিয়ে এসে দেখে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর একটু দূরে দিয়ে সর্বাঙ্গে আলোর গয়না পরে ভোঁ বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছে একটা জাহাজ।

পরে অনেক কাকুতিমিনতি ক'রে রাজগঞ্জ থেকে পরদিন আরেক নৌকোয় নিজের জায়গায় ফিরে এল বটে, কিন্তু দোকানের মালিক তাকে মেরে সর্বাঙ্গ ফুলিয়ে দিল।

রাগ করে সেইদিনই কাজ ছেড়ে দিয়ে ইয়াসিন চলে গেল বেলেঘাটার ফুটপাথে। সেখানে কাজ পেল একটা রুটির দোকানে।

সেই সময় একদিন ট্যাংরায় গিয়ে ইয়াসিন অবাক। এ আবার কোন দেশ? বেশ কয়েকটা কাঠের বাড়ি। চীনেম্যানে ভর্তি। পায়ে পটি-দেওয়া কাঠের খড়ম, মুখের কাছে চীনে-মাটির বাটি তুলে দুটো কাঠি দিয়ে ভাত খায়। দরজার বাইরে ছবি আঁকার মত করে হিজিবিজি কী সব লেখা। কী বলে কিচ্ছু বোঝা যায় না।

ঘুরতে ঘুরতে যখন সন্ধে হয়-হয়, তখন বস্তির ধারে-একটা বেড়ার গায়ে তাকিয়ে সে চমকে উঠেছিল। লাইনবন্দী হয়ে বসে আছে শ'য়ে শ'য়ে শকুন আর শঙ্খচিল।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল পৌরসভার কোন এক শিল-মোহরে একবার যেন দেখেছিল শকুনির ছবি। পরে সে জিগ্যেস ক'রে তার কারণটা জেনেছিল। পৌরসভার সবচেয়ে বড় কাজ হল শহরটাকে পরিষ্কার রাখা। ময়লা সাফ করার ব্যাপারে জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে শেয়াল-শকুনিদেরই সবচেয়ে বেশি নামডাক। তাই পৌরসভা শকুনিকে তার প্রতীক হিসেবে নিয়েছে।

চায়ের দোকানে বয়ের কাজ করতে করতে কত লোকের সঙ্গে যে ইয়াসিনের জানাচেনা হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ আপিসের কেরানী, কেউ ইস্কুলের মাস্টার, কেউ স্টেট বাসের ড্রাইভার, কেউ ওষুধের দালাল, কেউ আঁকে থিয়েটারের সিনসিনারি।

ইয়াসিন যখন টালিগঞ্জের ঘড়িঘর এলাকায় থাকত, তখন পৌরসভার প্রাথমিক ইস্কুলের এক মাস্টারের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। তাঁর একটা পা ছিল কাঠের। ইংরেজ আমলে পুলিশের গুলি লাগায় চোট-খাওয়া পা-টা কেটে ফেলতে হয়। একা একটা ঘর নিয়ে তিনি থাকতেন। কাছেই এক বস্তিতে। ঘরে বিজলি ছিল না। গলির মধ্যে বাতি জ্বলত। ঘরে হারিকেন থাকলেও রাস্তার সেই আলোয় তিনি পড়তেন। মাঝে মাঝে ইস্কুল থেকে ঢোকার সময় ইয়াসিনকে ডেকে নিয়ে যেতেন।

চা-মুড়ি খাওয়াতেন আর অনেক গল্প বলতেন।

ইয়াসিনকে তিনি একটা ছোট নোট খাতা আর একটা ডট-কলম দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "যখন যা দেখবি লিখে রাখবি।"

ইয়াসিন সেই থেকে তার খাতায় সব কিছু টুকে রাখে।
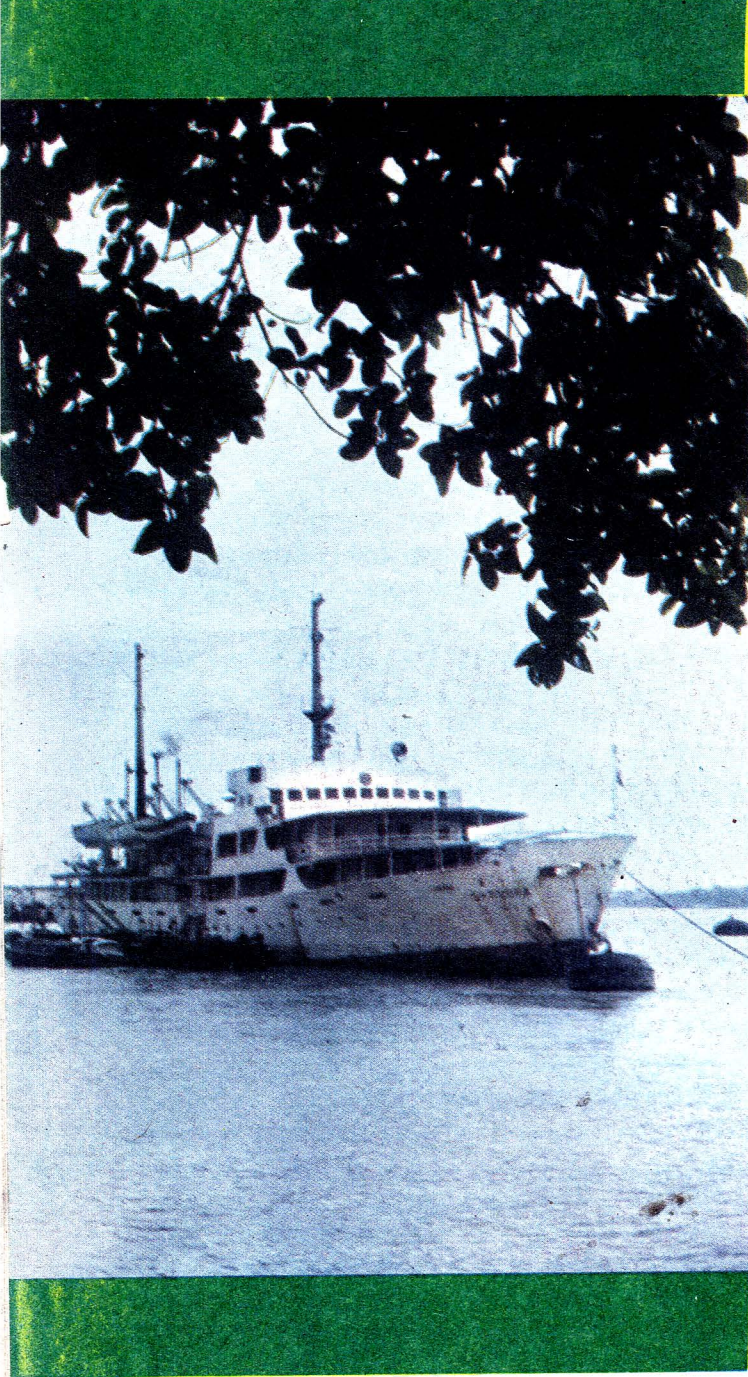
কলকাতার গঙ্গা

লেখালিখির এই কাজটা সে করে অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়ে। নইলে আশপাশের লোকে যে তাকে পুলিশের টিকটিকি ভাববে।

এই মাস্টারদাদুর কাছেই সে শুনেছে, কলকাতা শহরের পত্তন করেছিলেন এক ইংরেজ। তাঁর নাম জব চার্নক। গার্ডেন-রিচের ঘাটে এসে তাঁর নৌকো ভিড়েছিল। সে আজকের কথা নয়। ট্রামগাড়ি এ শহরে চলতে শুরু করে এক শো বছর আগে। গোড়ায় ছিল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। তার বছর তিরিশ পর মাথার ওপর তার টাঙিয়ে চলতে শুরু করল বিজলির ট্রাম। সে সব কবেকার কথা!

আগে এক সময়ে এই কলকাতাও গ্রাম ছিল। পাশে ছিল সুতানুটি আর গোবিন্দপুর। পরে এই তিন গ্রাম এক করে হল কলকাতা শহর। ছোটখাটো বন্দর আগেই ছিল। ইংরেজরা সেখানে নোঙর ফেলেছিল ব্যবসারই সূত্রে। তারও আগে এসেছিল পর্তুগীজরা।

যখন সরস্বতী নদী শুকিয়ে গিয়ে সপ্তগ্রামের বন্দর কানা হয়ে গেল, তখন বাংলার বণিক-সম্প্রদায় কলকাতামুখো হল। তাছাড়া বর্গীদের হাঙ্গামাও ছিল তাদের চলে আসার আরেকটা কারণ। সুবর্ণবণিকেরা করত মহাজনি কিংবা পোদ্দারি। ইংরেজ ব্যবসাদারদের সঙ্গে তাদের ছিল যোগ। পোদ্দারি আর মুৎ-সুদ্দিগিরি ক'রে তারা যে টাকা জমিয়েছিল, তার একটা অংশ তারা জাহাজী ব্যবসায়, নীল তৈরিতে আর চটশিল্পেও খাটিয়েছে। গন্ধবণিকদের ছিল মশলার কারবার। বেনেপুকুর, বেনেটোলা এই সব নাম থেকেই বোঝা যায় কোন কোন অঞ্চলে তারা প্রথম ডেরা বেঁধেছিল।

তাঁতীপাড়া, ছুতোরপাড়া, কাঁসারিপাড়া, জেলেপাড়া, মুচিপাড়া, যুগীপাড়া—নাম শুনেই বোঝা যায় কোন্ পেশার লোক কোথায় থাকত।

ভবানীপুরের কাঁসারিরা থালাবাসন তৈরি করত অনেক দিন আগে। যখন ঘোড়ার গাড়ির চল ছিল, তখন তারা ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করত। পরে লড়াইয়ের সময় মিলিটারির জামার বোতাম, ব্যাজ এ-সবও তৈরি করেছে। কেউ আবার কাঁসার কাজ ছেড়ে স্যাকরা বনে গেছে।

ধরাবাঁধা জাতব্যবসা ব'লে কলকাতায় এখন আর কিছু নেই।

নামের মধ্যে এখনও পুরনো দিনের অনেক খবর পাওয়া যায়। জায়গায় জায়গায় ছিল বাগান—হাতিবাগান, জোড়াবাগান, বেকবাগান। জায়গায় জায়গায় পুকুর—ফড়িয়াপুকুর, শ্যামপুকুর, মনোহরপুকুর। ছিল গাছ—তালতলা, নারকেলডাঙা, বটতলা, চাঁপাতলা, নেবুতলা। তাছাড়া হাটবাজার দিয়েও কত নাম। কত নাম ঠাকুরদেবতা দিয়ে।

ভারতে এমন কোনো রাজ্য নেই যেখানকার মানুষ কল-কাতায় নেই। ভাষাও আছে অগুনতি। শহর এলাকায় প্রতি দশজনের মধ্যে ছয় থেকে সাতজন বলে বাংলা। সিকিভাগ হিন্দী-উর্দু বলে। যত লোক ওড়িয়া বলে, তার ডবল লোক বলে উর্দু। যত লোক উর্দু বলে, তার তিন গুণেরও বেশি বলে হিন্দী। এই চার ভাষার লোকই কলকাতায় সংখ্যায় বেশি। ইংরেজী ছাড়া অ-ভারতীয় ভাষার মধ্যে চলে চীনা আর জার্মান। এদিকে যেমন আছে চীনেবাজার, ওদিকে তেমনি আছে আর্মানিটোলা।

জুতো তৈরি, দাঁত-তোলা, দাঁত-বাঁধানো আর কাঠের কাজে এ-শহরের চীনাদের খুব নাম। তেমনি নাম কিনেছে পাঞ্জাবীরা মোটরগাড়ি চালানো আর সারানোর কাজে। হালুইকর আর জলকলের মিস্ত্রিদের বেশির ভাগই ওড়িয়াভাষী। সুদের ব্যবসায় টাকা খাটায় কাবুলিওলার দল। হ্যাঁ, ময়দানে ইয়াসিন একবার ওদের নাচ দেখেছিল।

বাংলার বাইরে থেকে যারা এসেছে, তারা এককেটা এলাকায় কমবেশি ঝাঁক বেঁধে থাকে। যেমন, বড়বাজারে মারোয়াড়ী, তেমনি টেরিটি বাজার এলাকা আগে ছিল চীনাম্যানে ঠাসা। বছর প'য়তাল্লিশ আগেও চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে ছিল চীনাদের

আলাদা থিয়েটার। ক' বছর আগেও ছিল চীনা ভাষায় দৈনিক কাগজ।

তেমনি এখন দক্ষিণ কলকাতায় কোথাও পাঞ্জাবীরা, কোথাও গুজরাতীরা, কোথাও দক্ষিণ ভারতীয়রা যতটা পারে কাছা কাছি থেকে নিজেদের অঞ্চল গড়ে তুলছে।

এ-শহরের গুজরাতীদের হাতে কাপড়, কাঠ, তামাক আর বিড়িপাতার ব্যবসা। সিন্ধীরা কাপড় ছাড়াও সোনারুপো জহরত আর সেই সঙ্গে হুণ্ডির ব্যবসা করে। পাঞ্জাবীরা যন্ত্র-পাতি তৈরির সঙ্গে মজুর যোগানের ঠিকেদারি করে। দক্ষিণ ভারতীয়রা আপিসে-আপিসে হিসেব লেখে। নেপালীদের বেশ একটা বড় অংশ করে দরোয়ানির কাজ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কলকাতার বেশির ভাগ ইহুদী আর ফিরিঙ্গি এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ইহুদীরা গেছে ইজ-রাইলে আর ফিরিঙ্গিরা গেছে অস্ট্রেলিয়া আর ইংলণ্ডে। আর দেশ ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তানে গেছে বাঙালী-অবাঙালী অনেক মুসলমান।

কিন্তু যত লোক গেছে, তার চেয়ে অনেক বেশিগুণ লোক পূর্ব বাংলা থেকে সব কিছু হারিয়ে এসেছে।

মাস্টারদাদুর কাছে এই শহরের আরও অনেক গল্প সে শুনেছে। তখন তার নাম ছিল ফটিক।

ইয়াসিন হওয়ার পর একদিন মাস্টারদাদুর বস্তিতে গিয়ে দেখে তাঁর ঘরে অন্য এক ভাড়াটে। মাস্টারদাদু মারা যাওয়ায় তাঁর ঘর এখন নতুন ভাড়াটের দখলে।

অনেকদিন পর শ্মশানে গিয়ে ইয়াসিন সেদিন খুব কেঁদে-ছিল। সে কেঁদেছিল এক সঙ্গে দুজনের কথা মনে করে। তার বাবা আর মাস্টারদাদু। আর এই প্রথম বুঝল, তার মনের মধ্যে তার বাবার মুখটা এই দশ বছরে কী রকম ঝাপসা হয়ে গেছে।

মাস্টারদাদু মারা যাওয়ার পর থেকে ইয়াসিন তার নোট-খাতাটা কোনো সময় কাছ-ছাড়া করে না। তার কেন যেন মনে হয় মাস্টারদাদুর দেওয়া এই নোটখাতাটা একদিন খুব পয়মন্ত হবে।

ওর বন্ধুরা পয়সা হাতে পেলেই সিনেমায় যায়। ইয়াসিন বলে, আমার কাজ আছে। ব'লে সে চলে যায় কখনও ইস্টিশানে, কখনও হাসপাতালে, কখনও রাস্তার মোড়ে কিংবা অলি-গলিতে। মাস্টারদাদু বলেছিলেন, "বুঝলি ফটিক, ঘুরে ঘুরে দেখাটাও একটা কাজ। দেখে দেখে সব কিছু টুকে রাখবি।"

ফুটপাথের ওপর দাগ-দেওয়া চৌকো চৌকো ঘর। তার নোটখাতায় সেই ঘরের মাপ লেখা আছে। সে মেপে দেখেছে একটা ল্যাম্পোস্ট থেকে আরেকটা ল্যাম্পোস্ট মোটামুটি তিরিশ হাত তফাতে। ইয়াসিনের আন্দাজ, ছোটোয় বড়োয় মিলিয়ে এ শহরে আছে হাজার দুই রাস্তা। এ শহরের সমস্ত রাস্তা কেউ যদি মাত্র একবারও পাড়ি দিতে চায়, তাহলে রোজ তিন ঘণ্টা সমানে হাঁটলে তার সময় লাগবে দেড় মাস। ইয়াসিন ঘুরে ঘুরে দেখেছে তার গাঁয়ে-দেখা সব গাছ, সব পাখিই কলকাতার কোনো-না-কোনো রাস্তায় দেখা যায়।

যে রাস্তা দিয়ে অনেকবার গেছে, সে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে—আরে, এটা তো আগে দেখিনি।

যেসব জায়গায় আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি, বড়লোকের বাস— ইয়াসিন সেখানে রাস্তাঘাটে কুকুর-বেড়াল কম দেখতে পায়। কেননা, বড়লোকেরা নাকি বাড়তি ভাত-তরকারি ফেলে না। বরফের আলমারিতে রেখে দেয়। রাস্তায় এঁটোকাঁটা পড়ে না ব'লে কুকুর-বেড়ালেরও ভিড় হয় না। সেসব এলাকায় কাকও তেমন দেখা যায় না।

এমনি ক'রে ইয়াসিন এই শহরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। যত দেখে ততই সে অবাক হয়। আর কলকাতাকে ততই তার ভালো লাগে। কলকাতা দিনে-দিনে বদলাচ্ছে। ফুটপাথ ছোট হচ্ছে, তা হোক। ছোট রাস্তা দরাজ হচ্ছে। ভালো হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ফুটপাথের লোকগুলো যদি বেঁচে থাকার মত কাজ আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেত, তাহলে আরও ভালো হত। ইয়াসিন যদি এ শহরে কোনদিন থাকবার ঘর পায়, তাহলেও ফুটপাথে চিরদিন সে হাঁটবে। মাস্টারদাদু বলতেন, একদিন নাকি শহরের ভেতর থেকে গাড়িঘোড়া সব উঠে যাবে। তার বদলে তৈরি হবে শহর জুড়ে চলন্ত ফুটপাথ।

কলকাতা শহরকে ইয়াসিন চেনে শুধু চোখ দিয়ে নয়— সেই সঙ্গে শব্দ আর গন্ধ দিয়ে। সে জানে, কলকাতার প্রত্যেকটা জায়গাকেই গন্ধ আর শব্দ দিয়ে চেনা যায়। চোখ বেঁধে দিলেও সে ব'লে দিতে পারবে—ঠুকঠুক শব্দ, সোহাগার গন্ধ, ঢংঢং আওয়াজ, বাঁকে ক'রে বওয়া ছানার গন্ধ, ঝাঁকার ক্যাঁচকোঁচ আর মুটেদের ভারি পায়ের থপথপ, ফলের গন্ধ, ব্যাপারীদের হাঁক-ডাক, মাছ ধরার চারের গন্ধ : এ তাহলে বৌবাজার না হয়ে যায় না। স্টিমারের ভোঁ, চ্যালাকাঠ পোড়ানোর গন্ধ, দাউদাউ আগুনে ফট্‌ফটাস শব্দ, ধক্ ক'রে নাকে এসে লাগে গাঁজার গন্ধ, পাগ্‌লির ভাঙা গলার গান, খড়ের নৌকোর গন্ধ : এ তাহলে নিমতলা না হয়ে যায় না।

সারা শহর জুড়ে কোথাও বিশ্রী, কোথাও মিষ্টি কত যে গন্ধ। পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়ালে লজেঞ্চুসের মত মিষ্টি গন্ধ। যেখানে হাড্ডিকল, যেখানে ট্যানারি, সেখানে বাইরের লোকে নাকে কাপড় চাপা না দিয়ে পারে না। পুরনো পাড়া-গুলোতে চুনবালিখসা দেয়ালের সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। কখনও পাঁচফোড়নের গন্ধের সঙ্গে ছ্যাঁৎ ক'রে সাঁতলাবার শব্দ। বর্ষার মরশুমে সারা কলকাতা ভাজা ইলিশের গন্ধে ম' ম' করে। কোথাও কষানো হচ্ছে মাংস। কোথাও ফুটন্ত তেলে ফুলুরি-বেগুনি। কখনও ঘুঘুর ডাকের মত জাহাজের ভোঁ বাজে। কখনও ঝিঁঝিঁ ডাকার মত ইলেকট্রিক পাম্প চলার শব্দ। গরমের দিনে তেতে-ওঠা ফুটপাথে হোসপাইপের জল পড়লে সুন্দর একটা গন্ধ ছোটে। হাইড্রেন্টের জল ঝাঁঝরিতে ঝর্নার মত শব্দ ক'রে গড়িয়ে পড়ে।

দুপুরে গলির মধ্যে দু পাশের রেলিং থেকে মেলে-দেওয়া রংবেরং-এর শাড়িগুলো যখন হাওয়া লেগে পত্‌পত্ করতে থাকে, তখন চোখ বাঁধা থাকলে ইয়াসিন বলবে—এইখানে এক-বারের মতন আমার চোখের বাঁধন খুলে দাও। আমি দেখতে চাই রঙের নাচন।

কিংবা ধোবাখানার মাঠে দড়ির গায়ে ঝোলানো শুকোতে-দেওয়া জামাকাপড়গুলো যখন হাওয়ায় হাওয়ায় মানুষের মতই ফুলে ওঠে, ইয়াসিনের মনে হয় সেও এক আশ্চর্য দৃশ্য।

রাত্তিরে ফুটপাথে শুয়ে শুয়ে ইয়াসিন মাঝে মাঝে বিরাট একটা মিছিলের স্বপ্ন দেখে। কলকাতার ফুটপাথ আর বস্তির সমস্ত মানুষ চলেছে সেই মিছিলে। প্রত্যেকেরই পরনে ধবধবে পোশাক। তাদের কারো মুখে কোনো আতঙ্ক নেই, প্রত্যেকের হাতে পতাকার মত উঁচু ক'রে ধরা একটা ক'রে অধিকারপত্র— কাজের, বাসস্থানের, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের।

আর সেই মিছিলে ব্যাণ্ডপার্টি নিয়ে ইয়াসিন সকলের আগে আগে যেন ড্রাম বাজাতে বাজাতে চলেছে।

ছবি তুলেছেন : দেবীপ্রসাদ সিংহ
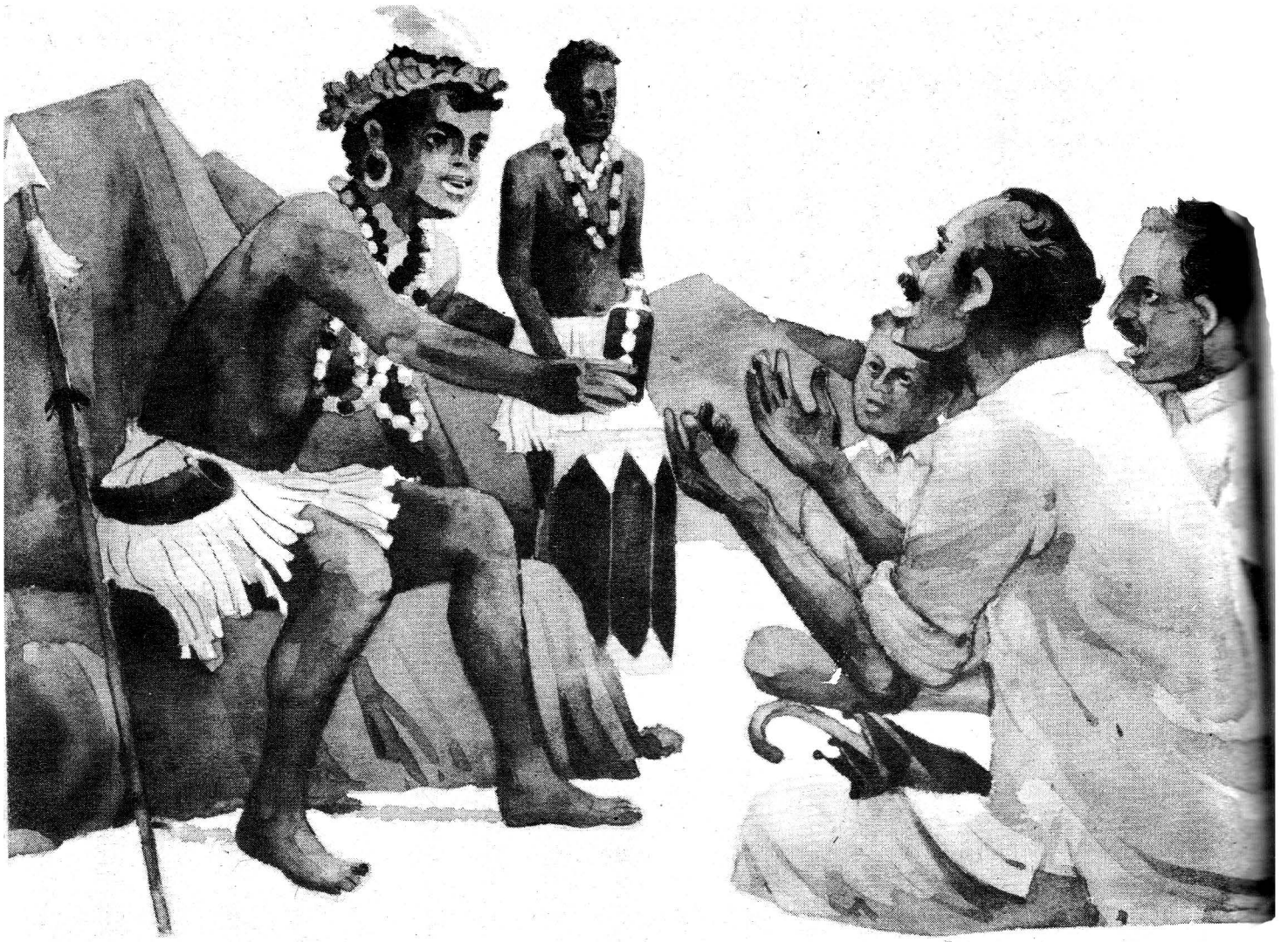
সাধু কালাচাঁদের ফলাও কারবার

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ক্লাস টেনের ছেলেরাও সাধু কালাচাঁদকে সমীহ করে চলে। তার কারণ অনেক। সে-কথায় পরে আসছি। ক্লাস সেভেনে ঢুকলে দেখা যাবে ডান দিকের ফিফথ বেঞ্চে সাধু কালাচাঁদ দেওয়ালের দিকে কোণে বসে আছে। সে কর্মকার না প্রামাণিক, ঘোষ না দত্ত—তা কারও মনে নেই। সবাই সাধু কালাচাঁদ বলেই ডাকে। একবার ওর মা বলেছিলেন, কালাচাঁদ আমার সাধু প্রকৃতির ছেলে। সেই থেকে ওর নামের আগে সাধু।

বড় ঘেরের হাফপ্যান্ট হাঁটুর মালাইচাকি পার হয়ে ঝুলছে। শার্টের গলার বোতাম আটকানো। পায়ে রবারের শু ফিতেবন্দী। দুই কনুইতে দু'টি পুরনো পাঁচড়া। কালাচাঁদ তাদের দেশের ভাষায় বলে 'পায়না'। চোখে একটু ঝিমুনির ভাব।

সারা ক্লাসের অনুরোধে থার্ড পিরিয়ডে সে সাত-আট বার বাঘ ডেকেছে। নতুন ভূগোল-স্যার ওঁত পেতে থেকেও ধরতে পারেননি। শেষ দিকে জি এন মণ্ডল—গোপীনাথ

মণ্ডল—শূন্যে বেত ঘুরিয়ে বলে গেছেন, "আমার যা কথা সেই কাজ। ওই বাইশ পাতাই উইকলি পরীক্ষার পড়া। আফরিকার জলবায়ু, নদ-নদী, ভূপরিচয়, বন্যপ্রাণী—যে-কোনো জায়গা থেকে কোশ্চেন আসবে। তারপর দেখছি বাঘ কোথায় যায়।"

নিষ্পাপ মুখ করে সাধু কালাচাঁদ আগাগোড়া বাঘ ডেকেছে। বলে না-দিলে তার ভাবভঙ্গী দেখে কেউ ধরতেই পারবে না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে—সব সময় অন্য কোন চিন্তায় সে ডুবে আছে। কিন্তু ওই মুখেই সে বাঘ ডাকে, কোকিল ডাকে, কাচ বা ব্লেড চিবিয়ে খায়। আবার দরকারমত যে-কোন স্যারের সই জাল করে যে-কোন ক্লাশের ছেলেকে হাফ-ছুটি দিয়ে দেয়।

সে নিজেই বলেছে, আর এক বছরের ভেতর হেড স্যারের সই জাল করে লেট ফি কিংবা ফাইনও মকুব করে দিতে পারবে। এখন ছুটির পর বাড়ি ফিরে সে রোজ তিরিশবার করে জড়িয়ে জড়িয়ে লেখে—নিবারণচরণ পাকড়াশি। ইংরিজিতে এন সি পাকড়াশি।

সারা স্কুলে এভাবে অসময়ের ছুটিছাটার মালিক হয়ে সে এখন নাইন-টেনের স্টুডেণ্টদের কাছেও খাতির পায়। দু পয়সা আসেও তাতে। ফি না-বলে কালাচাঁদ বলে ভিজিট। টেনের জন্যে হাফছুটি পিছু এক আধুলি। নাইনের বেলায় তিরিশ পয়সা। হিংসুটেরা বলে, সাধু কালাচাঁদের ফলাও কারবার।

কাছাকাছির ভেতর মডেল স্কুল, বি কে স্কুল থেকেও কল পায় কালাচাঁদ। ভিজিট নিয়ে দর-কষাকষি চলে। রফা হলে স্কুলের খাতায় একখানা আসল সই দেখে কালাচাঁদ হুবহু সই করে দেয়। ফাইন মকুব কিংবা ছুটি-ছাটার দরখাস্তে। কোন্ স্কুলের কেরানীই বা এসব সই যাচাই করার সময় পায়?

ভিজিটের পয়সায় সাধু কালাচাঁদের বাজারহাট ভালই হয়। এসব ব্যাপারকে সে বলে—কেস। অসুবিধায় পড়ে যারা আসে তাদের বলে—পেশেণ্ট। সময়টা ভালই যাচ্ছিল। ফি দিন টিফিনে কালাচাঁদ ঘুগনি খায়। স্কুলফেরত আইসক্রিম। কোন-দিন বা বাজারে জেমস কেবিনের পর্দাঢাকা কাঠের কুঠুরিতে বসে হাফ প্লেট ফাউলকারি সাঁটায়। স্কুলের শেষে হাফপ্যাণ্টের দু' পকেট ঝমঝম করে বাজিয়ে বাড়ি ফেরে।

নদীর ঘাট, ডাকবাংলোর মোড়, কাছারি পাড়া—সব জায়গায় মনোহারী দোকানদাররা রাস্তা দিয়ে সাধু কালাচাঁদকে যেতে দেখলে 'কালাচাঁদবাবু' বলে ডাকে। 'আসুন আসুন' বলে ধরে এনে বসায়। সাধু তাদের এটা-ওটার খদ্দের।

কালাচাঁদ নিজেও পঞ্জিকা দেখে মানি অর্ডার করে। কখনো অমৃতসর থেকে ঘড়ি আসে। লুধিয়ানা থেকে মাছ ধরার ছিপ। জম্মু থেকে ছুরি ভরে রাখার জন্যে ভেড়ার সিংয়ের খাপ।

এরকম পসারের পর কালাচাঁদ তো আর হেঁটে স্কুলে আসতে পারে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাইকেল রিকশায় ওঠে। আবার স্কুলের একটু আগে বাদামতলায় এসে নেমে পড়ে। শহরের সবচেয়ে নতুন সাইকেল-রিকশাখানা তার খুব পছন্দ। বেশ সাজানো-গোছানো। সেখানাই সে মাসকাবারি করে ফেলল। নিচু ক্লাসের ছেলেরা বলে, কালাচাঁদদার প্রাইভেট কার। ক্লাসফ্রেন্ডরা বেটাইমে সেই রিকশায় কালাচাঁদকে যেতে দেখলে বলে, সাধু কলে বেরোলো। নিশ্চয়ই কঠিন কেস।

তা দু-একটা এখন-তখন রুগীকে হাতে নিতে হয় তার। বিশেষ করে শীতকালে। জানুয়ারি মাসে। একখানা আসল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট সামনে রেখে সে যে-কোনো স্কুলের হেড স্যারের সইসুদ্ধ নিজ দায়িত্বে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেয়। ভিজিট পুরো পাঁচ টাকা।

গত জানুয়ারিতে মডেলের ক্লাস এইটের বিষ্টু আটশোর ভেতর মোট বারো পেয়ে সাধু কালাচাঁদকে কল দিল। দু'দিন পরামর্শের পর পুরো ভিজিট নিয়ে কালাচাঁদ ট্রান্সফার সার্টি-ফিকেট দিল। পাঁচ মাইল দূরে পল্লীমঙ্গল স্কুলে গিয়ে বিষ্টু নাইনে অ্যাডমিশন পেল। প্রোগ্রেস রিপোর্টে ভাল-ভাল নম্বর। সাধু কালাচাঁদের হাতের কাজ।

কালাচাঁদ'স ওন সলিউশন। কেরোসিন সহযোগে আমরুলি পাতা। খেতে টকটক। যে-কোন শ্যাওলাধরা পুরনো দেওয়ালে ইটের ফাঁকে গজায়। ভালো করে হাতের চেটোয় ডলে নিয়ে তাতে দু ফোঁটা কেরোসিন ঢেলে নিল কালাচাঁদ। তারপর সেই মিকশ্চার দিয়ে পাকা হাতে প্রোগ্রেস রিপোর্টের নম্বরগুলো তুলে ফেলে নতুন নতুন নম্বর বসিয়ে দিল।

একগাদা খুচরো পেশেণ্টের চেয়ে এখন দু' চারটে কঠিন কেস অনেক লাভের। সেরকম রুগী এলে কালাচাঁদ উদাস মুখে বলে, হসপিটালে যাও। কিংবা বলে, চেমবারে যাও। কড়কড়ে পাঁচ টাকার নোট দেখলে হিংসুটেদের চোখ টাটায়। তাই বুদ্ধি করে কালাচাঁদ তাদের নিজের বাড়ির বারান্দায় যেতে বলে। অনেকটা চেমবারের মতই। চাটাই বেড়া দিয়ে ঘেরা বারান্দায় সাধুর পড়াশুনোর ঘর।

চেমবারের প্র্যাকটিস বেড়ে যাওয়ায় কালাচাঁদ একদিন ঘোষণা করল, "আর ভাই প্রাইভেট প্র্যাকটিস পোষাচ্ছে না। মাথার কাজ। চাপ পড়ে ভীষণ। যার যা কেস তা নিয়ে হস-পিটালে গেলে পারো।"

ক্লাসে বসে যেসব জালিয়াতি করতে হয় তার নাম দিয়েছে প্রাইভেট প্র্যাকটিস। আসলে সবার সামনে নিতে হয় বলে ভিজিট সামান্য। তাই কালাচাঁদ ইণ্টারেস্ট পায় না। ষণ্ডামার্কা বিশ্বনাথ আবার ভিজিটের ভাগ চায়।

এসব পেশেণ্ট অত ভিজিট দেবে কোত্থেকে। তাই চেম্বার বা হসপিটাল তাদের দু চোখের বিষ।

তবু চেম্বারেই ভিড় বাড়তে লাগল। আশপাশ ধরে ছোট বড় আটটা স্কুল। রুগীর অভাব হওয়ার কথা নয়। খুব সিরিয়াস কেসে সাধু তার নিজের প্রাইভেট কারে পেশেণ্ট দেখতে যায়। এমনিতে সকাল-বিকেল পেশেণ্ট লেগেই আছে। নদীর ওপারের বেলফুলিয়া হাইস্কুল থেকেও পেশেণ্ট আসছে। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের পেশেণ্টরা আর তার দেখা পায় না। পেলেও মন পায় না। সাধু দায়সারা গোছের দেখে। একটা হাফ ছুটির কেস তো গুবলেটই হয়ে গেল। ধরা পড়ে পেশেণ্ট মার খেয়েও ডাক্তারের নাম কবুল করেনি। সাধুর লাক্।

চেম্বারের রুগীরা ভিজিট ছাড়াও ভেট দেয়। ডট পেন, ডাইরি, চকোলেট বার। প্রাইভেট প্র্যাক্টিসে সেসব কিছুই নেই। তবু এই প্র্যাকটিস থেকেই তো তার নাম ছড়ায়। এর থেকেই তো তার আজকের এই পসার। নামডাক। সাধারণ রুগীদের তাই অভিযোগ।

নিয়তির পরিহাস। সাধু আজ দু বছর ক্লাশ সেভেনেই আছে। তার হাত দিয়ে কত রুগী তরে গেল। নিজে তরেনি। কারণ সাধারণ। সই জিনিসটা দু ইঞ্চি লম্বা। সেটা সামলানো যায়। কিন্তু লিখিত পরীক্ষার আনসার তো অনেকখানি। সেসব সাধু সামলায় কী করে। পড়াশুনো জিনিসটা একেই বিচ্ছিরি। তারপর এই পসার হওয়ায় কালাচাঁদ ওদিকে বিশেষ মন দিতে পারেনি। সাধুর সে-জন্যে কোন আফশোস নেই।

কালাচাঁদ প্রিয় পেশেণ্টদের নিয়ে জেমস কেবিনে মাটন কবিরাজি খাচ্ছিল। পেশেণ্টরাই খাওয়াচ্ছিল। সাধু খেতে-

ছুটিতে বেড়ানোর পয়সা বাঁচাতে আমাদের এক বছর লেগেছিল

আর সে পয়সা খোয়াতে লেগেছিল মাত্র এক মিনিট!

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে! ছুটির খরচের টাকা ট্র্যাভ্লার্স চেকে বদলে নেবার জন্যে তখনই আমার ওঁকে জোর করা উচিত ছিল। বলেও ছিলাম, কিন্তু ওঁর ধারনা আমি বড় বেশী সাবধানী, তাই আর জোর করিনি।

তারপর যা হবার তাই হল···ছুটির প্রথম দিনেই আমার স্বামীর পকেট মারা গেল, সেইসঙ্গে আমাদের ছুটির খরচের পুরো টাকাও!

এবছর আমরা 'পয়সা ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টী' সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি!

হ্যাঁ, **স্টেট ব্যাঙ্ক ট্র্যাভ্লার্স চেক**! হারালে, চুরি গেলে বা নষ্ট হলে, আপনি আপনার টাকা ফেরত পাবেন। পুরো টাকা!

● এই সুবিধে, সারা দেশময় ছড়ানো স্টেট ব্যাঙ্কের ৫,৬০০টি শাখা ও তার সহযোগীদের কাছে পাওয়া যায়।

● ২০,০০০টি সুবিধেজনক জায়গায়—যেমন, হোটেল, দোকান, রেস্টুরেণ্ট, এয়ারলাইন অফিস, প্রধান প্রধান রেলস্টেশন এবং স্টেট ব্যাঙ্কের সকল অফিস ও সহযোগীদের অফিসে, স্টেট ব্যাঙ্ক ট্র্যাভলার্স চেক গ্রাহ্য।

● এর জন্যে কোনো কমিশন লাগে না।

● কেবল আপনি প্রতিস্বাক্ষর করলে অর্থাৎ আবার একবার সই করলে এ চেক ভাঙানো যায়—সুতরাং একমাত্র আপনিই এর টাকা পেতে পারেন।

● যত দিনে চান ব্যবহার করতে পারেন—এ বিষয়ে কোনো সময়-সীমা নেই।

৫০ টাঃ, ১০০ টাঃ আর ৫০০ টাকার ট্র্যাভ্লার্স চেক পাওয়া যায়।
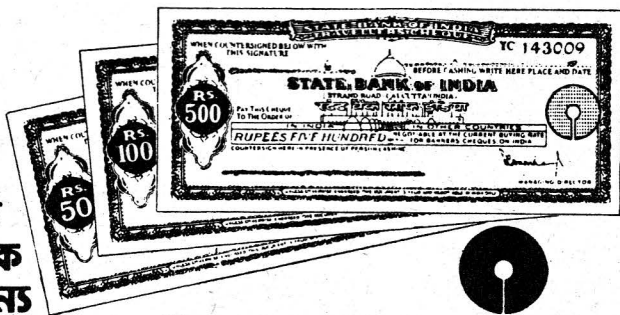
স্টেট ব্যাঙ্ক ট্র্যাভ্লার্স চেক আপনার জন্যে 'পয়সা ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টী'

স্টেট ব্যাঙ্ক

SBI-14-203

খেতে হাফিয়ে উঠল। ভারিক্কি আরামী চালে বলল, "আমার আর পড়াশুনোটা হল না রে।"

মডেল স্কুলের সিক্সের সতীনাথ তার এখন খুব ন্যাওটা। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। অনেকে খাতির করে সতীনাথকে বলে কম্পাউণ্ডারবাবু। কারণ সতীনাথ নিজেই শুধু কালাচাঁদকে একা পেলে ডাক্তারবাবু বলে ডাকে। সে-কথা চাউর হয়ে যায়। সাধুরও আসকারা ছিল তাতে। সতীনাথ হাসি-হাসি মুখে বলল, "ডাক্তার তোমার চেম্বারের ঝক্কি আগে সামলাও। তারপর ওই এলেবেলে পড়াশুনো আপনাআপনিই হয়ে যাবে।"

লেখাপড়া করে যেই!

গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই !!

সাধুর এই শ্লোকে শোক মেশানো ছিল। তার ক্লাস-ফ্রেণ্ডরা এখন উঁচুতে উঠে অন্য ঘরে বসে। সতীনাথ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "যেজন্যে লেখা-পড়া তার আর বাকি কী! তুমি তো গাড়ি-ঘোড়া চড়েই থাক।"

"তা যা বলেছিস!"

সেদিন সন্ধেবেলা কালাচাঁদের বাবা অঘোরবাবু আগে কাটা কার্তিকরাঙী ধান বোঝাই দিয়ে নৌকো করে আবাদ থেকে ফিরলেন। ভুলো মানুষ। মনটা খুশী - খুশী ছিল। খেতে বসে ছেলেকে বললেন, "কোন ক্লাসে পড়িস?"

"সেভেনে।"

কেমন খটকা লাগল। "গতবারও ধান নিয়ে ফিরে শুনে-ছিলাম, সেভেন। এবারও সেভেন? কী ব্যাপার?"

সাধুর মা পরিবেশন করছিলেন। বললেন, "আজকালকার মাস্টার-মশাই সব আগের মত তেমন কি আছেন। সব পাশ টেনে চলেন। কালাচাঁদকে দেখবার তো কেউ নেই। তাই আর উঠতে পারেনি।"

"তোমায় সেই কথা বুঝিয়েছে বুঝি!"

অঘোরবাবু গম্ভীর হয়ে খাওয়া শেষ করলেন। তারপর হাত মুখ ধুয়ে কালাচাঁদকে প্রশ্ন করে করে সব জেনে তো তাঁর চক্ষুঃস্থির। এক বছর নয়, অনেকদিন হল কালাচাঁদ ক্লাশ সেভেনে।

সাধুর চেমবারে ঢুকে তিন শিশি সলিউশন পেলেন। গন্ধ শুঁকে কিছু বুঝতে না পেরে অন্ধকার মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর একখানা খাতা খুলে দেখেন—অসংখ্য সই।

আধঘণ্টা মেরেও কালাচাঁদের মুখ থেকে কিছু বের করতে পারলেন না। কালাচাঁদ মার খায় আর সলিউশনের জন্যে মনে-মনে হায়-হায় করে ওঠে। গাদা-গাদা গার্জেন আর ক্লাশ টিচারের নমুনা সই-সুদ্ধ খাতাখানাও অঘোরবাবু ছিঁড়ে কুটি কুটি করলেন। কালাচাঁদ চোখ মোছে আর ভাবে—গেল! গেল!! এতবড় পসারটা মাঠে মারা গেল। বাবা যদি কিছু বোঝে।

"উইকলি পরীক্ষা কবে?"

"শুক্রবার।"

"কী পরীক্ষা?"

"ভুগোল।"

"বই নিয়ে আয়। কতদূর পড়া দেখি। মাঝে তো দুটো দিন মোটে—"

দেখাল কালাচাঁদ। বইখানা কালাচাঁদের হাতে দিয়ে বললেন, "আজ সারারাত ধরে এই বাইশ পাতা মুখস্থ করবে। ঘুমোবে না। কাল সকালে পড়া ধরব।"

কালাচাঁদ পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে সারা পাড়া ঘুমিয়ে পড়ল। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে সবজির গরুর গাড়ি যায় ক্যাঁচ কোচ। দুচাকার মাঝে নীচের হেরিকেনটা হটাং ঘটাং দুলছে।

টেবিল থেকে উঠে কালাচাঁদ অন্ধকার মাঠে নামল। হাতড়াতে হাতড়াতে দুটো ফাঁকা শিশি পেল। তিন নম্বরটা যে কোথায় পড়ে আছে অন্ধকারে। নমুনা-সইয়ের খাতার পেছনের আধখানা পেল মাঠের শেষে একদম রাস্তার গায়ে।

সবকিছু তুলে এনে টেবিলে রাখল সাধু। দু' শিশির কোনোটাতেই সলিউশনের ছিটেফোঁটাও নেই। ছেঁড়া খাতার শেষ বারো পাতায় পল্লীমঙ্গল, মডেল আর বি-কে স্কুলের ক্লাশ টিচারদের, কিছু গার্জেনের সই আস্ত পাওয়া গেল। অথচ এই খাতা আগে গার্জেনদের সইয়ে গিজ গিজ করত।

খাতার অবস্থা দেখে কালাচাঁদের চোখে জল এসে গেল। বাবা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশুতি রাত। খাতার পাশেই ভূগোল বই। আফরিকার নদ-নদী চ্যাপ্টারে লাল কালির দাগ। সেখানে কালাচাঁদের চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে মিশে গেল। কালাচাঁদ জানে পরের চ্যাপ্টারে আফরিকার পর্বতমালা। কিলিমানজারো না কীসব পর্বতের নাম। তার পায়ের কাছে মরুভূমি।

ডান হাতে মাথা রেখে খাতার ওপরেই সাধু ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে দেখে তাজ্জব ব্যাপার। বিশ্বাসই হতে চায় না। এ সে কোথায় এসেছে।

উঁচু মালভূমি-মত জায়গায় পাহাড়ী পথের ওপর লোকালয়। গোলপাতার ঘর। কাঠের দেওয়াল কয়েকখানা বর্শা হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। একটা বড় জয়ঢাক পেটাচ্ছে একজন আফরিকান। তার কোমর থেকে কলাপাতার ঝালর ঝুলছে। নীচের উপত্যকা দেখা যায়। সেখানে শীতকালের শান্ত একটা নদী নীল জল নিয়ে পড়ে আছে। তার তীর ধরে তিনটে সিংহী তাদের ছোট বাচ্চাদের নিয়ে খেলছে। নীচে দূরে খানিকটা জায়গায় এক পোঁচ সবুজ ঝকঝক করে উঠল সকালবেলার রোদে। কালাচাঁদ দেখেই বুঝল—ওটা মরুদ্যান। নদীর পারে জার্সি গায়ে একটা জেব্রা এসে হাজির হতেই সিংহের বাচ্চাগুলো তার পায়ের ফাঁকে গলে যেতে লাগল। তিন সিংহী ঠায় বসে তা দেখতে লাগল।

কালাচাঁদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। ফিরে তাকাতেই চিনতে পারল। আরে। এতো সেই কিলিমানজারো পর্বত। তার সরল ভূজ্ঞানে ন'য়ের পৃষ্ঠায় হুবহু এই ছবি আছে।

কিন্তু সে তো কালাচাঁদ। সে এখানে আসে কী করে? এবারে নিজের দিকে চোখ পড়ল। সে উঁচু ঢিবিতে বসে আছে। তার ডান হাতের কাছে একখানা বর্শা মাটিতে গাঁথা। কোমরে কলাপাতার ঝালর। দু'হাতের দুই কনুইয়ের পায়না-দুটো সেরে গেছে। মাথায় কিলিমানজারো পাহাড়ের কোন গাছের পাতার মুকুট হবে। গলায় পাথুরে মালা। বেশ ওজন আছে।
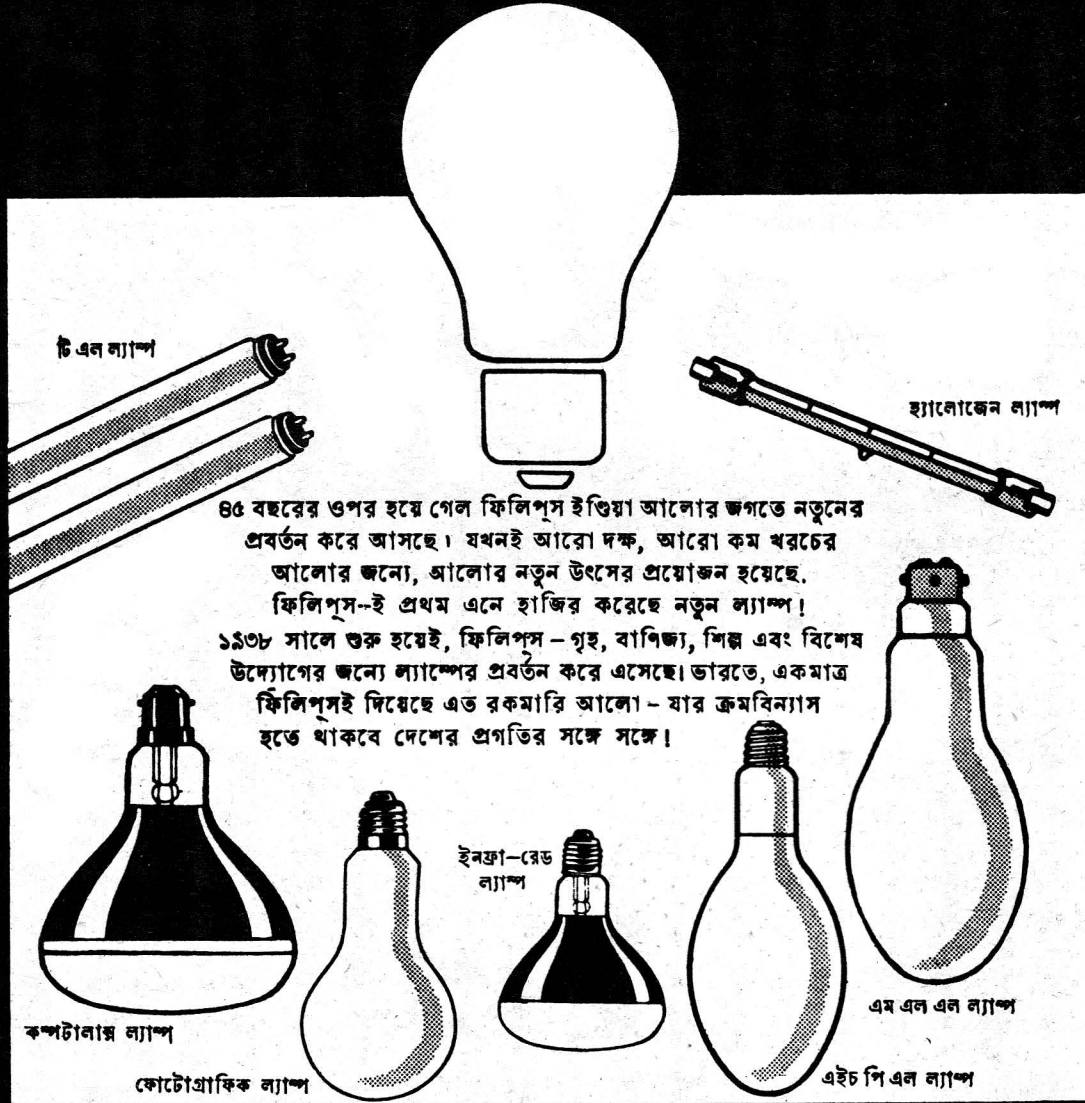
দূরে নদীর গায়ে একখানা লম্বা ছিপ এসে ভিড়ল। আসলে আফরিকান মাঝি ছিপখানা তীরে ভিড়িয়ে দিয়ে জলে দাঁড়িয়ে আছে। তিনজন যাত্রী লাফিয়ে ডাঙায় উঠল। এদিকেই আসছে।

কাছে আসতেই কালাচাঁদ চিনতে পারল।

প্রথম জন অঘোর প্রামাণিক। পায়ে রবারের জুতো বালিতে ভরে গেছে। হাফশার্ট। মাথায় একটি আব।

দ্বিতীয়জন নিবারণচরণ পাকড়াশি। পায়ে খোলা কাবলি জুতো। বুক পকেটে খাতা দেখার লাল ডটপেন। হাতে ছাতা।

সব রকমেই ভাল বাল্‌ব
ফিলিপ্‌স বাল্‌ব
টি এল ল্যাম্প
হ্যালোজেন ল্যাম্প
৪৫ বছরের ওপর হয়ে গেল ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া আলোর জগতে নতুনের প্রবর্তন করে আসছে। যখনই আরো দক্ষ, আরো কম খরচের আলোর জন্যে, আলোর নতুন উৎসের প্রয়োজন হয়েছে, ফিলিপ্‌স--ই প্রথম এনে হাজির করেছে নতুন ল্যাম্প! ১৯৩৮ সালে শুরু হয়েই, ফিলিপ্‌স – গৃহ, বাণিজ্য, শিল্প এবং বিশেষ উদ্যোগের জন্যে ল্যাম্পের প্রবর্তন করে এসেছে। ভারতে, একমাত্র ফিলিপ্‌সই দিয়েছে এত রকমারি আলো – যার ক্রমবিন্যাস হতে থাকবে দেশের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে!
ইনফ্রা–রেড ল্যাম্প
কম্পটালার ল্যাম্প
ফোটোগ্রাফিক ল্যাম্প
এইচ পি এল ল্যাম্প
এম এল এল ল্যাম্প
ফিলিপ্‌স – ল্যাম্প ও আলোর জগতে অগ্রণী
PHILIPS
ফিলিপ্‌স
ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

তৃতীয় জন খালি পায়ে এসেছে। বিশ্বনাথ।

তিনজনই পরিশ্রান্ত। একটা পাথরে বসে হাফাঁচ্ছিল সবাই। অঘোর প্রামাণিক রবারের জুতো উলটে বালি বের করছিলেন। এমন সময় জয়ঢাক থামল।

তিনজনই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"আপনারা কোত্থেকে আসছেন?"

"আপনি বাংলা জানেন?"

"সব জানতে হয়।" বলতে বলতে সাধু দেখল, "কেউ তাকে চিনতে পারেনি।"

তিনজনই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে জয়ধ্বনি দিল। জয় সাধু কিলিমানজারোর জয়! জয় বাবা কিলিমানজারো!! জয়!!

কালাচাঁদের খটকা লাগল। সে আবার পেছন ফিরে কিলি-মানজারো পাহাড়টাকে দেখে নিল। মনে মনে ভাবল, তা মন্দ না! কালাচাঁদ থেকে এক লাফে কিলিমানজারো। কালাচাঁদের আফরিকান বাংলা হয়তো কিলিমানজারো। যে ভাবেই সে এখানে আসুক, হয়তো ভাল পসার জমে যেতে পারে। একবার পসার হয়ে গেলে সে সবার সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। তখন সবাইকে দেখিয়ে দেবে—সে আসলে কী। তার আগে নয়।

অঘোর প্রামাণিক বললেন, "আমরা এশিয়ার খুলনা থেকে আসছি।"

"সে তো দেখেই বুঝেছি। কোন্ পথে এলেন? ভৈরব দিয়ে?"

ওঁরা আশ্চর্য হলেন, "আপনি সব জানেন?"

"জানতে হয়।"

বিশ্বনাথ বলল, "ভৈরব দিয়ে রূপসা নদীতে পড়লাম। তারপর মিপসা। বঙ্গোপসাগর। ভারত মহাসাগর। ভূমধ্য সাগর। আমাজানের মোহানায় নৌকোডুবির জোগাড়। কঙ্গো নদী অনেক ঠাণ্ডা। শুধু কুমিরের উপদ্রব। নীল নদে ঢুকে জোয়ার পেয়েই পাল খাটিয়ে নিলাম। তিন জোয়ারের পথ পেরিয়ে আপনার ডেরায় এসে হাজির হলাম।"

"পথে ঢেউ পেয়েছিলেন?"

নিবারণচরণ পাকড়াশি বললেন, "প্রবল। ভারত মহা-সাগরে অঘোরবাবু বমি করে একাকার করলেন। আমার পকেটে সব সময় মুখশুদ্ধি থাকে। তাই দু'বার খাওয়ালাম। তারপর আর বমি করেননি।"

"আপনি তো জুবিলি স্কুলের হেডমাস্টার?"

একথায় এন সি পাকড়াশির চোখ কপালে উঠল। "জয় বাবা কিলিমানজারো! আপনার দেখছি কিছুই অজানা নয়।"

"ডটপেনটা দিন। কাগজ আছে?"

এন সি পাকড়াশি ডটপেনের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবই বের করে দিলেন।

"এই তো আপনার সিগনেচার?"

আশ্চর্য! "আপনি আসলে কে বাবা? আপনি জাতিস্মর না যোগী? জয়! সাধু কিলিমানজারোর জয়!!"

"সেই জি এন মণ্ডল ভূগোল পড়াচ্ছেন?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"ওঁকে ড্রিলের ক্লাসে দিন।"

"কিন্তু উনি যে জগ্রাফি ট্রেনড্ টিচার—"

"ড্রিলে দিয়ে দেখুন না। ভাল পড়াবেন। এশিয়া থেকে মার্চ করে আফরিকায় চলে আসতে পারবেন। বেশ মজবুত স্বাস্থ্য। কী? প্রস্তাবটা খারাপ?"

"না না। আপনি যখন বলছেন। এর পর আর কী কথা—"

বিশ্বনাথ যেন খুশীই হল। এ হল গিয়ে বাবা কিলিমান-জারোর নির্দেশ।

এন সি পাকড়াশি অধীর হয়ে বললেন, "একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি।"

"ভিজিট এনেছেন?"

একখানা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিতে কালাচাঁদ আপত্তি করল। "অত তো নয়।"

"নিন না। এ তো স্কুল ফাণ্ডের টাকা। পেশেণ্ট হল গিয়ে স্বয়ং জুবিলি স্কুল। গতবছর আশপাশের স্কুল থেকে কয়েকটি ভাল ছেলে ভাল-ভাল নম্বরসুদ্ধ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আমার স্কুলে এসে ভর্তি হয়। এবার টেস্টে তারা সবাই ঢেড়িয়েছে। এদের যদি সেণ্ট আপ করি—তাহলে স্কুল ফাইনালে ফেল করে ওরা স্কুলের অ্যাফিলিয়েশনের দরকারী পাশের সংখ্যা নষ্ট করে দিতে পারে। ওদের ফাইনাল দিতে না পাঠালে ছাত্রসংখ্যা আবার কম হয়ে যায়। উভয় সঙ্কটে পড়েছি। কী করব বাবা?"

বুনো মহিষের সিংয়ের ভেতর নোটখানা গুঁজে রেখে কালাচাঁদ বলল, "সেণ্ট আপ করুন। ঢালাওভাবে টুকতে দিন।"

"তা কী করে দেব? ওদের তো অন্য স্কুলে সিট পড়বে।"

"সে-স্কুলের হেডস্যারের সঙ্গে ব্যবস্থা করুন। তাঁর ছেলেদেরও টুকতে দিন। আপনার স্কুলেই তো সিট পড়বে।"

"তা তো পড়বে। কিন্তু ওই হেডমাস্টারমশাই গোঁয়ার আছেন। টোকাটুকিতে বিশ্বাস নেই একদম। একথা বলতে গেলে মারতে আসবেন।"

"খুচরো দশ টাকার নোট আছে?"

এন সি পাকড়াশি একখানা এগিয়ে দিলেন।

সে-নোটখানাও মহিষের সিংহের ভেতর গুঁজে রেখে কালাচাঁদ একটা শিশি এগিয়ে দিল। "সাধু কিলিমানজারো'স ওন সলিউশন। জোর করে ধরে খাইয়ে দেবেন দু' দাগ। সব কথা শুনবেন। গোয়ার্তুমি আর থাকবে না।"

"খাওয়াতে গেলে যদি কামড়ে দেয়?"

"জুবিলি স্কুলের জন্যে এতটা পথ এলেন। ফিরে গিয়ে আর এটুকু করতে পারবেন না?"

এন সি পাকড়াশি লজ্জায় সলিউশনের শিশিটা ঝুল পকেটে ভরে ফেললেন।

অঘোর প্রামাণিক বললেন, "আমার একমাত্র ছেলে কালা-চাঁদকে পাচ্ছি না। তার মা কান্নাকাটি করে অন্নজল ত্যাগ করেছেন।"

"তাকে আর পাবেন না। সাধু হয়ে গেছে।"

"আমার পরিবারেরও তাই সন্দেহ। একবার চোখের দেখা দেখা যায় না? নইলে ওর গর্ভধারিণী আত্মঘাতী হবেন।"

"বাড়ি গিয়ে সকালবেলা পুবমুখী হয়ে বসবেন আর এক লক্ষ আট হাজার বার জপ করুন।"

"কী জপ করব বাবা?"

"আর ঠ্যাঙাব না। আর ঠ্যাঙাব না।"

"আপনি কী করে জানলেন বাবা?" অঘোর একদম আশ্চর্য। "সত্যি, মারটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। কার মাথা ঠিক থাকে বলুন। একই ক্লাশে পাকাপাকি রয়ে গেছে—বাড়ি ফিরেই জপে বসব। যদি ফিরে আসে কালাচাঁদ।"

"প্রাণমন দিয়ে জপলে কী না হয়!"

"আপনি ত্রিকালদর্শী বাবা কিলিমানজারো।"

"সবই দেখতে হয় আমাদের। তোমার ব্যাপার কী খোকা?"

বিশ্বনাথ হাঁটি-হাঁটি পা করে সামনে এগিয়ে এল। "আমি

লেখাপড়া বিলকুল ভুলে যাচ্ছি বাবা। রোজ একটু একটু করে—"

"কীরকম?"

"কাল পর্যন্তও মনে ছিল—ছোট হাতের টি লেখে কী করে। আজ আর তাও মনে নেই। আজ এই সকালবেলার ভেতরেই বড় হাতের ইউ লেখা আধখানা ভুলে গেছি। আর মোটে পাঁচটি হরফ ভুলে যেতে বাকী আছে। তারপর সব সাফ।"

"মনে মনে সেণ্টেন্স করতে পারো?"

"তা এখনো পারি। কিন্তু লিখব কী করে? হরফ-গুলোই মন থেকে মুছে যাচ্ছে রোজ।" বিশ্বনাথ কেঁদেই উঠল। "এখন সারাদিন বই খুলে বসে থাকি। কিন্তু পড়তে পারি না। অর্ধেকের ওপর হরফ যে মনে নেই।"

"এ তো কঠিন অসুখ। এর পর বাক্য গঠনও ভুলে যাবে। শেষে নিজের নামও হারিয়ে যাবে। নিজেকেই চিনতে পারবে না একদিন। সনাক্ত করতে লোক লাগবে।"

বিশ্বনাথ কালাচাঁদের ঢিবির সামনে বসে পড়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। দু'হাত ওপরে তুলে বলল, "একটা পথ দেখান সাধু কিলিমানজারো। নাহলে আমি এখান থেকে উঠব না।"

"আপনারা দু'জন ওই জয়ঢাকটার ওপাশে গিয়ে বসুন। কঠিন কেস। ভালো করে দেখতে হবে।"

নিবারণ আর অঘোর সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "উনি যদি কিছু বলেন—"

উনি মানে সেই আফরিকান ঢাকী। বর্শা হাতে সেই জয়-ঢাকটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ এদিকে। তার দৃষ্টির খানিকটা কিলিমানজারো পাহাড়ের ডগায়। ডোরা কাটা জেব্রাটার সঙ্গে খেলতে-খেলতে সিংহীদের দুই বাচ্চা পাহাড়ী পথ ধরে এদিকেই অনেকটা এসে পড়েছে। দূরে নদীতে আরেকখানা ছিপ এসে ভিড়ল। আফরিকান পেশেণ্টরা দল বেঁধে আসতে শুরু করেছে সবে। বর্ষাকালে জলের ঢল পাহাড় ধসিয়ে নামে অনেক সময়। তাই কিলিমানজারোর গায়ের অনেক জায়গায় পাথুরে খোসা উঠে গিয়ে লালচে বুক বেরিয়ে পড়েছে। সেখানটায় রোদ পড়ে দগদগ করছে।

ওরা দুজন সরে যেতে কালাচাঁদ বিশ্বনাথের দিকে তাকাল। "কখনো কোন ভিজিটে ভাগ বসিয়েছিলে?"

"কোথায়? মনে পড়ে না তো।"

"ভালো করে স্মরণ করো।"

"হ্যাঁ বাবা। কালাচাঁদের ভিজিটে। ও নিজেও দিত আমাকে—"

"কোন্ কালাচাঁদ? অঘোরবাবুর হারানো ছেলে?"

"হ্যাঁ বাবা। মারের চোটে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটা—"

"ফিরলে ভাল ব্যবহার করবে?"

"করতেই হবে। নইলে নিজেও তো একদিন হারিয়ে যাব। চিনতে পারব না। চিনিয়ে দিতে লোক লাগবে বললেন—"

"দায়ে পড়ে নয়—নিজের থেকেই ভাল ব্যবহার করবে তো?"

"আমার সে-অভ্যেস নেই বাবা। ক্লাশ থ্রি থেকেই সবাই আমায় ভয় করে। আমি কেড়ে খেয়ে বড় হচ্ছি—"

"অভ্যেসটা না ছাড়লে তো নিজের নাম ভুলে যাবে এক হপ্তার ভেতর।"

"আমায় বাঁচান সাধু কিলিমানজারো—এই আপনার ভিজিট—"

বিশ্বনাথ তার হাত ধরতেই ঘুম ভেঙে গেল কালাচাঁদের। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখল, রোদ উঠে গেছে অনেকক্ষণ। কোথায় কিলিমানজারো পাহাড়! ঘুমের ভেতর মুখ থেকে লালা পড়ে সরল ভূজ্ঞানের একখানা পাতা পুরো ভিজে গেছে।

বাবা অঘোর প্রামাণিক লোকজন জোগাড় করে উঠোনে ধান ঝাড়ানো শুরু করছেন।

ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

চারজন গান গায়

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

চারজন গান গায়
তিনদিন ধ'রে—
এইখানে, ঐখানে,
গড়িয়ার মোড়ে।
কেন এত চ্যাঁচামেচি?
কেন এত জোরে?
যেন সাতখানা ফ্যান
বন্‌বন্ ঘোরে।
আমি বলি ঃ ঢের হল,
এইবার থামো—
সন্দেশ আছে সাথে,
আছে কিছু আম-ও।
খাওয়া দাওয়া ভুলে তবু
ওরা গান করে।
আমি ভাবি—এইবার
সট্‌কাবো ঘরে ॥

ছবি এঁকেছেন অহিভূষণ মালিক

ওয়াল্‌ট ডিজনির সচিত্র কাহিনী ডাইনী পাহাড়ের দিকে

টনির আশ্চর্য ক্যাচ্ দেখে তো পাইন-উড্সের ছেলেমেয়েরা অবাক...
সে কী! ধরে ফেলল!
উরিব্বাবা!

ট্রাক আউট!
জিতে গেছি!
কী ক্যাচ্ রে বাবা
নির্ঘাত বারো ফিটের
ওপর লাফিয়েছে

ট্রাক ভীষণ চটে গেছে। ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, ওইরকম অদ্ভুতভাবে ক্যাচ ধরে টনি ওকে আউট করে দিয়েছে...
তুমি কিছুতেই অত উঁচু দিয়ে যাওয়া বল ধরতে পারনি! তুমি কায়দা করে আমাকে আউট করে দেবার চেষ্টা করছ!
আরে!

হঠাৎ...
উফ্!
চটাস্!

চালাকি পেয়েছ, না? এক ঘুঁষিতে এবার তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব!

টনি কিন্তু খুব সহজেই অত বড় ঘুঁষিটা এড়িয়ে গেল...
2-7

যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। এবার তোমরা তৈরি হয়ে নাও। আমরা এখন সিনেমা দেখতে শহরে যাব।

টনি, আমরা কিন্তু এখানে আসার আগে ঠিক করে এসেছিলাম যে, ওসব কায়দা-টায়দা আর দেখাব না। এখানকার ছেলেমেয়েরা ভাববে আমরা হয়ত তুকতাক জানি।
কিন্তু আমি তো আর ওর মার খেতে পারি না!

টনি ঘুঁষি এড়াবার জন্যে এক অদ্ভুত কায়দা দেখিয়েছে। কিন্তু ওর বেনের সেটা একেবারেই ভাল লাগেনি...
উফ্! ছেলেটা তুকতাক জানে!
তোমার এ-ভাবে ওটা করা উচিত হয়নি টনি। তুমি এমন কিছু একটা কায়দা দেখাতে পারতে যাতে দেখে মনে হত ও জিতে গেছে।
আমাদের কাছে এগুলো মজার, কিন্তু এ-সব দেখে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের ভূত-পেত্নী ভাবছে!
খুব মজা করে সিনেমা দেখে সবাই আবার পাইন উড্‌সে ফিরে আসছে...
দাঁড়াও, টনি! আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে!
কী?
ওই গাড়িটা! নির্ঘাত গাড়িটার কিছু একটা হবে!
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
দাঁড়ান-দাঁড়ান! এক্ষুনি গাড়িতে উঠবেন না!
মানে?
আমার দিদি কিন্তু ঠাট্টা করছে না স্যার! ...ওর মন বলছে...
ঠিক তক্ষুনি...
স্-স্কী-ই-ই-ই-স্!

টিয়া গাড়ির মালিককে সতর্ক করার একটু পরেই একটা ট্রাক প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এসে তার গাড়িতে ধাক্কা মারল...
কারও চোট্ লাগেনি তো ?
ন্-না লাগেনি !

এই বাচ্চা দুটি বাধা না দিলে আমার তো এতক্ষণ গাড়ির মধ্যে থাকার কথা ছিল !

দুর্ঘটনার কথা টিয়া কী করে আগে থেকে জেনে ফেলল ! গাড়ির মালিক তো অবাক...
আচ্ছা, এবার বলো...কী করে জানলে ট্রাকটা আমার গাড়িকেধাক্কা মারতে আসছিল ?
আসলে...মানে...

তোমরা এসো এবার !
আমি, আমি... চলি তাহলে !

ওই বাচ্চাদুটোর নির্ঘাত অলৌকিক ক্ষমতা আছে ! বোল্ট সাহেবকে জানালে উনি খুব খুশি হবেন !

একটু পরেই ... বিরাট বড়লোক অ্যারিস্টটল বোল্টের বাড়িতে বোল্ট অলৌকিক ব্যাপারে খুব আগ্রহী...
কী ব্যাপার ! এখন আবার কী জন্যে এলে ডিরানিয়ান ? ওইসব উদ্ভট বিষয় নিয়ে গালগল্প আর ভাল লাগে না !
2-23

ডিরানিয়ান ওই দুর্ঘটনার কথা বলল। সব শুনে বোল্ট এক মতলব ভাঁজল।
শোনো, ওই বাচ্চা দুটোকে এক্ষুনি আমার চাই ! যে ভাবে পারো, নিয়ে এস। দরকার হলে জাল-জোচ্চুরি করতে হবে।
ঠিক আছে, স্যার !

কিছুদিন পরেই টনি আর টিয়া পাইন উড্সে একজনকে দেখে অবাক হয়ে গেল...
ইনি তোমাদের কাকা। এঁর কাছে প্রমাণপত্রও আছে। এখন থেকে তোমরা এঁর কাছেই থাকবে।

ভদ্রলোকের দাবি, তিনি নাকি বাচ্চা-দুটির কাকা...
উনি ঠিকই বলেছেন। এই কাগজ-পত্তরগুলিই প্রমাণ করে যে, মিস্টার ডিরানিয়ান তোমাদের কাকা।

আমাকে লুকাসকাকু বলে ডাকতে পার!
ঠিক আছে স্যার...ইয়ে, লুকাসকাকু!

উনি আর টিয়া কিন্তু জানে না যে, ওদের হঠাৎ-পাওয়া কাকা শ্রাইন উড্‌স থেকে ওদের নিয়ে যাবার জন্যে জাল কাগজপত্তর দেখিয়েছে...
এবার তোমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। মিস্টার ডিরানিয়ান এখন তোমাদের তাঁর কর্তার বাড়িতে নিয়ে যাবেন। সেখানেই তোমরা থাকবে।

এই ডিরানিয়ান-লোকটা আমাদের কাকা নয়!
আমারও তাই মনে হচ্ছে! আমাদের আসল বাবা-মা কারা?

কিছুক্ষণ পরে, ডিরানিয়ানের কর্তা অ্যারিস্টটল বোল্ট তাঁর বিশাল বাড়িতে বাচ্চা দুটিকে আদর করে ডাকলেন।
পথে খুব কষ্ট হয়েছে, না? লুকাস কাকুর সঙ্গে যাও, উনি তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবেন।

ঘরটা এত সুন্দর করে সাজানো যে, ঢুকতেই ওদের ভয় কেটে গেল একেবারে...
আহ্! দারুণ! কত খেলনা, সব আমাদের!
ঠিক স্বপ্নের মতো!
3-2

সব কিছুর মধ্যে ওরা চট করে ডুবে গেল...
দড়ির-পুতুল আমার খুব ভালো লাগে। আমি দড়ি না ছুঁয়েই এদের নাচাতে পারি!
আমি তাহলে বাজনা বাজাচ্ছি

এদিকে লুকোনো-টেলিভিশনে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে দুজন অবাক হয়ে গেছে...
ডিরানিয়ান, এরকম অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার আমি জন্মেও দেখিনি!

অদ্ভুত সব ব্যাপার দেখে অ্যারিস্টটল বোল্‌ট অবাক হয়ে গেছে...
দেখেছ, পুতুলগুলোকে কেমন হাওয়ায় ভাসাচ্ছে! তুমি ঠিক বলেছ ডিরানিয়ান, ওদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে!

ডিরানিয়ান, ওই ক্ষমতাকে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে আমি আরও বড়লোক হয়ে উঠতে পারি!

একটু পরে, অ্যারিস্টটল বোল্‌ট বাচ্চা দুটিকে জানাল যে, সে তাদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা টের পেয়ে গেছে
তোমাদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তোমরা টেলিপ্যাথি জান। এসব যে আমার কত কাজে লাগতে পারে, ভাবতে পার না!
কী বলছেন, স্যার?

যেমন ধরো, তোমরা একটু
করলেই জানতে পার, ব্যবসা কোন্
যাবে, রাজনীতিতে কখন কী
হবে! এমন কী, কোন্ জায়গা খুঁড়লে
পাওয়া যাবে তাও বলে দিতে পার
আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কী মতলব আঁটছে
বলে দিতে পার আগে থেকে

কিন্তু, মিস্টার বোল্‌ট, বিশ্বাস করুন, এগুলো কী ভাবে করি জানি না!
সত্যিই স্যার। আমরা এগুলো কাউকে শেখাতে চাইলেও পারব না!

কোনোরকমে রাগ চেপে...
ঠিক আছে! তোমরা এখন ঘরে যাও। কাল সকালে আবার এসব নিয়ে কথা হবে।

সেই রাত্তিরে...
টনি, এই বোল্‌ট লোকটাকে আমার খুব বাজে ধরনের মনে হচ্ছে। এ-জায়গা ছেড়ে আমাদের পালাতেই হবে
কিন্তু, কীভাবে? আমাদের ঘরে তালা আটকে দিয়েছে। একগাদা কুকুর পাহারা দিচ্ছে।

আমার মন বলছে, আজ রাত্তিরেই আমরা এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারব!

অ্যারিস্টটল বোল্টের বাড়িতে কত আরাম, কিন্তু ওরা বুঝতে পারছিল যে, ওদের আসলে বন্দী করে রাখা হয়েছে!
জেলখানার মতো এ-বাড়ির চারদিকে পাহারা। আমরা কী করে পালাব?

পালাতেই হবে। বোল্ট আমাদের কক্ষনো ছেড়ে দেবে না।

অ্যারিস্টটল বোল্ট ওদের অলৌকিক ক্ষমতা স্বার্থপরের মতো নিজের কাজে লাগাবার মতলব করেছে দেখে টনি আর টিয়া পালিয়ে যাবে...
আরে! টনি, দ্যাখো! আমার হাত-ব্যাগের ঢাকনাটা আলগা হতেই এই মানচিত্রটা বেরিয়ে এল!

স্টোনি ক্রিক! মিস্টি উপত্যকা! শুনিনি!
আমিও শুনিনি! কিন্তু আমাদের ওখানেই যেতে হবে!
মিস্টি উপত্যকা
স্টোনি ক্রিক

উইন্টি, তুমিও এসো। আমরা তোমাকে ফেলে যাব না।
মিউ
বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিয়েছে!

টিয়া তার অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে চট করে দরজার তালা খুলে ফেলল...
ক্লিক!

কিন্তু যেই-না ওরা বাইরে...
রিরিরিরিরিরিং!
এইরে, অ্যালার্ম বেজে উঠেছে!
এই দিকে! শিগ্গির!

পালাও! কুকুর ছেড়ে দিয়েছে!
গর্র্র্!
র্র্উফ্!

ওদের ধরার জন্যে বাঘের মতো কুকুর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে...
ধরে ফেলল বলে!
গেটের কাছে যাবার আগেই ওরা আমাদের ধরে ফেলবে!

টিয়া কুকুরগুলোকে থামাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে...
থামো, থামো, শিগ্গির থামো বলছি!

টিয়া তার অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে কুকুরগুলোকে থামিয়ে দিয়ে এক অদ্ভুত হুকুম করল...
যাও, এবার ওই পাহারাদারদের তাড়া কর!

আরে! আমাদেরই তাড়া করছে যে!

ওরা দুজনেই একসঙ্গে ওদের অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে বন্ধ গেট খুলে ফেলার চেষ্টা করছে...

পাহারাদার গেট বন্ধ করে দিয়েছে...
3-23

ঠিক তক্ষুনি বেড়ালটা লাফ দিয়ে পড়তেই পাহারাদার ছিটকে গেল!
ম্যাও-ও-ও-ও!
গেটের চাবি

টিয়ারা পালাবার জন্যে এক ঘোড়া-বন্ধুর সাহায্য পেলেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না!
অ্যাই! ফেরো বলছি!

টনি আর টিয়া অ্যারিস্টটল বোল্‌টের বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল...
জোর্‌সে চালাও টিয়া। ওরা এক্ষুনি আমাদের তাড়া করবে!

আচ্ছা, আমরা কোন্‌ রাস্তায় যাব?
কী জানি! তবে যে-করেই হোক অনেক দূরে চলে যেতে হবে!

জানথুস্‌ থেকে অনেকটা দূরে চলে আসার পরে
তোমার জন্যেই পালিয়ে আসতে পারলাম, সোনামণি!
এ. জে. স্মিথ পশু চিকিৎসক
তুইও যা রে, কিটি।

ওদের পালিয়ে যাবার খবর শুনে হুকুম দিল, চারদিকে লোক পাঠাও...
ডিরানিয়ান, ওই বাচ্চাদুটোকে যে ভাবেই হোক ফিরিয়ে নিয়ে এস।
আচ্ছা

কিছুক্ষণ পরে...
আর পারছি না টনি!
এদিকে এস, টিয়া। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। বসাও হবে, আবার সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়েও যাব অনেকখানি।

মিস্টার ওড়ে, এবার খুব একটা লম্বা সফর দিচ্ছেন, না?
ঠিক বলেছ, তবে দয়া করে তোমার প্রশ্ন করা থামালে আমি এবার রওনা হতে পারি!
জেনারেল স্টোর্স
স্ক্রীইইচ!

দুটো ছোট ছেলেমেয়ে পালিয়ে দেখেছেন নাকি?
না তো! তবে দেখলেও ওদের আটকাতাম না!

আরে! ডিরানিয়ান না!
হ্যাঁ। আমাদের ধরার জন্যে সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছে!

গাড়ি চলছে, কিন্তু গাড়ির চালক জানে না যে, ওর গাড়িতে ওরা আছে...

মনে হচ্ছে মিস্টার ওডে স্টোনি ক্রিকের দিকেই যাচ্ছেন!
ওখানে গেলেই আমরা আমাদের রাস্তা খুঁজে পাব পাবই! আমার মন বলছে

একটু পরেই ওরা ধরা পড়ে গেল...
তাহলে তোমরা বাড়ি থেকে পালিয়েছ! শোনো, এটা বাস নয় যে, তোমরা বললেই আবার তোমাদের শহরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে!
বিশ্বাস করুন, আমরা পালাচ্ছি না!

টনি আর টিয়া ওদের সব কথা বলল...
আমি ও-সব অলৌকিক ক্ষমতা-টমতার কথা আবার বুঝি না! তবে অ্যারিস্টটল বোল্টের কথা শুনেছি। লোকটা যেমন বড়লোক, তেমনি পাজি।
মিস্টার ওডে, আপনি যদি দয়া করে আমাদের স্টোনি ক্রিকে নামিয়ে দেন

ঠিক আছে, উঠে পড় তাহলে। মনে হচ্ছে, তোমরা সত্যি কথাই বলছ! তবে তোমাদের নকল কাকা আমাদের পিছু নিতে পারে কিন্তু!

ইতিমধ্যে অ্যারিস্টটল বোল্ট নিজেই ওদের খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেছে...
ডিরানিয়ান, তুমি এক নম্বরের গাধা ওই গাড়ির ভেতরটা তোমার একবার দেখা উচিত ছিল! বাচ্চাদুটো হয়ত ওখানেই লুকিয়ে ছিল! লঙভিউয়ের শেরিফকে এক্ষুনি খবর দিয়ে দাও। আমি হেলিকপ্টারে যাচ্ছি।
4-6

লঙভিউতে পৌঁছে ওডে এক নতুন বুদ্ধি খাটাল...
আমি তোমাদের আবার শহরের বাইরে থেকে তুলে নেব!

লঙভিউতে স্বাগতম!
COUNTY SHERIFF

শেরিফের হাতে ধরা পড়ে টনি আর টিয়া জেলে আটক...
মিস্টার বোল্ট, আমি ওদের ধরে জেলে পুরেছি!... এক হাজার ডলার পুরস্কার! আঁ! ভাবাই যায় না, স্যার!

টিয়া, এক্ষুনি আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে!
হ্যাঁ, কিন্তু...

পালাতে হলে এক্ষুনি, নইলে...
ওদের কাকা এসে ওদের নিয়ে যাবে! বেশ! বেশ!
তুমি তালাটা খুলে ফ্যালো। শেরিফ যাতে শব্দ শুনতে না পায় তার ব্যবস্থা করছি!

টিয়া তালাটা খুলে ফেলার জন্যে ওর অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করছে আর টনি বাজাচ্ছে অদ্ভুত একটা সুর...
ক্লিক্!

হঠাৎ অদ্ভুত-গোছের একজন ওদের সাহায্যে এগিয়ে এল!
আ-আ আরে! কোট ঝোলানোর র‍্যাক্‌টা...

উফ্!

বাঁচাও!

একটু পরেই
শিগ্‌গির উঠে এস! লোকটা এক্ষুনি আমাদের তাড়া করে আসবে! স্টোনি ক্রীকে পৌঁছুবার পরে না হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে!
শেরিফ আমাদের ধরে ফেলেছিল! পালিয়ে এসেছি!

জেসন ওডে একটু দোনামনা করে টনি আর টিয়াকে স্টোনি ক্রিকে নিয়ে যেতে রাজী হল...
মিস্টার ওডে, দেখবেন, আপনি একটুও অসুবিধের মধ্যে পড়বেন না!
আইন-আদালতের খপ্পরে না পড়ে যাই! হঠাৎ তোমাদের সঙ্গে নিতে রাজী হলাম কেন? মাথাটা বিগড়েছে কি না একবার দেখিয়ে নিলে হত!

দেখা যাক! আর একটু গেলেই স্টোনি ক্রিক!

স্টোনি ক্রিকে ওরা পৌঁছে দেখল কেউ কোথাও নেই...
এবার? কী বলবে বল?
মিস্টার ওডে, একটু অপেক্ষা করুন! আমি একটা জরুরী খবর শুনতে পাচ্ছি! ...খবর পাঠাচ্ছেন আমার সত্যিকারের কাকা—বিনে কাকু!
সরাইখানা

উনি বলছেন, আমরা যেন এক্ষুনি ডাইনী-পাহাড়ের ঠিক নীচের পাহাড়ে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করি। পাহাড়টা এখান থেকে বেশী দূরে নয়!
একটা হেলিকপ্টার

মিস্টার বোল্ট, ওই দেখুন গাড়িটা স্টোনি ক্রিক ছেড়ে চলে যাচ্ছে!
গাড়িটাকে চোখে-চোখে রাখো, আর ডিরানিয়ানকে এক্ষুনি একটা খবর পাঠাও!

একটু পরেই
বাহ্! তোমরা ঠিক-ঠিক এসে গেছ তো! আমি জানতাম, তোমরা পারবে!
বিনে কাকু!
4-20

বিনে একটি বিচিত্র গল্প শোনাল...
আমরা বহু বছর আগে একটি মৃত গ্রহ থেকে তোমাদের পৃথিবীতে থাকব বলে এসেছিলাম! আমাদের একটি আকাশ যান সমুদ্রে ভেঙে পড়ে! এক জেলে টনি আর টিয়াকে উদ্ধার করেছিল!
সবই বিশ্বাস করব এখন।

এইরে! এক্ষুনি আবার ঝামেলা শুরু হবে!
ঘাবড়াবেন না! বাচ্চাদুটির আর কোনো ভয় নেই!

অ্যারিস্টটল বোল্‌ট আর তার লোক-
জন এসে পড়ল...
মিস্টার ওড়ে, ভাববেন না, ওরা এদের
আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না!

আমরা কীভাবে আপনাদের পৃথিবীতে
এসেছিলাম, এক্ষুনি দেখতে পাবেন!

হঠাৎ ডাইনী-পাহাড়ের কুয়াশা ভেদ করে...
একটা উড়ন্ত
চাকি!
এসো, এক্ষুনি আমরা
এটায় উঠে পড়ব!
র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌

ওরা অন্য গ্রহের মানুষ! ইস্‌! এটা
আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল!

টনি আর টিয়াকে নিয়ে উড়ন্ত চাকি
কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল!

ওরা আর ফিরবে না! ...ওদের সাহায্য
পেলে আমি কী না করতে পারতাম!
4-27

শুধু জেসন জানে, টনি আর টিয়া
চিরকালের জন্যে চলে যায়নি...

ওরা যাচ্ছে রহস্যময় ডাইনী-পাহাড়ের
নীচের মিস্‌টি উপত্যকায়। ওখানে আছে
ওদের প্রিয়জনেরা...
শেষ

ফুটপাথরের গাছ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

গাছের যে আবার প্রাণ আছে, তা আমার একদম জানা ছিল না। বেশ বড় হয়ে জানলাম জগদীশ বসুর সেই বিখ্যাত যন্ত্রের কথা, যা দিয়ে উনি গাছের নাড়ি দেখতেন।

অথচ মজা হল, এ-কথা জানার ঢের আগে থেকেই খুদে খুদে লঙ্কাগাছের বাচ্চাগুলো আমাদের খুব নেওটা ছিল। আমাদের পাড়ায় ফুটপাথের বাসিন্দা এক মহিলা তোলা উনুনে সন্ধের অন্ধকারে বসে কী-সব কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এনে রোজ রাঁধতেন। লঙ্কাদানা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ত নিশ্চয়

জলও পড়ত। দেখতে দেখতে সেই দানা থেকে সেখানে কচি-কচি গুড়গুড়ে সব সবুজ-সবুজ পাতা বেরুত। তুল-তুলে ডাঁটির তলায় শেকড়। রোদ উঠলে পাতাগুলো ঝিক-ঝিক করত। তারপর বিকেলের মধ্যেই তারা একটুখানি বেড়ে উঠত। দেখেই মনে হত ওরা নড়ে বেড়ায় না বটে, কিন্তু বাড়ে। পাড়ার দুষ্টু ছেলেমেয়ে বা ছাড়া গরুটরু ওদের পাতা ছিঁড়ে দিলে মনে হত ওদের লাগে। কান্না শোনা যেত না বটে, কিন্তু কাঁদত। অনেক সময় এই বাচ্চা-গুলোকে ফুটপাথের হাট-খোলা অবস্থা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আমরা বাড়ির টবে বসিয়ে দিতাম। ওদের যত্ন করে পোষা হত। ওরা বড় হয়ে ফুল ফুটিয়ে তারপর একদিন লঙ্কা দিত। সে-লঙ্কার স্বাদই যেন আলাদা বলে মনে হত। দুপক্ষের ভালবাসাবাসি থাকলে দেখেছি এমনি হয়।

আমাদের দেশের বাড়ির বুড়ো আমোদিনী কলকাতায় এলে বলত, "ফুটপাথরের গাছগুলো ঠিক কলকাতার লোকেদের মত। কী কান্ড করে সব বেঁচে আছে দ্যাখো।"

আমরা তখন সবে মালয়দেশ থেকে কলকাতায় এসেছি। সে অনেক বছর আগেকার কথা। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। দক্ষিণ কলকাতায় লেক রোডে আমাদের বাসা। রাস্তায় সারি-সারি বকুল গাছ। কোথাও ফুটপাথ বাঁধানো, কোথাও বা ঘাস আছে। কিন্তু বকুলগাছগুলোর তাতে খুব আসত-যেত না। কেননা, সময় হলেই শিশিরে-ভেজা বকুলের গন্ধে পাড়া মাত হয়ে উঠত। মুঠোয় ভরে বকুল ফুল তুলতাম আমরা আর বকুল ফল হলে তা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত রাস্তার বাসিন্দা ছেলেমেয়েরা।

একটু হেঁটে গেলেই ঢাকুরিয়া লেক। সেখানে গাছের মেলা। মাঝখানে পড়ে সাদার্ন অ্যাভেনিউ। রাস্তাটা বেশ চেটালো। এ রাস্তা ধরে দক্ষিণে গেলে ডান হাতের ফুটপাথে বেশির ভাগ কৃষ্ণচূড়ার মেলা। সবুজ ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া মাথা-ওয়ালা বিশাল সব গাছ। গ্রীষ্মকালে এ-গাছের সবুজ ঢেকে যায় থোকা-থোকা লাল কৃষ্ণচূড়া ফুলের দৌরাত্ম্যে। তখন আকাশের দিকে চেয়ে হাঁটতে ভাল লাগে।

এদের মধ্যে একটা গাছ ছিল যেমন উঁচু, তেমনি ছিল তার হিরোর মত চেহারা। একটুখানি হাওয়াতেই সে পাতা দুলিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েদের খেলায় যোগ দিতে ডাকত। কথা গ্রাহ্য না করলে ঝরঝরে ফুল ঝরিয়ে দিত গায়ে-মাথায়। আমরাও বেশ মজা পেতাম। রবীন্দ্রজয়ন্তী হবে। কৃষ্ণচূড়ার বাহার সে-সময় সব বাহারকে ছাড়িয়ে যায়। আমরা আমাদের হিরো গাছে, সবে-নাম-হচ্ছে এমন একজন তরুণ গায়ক হেমন্তকে কেবল সাইজে লম্বা হবার দরুন সবাই মিলে চড়িয়ে দিলাম ঠেলে-ঠুলে। সুচিত্রা তখনও শান্তিনিকেতনে। অনেক অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখে ফেলেছে। বেড়াতে এসেছে কলকাতায়। ফুলে ঘর সাজিয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী করবার জন্যে হেমন্তকে দিয়ে পটপট করে কৃষ্ণচূড়ার লালে-লাল-হওয়া ডাল ভাঙানো হল। নীচে আমরা অনেকে সেই ডালগুলো তুলে নিয়ে সাজিয়ে ফেললাম সভা-প্রাঙ্গণ। হারমোনিয়াম নেই, তানপুরা নেই, তবলা নেই। তবু তরুণ সব গলার সেই গান শুনে ঐ গাছটাও নিশ্চয় আনন্দ পেয়েছিল। কেননা, তার ভাঙা ডাল সাজিয়ে যে চেহারা হয়েছিল জায়গাটার, তা তারও কল্পনার বাইরে। আমরা ওর ভাঙার ব্যথা পুরিয়ে দিয়েছিলাম। তাই তখনও ও ফুল ঝরাচ্ছিল—বোধ হয় গাছ, দিয়ে আনন্দ পায় বলে। এটাই তো ওদের স্বভাব কিনা।

কিন্তু সব চাইতে যে গাছটাকে আমি ভালবাসতাম সেটা ছিল লেক রোডের ছা-পোষা গোছের দেখতে এক বকুলগাছ।

হাওয়া মনের মত বইলে গাছটা হিহি করে পর্যন্ত হেসে উঠতে পারত। দারুণ মাই-ডিয়ার গোছের এই গাছটার তলায় আমাদের প্রবল দৌরাত্ম্য ছিল।

অনেক কাল আগের ব্যাপার। তখন এ শহরে দু ধরনের মেয়ে দেখা যেত। ভিতু-লাজুক আর ডানপিটে। ডানপিটেরা সংখ্যায় খুব কম। আমরা একদল ডানপিটে মেয়ে সাইকেল

চড়তাম আর আরও বেপরোয়ারা রোলার স্কেট্‌স্‌ পরে বকুল গাছ প্রদক্ষিণ করে শান-বাঁধানো ফুটপাথ থেকে নেমে গিয়ে পিচ-বাঁধানো রাস্তায় চলন্ত গাড়ির সঙ্গে রেস্‌ দিতাম। প্রথমে আমাদের এ হেন আবির্ভাবে পাড়ার লোক অবাক হয়েছিল। পরে অভ্যাস হয়ে গেল।

একদিন আমার ছোটবোন (ডানপিটের দলে) আনুকে পেছনে কেরিয়ারে বসিয়ে বেআইনী ডবল-রাইড্‌ করে আমাদের সেই হাসি-হাসি বকুলগাছের কাছাকাছি এসে পড়ে দেখি, এক বৃদ্ধা ঘটির গঙ্গাজল গাছের গোড়ায় ঢেলে পুণ্যি অর্জন করছেন। তখন কালিঘাট-যাত্রীরা ফেরার পথে একটু লেকের আশপাশের দৃশ্য দেখতে এদিকে আসত। গাছের প্রাণ আছে, গাছ আমাদের জীবন দেয়, গাছ লক্ষ্মীছেলে,—এটা ছিল আগেকার দিনের স্লোগান। সেই রাজা অশোকের সময় থেকে গাছ পোঁতার কতসব গল্প আমরা শুনেছি। বৃদ্ধা জল দেওয়া শেষ করে মাথা তুলে আমাদের সাইকেল চড়ে আসতে দেখে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কাছে আসতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, "মা, মা, তোমরা দাঁড়াও একটু দেখি! কলকাতা সম্পর্কে যা শুনেছি তাহলে সব সত্যি?" আমরা দাঁড়িয়ে পড়ে হেসে উঠলাম, "হ্যাঁ সত্যি!" সঙ্গে-সঙ্গে গাছটা অতি মাইডিয়ার বন্ধুর মত এক গাদা বকুল ফুল ঝরিয়ে দিয়ে বৃদ্ধারও মন ভাল করে দিল। উনি হেসে বলে উঠলেন, "বেঁচে থাকো মা! সাইকেল চড়বে বইকী, গেঁয়ো হয়ে মরে লাভ কী?" বলে উনি 'মা জগদম্বা'কে স্মরণ করতে করতে চলে গেলেন।

তারপর দেখতে দেখতে বছরগুলো কেটে গেল হুহু করে। লেক রোডের বকুল গাছের ছায়া ছেড়ে বহু দূরে চলে গেলাম। এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে যখন ফিরে এলাম, তখন আবার আস্তানা গাড়লাম এই পাড়ায়। পুরনো বন্ধু বকুলগাছটাকে খুঁজে পেতে দেরি হয়নি। অযত্নে নুয়ে পড়েছে। গায়ে অসংখ্য ঘুঁটে লাগানো। বকুলের গন্ধ ছাপিয়ে গোবর আর রাস্তার দুর্গন্ধ নাকে আসছে। পাশেই একটা টিউব ওয়েল হয়েছে দেখছি। তাতে কাপড় কাচছে একদল রাস্তার বাসিন্দা। বকুলগাছটার কাছে আসতে দেখলাম সে ভারী বিষণ্ণ হয়ে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ডালপালার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চাইছে। যে-সব পাতা বেশির ভাগ সময় ঝকঝক করত, সেগুলো এখন ধুলোমাখা ম্যাড়-ম্যাড়ে হয়ে পড়েছে। একটা আধমরা গরুর গলার দড়ি, গাছটার গুঁড়িতে জড়িয়ে শক্ত করে বাঁধা। গুটি আষ্টেক ছোট ছোট নোংরা কাপড় পরা ছেলেমেয়ে বকুলের ভাঙা বা ভেঙে নেওয়া একটা ডালে ঝুলে ঝুলে খেলছে। ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে গাছটা। ভারী মন খারাপ হয়ে গেল দৃশ্যটা দেখে। বিশেষ করে যখন মনে হল গাছটা অন্ধ হয়ে গেছে।

খবর নিয়ে দেখলাম সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের অবস্থাও খুব সুবিধের নয়। ম্যানসান হাউসের উঁচু মাথা ভেদ করে যেটুকু আলো আজকাল ও পায় তাতে লাল ফুলের বন্যা বওয়ানো যায় না। তাছাড়া গাছটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে অবহেলায়। কিন্তু চিকিৎসা করেনি কেউ। জমির সার কমে গেছে। ফুট-পাথের বাহার বাড়াতে গিয়ে ফুটপাথ সত্যিকারের 'ফুটপাথর' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন বেদম ঝড় হয়ে গেল। বকুল গাছের পাশ দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে চলে যাচ্ছি, নকুলের গলা পেলাম—'মাইজী!' থমকে দাঁড়ালাম। ঐ বকুলতলার দলটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে। হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া আবার এক-আধটা ইংরেজী। কে যে কী বোঝা যায় না। নকুল বলে, "মাইজী, চা খাবার জন্যে দশটা পয়সা দেবে?" পয়সাটা দিয়ে চোখ পড়ল বকুল-গাছটার ওপর। প্রায় শুয়ে পড়েছে গাছটা। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে খিদেয় চ্যাঁভ্যাঁ লাগিয়েছে। নুয়ে-পড়া গাছটা থেকে খুঁটে খুঁটে বকুল ফল খাচ্ছে কয়েকজন। কিছুটা জায়গা জুড়ে নোংরা-নোংরা সুগন্ধী বকুল ফুল পড়ে। নকুল বিজ্ঞের মত বলল, "গাছটা বাঁচবেনি। কালকে মোরা ঝড়ে মরেছিনু একটু হলে। বাব্বা! ভাগ্যে ঐ বাবুদের গলিটা খোলা ছ্যালো।"

বলে নকুল একটা ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে এসে বলল, "একে দশটা পয়সা দেবে?"

"এটা আবার কে?"

নকুল সপ্রতিভ গলায় উত্তর দিল, "আমার মেয়ে।"

"সে কী রে! তোর তো পাঁচ বছর বয়েস হবে। ওর তো বছর তিনেক মনে হচ্ছে।"

নকুল একটুও দমে না গিয়ে বলে উঠল, "ওকে তো ওর মা দড়ি দিয়ে বকুলতলায় বেঁধে রেখে যেত। আমার তো মা ছ্যালোনি। আমি ওকে পাহারা দিতাম। সেই ইস্তক ও মোর মেয়ে হয়। হ্যাঁ গো।"

"ভাল। আর ঐ ছেলেমেয়েগুলো কে হয় রে তোর?"

"ওরা সব বকুলতলার বন্ধু। ওরা রাতে বকুলতলায় থাকে না। বস্তিতে চলে যায়। ওদের মায়েরা সব ঠিকে কাজ করে তো। আমি বাবা আর চার-পাঁচটা লোক গাছতলায় থাকি।"

বলেই নকুল ছুটে চলে গেল মেয়েটার হাত ধরে। একটু পরে বাড়িতে এসে হাজির। এবার সঙ্গে একটা কুকুরের বাচ্চা। হাতে একটা খেলার ঘড়ি বাঁধা। বলল, "মাইজী রুটি দাও খাওয়া হয়নি।"

"সে কী রে, পয়সা দিলাম যে।"

"ওটা দিয়ে তো ঘড়ি কিনেছি। বিশ পয়সা নেল মেয়েটাকে বকুল ফল পেড়ে খাইয়ে দিয়েছি। তিনখানা রুটি দিও। কুকুর খাবেনি?"

রুটি দিতে গিয়ে আড়চোখে দেখলাম, ছোট্ট মেয়েটাকে দূরে রেখে এসেছে পাছে আমি বিরক্ত হই। রুটি তিনভাগ হবে। কুকুর মেয়েটা আর ও খাবে সমান অধিকারে। আমার মুখের দিকে চেয়ে ও অবাক হয়ে বলল, "তুমি জাননি বুঝি? আমি তো দেশে চলে যাব। ডেরাইবার হয়ে ফিরব, অনেক বড় হব তো!"

"তাই বুঝি ঘড়ি পরেছিস?"

"হ্যাঁ গো। একটু চিনি দিও মাইজী। আর তো ভিখ্‌ মাংবোনি। তুমি তো মানা করেছ। কুকুরটাকে নিয়ে যাব সাথে।"

এই বলে দলবলসহ নকুল চলে গেল। তারপর বিকেলে এল কালবৈশাখী ঝড়—একেবারে আকাশ কালো করে। দুমদুম করে গাছ পড়ার শব্দে শহর চমকিয়ে যখন সকাল হল, তখন আমার সেই অত বছরের বন্ধু, নকুলদের আশ্রয় গাছটা আরও অনেকগুলো গাছের সঙ্গে উপড়ে মারা গেল।

ছুটে এসে খবরটা দিল নকুলই। শুকনো মুখে বলল, "একদম মরে গেছে।"

গিয়ে দেখলাম সত্যি। অদ্ভুত নিস্তব্ধ হয়ে সমূলে উপড়ে পড়ে আছে আমার কতকালের সেই বন্ধু, খেলার সাথী গাছটা।

একটু পরেই এক দল লোক এসে গাছটাকে ঝপাঝপ কেটে ফেলে নিয়ে চলে গেল। গাছটাকে একদিনও ওরা যত্ন করল না, কিন্তু মরা মাত্র কী উৎসাহে তার কাঠ বেচতে নিয়ে গেল।

মনটা খিঁচড়ে গেছে। নকুল সদলে এসে হাজির। চমৎকার বকুল-চারা পাওয়া যেতে পারে লেকের ধারে। ওরা অনেক খুঁজে পেতে জানতে পেরেছে! হেসে বললাম, "বেশ তো! তবে যত্ন করিস। যেন পুঁতেই দায় সেরে দিস নে।"

ওরা হো হো করে চলে গেল। আমি কেবল ভাবছি, ওরা বকুল-চারা চেনে তো?
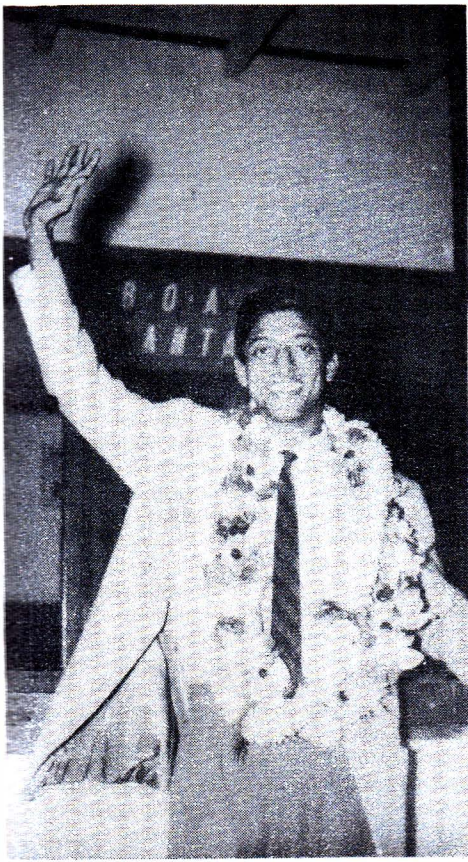
জাকার্তা থেকে ফিরে

চুনী গোস্বামী

যেমন খেলেছি

"গোল...গোল...গোল...চুনী গোল দিয়েছে...চুনী গোল দিয়েছে।"

১৯৬৭ সালের লীগ মরশুমের এক অপরাহ্নে ইডেন উদ্যান মুখরিত হল দর্শকদের উল্লাসে। খেলাটি ছিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে। ওই খেলায় সে বছর প্রথম ডিভিশন লীগের ফয়সালা হয়েছিল। মোহনবাগান জিতেছিল ১-০ গোলে। কিন্তু না, মোহনবাগান লীগ পায়নি। লীগ পেয়েছিল মহমেডান স্পোর্টিং। মোহনবাগান আগের সপ্তাহেই মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে জিততে না পেরে লীগের আশা হারিয়েছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের লীগ জয়ের আশা ছিল। ওই খেলায় ড্র করলে বা জিততে পারলে ওরাই লীগ পেত।

১৯৬০ থেকে ৬৭ সাল পর্যন্ত আমি 'টপ ফর্মে' খেলেছি। সব খেলা হয়ত দর্শকদের ভাল লাগেনি, কিন্তু যে-কোন খেলাই হোক না কেন—তা সে মোহনবাগান দলের পক্ষেই হোক কিংবা বাংলা বা ভারতীয় দলের পক্ষেই হোক, আমি মনপ্রাণ দিয়ে খেলেছি। আমি ফুটবলকে ভালবাসি। কিন্তু একটা বদনাম আমার বরাবর থেকেই গেছে, আমি নাকি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গা লাগিয়ে খেলি না। আমি পূর্ববঙ্গের ছেলে, তাই নাকি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আমার খেলতে মন আসে না। আমি এদেশে বাস করছি, আমার স্ত্রীও পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে, তবু ঠিক যেন জাতে উঠতে পারছি না। এটা আমার একটা দুঃখ ছিল বরাবর। কিন্তু আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে কোনদিন ঢিলেমি দিয়ে খেলিনি। আমার যা খেলা তাই খেলেছি। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জেতা বা সবসময় ভাল খেলা সহজ কথা নয়। কারণ তারা শক্তিশালী টিম।

প্রতিপক্ষের গোলে বল ঢুকিয়ে বিজয়ীর মত ফিরে যাচ্ছেন.

আগের সপ্তাহে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে আমি ভাল খেলেছিলাম। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলার আগের দিন অনেকে আমাকে বলেছিলেন ঃ "চুনী বেশ ভালই তো খেলছ. দেখ না যদি হারাতে পার।" "চুনী পারবে না সে কী হয়!" "চুনী ইচ্ছে করলেই পারে।" আমার স্ত্রীও এ'দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন আমি আমার সাধ্যমত খেলেছিলাম, এবং তুমুল উত্তেজনা ও কোলাহলের মধ্যে গোল দিয়েছিলাম আমিই। সেই গোলেই ইস্টবেঙ্গলের হার হল। ওরা আর লীগ পেল না। লীগ পেল মহমেডান স্পোর্টিং। ইডেন উদ্যানে মোহনবাগান একবারই হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে, আর সেটা আমারই দেওয়া গোলে। জানি না এই জয় আমার সেই দুর্নামকে কাটাতে পেরেছে কিনা!

সেদিন বাড়ি ফিরে দেখি আমিনিয়া থেকে একরাশ খাবার এসেছে। বিরিয়ানি. চাপ, কোর্মা, আরও কত কী! স্ত্রীকে বললাম, "এ কী! এত খাবার কে আনিয়েছে? খাবে কে?" ও বলল, "আমরা তো আনাইনি, একদল লোক এসে দিয়ে গেল, আর বলল, "চুনীনে হামলোগোকো লীগ মিলা দিয়া।" বুঝলাম, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সমর্থকরা খুশি হয়ে খাবার দিয়ে গেছে।

না, সেই খেলায় গোল করার সময় কোন বাড়তি উত্তেজনা আমার আসেনি। খেলা খেলতে গেলে অনেক সুযোগ নষ্ট হবে, অনেক গোলও হবে, কিন্তু বড় খেলোয়াড় হতে গেলে তাতে অভিভূত হয়ে পড়লে চলবে না। গোল মিস্ করা বা গোল দেওয়া দুটোকেই মন থেকে মুছে ফেলে খেলতে হবে স্বাভাবিক খেলা।

১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশিয়ান গেমসে আমার অধিনায়কত্বে ভারত পেল স্বর্ণপদক। তখন আমাদের টিম ছিল দুর্দান্ত। দলে ছিল থঙ্গরাজ, ইউসুফ, প্রদীপ, বলরাম, জার্নেল, রামবাহাদুর, পি কে সিনহা। সবাই আশা করেছিল, আমরা ভাল খেলব। কিন্তু প্রথম খেলাতেই হেরে গেলাম ২—০ গোলে। মন খারাপ হয়ে গেল ভীষণ। আমরা ঠিক করলাম, মনের জোর ফিরিয়ে আনতেই হবে, ভাল খেলা খেলতেই হবে। আমরা যদি নিজেদের খেলা খেলতে পারি তাহলেই জিতব। জিততেও লাগলাম। সেমি ফাইনাল এল। সেমি ফাইনাল আমার কাছে ছিল সবচেয়ে বড় খেলা, কারণ জিততে পারলেই একটা প্রাইজ বাঁধা। অবশ্য এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেমি ফাইনাল খেলতে আমার খুব ভাল লাগে। সেমি ফাইনালে আমি বিজয়সূচক গোল দিয়েছিলাম।

সেই খেলাতে জার্নেলের মাথায় চোট লাগল। ডিফেন্সে জার্নেল ছিল আমাদের প্রধান স্তম্ভ। আমরা দুশ্চিন্তায় পড়লাম। কিন্তু সৌভাগ্যবশত জার্নেল তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠল। ফাইনালের আগের দিন রাত্রে আমাদের প্রশিক্ষক স্বর্গত রহিম সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। আমাদের ফরোয়ার্ড লাইনে এমন একজনের দরকার ছিল, যে দৈহিক শক্তিতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ঠিক হল জার্নেল হবে সেণ্টার ফরোয়ার্ড, আর অরুণ ঘোষ স্টপার। আমাদের পরিকল্পনা সার্থক হল, কারণ জার্নেল সিং প্রয়োজনীয় গোলটি দিয়েছিল। গোল দিয়েছিল অভাবনীয়ভাবে। দুদিকে দুজন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে দৈহিক শক্তিতে পরাস্ত করে ও গোল দিয়েছিল। গোল মিসও করেছিল জার্নেল, অবশ্য তার জন্যে ওকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। ও খেলেছিল অনভ্যস্ত জায়গায়, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনার সার্থক রূপ দিয়েছিল। আমার মনে হয়, এর পরে ও বোধ হয় আর কোনদিন সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলেনি।

১৯৬৪ সালে মারডেকা। তার আগে রবীন্দ্র সরোবরে অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জনের খেলায় আমরা হেরে গেলাম ইরানের কাছে ১—৩ গোলে। সে বছর পি কে, থঙ্গরাজ, বলরাম প্রমুখ খেলোয়াড়রা দলে ছিল না। ভাবছিলাম মারডেকায় যাব কিনা। শেষ পর্যন্ত যেতে হল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল টিম হলেও আমরা খুব ভাল খেললাম। গ্রুপ ম্যাচে একটি পয়েণ্টও হারাইনি আমরা। ফাইনালে বর্মার সঙ্গে খেলা। এই বর্মাকে আমরা ১৯৫৮ সালে ৮—১ গোলে হারিয়েছিলাম। তাই মনে হয়েছিল আর একটি স্বর্ণপদক আমাদের হাতে। শোনা যায়. কলকাতায় সাংবাদিকরা ভারতের জয়লাভে সুনিশ্চিত হয়ে হেড লাইন পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমরা হেরে গেলাম এক গোলে। এই খেলায় আমি পায়ে আঘাত পাই। বেশির ভাগ সময়ই ভারত দশ জনে খেলে।

১৯৬০ সালে আমি প্রথম অলিম্পিকে খেলি। যোগ্যতা অর্জনের খেলায় আমরা ইন্দোনেশিয়াকে আমাদের দেশে ৪—১ গোলে হারিয়েছি। ফিরতি খেলা খেলতে গেছি জাকার্তায়।

সে সময় একটা মজার ঘটনা ঘটে, তার নায়ক আবার আমি।

খেলায় আমরা ২—০ গোলে জিতলাম। সন্ধ্যায় টাউন হলে এক ভোজসভার নিমন্ত্রণ এল। আমরা সবাই গেলাম। ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় বললেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ভাল। এখনই নাচ শুরু হবে. আমি আশা করব আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা এই নাচে যোগ দেবেন।

নাচ শুরু হল। সেই নাচে ইন্দোনেশিয়ার অনেক সুন্দরী চিত্রতারকারাও অংশ নিয়েছিলেন। নাচ তো দূরের কথা, আমরা কেউ জায়গা ছেড়েই নড়লাম না।

হঠাৎ আমার মনে হল, ভারতবর্ষের নৃত্যনাট্যে এত খ্যাতি, আর আমরা নাচের আসরে পেছিয়ে থাকব! উঠে পড়লাম চেয়ার ছেড়ে। একজন চিত্রতারকার সঙ্গে নাচ জুড়ে দিলাম। একটু পরেই তুমুল হাসির রোল উঠল। আরে, এরা হাসছে কেন! পরে বুঝলাম, আমার নাচই ওদের হাসির কারণ। আমার নাচের তাল তো ঠিক ছিলই না, উপরন্তু মেয়েটি যেদিকে যাচ্ছিল আমি যাচ্ছিলাম ঠিক তার উল্টো দিকে। হঠাৎ দেখি সঙ্গী মেয়েটি কোমরে হাত দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। নাচ ঠিক না হলেও সেদিন ভোজসভায় প্রচুর আনন্দ পেয়েছিল সবাই। আর, অলিম্পিক যাওয়ার আনন্দে আমাদের প্রত্যেকের মন ভরে ছিল।

বিদেশে অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড়ের খেলা দেখেছি, যেমন পেলে, ইউসেবিও, ডি' স্টিফানো, গ্যারিনচা। মন ভরে গেছে ওদের খেলা দেখে। কিন্তু আমাকে অভিভূত করে ডি' স্টিফানো। অসাধারণ খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। সমস্ত খেলাটিকে নিজের আয়ত্তে রাখতে পারতেন। যেখানে বল, সেখানেই ডি' স্টিফানো—সে লেফট আউটেই হোক, আর রাইট আউটেই হোক বা নিজের রক্ষণভাগের যে কোনো জায়গাতেই হোক। তাঁর ছিল খেলা বোঝার অসামান্য ক্ষমতা। দলের সমস্ত খেলোয়াড় যেন এক সুতোয় বাঁধা, আর সেই সুতো ধরে টানতেন ডি' স্টিফানো। তাঁর খেলা সত্যিই অসাধারণ, কোনদিনও তাঁর খেলা ভুলতে পারব না। এখনও চোখ বুঝলে আমি ডি' স্টিফানোর মুখ দেখতে পাই।

এখন খেলার মাঠ থেকে অবসর নিয়েছি। মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় সেইসব পুরোনো দিনের খেলোয়াড়দের কথা—বলরাম, পি কে, জার্নেল, অরুণ ঘোষ। এখনো মাঠে যাই, খেলা দেখি। ভাল লাগে হাবিব আর সুধীর কর্মকারকে।

এতক্ষণ ফুটবলের কথা বললাম, এবার ক্রিকেটের দুটি ঘটনার কথা বলব। ক্রিকেটে আমি টেস্ট খেলিনি, আর খেলেছিও কম, কিন্তু সেখানকার সামান্য সাফল্যই আমাকে আনন্দ দিয়েছে প্রচুর।

১৯৬৬ সালে সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম হারে মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের সম্মিলিত দলের বিরুদ্ধে। সেই খেলাটিতে আমি খেলেছিলাম। আটটি উইকেট পেয়েছিলাম, রান করেছিলাম ৩২, ক্যাচ ধরেছিলাম দুটো। খেলাটি জিতেছিলাম ইনিংসে। দ্বিতীয় ইনিংসে যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ জুটি লেস্টার কিং ও গ্রিফিথ ব্যাট করছে তখন আমাদের রান অতিক্রম করতে ওদের সামান্য বাকী।

জলপানের বিরতিতে অধিনায়ক হনুমন্ত সিং আমাদের ডেকে বললেন, "তোমরা করছ কী! এতগুলো উইকেট নিলে আর এই উইকেটটা নিতে পারছ না। ওরা যদি আমাদের চেয়ে দশ রানও এগিয়ে যায় তাহলে সর্বনাশ হবে! হল, গ্রিফিথ, কিং এমন বল করবে যে, আমরা দশ রানের মধ্যেই আউট হয়ে যেতে পারি। শুধু তাই নয়, বাড়ি ফেরার বদলে আমাদের

ক্রিকেটের চুনী

অনেককেই হয়ত হাসপাতালে যেতে হতে পারে। কাজেই প্রাণপণে চেষ্টা কর যাতে আর ব্যাট করতে না হয়।" সব শুনে একটু নার্ভাস হয়ে পড়লাম, আর প্রার্থনা করলাম যেন আমার কাছে ক্যাচ না আসে!

কিন্তু আমার কাছেই এল ক্যাচ। সুব্রতর বলে কিংয়ের ক্যাচ। সমস্ত মনপ্রাণ সংযোগ করে সেই ক্যাচটি ধরেছিলাম। আনন্দের আতিশয্যে ক্যাচটি ধরার পরেই শুয়ে পড়েছিলাম মাটিতে, আর দলের সব কজন খেলোয়াড় ফেলেছিল স্বস্তির নিশ্বাস।

দ্বিতীয় খেলাটি ছিল ১৯৬৯ সালের রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। বোম্বাইতে খেলা। বোম্বাই দলে ছিল অজিত ওয়াড়েকর, সুনীল গাভাসকার, রমাকান্ত দেশাই প্রমুখ বাঘা-বাঘা খেলোয়াড়। যা টিম, তাতে আমাদের জেতার আশা ছিল খুব কম।

খেলার দিন সকালে উঠে দেখি, আমার বিছানার তলায় যে একশ টাকার নোটটা ছিল সেটা আর নেই। আমার কাছে আর কোনো টাকা ছিল না। এটা কলকাতা নয়, বোম্বাই। কারও কাছে গিয়ে যে টাকা চাইব, সে উপায়ও নেই। আমাদের দলের ম্যানেজার কমলদা সব শুনে বললেন, "তাতে কী হয়েছে, তুমি একশ রান কর আমি তোমায় দুশ টাকা দেব।" মনে মনে বললাম, একশ করা কি মুখের কথা। তার ওপর দেশাই যা বল করছে, দশ মিনিট টিঁকে থাকতে পারলে হয়!"

সেই ম্যাচে দু ইনিংসে আমি রান করেছিলাম ৯৬ আর ৮৬। অল্পের জন্যে দুবার একশ করা হল না, ওদিকে আবার একশ টাকার নোট হারিয়ে গেল। সেবার সবশুদ্ধ আমি তিনটে একশ হারালাম।

ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ

শৈলেন ঘোষ

ময়ূরকণ্ঠী রঙ
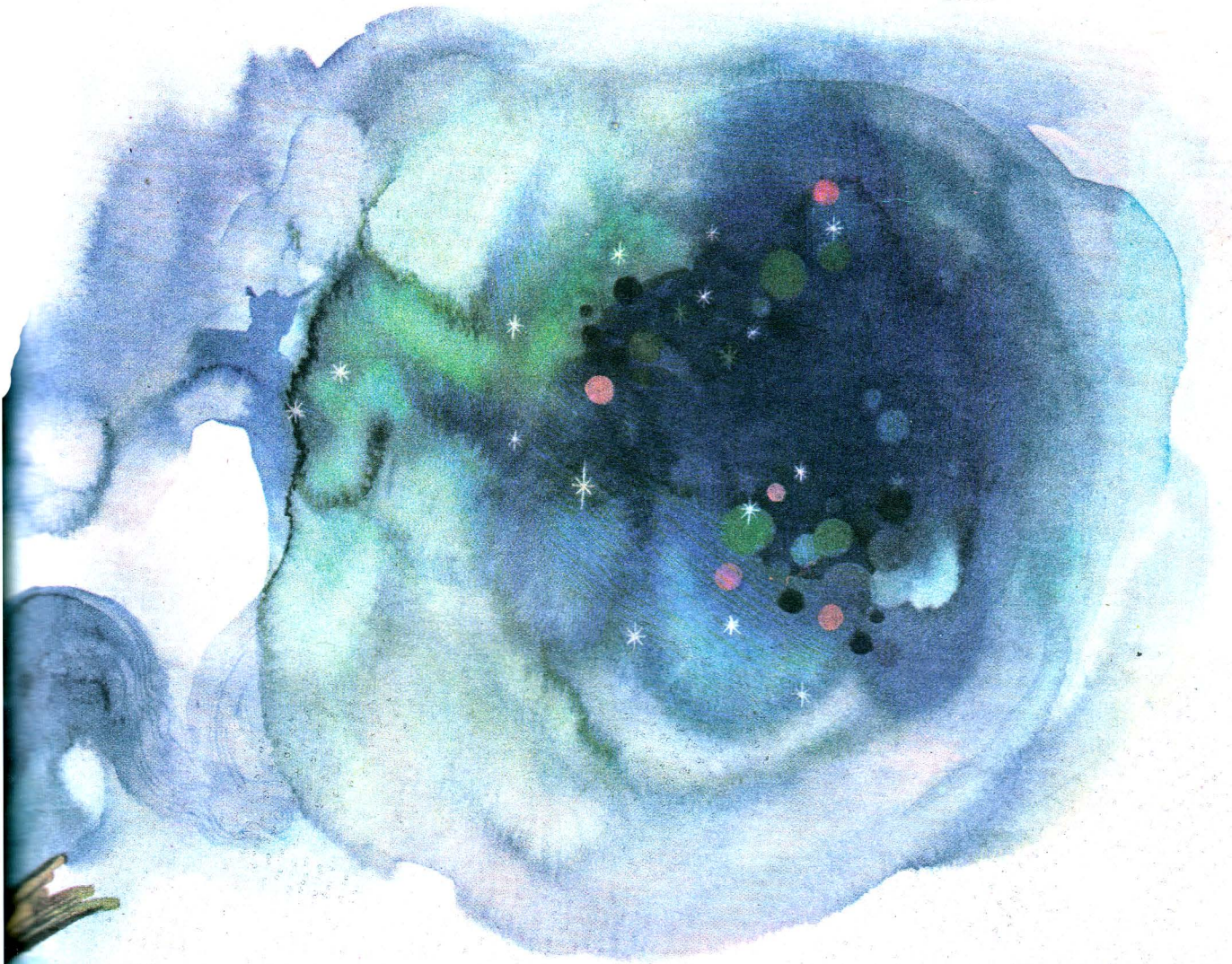
ওর নাম যদি জগন্নাথ হয়, তবে ওর বন্ধুর নাম মানিক।

অবিশ্যি মানিক বললে অনেকেই তাকে চিনবে না। কেননা, মানিক ওর ভালো নাম। ওর ডাক-নাম মাকু। মানিককে কেউ মাকু বলে ডাকলে রাগে জ্বলে যায় জগন্নাথ। ও বুঝেই পায় না, এমন একটা সুন্দর নাম অমন কুচ্ছিত হয়ে যায় কী করে! ভীষণ খারাপ লাগে জগন্নাথের। ওর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, তোমরা ওকে মাকু বলে ডাকবে না। ওর নাম, মানিক—মানিক, বুঝলে!

বুঝবে কে? বুঝবে তো মুখের এই ঠোঁট দুটো। কিন্তু তারাই যদি বেঁকে বসে থাকে! এই ঠোঁট দুটোই যদি এঁকে-বেঁকে মানিককে মাকু বলে মুখের ফাঁকে নাচতে থাকে! তবে কী করা! যাই বলো, ঠোঁটের কেরামতি আছে। নইলে, ঝকমককান্তি মানিকের ঘষা-কাঁচের মত এমন ম্যাড়মেড়ে বেহাল অবস্থা হয়!

যে যাই বলুক, ওকে মানিক বলেই ডাকে জগন্নাথ। ডাকতে ভালো লাগে। ভালো লাগে যেমন মানিককে, তেমনি ভালো লাগে ওর নামটা। মাঝে মাঝে জগন্নাথের মনটা কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। ঠিক তখুনি যদি হঠাৎ মানিকের মুখটা ওর চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে, তখন আলোয় ভরে যায় ওর সারাটা মন। মানিকের রঙিন আলোয়! তখন যেন আরও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে মানিককে। আর ভাবতে ইচ্ছে করে, ওর নামটা যদি জগন্নাথ না হয়ে সোনা হতো! মানিক যদি জগন্নাথকে সোনা বলে ডাকে! বেশ হয়! জগন্নাথ সোনা, আর ও মানিক!

কিন্তু তা তো হয় না। হবে কেমন করে? জগন্নাথের মনের কথা তো আর মানিক জানে না। নিজের মনের কথা বলতে ভারী লজ্জা করে জগন্নাথের। ও যদি হাসে! হয়তো, যখন খুব ছোট্ট ছিল জগন্নাথ, তখন তোমাদের মত জগন্নাথের মা-ও হয়তো ছেলেকে কোলে নিয়ে 'সোনা-সোনা' বলে কত আদর করেছে! কিন্তু মায়ের সেই আদরের সোনা-ডাক কোনদিনই জগন্নাথের নাম হল না। কেউ ডাকেনি ওকে সোনা বলে।

সত্যি, জগন্নাথ নামটা কেমন যেন! নাম শুনলে হাসি পায়! তোমাদের আর দোষ দেব কী! নিজের নাম শুনলে জগন্নাথের নিজেরই হাসি পায়! অবিশ্যি নামটা যে খুব খারাপ, তা কেউ বলতে পারো না। তবে হ্যাঁ, একটু সেকেলে-সেকেলে! তবু যতই হোক ঠাকুরের নাম তো! তাই বলে যেন ভেবে বসো না, ঠাকুরের মত আমাদের জগন্নাথও জবুথবু! ঠাকুর-জগন্নাথ যে কেন অমন হাত-পা খুইয়ে চুপটি করে বসে থাকেন, তা জানে না ও। শুধু জানে, ঠাকুর ঠাকুরই। তিনি যা করেন, সবার ভালোর জন্যে করেন।

জগন্নাথ ঠিক তোমাদের মত। মানে, তোমাদের চেয়ে কিছুতেই বড় হবে না। মানিকও তাই। মাথায় অবিশ্যি মানিক একটু ঢ্যাঙা। কিন্তু তাই বলে যেন মনে করো না, মানিক

জগন্নাথের চেয়ে বড়। তোমরা প্রথম চোটে দেখলে ভাববে, মানিকের বুঝি বয়সের গাছপাথর নেই। ওকে দাদা বলা উচিত।

আসলে কী জানো এক-একজন এমনি হয়। বয়সের নামে খোঁজ নেই, কিন্তু গতরখানি মা-দুর্গার অসুর। অবিশ্যি মানিককে অসুর কেউ বলছে না। ওকে অসুর না বলে বরঞ্চ জগন্নাথকে কেউ যদি বলে হাড়গিলে, তবে একটুও রাগ করবে না জগন্নাথ। করবে কেন? যা রোগা-প্যাঁটকা চেহারা! সত্যি বলতে কী, ছেলেরা যদি হাড়ে-মাসে একটু শক্ত-সমর্থ না হয়, তো কেমন যেন ফ্যাকলা-ফ্যাকলা লাগে। ছেলেদের ধকল সামলাতে হয় কত! স্বাস্থ্য না-থাকলে দুর্দশার একশেষ! এই ধরো না, জগন্নাথকেই একবার যা ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছিল! কী পিটুনিই খেয়েছে। খেয়েছে মানে কি আর যার-তার হাতে, একেবারে খোদ মানিকের হাতে! অবাক হয়ে ভাবতে বসলে তো?

মানিককে কস্মিন্‌কালেও চিনত না জগন্নাথ। মানিকের সঙ্গে ভাব হওয়ার আগে ওর বন্ধু ছিল কোয়া। কোয়া জগন্নাথের কুকুর। কোয়া যখন খুব ছোট্ট, সবে হাঁটতে-চলতে শিখেছে, তখন ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিল জগন্নাথ।

সেবার খুব শীত। যাকে বলে শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। কুয়াশায় ঢেকে গেছে চোখের দৃষ্টি। রাত হয়েছে। কোয়া রাস্তায় পড়ে পড়ে কোঁকাচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে ঠাণ্ডাটা যখন দুষ্টুমি করে ওর গায়ে চিমটি কেটে দিচ্ছিল, তখন বেদম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শীতটাকে ধমক মারছিল। কী সুন্দর দেখতে কুকুরটাকে। গায়ের রঙটা ভেলভেটের মত কুচকুচে কালো। কানের পাশ দুটো সাদা ধবধবে। গোলগাল, নাদুস-নুদুস। দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে জগন্নাথ। ওইটুকুন একটা কুকুর-ছানার কষ্ট দেখে, ওরও ভারী কষ্ট লাগল। ভেবেছিল আশে-পাশে হয়তো ওর মা-ও আছে। গায়ে যে হাত দেবে সে আর সাহস হল না। বলা যায়, ওর মা যদি খ্যাঁক করে তেড়ে এসে কামড়ে দেয়! যতই হোক, ছেলে তো!

কিন্তু বড্ড মায়া লাগছিল জগন্নাথের। ঠাণ্ডায় ভারী কষ্ট হচ্ছে কুকুরটার। অত কী, জগন্নাথই ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। ওর আর দোষ কী! ও তো একটা এইটুকুন বাচ্চা প্রাণী। এই হাড়-কাঁপুনী শীত সহ্য করা কি আর ওর কম্ম! আহা!

"আ-তু-তু-তু," হাত বাড়িয়ে ডাক দিল জগন্নাথ।

ল্যাজটা নেড়ে দিল কুকুরটা। চোখ দুটো পিট-পিটিয়ে নেচে উঠল। ও যেন উঠে বসবার চেষ্টা করল।

জগন্নাথ আবার ডাক দিল, "তু-তু।"

সত্যিই, উঠে বসে জোরে জোরে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

ওর গালটা টিপে দিয়ে এত আদর করতে ইচ্ছে করছে জগন্নাথের। হাত বাড়াল জগন্নাথ। বাচ্ছাটা মুখ বাড়িয়ে জগন্নাথের হাতে মাথা ঠেকাল। জগন্নাথ ওকে কোলে তুলে নিল। জগন্নাথের কোলের মধ্যে গোল্লা পাকিয়ে সেঁদিয়ে গেল বাচ্ছাটা। ঠাণ্ডায় জগন্নাথের কোলের মধ্যে ও যেন ডুবে যেতে চাইছে। জগন্নাথ আদর করে ওর মুখখানা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলে, "তোর মা কোথায়?"

বাচ্ছাটা কী বুঝল কে জানে, চেঁচিয়ে উঠল, "কোয়া, কোয়া!"

কোয়া! কোয়া! কুকুর-ছানা কী বলছে জগন্নাথ আর বুঝবে কী! তাই আবার জিজ্ঞেস করলে, "কী বলছিস?"

কুকুর ডাকলে, "কোয়া, কোয়া!"

"খিদে পেয়েছে?"

"কোয়া, কোয়া!"

"যাঃ বাব্বা!" হেসে ফেললে জগন্নাথ, কী মজা দেখো, যা-ই জিজ্ঞেস করি, কোয়া, কোয়া!"

জগন্নাথ হেসে ফেলতেই কুকুরটাও ওর হাতটা চেটে দিল।

জগন্নাথ বললে, "হাত চাটলে কী করব। খাবার-দাবার কিচ্ছু নেই। আমার হাত ফোক্কা, ট্যাঁকও ঢুনঢুন। তোর নাম কী?"

"কোয়া কোয়া।"

"কোয়া, কোয়া," চিৎকার করে উঠলো জগন্নাথ। দু হাত দিয়ে লুফে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, "কোয়া, কোয়া। কে রাখল তোর এমন নাম?"

জগন্নাথের বুকটা জড়িয়ে ধরেই কুকুর-ছানা ল্যাজ নাড়তে নাড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, "কোয়া—কো—য়া!"

জগন্নাথ খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে ওরই মত করে ডাক দিল, "কোয়া—কো—য়া। আমিও তোকে কোয়া বলেই ডাকি। চ, শুবি চ।"

শোবে আর কোথায়! শোবে তো এখানেই। যেখানে ও শুয়ে ছিল। এই রাস্তায়।

রাস্তার ওপরই শুইয়ে দিল জগন্নাথ কুকুর-ছানাটাকে। ছানাও লক্ষ্মীটির মত শুয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াল জগন্নাথ। তারপর পথ হাঁটল।

জগন্নাথ একটুখানি পথ হেঁটেছে কি হাঁটেনি, এই দেখো, কুকুর-ছানাটাও পিছু হাঁটছে। একেবারে জগন্নাথের পায়ে-পায়ে। প্রথমটা জগন্নাথ টেরই পায়নি। কিন্তু হঠাৎ যখন আলটপ্‌কা কুকুর-ছানার মাথাটা ওর পায়ে ঠেকল, জগন্নাথ চমকে উঠেছে। ফিরে দেখার আগেই ও ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দিলে।

জগন্নাথ চেঁচালে, "এই কোথা যাচ্ছিস? পালা, পালা।"

থমকে দাঁড়িয়ে ছানাটা চেয়ে রইল জগন্নাথের চোখের দিকে, আর ল্যাজ নাড়তে লাগল।

জগন্নাথ ওকে তুলে নিলে। "ওরে, তুই তো ভারী দুষ্টু," বলতে বলতে যেখানে ও শুয়ে ছিল, সেখানে নিয়ে চলল। তারপর নিজের জায়গায় ফিরিয়ে এনে কুকুরকে শোয়াতে শোয়াতে বললে, "ফের দুষ্টুমি করলে কান মলে দেব। চুপটি করে শুয়ে থাকবি!" বলে জগন্নাথ নিজে ফিরে দাঁড়াল। কুকুর-ছানা ডেকে উঠল, "কিঁউ—কোয়া।"

জগন্নাথ আবার হেসে ফেলল। মনে মনে ভাবল, "না, বেশী আদর না দেওয়াই ভাল। যতই হোক কুকুর তো! একবার পেয়ে বসলেই মুশকিল, মাথায় উঠবে।"

জগন্নাথ হাঁটতে লাগল। এবার একটু জোরে-জোরে। কুকুরও ছুটে এল নড়ে নড়ে। জগন্নাথ ভাবলে, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! জগন্নাথ ছুট দিলে। কুকুরও ছুটল। ছুটল বটে কিন্তু জগন্নাথের লম্বা পায়ের লম্বা ছুট। ওই ছোট্ট কুকুর কেমন করে পাল্লা দেবে! কাজেই কুকুর খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ছুটতে-ছুটতে কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে কাঁদতে লাগল। জগন্নাথের ছোটা হল না। দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবলে, ব্যাপারটা কী! কুকুরটারও কি আমার মত মা নেই! বুকটা চমকে উঠল জগন্নাথের।

মা নেই। কুকুরের নেই। জগন্নাথেরও নেই।

জগন্নাথ জ্ঞানে কখনও মাকে দেখেনি। মা কেমন, মায়ের আদর কেমন, জগন্নাথ জানে না। অন্যের মাকে দেখলে ও ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। জগন্নাথ ভাবে, ওর মা-ও কি আর সকলের মায়ের মত অমনি।

অমনি কি না জানে না জগন্নাথ। শুধু জানে তার মা নেই। মাঝে মাঝে যখন চুপটি করে ভাবে মায়ের কথা, ভাবে, ওই গাছ-গাছালি মাঠের দিকে চেয়ে, কিম্বা রাতের আঁধার-ঘেরা আকাশের দিকে চেয়ে, তখন কেমন আনন্দ-খুশিতে ওর মনটা আর ছোট্ট এই বুকটা দুলে ওঠে। ও বাবাকে জড়িয়ে

ওরে বলে, "বাবা, মায়ের গল্প বলো।"

বাবার কাছে গল্প শুনতে-শুনতে ওর মায়ের মুখটি যেন স্বপ্নের মত ভেসে উঠত ওর চোখের পাতায়। মায়ের পরনে নীল রঙের শাড়ি। পায়ে ঝুমুর-ঝুমুর মল। হাতে বালা। কপাল-জোড়া টকটকে লাল সিঁদুরের ফোঁটা।

কিন্তু আর কিছু জানে না জগন্নাথ। জানে না, ও যখন ছোট্ট ছিল, ওর কপালে মা আদর করে চুমু খেয়েছে কিনা। কিম্বা নিঝুম রাতে গুনগুন গান গেয়ে ওর চোখের তারায় স্বপ্ন-সোনা ঘুমের জাদু ছড়িয়ে দিয়েছিল কিনা!

কুকুরটা আবার ডেকে উঠল, "কোয়া, কোয়া।"

জগন্নাথের হাসি পেয়ে গেল। দুষ্টু বুদ্ধিটা কিলবিল করে উঠল জগন্নাথের মাথার ভেতরে। ইচ্ছে হল কুকুরের সঙ্গে মজা করে। ছুটল জগন্নাথ। কুকুরটাও পিছু নিল। লুকিয়ে পড়ল জগন্নাথ। কুকুরটাও দেখতে পেল। লাফ দিল জগন্নাথ। কুকুরটাও লাফিয়ে উঠল। হেসে উঠল জগন্নাথ। কুকুরটাও ডেকে উঠল। খুশির ডাক। তারপর জগন্নাথের কোলের ওপর লাফিয়ে ওঠার জন্য দু পা বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। জগন্নাথ লুফে নিল দু হাত বাড়িয়ে কুকুর-ছানাকে। নিজের কাঁধের ওপর বসিয়ে বললে, "চ তুই আমার সঙ্গে। তোকে পোষ মানাব।"

কুকুর-ছানা কী বুঝল কে জানে। জগন্নাথের ঘাড়ে বসে কান চেটে দিলে। জগন্নাথ হাঁটতে লাগল। তারপর গান শুরু করে দিলে। জগন্নাথ গাইতে জানে। তবে কি আর তেমন! ওর বাবা গান গাইত। যুদ্ধের গান। কদম কদম পা ফেলে ওর বাবা সৈনিকদের যে-গানটা গাইত, সেই গান। একটাই গান জানত ওর বাবা। জগন্নাথও জানে সেই একটা গানের আধখানা। সেই আধখানা গানই কদম কদম পা ফেলে এখন ও গাইতে-গাইতে চলবে। চলবে কুকুরকে কাঁধে নিয়ে।

কোথায় চলবে?

তা কেউ জানে না। এই রাতের অন্ধকার অথবা ওই ভোরের আকাশ, কেউ ওকে বেঁধে রাখবে না। রাখতে পারে না। কেননা, কেউ নেই ওর। ও একা। যার কেউ নেই, তাকে কে বাঁধতে পারে?

অবিশ্যি জগন্নাথ আগে ভাবত, ওর কেউ নেই। এখন আর ভাবে না। আগে তো জগন্নাথ আরও ছোট্ট ছিল, তাই ভাবতে ভাবতে ওর চোখ দুটি ছলছল করে বুজে আসত! এখন? চোখে জল আসে না। এখন ও জানে, এই যে পথ চলে গেছে সামনে দিয়ে, এ-পথ দিয়ে ও যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে। কেউ বকবে না। আর সবার মত এ-পথটাও জগন্নাথের নিজের। খুব আপনার। এ-পথ ছাড়া ওর আর কিছু নেই।

আর কেন বলি কিছু নেই? বরঞ্চ এতদিন বলা যেত ওর কিছু ছিল না। আজ আছে। একটা কুকুর-ছানা। কোয়া। আপাতত কোয়া ওর কাঁধে চড়ে চলবে-চলবে-চলবে।

কোয়া নামটা জগন্নাথ ভালোই রেখেছে। কিন্তু এই ভাল নামটা রাখতে জগন্নাথকে তো আর মাথা ঘামাতে হয়নি। কুকুর-ছানা নিজেই ডাকল "কোয়া, কোয়া", আর অমনি ওই কোয়া ডাকটা নাম হয়ে জগন্নাথের মুখ ফুটে বেরিয়ে এল। এতে জগন্নাথের বাহাদুরিটা কী আছে! এখন তাকে অবশ্য মাথা ঘামাতে হচ্ছে, অন্য কথা ভেবে। কথাটা হচ্ছে, এখন কুকুরকে সে খেতে দেবে কী! নিজে না হয় দুদিন পেট কোলে করে বসে থাকা যায়, কিন্তু কুকুর? কুকুর তো আর শুনবে না। তাছাড়া কুকুরের কাছে ওরও তো একটা মান-ইজ্জত আছে। যতই হোক কুকুর এখন তার অতিথি। খাতির-যত্ন ঠিক-ঠিক না হলে লোকে নিন্দে করবে না!

সত্যি কথা বলতে কী, এর ওর কাছে হাত পাততে জগন্নাথের কী ঘেন্নাই লাগে! সে কি ভিখিরি! যারা দু বেলা হাত পেতে ভিক্ষে করে বেড়ায়, তাদের দু চক্ষে দেখতে পারে না জগন্নাথ। লোকগুলোর হাত আছে, পা আছে, খেটে খেতে পারে তো! চেয়ে খেতে লজ্জা করে না।

না-খেতে পেলেও জগন্নাথ মুখ বুজে পড়ে থাকবে, তবু কাউকে কিছু বলবে না। তবে ও পারে, খুব খাটতে পারে। খাটতে পারে বলেই, এর তার বাড়িতে কাজ খুঁজে বেড়ায়। হয়তো কারো বাড়িতে ক বালতি জল তুলে দিল, কিম্বা ফুল-বাগানে মাটি কেটে দিল। আর না হয় তো, কেউ বললে, ছাগল চরাতে মাঠে চলল। যদি কিছু না মেলে, রাস্তা থেকে ছেঁড়া-ফেলা কাগজ কুড়িয়ে, থলে ভর্তি করে, বাজারে ছেঁড়া কাগজের খরিদ্দারকে বেচে এল। এতে ওর লজ্জা নেই। এ-কাজ করতে ওর ভাল লাগে। ওর বাবা বলেছে, কাজ ছাড়া কে বাঁচতে পারে। আকাশের ওই সূর্যটা সারাদিন ধরে আলো দিচ্ছে, সে কাজ করছে। আমাদের এই পৃথিবীটা সারা বছর, সারাক্ষণ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সে-ও কাজ করছে। তাই দিন হচ্ছে, রাত আসছে। গ্রীষ্ম যাচ্ছে, বর্ষা আসছে। মাঠে ফসল ফলছে। শরৎ আসছে, পুজো হচ্ছে। আর চেয়ে দেখলেই চোখে পড়বে, গাছের ফাঁক, খড়-কুটোর বাসায়, মা-পাখি ছানার মুখে খাবার দিচ্ছে। কাজের কি শেষ আছে! আর ওই দেখো না, জগন্নাথের কাঁধে বসে কোয়া কেমন চলতে চলতে দোল খাচ্ছে! দোল খাচ্ছে বলে গড়িয়ে পড়ছে। মাটিতে ডিগবাজি খাবার আগেই আবার কেমন জগন্নাথের কাঁধটা খামচে ধরছে! এটাও তো কাজ!

কাজ কিনা কে জানে। তবে জগন্নাথের কাঁধে চেপে একটুও ভয় করছে না কোয়ার। ভারী মজা লাগছে। যতই হোক নিজের তো আর কষ্ট নেই। ও যদি কুকুর না হয়ে মানুষ হত, তাহলে এতক্ষণে হয়তো "হ্যাট হ্যাট" করে চেঁচিয়ে উঠত। আর জগন্নাথও তাহলে কোয়াকে পিঠে নিয়ে ছুটত। ঘোড়-দৌড়ের মত মানুষ-দৌড়!

ঘোড়া মানুষকে পিঠে নিয়ে ছোটে। সেটার না হয় মানে বুঝি। কিন্তু এখন মানুষ একটা কুকুর-ছানাকে কাঁধে নিয়ে হাঁটছে, এর কি কোন মানে খুঁজে পাচ্ছ? না, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছ?

শীতটা জব্বর পড়েছে। পেটে কিছু না পড়লে, সে তবু কথা শুনবে। কিন্তু এই কনকনে ঠান্ডা, সে তো আর বাগ মানবে না। তাকে যদি এখন জগন্নাথ বলে, "ও বুড়ী, শীত বুড়ী, তুমি এখন ঘরে যাও তো, কোয়ার বড্ড কষ্ট হচ্ছে" তা হলে পত্রপাঠ বুঝি শীতবুড়ী জগন্নাথের কথায় সুড়সুড় করে ঘরে সেঁদিয়ে পড়বে! আর সঙ্গে সঙ্গে ফুরফুর করে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেবে! সে-গুড়ে বালি! ভগবান মুখ দিয়েছেন কথা বলতে, মন দিয়েছেন ভাবতে, ভাবো না যা খুশি। তাতে শীতও যাচ্ছে না, বসন্তও আসছে না। আপাতত কোয়া নামে ওই কুকুর-ছানাকে কাঁধে নিয়ে লটর-পটর করে, এই শীতের মধ্যে, জগন্নাথকে হাঁটতেই হবে। একটাই শুধু ভয়। কুকুরটার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। বুকে সর্দি বসলে সে আর এক ফ্যাসাদ। ও তো আর এখন একা নয়। একা হলে ওর তো আর ভাবনা ছিল না কিছু। রাস্তা-ঘাট যেখানে হোক একটা মাথা গোঁজবার মত ঠাঁই পেলেই নিশ্চিন্ত। আচ্ছা, কোয়াও কি জগন্নাথের

মত হারিয়ে গেছে!

একে বলে কপাল। তা ছাড়া কী বলি! জগন্নাথ যদি হারিয়ে না যেত, তাহলে কি আর কোয়ার জন্যে এমন করে ভাবতে হত! সেই ছোট্ট বাড়িটা ওদের। এখনও চোখের ওপর স্পষ্ট ভাসছে জগন্নাথের। সামনে পলাশ গাছ। বসন্তের দিনে ফুলে ফুলে গাছ ভরে যেত। বকুল গাছের নীচ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতদিন ও বাবাকে বলেছে, "আঃ! কী মিষ্টি গন্ধ বাবা।" বকুল গাছের পাতার আড়াল থেকে নীল আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে এত ভাল লাগত জগন্নাথের।

ওর বাবা ছিল সৈনিক। দলের নায়ক। দু-দুবার যুদ্ধে গেছল ওর বাবা। দুরন্ত মরুভূমির যুদ্ধে ওর বাবা শত্রুকে ঘায়েল করে পেয়েছিল বীরচক্র। হয়েছিল একটা গোটা দলের নায়ক। সত্যিই বীরের মত বুক ফুলিয়ে জগন্নাথের বাবা যখন শত্রুর ঘাঁটির দিকে এগিয়ে চলত, দেখে মনে হত মরতে ভয় নেই নায়কের। থমকে দাঁড়াতে জানে না নায়ক।

সত্যিই তাই। থমকে দাঁড়াতে জানে না বলেই একবার শত্রুর কামানের মুখোমুখি পড়ে গেছলো নায়ক আর তার গোটা দলটা। সেবার যুদ্ধ হয়েছিল গভীর জঙ্গলে। জঙ্গলের যুদ্ধে লুকিয়ে-ছাপিয়ে শত্রুকে খতম করা যেমন সহজ, তেমনি ভয় তো নিজেদেরও অনেক। কারণ জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড় থেকে কখন শত্রু আচমকা আক্রমণ করে বসবে, সে তো কেউ জানে না। কোথায় শত্রু-সৈন্য ঘাপটি মেরে বসে আছে, তার টের পাওয়াই মুশকিল।

সেদিন রাতে চাঁদ উঠেছিল। জঙ্গলে নানান রকমের অসংখ্য গাছ মাথা তুলে চাঁদের আলো আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোথাও, যেখানে যুদ্ধের আগুনে গাছের পাতা ঝলসে ঝরে পড়েছে, কিম্বা বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত গাছ লুটিয়ে পড়েছে, সেখানে মুঠো মুঠো চাঁদের আলো ছড়িয়ে পাতা-বাহারের আলপনা এঁকেছে। আর ছায়া-ছায়া গাছের পাতা সেই আলপনার ওপর ঝুনঝুনি বাজিয়ে নাচছে। বেশ কিছুটা দূরে এই জঙ্গলের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। নদীর ওপারে শত্রু-ঘাঁটি। নদীটা এপার-ওপার খুব চওড়া না হলেও, খুব গভীর। কেউ যদি স্রোতের টানে বেসামাল হয়ে পড়ে, তা হলে তার রক্ষে নেই। অতল জলে হাবুডুবু খেতে খেতে নির্ঘাত মরবে। নদীর ওপর একটা কাঠের তৈরি সাঁকো। এই পারের জঙ্গলের রাস্তা ওই সাঁকোর ওপর দিয়ে ওপারের জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। হুকুম হয়েছে, সে-রাত্রে নদী পেরিয়ে ওপারের শত্রু-ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে।

জঙ্গলে রাতের নিস্তব্ধতা। এই নিস্তব্ধতা ভেঙে-ভেঙে ঝিঁঝির ডাক এদিক-ওদিক থেকে ভেসে আসছে। মাঝে-মাঝে পাতার ফাঁকে-ফাঁকে পাখ-পাখালির ডানা নাড়ার শব্দ। চাঁদের আলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে জোনাকিরা নেচে বেড়াচ্ছে।

বীর নায়ক এগিয়ে চলেছে আগে-আগে। তার পেছনে দলের আর সকলে। কী সাবধানে পা ফেলছে ওরা। আলতো আলতো ডিঙি মেরে। নায়ক ইশারা করলেই ওরা থামছে। আবার হাঁটছে। লক্ষ্য নদীর ওপর ওই কাঠের সাঁকো। শত্রু টের পাবার আগেই ওই সাঁকো পেরুতে হবে। কারো মুখে কোন কথা নেই। শুধু ওই কজন জওয়ানের নিশ্বাসের শব্দ। ওদের পায়ের চাপে ঝোপ-ঝাড়ের ডাল-পালা দুমড়ে হঠাৎ-হঠাৎ যে শব্দটুকু শোনা যাচ্ছে, তাতেই যেন জঙ্গলের বুকটা চমকে উঠছে।

হঠাৎ খসখস! কিসের যেন আওয়াজ শোনা গেল! হাঁটতে হাঁটতে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নায়ক। দাঁড়াল সৈনিকের দল। ঝটপট শুয়ে পড়ল বুকের ওপর ভর দিয়ে। জমাট নির্জনতা। নেকড়ে বাঘের মত ওঁত পেতে ওরা নিশ্চুপ হয়ে রইল। না, কিছুই নজরে পড়ল না। আর কোন খসখসানিও শোনা গেল না। তবু এখনই দাঁড়িয়ে

উঠে এগোলে চলবে না। বুকের ওপর ভর দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। একটুখানি মাত্তর গেছে, ওই দেখো একটা ভালুক! হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। বুঝতে বাকি রইল না, এই ভালুক-মহারাজই ওদের ভড়কি দিয়েছে। যখন ভালুক দেখা গেছে, তখন হয়তো আরও ভয়ংকর কোন জন্তুও থাকতে পারে এই জংগলে। কথায় বলে বাঘ-ভালুকের জংগল। তবে জন্তুর ভয়ে তো আর সৈনিক পালাবে না, যুদ্ধ থামবে না। সৈনিক এগিয়ে যাবে।

নায়ক এবার উঠে দাঁড়াল। নায়কের সংগে আর সকলে। বন্দুকের নল উঁচিয়ে পা ফেলল।

আর-একটু এগোতেই কাঠের সাঁকোটা ওদের নজরে পড়ল। নায়ক দেখল, নদীর জলে ভাঙা-ভাঙা ঢেউয়ের গায়ে জ্যোৎস্নার আলো বিন্দু-বিন্দু লক্ষ-লক্ষ মুক্তার মত দোলা খাচ্ছে।

নায়কের নির্দেশে থমকে দাঁড়াল গোটা দলটা। গাছের আড়ালে আড়ালে আড়ি পাতলে। সাঁকো পেরুবার আগে সব কিছু আর-একবার ভাল করে দেখে নিতে হবে। দেখতে হবে. সামনের পথ পরিষ্কার কিনা, শত্রু কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে কিনা। থমথম করছে চারিদিক। শুধু ছল-ছলিয়ে নদীর জল উপছে পড়ছে পাড়ে-পাড়ে। নজরে পড়ল একটা হরিণ-ছানা আর তার মা মুখ নিচু করে জল খাচ্ছে। চুকচুক। ওরা ভারী নিশ্চিন্ত। জানে না, একটু পরে এই জঙ্গল তোলপাড় করে বাঁচা-মরার লড়াই শুরু হয়ে যাবে। সৈনিকের দল গাছের আড়াল থেকে সতর্ক পা ফেলে বেরিয়ে এল। বাজপাখির মত তীক্ষ্ন চোখে চেয়ে দেখলে। সজাগ কান। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ওরা। নায়কের সংগে হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সৈনিকের দল।

কিছুটা এগোতেই নাগালের মধ্যে পেঁছে গেল। ওই দেখা যাচ্ছে সাঁকো। এবার অত্যন্ত সাবধানে উঠে দাঁড়াল। ওদের সন্ধানী চোখের দৃষ্টি নদীর ওপারে স্থির হয়ে চেয়ে রইল।

গুড়ুম—গুড়ুম!

আচমকা গুলি।

"ক্যাঁচ-ক্যাঁচ", একটা পেঁচা ডেকে উঠে ঝটপট উড়ে পালাল। ঝটর-পটর ডানা ঝাপটা দিয়ে আর কিচির-মিচির করতে-করতে পাখি—পাখি, অসংখ্য পাখি নিজেদের বাসা ছেড়ে চাঁদের আলোয় ছোটাছুটি লাগিয়ে দিলে। এতক্ষণে হয়তো সেই হরিণ-ছানা আর তার মা প্রাণপণে ছুট দিয়ে পগাড় পাড়। সৈনিকের দল এই আচমকা আক্রমণে প্রথমটা হকচকিয়ে গেছল। কিন্তু তারপরেই ঝুপঝাপ মাটির ওপর শুয়ে পড়ল। এখানে কোথাও-কোথাও নদীর জলে কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। আবার কোথাও বা কাঁটা-ঝোপের ঝাড়।

আবার গুড়ুম—গুড়ুম!

এবার এদিক থেকে উত্তর গেল, কড়-কড়-কড়-ড়-ড়! গুড়ুম—গুড়ুম!

তারপর গুড়ুম—গুড়ুম!

কড়-কড়-ড়-ড়।

গুড়ুম!

ঠাঁই—ঠাঁই—ঠাঁই!

যুদ্ধ লেগে গেল। নিস্তব্ধ, নির্জন জঙ্গল চকিতে গোলা-বারুদের আগুনে ঝলসে উঠল। আকাশের চাঁদের আলো, বারুদের মিশকালো ধোঁয়ার আড়ালে হারিয়ে গেল।

নায়কের হুকুম, যেমন করেই হোক নদীর ওই সাঁকো তাদের দখলে আনতে হবে। বন্দুকের গুলির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তারা এগোবার চেষ্টা করছে। শুরু হয়ে গেল মুখোমুখি লড়াই। এক তিল মাটির জন্যে গুড়ুম—গুড়ুম!

গাছে-গাছে আগুন লেগে গেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। আগুন মাথায় নিয়ে চুপচাপ ঝলসে-ঝলসে পুড়তে লাগল বনের গাছ-গাছালি। নায়ক এগিয়ে গেল সাঁকোর দিকে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে। নায়কের সংগে এগিয়ে চলল সৈনিকেরা। ওরা আর থামবে না। শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে ওরা পেঁছে যাবে নদীর ওপারে!

এবার ওরা সটান সাঁকোর ওপর উঠে এসেছে। এবার নির্ঘাত ওরা পেঁছে যাবে সাঁকোর ওপারে।

নায়ক চেঁচিয়ে উঠল, "আগে বাড়ো।"

গুড়ুম—গুড়ুম!

চারিদিক থেকে গুলি ছুটে-ছুটে আসছে। ওরা এবার তীরের মত ছুটে চলল—নায়কের সংগে সাঁকোটা জয় করতে। ওরা চিৎকার করে উঠল। সংগে-সংগে প্রচণ্ড আওয়াজ করে কী যেন ফেটে পড়ল—দুম!

আগুন—আগুন। যেদিকে চাও আগুন। কুণ্ডুলি পাকিয়ে, ঘন কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে ওই ধোঁয়ার কুণ্ডুলি শূন্যে মিলিয়ে যেতেই নজরে পড়ল, সাঁকোটা ভেঙে গুঁড়িয়ে মুখ থুবড়ে নদীর ওপর পড়ে আছে। শত্রু উড়িয়ে দিয়েছে সাঁকোটা। সেই সংগে ছিটকে গেছে নায়ক আর তার গোটা দলটা। কে মরল, কে বাঁচল তখন আর ভাববার সময় নেই। বিপদ দেখে ভয় পেলেও চলবে না। তাই যারা বেঁচে রইল, তারা স্থির হয়ে নায়কের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

নায়ক নেই। ওই সাঁকোটা বোমার ঘায়ে ধ্বংস হওয়ার সংগে সংগে নায়কও নদীর জলে ছিটকে পড়েছে। নায়ক আর আদেশ দেবে না ওদের। নায়ক নদীর জলে ভেসে যাবে।

নায়ক সাঁতার জানে। নদীর জলে ভাসতে-ভাসতে সাঁতার কাটতে লাগল। বেঁচে গেছে। কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে নায়ক। নায়কের রক্তে নদীর জল রঙিন হয়ে উছলে উঠল।

জলে ভাসতে ভাসতে অনেকদূরে চলে গেছে নায়ক। রক্ষে এই, শত্রুর নজর পড়েনি তার দিকে। তাহলে হয়তো গুলির পর গুলি ছুড়ে ওর বুকখানা ঝাঁঝরা করে দিত।

জলে ভাসতে ভাসতে অনেকদূরে চলে গেল নায়ক। অনেকক্ষণ পর নদীর পাড়ে গিয়ে যখন তার দেহটা এলিয়ে পড়ল, তখনও ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। মাথা ঘুরছে নায়কের। মাথা আর তুলতে পারলে না নায়ক। অজ্ঞান হয়ে গেল!

আর কিছু জানে না নায়ক। জানে না কখন তাকে ওখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল দলের লোকেরা।

বেঁচে গেল নায়ক। ঘরেও ফিরে এল। কিন্তু আর তাকে কোনদিন যুদ্ধে যেতে হল না। কেননা, নায়কের ডান-পা সাঁকো-জয়ের যুদ্ধে গুলির আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে-পা কাটা গেছে। যুদ্ধের নায়ক, জগন্নাথের বাবা, এখন খোঁড়া!

কিন্তু এর জন্যে তার মনে কোন খেদ নেই। কারণ জগন্নাথের বাবা জানে, দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে-করতে যে মরে, সে তো বীর! তবু তার ভাবনা একটাই; এই খোঁড়া পা নিয়ে ছেলেটাকে সে মানুষ করবে কী করে! জগন্নাথ এখনও ছোট। বাবার খোঁড়া পা-টার দিকে তাকিয়ে থাকে জগন্নাথ, আর ভাবে, একদিন সে-ও যুদ্ধে যাবে। তার বাবার পা যারা খোঁড়া করে দিয়েছে, তাদের সংগে ও লড়াই করবে।

সহজে মুষড়ে পড়ার মানুষ ছিল না জগন্নাথের বাবা। পা নেই তো কী হয়েছে! তার এই চওড়া বুকখানা তো আর দুমড়ে যায়নি। এই হাত দুখানার তাগদ যতদিন আছে, সে কাকে ভয় পায়। সে যোদ্ধা। অনেক ঝড়ঝাপটা তার এই মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। অসংখ্য গোলাবারুদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে। তোয়াক্কা করেনি মরতে। বিপদ মাথায় নিয়ে এগিয়ে গেছে। বিপদকে জয় করে বাঁচার মধ্যে যে আনন্দ, সেই আনন্দকেই যেন খুঁজে বেড়ায় জগন্নাথের বাবা। ও জানে, তার ছেলেও একদিন বিপদকে জয় করতে শিখবে। বীরের ছেলে, সে-ও হবে বীর!

একটা গাড়ি কিনল জগন্নাথের বাবা, আর একটা ঘোড়া। কী সুন্দর হালকা নীল রঙের গাড়িটা! ঘোড়াটাও তেমনি সুন্দর। গাটা বাদামী রঙের। আর তেমনি ডগমগিয়াল। গাড়ির সামনে ঘোড়া জুতল জগন্নাথের বাবা। তারপর নিজে বসল কোচোয়ান হয়ে। সোয়ারি নিয়ে গাড়ি ছোটালে, "হ্যাট হ্যাট।" ঘোড়া ছুটল, টগবগ টগবগ।

পা গেছে বলে বসে বসে, কপাল চাপড়ে হা-হুতোশ করার লোক ছিল না জগন্নাথের বাবা। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া খাটিয়ে, উত্তরপাড়ার লোক দক্ষিণপাড়ায় পেঁাছে দিয়ে, ছেলেকে মানুষ করতে লাগল।

গাড়ি ছুটছে। দেখে মনে হত রাজপথে রাজার রথ ছুটছে। ঝকমক গাড়ি, টগবগ ঘোড়া। যার যখনই দরকার পড়ছে, তখনই জগন্নাথের বাবার কাছে ছুটছে। কেউ যাচ্ছে মামার বাড়ি, কেউ চলেছে দেশের বাড়ি, কেউ চলেছে হাওয়া খেতে, কেউ বা যাচ্ছে বিয়ে খেতে। আর গাড়ি যখন ছুটত না, তখন জগন্নাথের বাবা জগন্নাথকে কোলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে শহর ঘুরতে বেরুতো। পা গেছে তো কী হয়েছে? সারাদিনে খুঁটিনাটি হাজারটা কাজ করত জগন্নাথের বাবা ওই ঘোড়ার পিঠে চেপে। খোঁড়া পায়ে পথ চলতে ঘোড়া তার বন্ধু হয়ে গেল।

একবার জগন্নাথের বাবার ডাক পড়ল বিয়েবাড়িতে। কী করতে হবে? না গাড়ি করে কনেকে বরের সঙ্গে বরের ঘরে পেঁাছে দিতে হবে। কাল বিয়ে হয়েছে, সানাই বেজেছে। আর আজ সানাই থেমেছে, কনে গাঁটছড়া বেঁধে, মা-বাবার মায়া কাটিয়ে পরের ঘরে পর হয়ে চলে যাবে।

ফুল-পাতা দিয়ে গাড়ি সাজানো হল।

ঘোড়ার মাথায় রাঙন-পালকের সাজ পরানো হল। ঘোড়ার গলায় রেশমী কাপড়ের ঝিলিমিলি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। ঘোড়ার গলায় ঘুঙুর—ঝনঝন বাজতে লাগল।

জগন্নাথের বাবাও সাজল। যতই হোক, নতুন বিয়ের বর-কনে আজ তার গাড়িতে চেপে বাড়ি যাবে। সে না সাজলে, বিয়ে-বিয়ে মানাবে কেন? তাই জগন্নাথের বাবা চুরিদার পাজামা পায়ে দিল, জরিদার পাঞ্জাবি গায়ে দিল, আর সঙ্গে নিল রুপো বাঁধানো লাঠিটা। পা যেদিন থেকে গেছে সেদিন থেকে লাঠিটাই ওর চলার সাথী।

ভারী মানিয়েছে কিন্তু জগন্নাথের বাবাকে।

"হ্যাট-হ্যাট," বর-কনেকে নিয়ে গাড়ি ছুটল। অমনি ইংরিজী বাজনার ব্যাগপাইপ বেজে উঠল, প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ, ভ্যাঁপো—ভ্যাঁপো! সহিস হাঁকল, "সাম্‌নেসে হট্‌ যাও।"

ঘোড়া ছুটছে, টগবগ টগবগ।

গাড়ি ঘুরছে, খটখট, ঝটপট।

আলোর রোশনাই ঝকমক ঝকমক।

ছুটতে ছুটতে গাড়ি রাস্তার খানা-খন্দে যখনই টাল খাচ্ছে, কনের গা ভর্তি সোনা-দানা টুংটাং করে বেজে উঠছে।

ছুটতে ছুটতে ঘোড়া যখনই কদমে পা ফেলছে, গলার ঘুঙুর ঝমঝম করে নেচে উঠছে। বর-কনের ঘর-যাত্রা বেড়ে লাগছে দেখতে।

খানিকটা এসে, শহরটা শেষ হতেই, মাঠ পড়ল। তখন তো সাঁঝ নেমেছে, তাই মাঠ ধু-ধু গাঁ-ছমছম! লোকে বলে বদনাম আছে এ-মাঠের। এ-মাঠ পেরুতে দুর্গানাম জপতে হয়। এ-মাঠে ভয় আছে।

ভয় আছে না ঘেঁচু আছে। জগন্নাথের বাবা ওসব থোড়াই কেয়ার। বুক ফুলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "সামনেসে হটো।"

"সামনেসে হটো," চেঁচায় কেন সহিস? সামনে ওরা কারা? কপাল ভর্তি রক্তের ফোঁটা। কানে দুলছে রুপোর মাকড়ি। হাতে ঘুরছে লোহার বালা।

"হা-রে-রে-রে," করে হাঁক পেড়ে লাফিয়ে পড়ল গাড়ির সামনে। ঘোড়া চিঁহিহি করে, দুপা তুলে, দাঁড়িয়ে পড়ল পথের মাঝখানে। তারপর মার্‌ মার্‌' করে সেই রক্ত-ফোঁটা-পরা লোকগুলো লাঠি ঘোরাতে লাগল।

জগন্নাথের বাবার বুঝতে বাকি রইল না, এরা কারা। নতুন কনের সোনার সাজ এরা লুঠ করবে। এরা লুঠেরা। নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে, জগন্নাথের বাবা। বুঝেছে বর-কনেকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের রুপো-বাঁধানো লাঠিটা হাতে নিয়ে "তবে রে শয়তানের দল" বলে ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর এক পায়ে খাড়া। লুঠেরার দল হুংকার দিয়ে উঠল। হুংকার দিতে-দিতে লাঠি ঘোরাতে লাগল। অমনি জগন্নাথের বাবার হাতের লাঠি সাঁই-সাঁই করে গর্জে উঠেছে। তীরের বেগে লাঠি পড়ল কারো ঘাড়ে, কারো মাথায়। কেউ ছিটকে পড়ল মাটিতে, কারো মাথা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরল। কেউ পড়ে-পড়ে বেদম মার খেল। বাকীরা যে যেদিকে পারল মার ছুট্‌। ঘোড়া চার পা তুলে লাফিয়ে উঠে চিৎকার শুরু করে দিলে চিঁহিহি। জগন্নাথের বাবা সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া গাড়ি নিয়ে কদম-পায়ে ছুট দিলে। জগন্নাথের বাবা লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে হাঁক পাড়লে, "সামনেসে হটো—হটো"।

কোথায় গেল ইংরিজী বাজনার ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো আর কোথায় গেল সেই রঙ-বেরঙের আলোর রোশনাই! দে চম্পট! আপনি বাঁচলে বাপের নাম!

কী সাহস জগন্নাথের বাবার! মানুষটার একটা পা। এক পায়ে এ যে ভেলকি দেখাল জগন্নাথের বাবা। গাড়ি ছুটছে। গাড়ির ভেতর বসে-বসে বর কাঁপছে ঠকঠক করে। কনে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। লুঠেরা তাদের গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারেনি। কী বাহাদুরি জগন্নাথের বাবার।

গাড়ি যখন বরের বাড়ি পেঁাছল, তখন জগন্নাথের বাবার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। বর-কনেকে ঘরে তুলে দিয়ে যখন বিদায় নেবে, তখন কনের জ্ঞান এসেছে। ছুটে এসে জগন্নাথের বাবার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কেঁদে ফেললে। জগন্নাথের বাবা দু হাত দিয়ে কনেকে তুলে নিলে। মাথায় হাত দিয়ে বললে, "বোকা মেয়ে, কাঁদছিস কেন? আমি থাকতে তোর গায়ে কে হাত দেবে! জানিস আমি সৈনিক। যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার পা গেছে। পা থাকলে প্রাণ নিয়ে কেউ পালাতে পারত! কাঁদিস না মা। যা, ঘরে যা। তোদের আর ভয় নেই।" বলতে বলতে জগন্নাথের বাবারও চোখ ছলছলিয়ে উঠল। মাথায় হাত রেখে কনের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে, নিজের চোখের জল চোখে নিয়ে, গাড়ি ছুটিয়ে বাড়ি ফিরল।

The Pride of
Rajasthani
Craftsmanship...
Bhilwara
"Terene" Suitings
Simply superb in design, shade and texture.
Bhilwara Silk Mills Ltd.
24 Community Centre, East of Kailash,
New Delhi-110024.
Available at :
M/s. S. Ratanshi, 37, Armenian Street, Calcutta-700001
M/s. Chamanlal & Co., 25A, Jamnalal Bajaj Street, Calcutta-700007
Sobhagya/BSM/176

আজ বড্ড ক্লান্ত হয়ে গেছে জগন্নাথের বাবা। ঘোড়াকে রোজকার মত দলাই-মালাই করে দানাপানি দিয়ে ছেলের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। জগন্নাথ ঘুমিয়ে পড়েছে। এত ক্লান্তির মধ্যেও মনটা তার আজ ভারী তৃপ্ত। ভারী হাল্কা। মনে হচ্ছে, আজ যেন সত্যিকারের একটা কাজের মত কাজ করতে পেরেছে জগন্নাথের বাবা। ওই লুঠেরাদের সে শায়েস্তা করেছে। ওদের শয়তানি টুকরো-টুকরো করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওই খোঁড়া মানুষটা।

কখন যে ঘুম আপনি এসে চোখের পাতায় ডুব দিল, বুঝতে পারে না জগন্নাথের বাবা। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। এখন ওই ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালে মনে হবে, ওর মত এমন সুখী মানুষ বুঝি আর দুটি নেই। যতক্ষণ বুকের কাছে ওই ছেলেটা রয়েছে, ততক্ষণ কাকে ভয় করে সে! ভাবনা শুধু ছেলেটার জন্যে। এখনও সমর্থ হয়ে উঠতে তার অনেক দেরি। থাক দেরি, তবু নিশ্চিত জানে, এ ছেলে একদিন বড় হয়ে উঠে তার খোঁড়া বাপের দুঃখ ঘোচাবে। কোন্ বাপ না ছেলের কথা ভেবে স্বপ্ন দেখে? কে না ভাবে, তার ছেলে পাঁচজনের একজন হবে? জগন্নাথের বাবাও ভাবে। জগন্নাথের বাবাও স্বপ্ন দেখে। দেখে সেই ঝলমল আর সুন্দর দিনের ছবি। একদিন জগন্নাথের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনবে। তার শূন্য ঘরে আলো ফুটবে। কত আনন্দ, কত খুশি—

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জগন্নাথের বাবার। চোখের ভেতরটা এত জ্বলে উঠল কেন? চোখ মেলেই উঠে পড়েছে। হকচকিয়ে গেছে! এত ধোঁয়া এল কোত্থেকে ঘরের ভেতর! তড়িঘড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। ঘরের দরজা খুলতেই চমকে উঠেছে। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুন লেগেছে আস্তাবলে, তার সাধের ঘোড়ার গাড়িতে। চিৎকার করে উঠল, "আগুন।" সেই চিৎকার শুনে আস্তাবলের ঘোড়াও চিঁহি-চিঁহি ডাক ছেড়ে লাফালাফি লাগিয়ে দিলে। আগুনও লাফিয়ে-লাফিয়ে তার ঘরের দিকে ছুটে আসছে। বুকটা দুর-দুর করে শিউরে উঠল। ঘরে যে তার ছেলে ঘুমুচ্ছে! তাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু তার আগেই ওর মাথার ওপর লাঠি পড়ল, ধাঁই! ছিটকে পড়ে গেল ওই লম্বা-চওড়া মানুষটা। ওর ঘাড়ের ওপর কে যেন পা তুলে চাপ দিলে। চেয়ে দেখল জগন্নাথের বাবা। দেখল, সেই লুঠেরাদের সর্দার।

অত সহজে হেরে যাবার মানুষ নয় সে! একটা পা গেছে তার। কিন্তু হাত দুটো তো নুলো হয়ে যায়নি। দু হাত দিয়ে জাপটে ধরেছে সর্দারের ঠ্যাংটা। তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে চাপ দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে সর্দারকে ছিটকে ফেলে দিলে সাত হাত দূরে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে কোঁকাতে লাগলো সর্দার।

জগন্নাথের বাবা ছুটে ঘরে ঢুকে গেছে। ছেলেকে নিমেষের মধ্যে পিঠে তুলে নিল। এক পায়ে লাফ দিতে-দিতে ঘরের বাইরে। ততক্ষণে দুরন্ত আগুন ঘরের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে।

ভেবে পাচ্ছে না, এখন কী করবে সে! লাঠির ঘায়ে মাথা দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে! বাড়িটা যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সেদিকে তাকাবার আর ফুরসত নেই। ও বুঝতে পেরেছে ওই লুঠেরাদের দলই এই নিশুতি রাত্রে তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। হয়তো এবার তারা ওদের দুজনকেও মেরে ফেলবে। না, জগন্নাথকে মরতে দেবে না সে। ছেলেকে লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু কোথায়?

ওই যে ওরা! লুঠেরার দল। সামনে একটু দূরে ওরা দাঁড়িয়ে। ওদের হাতে বন্দুক! না, কারো কাছে কোনদিন মাথা হেঁট করেনি জগন্নাথের বাবা। বুক ফুলিয়ে, ওদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবল, এখন বোকার মত মুখোমুখি লড়াই করলে নিশ্চিত বিপদ! তাই ও চিৎকার করে ডাক দিল, "বাদামী।"

বাদামী তার ঘোড়ার নাম। ঘোড়া চিঁহি-চিঁহি-হি ডাক ছাড়লে। চোখের পলকে ছুটে এল তার কাছে। ছেলেকে কোলে নিয়ে বাবা এক পায়ে ভর দিয়েই লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া সেই ধোঁয়ার কালো ছায়ার আড়ালে ছুট দিলে। লুঠেরার দল চেঁচিয়ে উঠল, "ভাগলো, ভাগলো।"

সঙ্গে সঙ্গে লুঠেরাদের সর্দার হুংকার দিলে, "মার ডালো, মার ডালো।"

ঘোড়া তখন ছুটতে-ছুটতে রাস্তায় নেমেছে। সর্দারের হুকুম পেয়ে লুঠেরার দলও ঘোড়ার পিছু ছুট দিয়েছে। ওরা চেঁচাল, "থামো, থামো, নইলে জান যাবে।"

থামবে না জগন্নাথের বাবা! ওদের হুকুম তামিল করবে একজন সৈনিক? ও ভয় পাবে ওই নীচ লুঠবাজদের?

গুড়ুম—গুড়ুম! গুলি ছুটল।

ওই অত বড় বিশাল দেহটা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঘোড়া। ওর পায়ে বন্দুকের গুলি লেগেছে। ছেলেকে কোলে নিয়ে পড়ল জগন্নাথের বাবা। তাড়াতাড়ি উঠতে গেল। পারল না। কে যেন তার মাথায় বাড়ি মারলে। মাথা ঘুরে গেল। নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল সেইখানে। ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা।" বাবা সাড়া দিল না। বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছে!

কিছুই করতে পারল না আর জগন্নাথ। নিমেষের মধ্যে ওই লুঠেরার দল ছুটে এসে, ছোঁ মেরে ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিলে। জগন্নাথ কিছু বোঝবার আগেই ওরা ওকে একটা বস্তার মধ্যে পুরে ফেললে। জগন্নাথ ঘাড়ে-গর্দানে এক হয়ে বস্তার মধ্যে হাঁসফাঁসিয়ে চিৎকার শুরু করে দিলে! কিন্তু কে শুনছে সে-চিৎকার!

জগন্নাথের বাবা পড়ে রইল অজ্ঞান হয়ে। আর বস্তায় বেঁধে ওরা জগন্নাথকে ধরে নিয়ে এল নিজেদের আস্তানায়।

চেঁচাতে-চেঁচাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জগন্নাথ। আর যেন গলা ওর কথা বলতে পারছে না। ও যেন ঝিমিয়ে পড়ল। এ কোথায় নিয়ে এল ওরা জগন্নাথকে। অন্ধকার রাত। বোঝা-ই যায় না। বস্তাটা ধপাস করে আছড়ে ফেলল শান বাঁধানো মেঝের ওপর। লাগল জগন্নাথের। লেগেছে মাথায়। তবু একটুও শব্দ বেরুল না ওর মুখ দিয়ে। ও যেন ছাগল-ভেড়া!

বস্তাবন্দী হয়ে মেঝের ওপরই পড়ে রইল জগন্নাথ সেই অন্ধকার রাত্রে। জগন্নাথ আসলে কিছুই বুঝতে পারেনি। বোঝবার সময়ই-বা পেল কই? তাছাড়া সব কিছু বোঝবার মত সময়ও তার হয়নি এখনও। সব কিছু কেমন যেন ওর ঘুম-জড়ানো চোখের ওপর আচমকা ঘটে গেল। কী যে হল, কেন যে তাদের বাড়িতে আগুন লাগল আর বাবা যে তার জগন্নাথকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে কেন ছুটছিল, এসব 'কেন'র কিছুই উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না জগন্নাথ। শুধু ওর বাবার মুখখানা যখনই হঠাৎ-হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছিল, তখনই বস্তাটা ছিঁড়ে ফেলার জন্য ওর ছোট্ট হাত দুটি আঁকপাক করে উঠছিল। সে বস্তায় টান মারছে, কিন্তু ছিঁড়ছে না। বস্তা ছিঁড়বেও না। সে-শক্তি তার নেই। ওর যেন দম আটকে আসে।

কখন অজানতে অন্ধকার রাতটা কেটে গেল। জগন্নাথ বুঝতে পারল, সকাল হয়েছে। কেননা, কাক ডাকছে। হঠাৎ

তার মনে হল, কারা ফিসফিস করে কথা বলছে।

হ্যাঁ, কথাই বলছিল লুঠেরার দল। ওরা জগন্নাথের বস্তাটা টেনে তুলে নিলে। এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলল জগন্নাথকে। ও আর একবার সেই বস্তার মধ্যে তেড়ে-ফুঁড়ে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল, পারল না। কেননা, ওর তখন সব শক্তি কোথায় হারিয়ে গেছে। বুকটা ওর কেঁপে উঠল, ভয়ে। হাঁপাতে লাগল জগন্নাথ!

ওকে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে এল লুঠেরার দল। মস্ত চত্বর। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। পাঁচিলের একদিকে একটা লোহার ফটক। সেই চত্বরের মাঝ-বরাবর ওরা বস্তাটা ছুঁড়ে ফেললে। তারপর বস্তার মুখটা খুলে, জগন্নাথকে টেনে বার করলে। জগন্নাথের চোখ দুটি এতক্ষণ অন্ধকারে বন্ধ ছিল। হঠাৎ খোলা আলো চোখে পড়তেই ঝলসে উঠছে চোখ দুটি। চাইতে পারছে না। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল জগন্নাথ। পা দুটি টলছে তার।

চোখের দৃষ্টি আলোয় ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল জগন্নাথের। ও দেখল, একটু দূরে, কতকগুলো লোক তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখগুলো লাল টকটক করছে! জগন্নাথ বুঝতে পারল না এরা কারা। শুধু এটুকু বুঝল, কাল রাত্রে ওরাই বাবার মাথায় লাঠি মেরে রক্ত বার করে দিয়েছে। বুঝল, ওরাই ওকে ধরে এনেছে। কিন্তু এখন সে কী করবে! কিছুই ঠিক করতে পারছে না। বুঝতে পারছে না, এখান থেকে ছুটে পালাবে কি না। পালাবেই বা কোথা? চারপাশের পাঁচিল এত উঁচু, লাফালেও নাগাল পাবে না। তা ছাড়া লাফানোর কথা এখন ওঠেই না। ওর বলে দাঁড়াতেই কষ্ট হচ্ছে! তবু খোঁড়াতে-খোঁড়াতেই পা ফেলবার চেষ্টা করল। হঠাৎ কোথাও কিচ্ছু নেই, কাড়া-নাকড়া বাজলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি একটা শব্দের বাজনা বেজে উঠেছে। জগন্নাথ চমকে চাইতেই দেখল, সামনে একটা ষাঁড়! তার দিকে শিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিমেষের মধ্যে জগন্নাথের সেই দোমড়ানো-মোচড়ানো শরীরটা সিধে শক্ত হয়ে উঠল। ষাঁড় ছুটে এল জগন্নাথের দিকে। জগন্নাথ হকচকিয়ে গেছে। বুঝল তার বিপদ। তখন আর কিছু ভাববার সময় নেই তার। ও লাফ দিলে। সরে গেল। ষাঁড়টা জগন্নাথকে মারতে গিয়ে মারলে পাঁচিলের গায়ে টেনে এক গোঁত্তা। আর বলব কী, সঙ্গে সঙ্গে ওই কাড়া-নাকাড়ার শব্দটা যেন দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠল। ষাঁড়টাও রেগে কাঁই! চার পা তুলে ভীষণ দাপাদাপি শুরু করে দিলে। ওই পাগলা ষাঁড়কে সামাল দেবার সাধ্যি আছে জগন্নাথের! আবার তেড়ে আসছে ষাঁড়! দিলে গুঁতিয়ে! না, এবারও সামলে নিয়েছে জগন্নাথ। কিন্তু এ কী! ও ষাঁড়ের পেছনে ছুটল কেন? ছুটল না তো, লাফ মারল। ছেলের কী সাহস দেখো! লাফ দিয়ে সে ষাঁড়ের পিঠের ওপর বসে পড়েছে! বসেই, ষাঁড়ের ল্যাজে পাক মেরেছে! আর কে দেখে! ষাঁড় তিড়িং-বিড়িং লাফ মারলে, এদিক-ওদিক ছুট মারলে। চত্বরের চারপাশে চরকি খেতে লাগল। তখন ষাঁড়ের সামনে যাবে কে? গুঁতিয়ে নাড়িভুঁড়ি বার করে দেবে না! জগন্নাথ কিন্তু ছাড়বার পাত্তর নয়! পিঠে বসে, ষাঁড়ের ল্যাজে পাক দিতে দিতে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লে শিবঠাকুরের বাহনটিকে! ঠ্যাংই ছোড়ো আর লাফই মারো, জগন্নাথ ছাড়ছে না! এ তো দেখি উল্টো বিপত্তি! কোথায় জগন্নাথকে ঠান্ডা করার জন্যে ষাঁড়কে আনা হল, এখন তো জগন্নাথই ষাঁড়কে জব্দ করে ছাড়ছে। এবার না-পালালে ষাঁড়ের প্রাণ যাবে! কিন্তু পালাবে কোনদিকে? এদিক ওদিক সব দিকে ছুট মেরে ষাঁড় যখন কিচ্ছু কূল-কিনারা করতে পারল না, তখন মারল ঢুঁ ওই লোহার ফটকে। ফটক ভাঙল না। জগন্নাথ ভাবল, এই তো ভাল। ল্যাজটা আবার দিয়েছে পেঁচিয়ে। ষাঁড় আবার হুড়-মুড়িয়ে ফটকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তবুও ফটক ভাঙল না। তবে আর একবার। দে নাচিয়ে। ষাঁড় থাক-প্রাণ যাক-প্রাণ করে ফটকের ওপর এমন ছিটকে পড়ল যে ফটক ধড়ধড়, মড়মড় করে মাটির ওপর চিৎপাত! আর দেখতে, ষাঁড়ও ভাঙা ফটক ডিঙিয়ে-লাফিয়ে মার ছুট! জগন্নাথ ছুটন্ত ষাঁড়ের ল্যাজ মুড়িয়ে আরও জোরে ছোটার জন্যে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাট্, হ্যাট।" ষাঁড় জগন্নাথকে পিঠে নিয়ে তীরের মত ছুটতে লাগল।

লাল টকটকে চোখওলা মানুষগুলো তো তাই দেখে থ। তাদের কিছু বোঝার আগেই ষাঁড় পগারপার। আর এমনই বরাত, হাতের কাছে একটা বন্দুকও রাখেনি কেউ! কে আর ভেবেছিল বন্দুক লাগবে। ভেবেছিল, ষাঁড়ের গুঁতোতেই ছেলের পিণ্ডি চটকে যাবে! কিন্তু এখন নিজেরাই ভোঁতা মুখে থোঁতা হয়ে বসে থাকো।

কিন্তু বসে থাকার জন্য তো আর জন্মায়নি ওই লুঠেরার দল। যখন দেখল, সত্যিই ষাঁড়ের পিঠে চেপে ছেলেটা ভাগছে, তখন তারাও "ধর ধর" করে তাড়া লাগালে। কিন্তু ধরবে কে? আর কাকেই বা ধরবে। একটা পুঁচকে ছেলের পাল্লায় পড়ে ষাঁড়-বাবাজী নাস্তানাবুদ। ঈশ্ কী ঘেন্না! ঘেন্না যত পাচ্ছে, ষাঁড়ের গোঁ তত বাড়ছে। গোঁ তো গোঁ, ষাঁড়ের গোঁ! মোচড় খেয়ে ল্যাজই ছিঁড়ুক, কী হোঁচট খেয়ে থুবড়ে মরুক, উনি থামবেন না! দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটবেন।

ষাঁড়ের সঙ্গে ছুটে লুঠেরার দল পারবে কেন? তারা একে-বারে বেপাত্তা! এখন ভাবছে, ছেলেটা যাক ক্ষতি নেই। ষাঁড়টা ফিরলে বাঁচি!

আর ফিরেছে! বাঁটকুল ষাঁড় বেঁটে ঠ্যাং-এ দৌড় মেরে রাস্তাঘাট, দোকান-মাঠ ছাড়িয়ে-ছুড়িয়ে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চোঁচা পিটটান।

নিশ্চিন্ত হল জগন্নাথ। লোকগুলোকে আর দেখাই যাচ্ছে না। জগন্নাথ ভাবলে, এখন থামা যায়, ষাঁড়ের পিঠ থেকে নামা যায়! তাই পেছনবাগে আর-একবার ভালো করে নজর দিয়ে, জগন্নাথ ষাঁড়ের ল্যাজে প্যাঁচ মারা ছেড়ে দিল।

কিন্তু কই, ষাঁড় তো থামল না? যেমন ছুটছিল তেমনিই ছুটছে। জগন্নাথ ভাবলে, এ তো দেখি উল্টো বিপত্তি! ষাঁড়টা শেষে খেপে গেল নাকি! তাই ষাঁড়ের মেজাজটা ঠান্ডা করার জন্যে ও নরম সুরে তাল দিলে, "আ-আ! থাম-থাম!"

ষাঁড়ের বয়ে গেছে। সে যেমন ছুটছিল, তেমনি ছুটছে। জগন্নাথ থামবার জন্যে যতই "আই-আই" করে, ষাঁড় ততই পাই-পাই ছোটে। এবার কিন্তু ভয় পেয়ে গেল জগন্নাথ! দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ষাঁড় বুঝি আর থামবেই না। তা হলে এখন কী করা যায়! এ তো আর ছাগল-ভেড়া নয় যে, ধমক দিয়ে সামলে নেবে! এ ষাঁড়! একবার বিগড়োলে রক্ষে নেই। আর এখন তো মনে হচ্ছে বিগড়েই গেছে! জগন্নাথ ওর পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়বে নাকি। কিন্তু হাত-পা ভাঙলে? একে বলি ভাগ্য! পড়বি তো পড়, সামনে একটা গাছ। একটা ডাল নিচু হয়ে ঝুলে আছে রাস্তার ওপর। চট করে মাথায় বুদ্ধি এসে গেল জগন্নাথের। করেছে কী, গাছের নীচ দিয়ে ষাঁড় যেই ছুট মেরেছে, জগন্নাথ অমনি চটপট একটা ডাল ধরে ফেলেছে। ধরেই পড়েছে ঝুলে! ষাঁড়ের পিঠ থেকে গাছের ডালে। ঝুল-ঝুল বাদুড়-ঝোলা! কিন্তু এ কী! তবুও তো ষাঁড় থামল না। ল্যাজ উঁচিয়ে যেমন ছুটছিল তেমনিই ছুটছে। ছুটতে ছুটতে নিশ্চিন্দিপুর! পেছন ফিরে একবার দেখলেও না, পিঠ থেকে

লাফ মেরে তার সওয়ার জগন্নাথ ঠ্যাং-ঝোলা হয়ে গাছে দোল খাচ্ছে!

ষাঁড় তো গেল, সে না হয় হল, কিন্তু এমনি বাঁদরের মত ডাল জাপ্টে জগন্নাথ তো আর বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। কষ্ট তো বটেই। তা ছাড়া ওর তো আর জানতে বাকী নেই, ষাঁড় খুঁজতে সেই লাল টকটকে চোখওলা লোকগুলো এক্ষুনি এসে পড়বে! তাই চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে, তরতর ক'রে গাছের মগডালে উঠে পড়ল। পাতার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইল। এখানে আর ওকে খুঁজে পেতে হচ্ছে না!

রাস্তাটা নাক-বরাবর সিধে চলে গেছে। অনেকদূর অবধি ডাইনে-বাঁয়ে স্পষ্ট দেখা যায়! সুতরাং কেউ যদি এদিকে আসে, অনেকদূর থেকেই জগন্নাথ দেখতে পাবে। ষাঁড়ের হাত থেকে এখন সে না হয় নিস্তার পেল। কিন্তু কে ভরসা দিতে পারে যে, ওই লুঠেরাদের খপ্পর থেকে জগন্নাথ রক্ষা পাবে! এই সময় যদি একটা বন্দুক থাকত জগন্নাথের কাছে! তাহলে লুঠেরাই আসুক কী ভূতেরাই আসুক, গুড়ুম-গুড়ুম! জগন্নাথের কাছে সব ঠান্ডা! ওর বাবা যখন যুদ্ধ করত, বন্দুক ছিল। জগন্নাথ কতবার সেই বন্দুকটা হাত দিয়ে দেখেছে। বন্দুকের ভেতর চোখ রেখে কেমন করে শিকার টিপ করতে হয় তা ও জানে।

বলো, এইভাবে গাছের ডালে বসে থাকা যায়? অনেকক্ষণ তো কাটল, তবু তো প্রভুরা এখনো এলেন না! তবে কি তাঁরাও ষাঁড়ের মায়া ত্যাগ করে, ঘরের ভেতর নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছে? হুঁঃ! গেছে তো ভারী একটা ষাঁড়! ওরা অমন, ইচ্ছে করলে, একশো-দুশো ষাঁড় নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিতে পারে। সে না হয় ঠিক আছে। একশো-দুশোর জায়গায় পাঁচশো-ছ'শো ষাঁড় আসুক। ষাঁড় নিয়ে যত পারে ষণ্ডামার্ষণ্ড করুক, কিন্তু এখন যে জগন্নাথের দফা-রফা হয়ে যাচ্ছে!

ভেবেই পাচ্ছে না জগন্নাথ, কখন বাবার কাছে ফিরে যাবে। তাছাড়া কোন রাস্তা দিয়ে যে ও ফিরে যাবে, তাও বুঝতে পারছে না। এ কোথায় যে এসে পড়েছে সে, কে জানে!

না; এখনও যখন এল না, মনে হচ্ছে আর কোন ভয় নেই। ভয় থাক আর নাই থাক, জগন্নাথ আর গাছের ডালে এমন হনুমানের মত বসে থাকতে পারছে না। কী ঝকমারি! ভালোরে ভালো, কাল সারারাত বস্তাবন্দী হয়ে কোন রকমে প্রাণটি নিয়ে বেঁচে ছিল। তারপর ষাঁড়ের গুঁতো! আর এখন? এ আবার কোন গাড্ডায় পড়ল বলো?

"এই জগন্নাথ।"

ধড়াস করে উঠেছে জগন্নাথের বুকটা। কেউ ডাকল নাকি তার নাম ধরে। চোখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখলে জগন্নাথ। কিন্তু কেউ নেই তো!

"এই জগন্নাথ!"

সত্যিই তো আবার ডাকল! আর কথা আছে! গাছ থেকে দুড়দাড়িয়ে লাফ মেরে দে ছুট! জগন্নাথ ছুটেছে।

আর ছুটেছে! বিপদ যখন আসে তখন তো আর একদিক থেকে আসে না। সাঁড়াশির মত দাঁত খিঁচিয়ে চারদিক থেকে তেড়ে আসে! তা না হলে জগন্নাথ ওই লুঠেরাদের ভয়ে যতক্ষণ গাছের ডালে বসে ছিল, ততক্ষণ তাঁদের টিকিটি দেখা যায়নি! যেই না ও গাছ থেকে নেমেছে অমনি একেবারে সামনা-সামনি! এই রে! কে জানে ওরা জগন্নাথকে দেখতে পেল কিনা, কিন্তু জগন্নাথ তো দেখে ফেলেছে। আর রক্ষে আছে? জগন্নাথ দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে দে লম্বা!
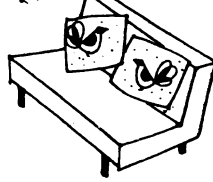
বলব কী, সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ডাক, "এই জগন্নাথ, লম্বা দিচ্ছিস কেন? দাঁড়া, দাঁড়া!"

এ কী রে! এ যে একটা বাঁদর!

বাঁদর! তাই তো, তাই তো! বাঁদরমহারাজই তো গাছের ডাল থেকে আগ বাড়িয়ে ডাকছে! এ আবার কোন দেশী বাঁদর রে বাবা, কথা বলে!

জগন্নাথ তো জানে, যে পালায় সে বাঁচে। সুতরাং, এখন তুর পিছুই ডাকো আর সামনে হাঁকো, কিছুই সে দেখল না। ছুট-ছুট-ছুট।

অমন করে ছুটে পালালে কার নজরে না-পড়ে। ঠিক। দেখতে পেয়েছে লুঠেরার দল। আর কথা আছে! ওরাও দিয়েছে ছুট জগন্নাথের পিছু। কিন্তু যেতে তো হবে এই গাছের নীচ দিয়ে! যাক না একবার! গাছের ওপর বাঁদর মহারাজ! তিনি তো কোমর বেঁধে তৈরি। হাতে তার ভাঙা ডাল। যেই না একজন ছুট দিলে, ধাঁই! মাথায় গাছের ডালের ঘা পড়ল। ধপাস! লোকটা পড়ে গেল। যেই না দুজন ছুটে জগন্নাথকে ধরতে গেল, ঠকাস! ঘাড়ে লাঠি পড়ল। মটাস! ঘাড় ভাঙল। তারপর বাঁদর মহারাজ আনতাবুড়ি সাঁই-সপাসপ, ধাঁই-ধপাধপ করে গাছের ওপর থেকে লাঠি ঘুরিয়ে লাঠালাঠি শুরু করে দিলে! আরে সব্বনাশ! দেখো, দেখো, কী বেদম ঠেঙানি দিচ্ছে!

ঠেঙানি খেতে-খেতে বাঁদরের কাছে লুঠেরার দল যখন হেরে গো-হারান হয়ে গেছে, তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে পালা, পালা, পালা! পিটুনির ঠেলায় বাপ বলতে তর সইল না! কারো হাড় ভাঙল। ঘরে ফিরে ভাঙা হাড়ে মালিস করতে বসল। কারো গা কাটল। কাটা ঘায়ে মলম-পটি বাঁধতে লাগল।

লুঠেরার দল ভেগে পড়তেই, বাঁদর গাছ থেকে মেরেছে লাফ। লাফ মেরেই জগন্নাথের পিছু। ডাক দিলে, "জগন্নাথ, জগন্নাথ। দাঁড়া, দাঁড়া।"

জগন্নাথ চেয়েই দেখল না। ছুটতে ছুটতে চেঁচাল, "বাবা, বাবা!"

ছেলে বিপদে পড়ে বাবাকে হাঁক পেড়ে ডাকছে, এ তো আর কোন আশ্চর্য কথা নয়। কিন্তু একটা বাঁদর জগন্নাথের নাম ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ছুটছে, এ দেখলে তো লোকে তাজ্জব বনে যাবে! গেলে আর কী করা! ওই তো ডাকছে। কেউ তো আর কানে তুলো গুঁজে বসে নেই যে, শুনতে পাবে না!

বাঁদরের সঙ্গে ছুটে জগন্নাথ পারবে কেন? ওরা যেমন ছুটতে পারে, তেমনি লাফ মেরে হাঁটতে পারে। কাজেই জগন্নাথ যতই ছুটুক, বাঁদর ঠিক ধরে ফেলবে।

ধরে ফেলবে বলি কেন, ওই তো ধরেই ফেলেছে। জগন্নাথের একদম কাছাকাছি এসে পিছন থেকে বাঁদর চেঁচালে, "এই জগন্নাথ।"

জগন্নাথ চেঁচানি শুনলে না।

বাঁদর তখন জগন্নাথের মুখের সামনে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে বললে, "কোথা যাচ্ছিস?"

জগন্নাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাঁপাচ্ছে। বাঁদরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল! ভাবলে, এতক্ষণ কি তা হলে বাঁদরটাই তার নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু বাঁদর কথা বলতে পারে, এমন কথা তো ও কোনদিন শোনেনি!

বাঁদর ব্যস্ত গলায় আবার বললে, "পালাতে হবে। এক্ষুনি ওরা এসে পড়বে। আমার পিঠে চাপ।"

জগন্নাথ ভাবলে, যাঃচ্চলে! বাঁদরটা তো বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বলছে! মুখের ফাঁকে ফসকাচ্ছেও না, আটকাচ্ছেও না। আর এতই যখন গায়ে পড়ে ভাব করতে চাইছে, তখন বাঁদরের সঙ্গে কথা বলতে তার কোন কিন্তু-কিন্তু না-করাই ভালো। তাই বললে, "তুই কোন্ দেশী বাঁদর রে, কথা বলছিস?"

বাঁদর উত্তর দিলে, "বাঁদর আমি বিদেশী, তবে কথা বলছি এ-দেশী। আমি লেখা-পড়া-শেখা বাঁদর কিনা!"

জগন্নাথ জিগ্যেস করলে, "তুই লেখা-পড়া জানিস?"

"নির্যস! আর, জানি বলেই তো তোকে পিঠে চাপতে বলছি।" উত্তর দিলে বাঁদরটা।

জগন্নাথ বললে, "আমি তোর চেয়ে বড়। আমার ভার সামলাবি কী করে? তুই মুখ থুবড়ে পড়লে, আমি মরব যে!"

বাঁদর উত্তর দিলে, "আমার পিঠে চাপলে তোর পড়ার ভয় নেই। তবে না-চাপলে চ্যাঁক-চুঁক হয়ে যাবার যথেষ্ট কারণ থেকে যাচ্ছে!"

বাঁদরের কথা শুনে জগন্নাথ ফ্যালফেলিয়ে গেল! কেননা, চ্যাঁক-চুঁক কথাটা তো সে কোনদিন শোনেনি। কথাটার যে কী মানে তা-ও সে জানে না! না-জানলেও জিগ্যেস করা যাচ্ছে না। তাহলে বাঁদরের কাছে মুখ থাকে না। বাঁদর বিদেশী হয়েও যে-কথাটা জানে, জগন্নাথ এ-দেশী হয়েও সে-কথাটা জানে না, এটা জানলেও লোকে থু-থু করবে! তাই জগন্নাথ ব্যাপারটা চেপে গিয়ে বাঁদরকে জিগ্যেস করলে, "তোর পিঠে চাপলে বাবাকে খুঁজে পাব?"

বাঁদর বললে, "দেখা যাক, মংগলে ক্ষুধা, বুধে পাঁউরুটি! নে তো, এখন পিঠে বস।"

এ-কথা বলতেই হবে, কথা-বার্তায় বাঁদরটা জগন্নাথকে কাত করে দিয়েছে। কারণ "মংগলে ক্ষুধা, বুধে পাঁউরুটি" এ-সব কথা জগন্নাথ শোনেইনি কোনদিন। তাই আর বেশী ঘাঁটা-ঘাঁটি না-করে ওর পিঠের ওপর উঠে পড়ল!

বাঁদর বলল, "আমার গলাটা হাত দিয়ে যথেষ্ট জড়িয়ে ধরবি।"

জগন্নাথ যথেষ্ট জড়াল কিনা বলা যথেষ্ট শক্ত, কিন্তু দেখা গেল, বাঁদরটা ওকে পিঠে নিয়ে লাফিয়ে, খানাখন্দ পেরিয়ে, বেমালুম বেপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। জগন্নাথ যেন হালকা ফুস, একটা চড়াই পাখি!

জগন্নাথ জিগ্যেস করলে, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে বাঁদর?"

বাঁদর উত্তর দিলে, "আজ একাদশী। সব কথা বলতে নেই, শুনতেও নেই। পেটের যেমন উপোস, মুখেরও তেমনি হা-হুতোশ!"

জগন্নাথ চোখ দুটো ছানাবড়ার মত গোল্লা-গোল্লা করে বললে, "অ!"

বাঁদরটা আবার বললে, "তবে আমাকে তোর বাঁদর বলা উচিত নয়। কেননা, বাঁদর আমার নাম নয়। অসভ্য, অশান্ত, অবাধ্য, ইত্যাকার বিভিন্ন প্রকারের বালক-বালিকাদের বাঁদর বলে। আমি আসলে মাংকি।"

জগন্নাথের মুখ ফসকে আবার ফুট করে বেরিয়ে এল, "অ!"

লাফাতে-লাফাতে, ছুটতে ছুটতে হঠাৎ বাঁদরটা একটা পেয়ারা গাছের নীচে ঝুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছ থেকে একটা পেয়ারা ছিঁড়ে জগন্নাথকে বললে, "খা।"

জগন্নাথ মুখটা বিচ্ছিরি করে বললে, "খেতে ইচ্ছে নেই।"

বাঁদর বললে, "খেয়ে নে। এখনও অনেকটা যেতে হবে!"

"কেন, আমাদের বাড়িটা কি এখনও অনেক দূরে?"

জিগ্যেস করলে জগন্নাথ।

সিধে সাফ-সাফ উত্তর না দিয়ে, বাঁদরটা বেঁকা মুখে কেমন

'হুঃ! হু!' করে হেসে দিল। তারপর জগন্নাথকে পিঠে নিয়ে আবার লাফ মারল।

বাঁদরের হাসি দেখে জগন্নাথের খুবই সন্দেহ হয়েছে। জগন্নাথ আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, "আমায় নামিয়ে দাও, তোমার মতলব খারাপ।"

জগন্নাথের চেঁচানি শুনেই বাঁদরটা কেমন চুপসে গেল। জগন্নাথকে কাকুতি-মিনতি করে বললে, "তুই বিশ্বাস কর, রামছাগলের দিব্যি করে বলছি, সেরকম আমার কোন অসৎ অথবা অনেয্য ইচ্ছাও নেই, অনিচ্ছাও নেই। তবে কী জানিস, তোর বাবাকে তো আমি খুঁজে দিতে পারব না, তাই তোকে আমার তাল-ফুলুড়ি মামার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। মামার তো অফুরন্ত বুদ্ধি, মামা টুসকি মারতে-মারতে বলে দেবে কোন-দিকে তোদের বাড়ি।"

জগন্নাথ বাঁদরের কাকুতি-মিনতি শুনে ঠাণ্ডা হলেও ওর কেমন যেন কান্না-কান্না পাচ্ছিল। কতক্ষণ বাবাকে দেখেনি। আর এমন করে, বাবাকে হারিয়ে, বাঁদরের পিঠে চেপে তার তাল-ফুলুড়ি মামার কাছে যেতে হবে, এ-কথা ভাবতে ভাবতে ওর পিঠটা কেমন যেন টনটন করে উঠল। জগন্নাথ পিঠটা টানটান সিধে করতেই বাঁদর বললে, "কী রে, উচ্চিংড়ির মত অমন চিংকিড়ি, চিংকিড়ি করছিস কেন?"

জগন্নাথ এবার মরিয়া হয়ে গেল। পেয়ারাটায় তেড়েমেড়ে এক কামড় দিয়ে বললে, "কত যে ছাই ভস্ম বলছিস তুই, কিছু মানে বুঝছি না।"

বাদর জিগ্যেস করলে, "কিসের মানে?"

"চিংকিড়ি, চিংকিড়ি!"

"এইরে, সমূহ আকুপাংচার! তুই যদি চিংকিড়ি কথাটার মানে না-বুঝিস, তা হলে তো তোর দারুণ বিপদ! তাল-ফুলুড়ি মামা তো তোকে তাল ঠুকে থ্যাবড়া করে দেবে।"

"তাহলে থাক, তোমার মামার কাছে গিয়ে কাজ নেই।" বিরক্ত হয়েই জগন্নাথ উত্তর দিলে।

বাঁদর বললে, "দেখ, তুই মিছিমিছি হুজ্জুতি করছিস। আমি তোর হিতের জন্যেই তোকে পিঠে নিয়ে মামার কাছে যাচ্ছি। এতে কি আমি দু পয়সা পাব? না, আমার কিছু স্বার্থ আছে? তোকে দেখে আমার মনটা দুঃখু-দুঃখু পাচ্ছিল বলেই এই ঝক্কি আমি নিয়েছি। নইলে আমার অত কী দায় পড়েছে! যাই হোক, এবার আমায় ভাল করে বাগিয়ে-বুগিয়ে ধর, মামার বাড়ি এসে গেছে।"

এসে গেছে বলতেই জগন্নাথ ঝটপট মুখের ভেতর থেকে পেয়ারার ছিবড়েগুলো ছুঃ ছুঃ করে ফেলে দিলে। এতক্ষণ ধরে চিবুচ্ছিল। বাঁদরটা থপাস করে একটা বাড়ির ছাতের ওপর লাফ দিলে। জগন্নাথ একটু টাল খেয়ে সামলে নিতেই বাঁদরটা বললে, "এবার নাম।"

জগন্নাথ অতশত কি বুঝেছে! ভালোমানুষটির মত বাঁদরের পিঠ থেকে নেমে যেই ছাতে পা দিয়েছে অমনি সড়াত! ছাত ফুটো হয়ে জগন্নাথ নীচের দিকে গোঁত্তা খেলে! তারপর পা ফসকে আলুর দম! ছাত থেকে সটান ডিগবাজি।

কী কাণ্ড দেখো! জগন্নাথ যে পড়ল, তা দেখে বাঁদরটা কোথায় ভয় পাবে, তা না ব্যাটা তেএঁটের মত হেসে উঠেছে! এমন ন্যাকা বাঁদর জন্মে কেউ দেখেছে! ছেলেটার হাত ভাঙল, না পা মচকাল সেদিকে খোঁজখবর নেই, বেহায়ার মত চিল্লিয়ে-চিল্লিয়ে হাসছে!

কিন্তু এ কী ব্যাপার!

কী ব্যাপার?

জগন্নাথের হাতও ভাঙল না, মাথাও ফাটল না। ধপাস! পা হড়কে একটা ঘরের মধ্যে পড়ল। পড়ল ঠিকই, কিন্তু অবাক কথা—একটুও লাগল না! মনে হল, একটা নরম গদির ওপর বসে পড়েছে জগন্নাথ। নিজের চোখ দুটো কচলিয়ে ভালো করে চেয়ে দেখতেই জগন্নাথ হাঁদাগঙ্গারাম! দেখে কী, সে একটা দোলনার ওপর বসে বসে দোল খাচ্ছে! আর-একটা লোক তার সঙ্গে দুলে দুলে নাড়ি টিপে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন অদ্ভুত আর উদ্ভুট্টি গোছের লোক জগন্নাথ এর আগে আর কক্ষনো দেখেনি। লোকটার মাথার চুলগুলো শজারুর কাঁটার মত খাড়া-খাড়া। কান দুটো অনেকটা গাধার কানের মত, লম্বা। ঠোঁট দুটো থ্যাবড়া বন-মানুষ! নাক নিয়ে কথা না-বলাই ভালো। কারণ তিনি আছেন কি নেই, বোঝা-ই দায়! হাতের নোখগুলো কতদিন কাটেনি যেন! ময়লা জমে কী যাচ্ছেতাই নোংরা হয়ে আছে! কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, জগন্নাথ দেখে কী, লোকটার ছেঁড়া তাপ্পিমারা প্যান্টের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটি ল্যাজ উঁকি মারছে। আর ছাগলের যেমন ল্যাজের ডগায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লোম থাকে, তেমনি গুটিকয় লোম ফিরফির করছে! জগন্নাথ মনে মনে ভাবলে, মানুষেরও ল্যাজ হয়!

হঠাৎ লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "হয়, হয়।" চেঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখ দিয়ে ভক-ভক করে এমন বিটকেল গন্ধ বেরিয়ে এল! একেবারে জগন্নাথের নাকে! আর একটু হলেই ওয়াক থু!

সামলে নিলে জগন্নাথ। ভাবলে, লোকটা ওর মনের কথা কী করে জানতে পারল! লোকটা তুক-তাক জানে নাকি!

আসলে জগন্নাথের মনের কথাটা ও মোটেই জানতে পারে-নি। জগন্নাথ তো বোকা নয়। তাই যেই লোকটা আবার কথা
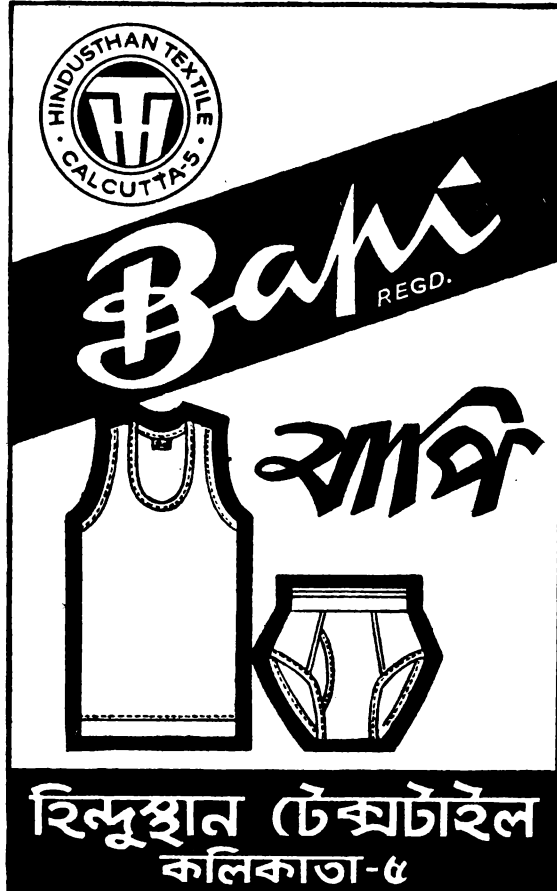
বলেছে, জগন্নাথ বুঝে নিয়েছে। লোকটা বললে, "হয়, হয়, নানান কারণে অসুখ হয়। যেমন ধরা যাক ক্লাসের পড়া না করলে, ইসকুল যাবার ভয়ে, অসুখ হয়! খুব ঠকঠকানি শীতের দিনে চান করতে ভয় থাকলে, অসুখ হয়। কিংবা গরমের দিনে নিম-পাতার ঝোল মেখে ভাত খেতে বললে, অসুখ হয়। অথবা—অথবা—অথবা"—বলতে বলতে লোকটা গন্ধওলা মুখটা হাঁ করে জগন্নাথের দিকে এগিয়ে এল। জগন্নাথের গাটা ঘিনঘিনিয়ে উঠেছে! চিড়িং করে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল জগন্নাথ। চিৎকার করে বলে উঠল, "আমার অসুখ করেনি, আমার অসুখ করেনি।"

চিৎকার করতেই হঠাৎ পেছন থেকে এমন এক ঝাপটা খেয়েছে জগন্নাথ যে, হুমড়ি খেয়ে টলে পড়ল! বেচারা কুপোকাত! পেছন ফিরে চেয়ে দেখে আঁতকে উঠেছে! আরি ব্যস! ইয়া পেল্লায় একটা পাখি! পাখি বলবে না পাখিটাকে দানো বলবে, বুঝে উঠতে পারছে না জগন্নাথ! দেখলেই শিউরে উঠতে হয়! কেননা, এত বড় পাখি জগন্নাথ দেখেইনি জন্মে! কী তাগড়াই চেহারা! প্রায় জগন্নাথের মাথার সমান ঢেঙা। ভয়ংকর হিংসুটে চোখ দুটো! ঠোঁটটা বেল-পাড়া-আঁকশির মত বেঁকে চেপটে আছে মুখের সঙ্গে! পায়ের নোখগুলো বেঁকা-তেড়া। গুনছুঁচের মত খোঁচা-খোঁচা! আর খুব ঝড় উঠলে তালগাছের পাতাগুলো যেমন ঝটাপটি খেয়ে হাঁসফাঁস করে, তেমনি ডানা দুটো তার জগন্নাথের ঘাড়ে ঝাপটা মেরে ঝটপটাচ্ছে! জগন্নাথ তাই দেখে চিৎকার করে উঠল! জগন্নাথের চিৎকার শুনে পাখিটা ক্যাঁক-ক্যাঁক করে মারলে এক ধমক। জগন্নাথের পিলে চমকে উঠেছে। থমকে গেল জগন্নাথ। আর তাই দেখে লোকটার দাঁত ছরকুট্টে কী হাসি, হে-হে-হে! তার বত্রিশপাটি দাঁতের দিকে জগন্নাথের চোখ পড়তেই নাক সিঁটকুলে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, দাঁতে ছ্যাতলা পড়েছে! মাছি ভ্যান ভ্যান করছে! লোকটা বোধ হয় সাতজন্মে চান করে না, দাঁত মাজে না।

হাসতে হাসতে লোকটা টপাস করে জগন্নাথকে জড়িয়ে ধরলে। জগন্নাথ কিছু বোঝবার আগেই, খোঁচা খোঁচা নোখ দিয়ে এমন কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করলে যে, জগন্নাথের প্রাণ যায়! নোখের খোঁচা খেয়ে জগন্নাথের যেমন লাগছে, আঃ, আঃ! কাতুকুতু খেয়ে তেমনি হাসছে, হাঃ, হাঃ! হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে বেচারা মাটিতে গড়াগড়ি! তাই দেখে পাখিটার কী নাচন-কোদন দেখো! মশাই, চিল চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে!

হাসতে-হাসতে কিংবা কাঁদতে কাঁদতে জগন্নাথ যখন নাস্তানাবুদ, মানে, দম প্রায় ফেটে পড়ে, ঠিক সেই সময় বাঁদরটা প্রায় লাফ মেরে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই লোকটাকে জাপ্টে ধরলে, "করছেন কী, করছেন কী, তাল-ফুলুড়ি মামা! ছেলেটার যে বাবা হারিয়ে গেছে! আপনার কাছে এসেছে বাবার খোঁজ করতে!"

সঙ্গে-সঙ্গে সেই তাল-ফুলুড়ি মামা নামে লোকটা জগন্নাথকে ছেড়ে দিয়ে বললে, "সে-কথা আগে বলবি তো! রামোচন্দর, রামোচন্দর, আমি ছেলেটাকে ছুঁয়ে ফেললুম!"

বাঁদর বললে, "মামা, ছুঁলে কোন দোষ হবে না। ছেলেটা জগন্নাথ।"

ততক্ষণে জগন্নাথ কাপড়-জামা ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়াল। অমনি পাখিটা আবার খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠেছে! হাসতে হাসতে এমন বিচ্ছিরি গলায় ডাকলে "জগন্নাথ" বলে যে, তাই শুনে জগন্নাথের গা-পিত্তি জ্বলে গেল! মনে হল ঠাস করে চড়িয়ে দেয়!

হয়তো দিত চড়িয়ে। কিন্তু হঠাৎ তাল-ফুলুড়ি মামার

কানের দিকে নজর পড়তে ওর চক্ষু চড়কগাছ! মামার কান দুটো, যেমন গাধা কিংবা গরু-ভেড়ার কান নড়ে, তেমনি নড়তে শুরু করে দিয়েছে। একী রে! মানুষের কান নড়ছে! জগন্নাথ তো কোনদিন মানুষের কান নড়তে দেখেনি! মানুষের কান নড়ে নাকি!

তাল-ফুলুড়ি মামা কান দুটো তেমনি নাড়তে নাড়তে বাঁ হাতটা ঝাঁ করে ডান দিকে ছুঁড়ে তারপর ডান হাতটা ধাঁ করে বাঁ দিকে টানলে। টেনেই ঝপ করে একটা কৌটো কোত্থেকে বার করে ফেললে। কৌটোটা ছোট্ট। কিন্তু কোত্থেকে যে বার করল, জগন্নাথ বুঝতে পারল না। সেটার দিকে

তাকিয়ে তাল-ফুলুড়ি মামা জগন্নাথকে গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করলে, "বাবার বয়স কত?"

জগন্নাথ উত্তর দিলে, "জানি না।"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা হাতের কৌটোটা ডুগডুগি বাজানোর মত নেড়ে দিলে। কৌটোর ভেতরে টুং টুং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। তারপর আবার জিগ্যেস করলে, "তোর বাপ কতটা লম্বা?"

জগন্নাথ বললে, "জানি না।"

ঘণ্টা বাজল টুং টুং।

"কতটা বাঁটকুল?"

"জানি না।"

টুং টুং!

"কতটা খায়?"

এবার যেন জগন্নাথ রেগেমেগে মরিয়া হয়েই উত্তর দিলে, "যতটা খিদে পায়!"

তাই শুনে হঠাৎ তাল-ফুলুড়ি মামা বাঁদরের মাথায় ঠকাস করে গাঁট্টা মেরে ব্যস্ত হয়ে বললে, "মর্নাকি! মর্নাকি!"

মর্নাকি মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে জিগ্যেস করলে "কন কী? কন কী?"

"দেখ, দেখ," বলে কৌটোটা বাঁদরের চোখের সামনে তুলে বললে, "ছেলেটার নাম যদি জগন্নাথ হয়, তবে ওর বাবার নাম বাবা! ওর বাবা যদি এইখানে থাকে, তাহলে ওদের বাড়িটা এইখানে। ওদের বাড়িটা যদি ওইখানে হয়, তবে রাস্তাটা এইখানে। মানে বুঝলি?"

বাঁদর বললে, "আজ্ঞে মামা, মানে তো বোঝবার জন্য নয়। মানে তো মানে-বইয়ে লেখা আছে। মুখস্থ করার জন্যে।"

কৌটো দেখে জগন্নাথের মন তো আগের থেকেই ছুঁক ছুঁক করছিল। তারপর মামার কথাগুলো শুনে আর থাকতে পারে! পড়ি-মরি আগবাড়িয়ে ছুটে এসে বললে, "কই দেখি?"

তাল-ফুলুড়ি মামা চট করে কৌটোটা ওপর বাগে তুলে ধরে বললে, "অমনি, অমনি! একি মগের মুল্লুক। ভারি স্যায়না ছেলে দেখছি।"

পাখিটাও নিজের গলা মামার মত করে বললে, "ভারি স্যায়না ছেলে দেখছি!"
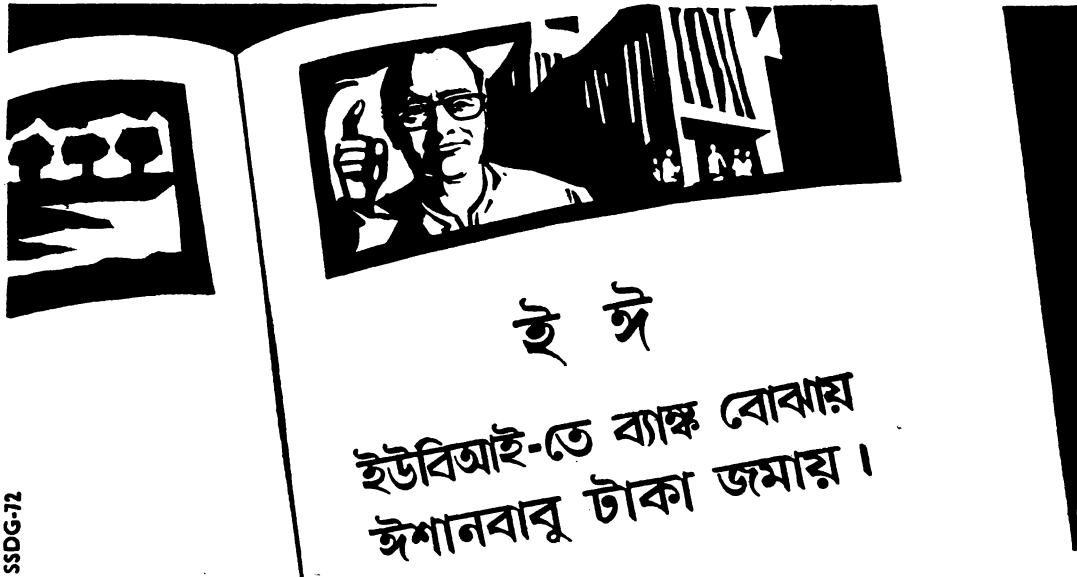
মামা জিগ্যেস করলে, "ট্যাঁকে টাকা আছে? কৌটো দেখতে পাঁচ সিকের পুজো লাগবে।"

আসলে তখন পাঁচ সিকে ছেড়ে জগন্নাথের ট্যাঁকে এক সিকেও ছিল না। পয়সা-কড়ি নিয়ে কি সে বেরিয়েছে! হঠাৎ বিপদে পড়ে তাকে এখানে আসতে হয়েছে। তা-ও বাঁদরের কথায়। তাই জগন্নাথ জিগ্যেস করলে, "কৌটোটা এখন দেখে পুজোটা পরে দিলে চলবে না?"

কথাটা শুনে তাল-ফুলুড়ি মামার সঙ্গে সেই ঢ্যাপসা-ঢুসকো পাখিটাও এমন খ্যালখ্যাল করে হেসে উঠল যে জগন্নাথের মনে হল তখনই তাকে পটকে দেয়! অবশ্য বাঁদরটা হাসেনি। কিন্তু তাই বলে জগন্নাথের জন্যে যে সে দয়ায় গলে পড়ছে, তার মুখ দেখে এ-কথাও কেউ বলতে পারে না। কেননা বাঁদরের মুখ তো! দয়া-মায়া, হাসি-কান্না, সে মুখ দেখে বোঝা যায় না। জগন্নাথ তবু রাগটা মনের মধ্যে সামলে নিয়ে বললে, "দেখুন, আমি তো পয়সা-কড়ি সঙ্গে আনিনি। বাড়ি ফিরে পাওনা-গণ্ডা আমি সব মিটিয়ে দেব।"

মামা জিগ্যেস করলে, "ধার?"

অমনি পাখিটা বলে উঠল, "ধারে এখানে কাজ হয় না!

ফেলো কড়ি মাখো তেল।"

এবার সত্যিই জগন্নাথ ভীষণ চটে গেছে। তেড়েমেড়ে পাখিটাকে বললে, "তুই চুপ কর তো! তখন থেকে খালি ভাংচি দিচ্ছে। আঃ গেল যাঃ।"

পাখিটা ঝুঁটি ফুলিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, "এই, তুই তোকারি করছিস কেন রে! কালকের ছেলে, ছোট-বড়ো জ্ঞান নেই! গুরুজনদের সম্মান দিতে জানিস না!"

জগন্নাথ উত্তর দিলে, "আহা রে, কী আমার গুরুজন! ভারি তো একটা পাখি, সে আবার গুরুজন!"

ঝগড়াটা আর একটু হলেই দানা বেঁধে উঠত। বাঁদরটা তখন চট করে জগন্নাথ আর পাখিটার সুমুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে দুজনকে থামিয়ে-থুমিয়ে বললে, "আরে, আরে, করছিস কী! নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি করতে আছে? তারপর জগন্নাথের কাঁধে হাত দিয়ে বললে, "দূর বোকা, খেপছিস কেন? এক কাজ কর, মামার কথাও থাক, তোর কথাও থাক, পাঁচ সিকের জায়গায় পাঁচটা পয়সা দিয়ে দে।" বলে মামাকে জিগ্যেস করলে, "কী মামা, ঠিক আছে?"

মামা চোখ দুটো ভুরুর কাছে উঁচিয়ে, যেন রাজিও নয় গররাজিও নয়, এই ভাব দেখিয়ে বললে, "অন্য কেউ বললে, আমি কক্ষনো রাজি হতুম না। তুই যখন বলছিস—"

"জগন্নাথ তখন বাঁদরকে কাকুতি-মিনতি করে বললে, "দেখ ভাই, সত্যি বলছি, আমার কাছে কিচ্ছু নেই। বাড়ি ফিরে পাই-পয়সা সব আমি চুকিয়ে দেব।"

মামা চিৎকার করে উঠল, "না, না, না। নগদা-নগদি ছাড়া আমি কাজ করব না। আমার কাছে আজ নগদ, কাল ধার।"

সেই কথা শুনে হঠাৎ যে এমন দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে জগন্নাথ ক্ষেপে উঠবে, কে বুঝতে পারে! তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে, তাল-ফুলুড়ি মামার তাপ্পিমারা জামাটা টেনে ধরে বললে, "আমি বার বার বলছি বাড়ি গিয়ে দাম শোধ করে দেব, আমার কথা গ্রাহ্যি করছেন না! কৌটোটা আমায় দেবেন তো দিন, নইলে কেড়ে নেব।"

খেপে গেলে মানুষের জ্ঞান-গম্যি যে একেবারে লোপ পায়, জগন্নাথকে তখন দেখলে এ-কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাল-ফুলুড়ি মামা ওর চেয়ে কত বড়, ষণ্ডা-মার্কা চেহারা! জগন্নাথ কখনও মামাকে বাগে আনতে পারে! মামা মেরেছে এক ধাক্কা! জগন্নাথ ছিটকে দুম-পটকা। মামা ডান হাতের কৌটোটা ধাঁ করে বাঁ হাতে নিতেই ফুস! মানে, দেখতে-দেখতে কোথায় লুকিয়ে ফেললে। জগন্নাথের যেন কেমন সব তালগোল পাকিয়ে গেল! জগন্নাথ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল লোকটার খালি হাতের দিকে। কিন্তু লোকটা দাঁড়িয়ে রইল না। মুখটা খিঁচিয়ে জগন্নাথের দিকে তেড়ে এল। জগন্নাথের কানটা ধরে হিড়হিড় করে টান দিয়ে বললে, "চোট্টামি করবার জায়গা পাসনি। ফের এমনি করবি তো পুলিশে দিয়ে দেব। আমায় চিনিস না!"

ভীষণ অপমান লাগল জগন্নাথের। কিন্তু কিচ্ছু বলল না। কারণ জগন্নাথ বুঝেছে লোকটার সঙ্গে গায়ের জোরে লড়াই করা তার কম্ম নয়!

লোকটা জগন্নাথের কানে টেনে এক হ্যাঁচকা মারলে। উঃ! কী ভীষণ লেগেছে জগন্নাথের। জগন্নাথকে টেনে চ্যাংদোলা করে তুলে বাঁদরকে বললে, "এই ধর।" বলে বাঁদরের দিকে তোল্লাই ছাড়লে। বাঁদর আলুগপ্পা লোফার মত জগন্নাথকে লুফে নিয়ে দুম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত পাখিটা কোন ক্যাঁচর-ম্যাচর করেনি। বাঁদর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই চেঁচিয়ে উঠল, "দিলে না কেন ছেলেটার তুবড়ি ফাটিয়ে! উঃ কী ঘেঁচড়া ছেলে রে বাপ! সাতজন্মে দেখিনি।"

বাঁদরটা জগন্নাথকে নিয়ে এল আর-একটা ঘরে। পাশেই ঘরটা। ঘরে নিয়ে এসে বললে, "এখানেই থাকতে হবে তোকে। পুজোর পয়সা না ছাড়লে, তোর ছাড়ান নেই। ভুল করলি, পয়সা ছাড়লে তো আর এত ঝামেলা হত না!"

জগন্নাথ এবার ভীষণ চটিতং। বললে, "তোকে এখানে কে নিয়ে আসতে বলেছিল! তখন থেকে বলছি আমার কাছে পয়সা নেই, তবু ভ্যাজাড়ং ভ্যাজাড়ং করেই চলেছে! তোদের মগজে কি কিচ্ছু ঢোকে না!"

বাঁদর ফট করে বলে বসল, "টংকা মানেই লবডংকা।"

কথাটা যে কেন বলল, জগন্নাথ বুঝতে পারল না।

তারপরে বাঁদরটা আবার বললে, "এইখানে বসে-বসে ধ্যান কর। যদি মা লক্ষ্মীর দয়া হয় বেঁচে যাবি। নইলে এইখানেই খাবি খেতে-খেতে অক্কা পাবি।" বলে বাঁদরটা একটা বিচ্ছিরি নোংরা ঘরে জগন্নাথকে ফেলে রেখে চলে গেল।

জগন্নাথ হন্তদন্ত হয়ে ডাক দিলে, "এই বাঁদর, শোন, শোন।"

বাঁদর সাড়া না দিয়েই ভো-কাট্টা।

ঘরটা সত্যিই যা-তা। স্যাঁতস্যাঁতে! আলো-বাতাস কিচ্ছু নেই। ঝুল আর মাকড়সার জালে এ-কোণ, ও-কোণ ছেয়ে আছে। কী বিচ্ছিরি বোঁটকা গন্ধ! ঘরের মধ্যিখানে একটা ছেঁড়া চাটাই পাতা। অবিশ্যি দরজাটা খোলা, এই যা! চাটাইয়ের ওপর ঠুঁটোর মত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে জগন্নাথ ভাবতে লাগল, এখন সে কী করবে! পালাবার ইচ্ছে থাকলেও পালাতে পারছে না। কেননা, একেবারে অচেনা জায়গা। কোনখান দিয়ে সে এখানে এল আর কোন্‌দিক দিয়ে যে সে বেরিয়ে যাবে, কিছুই ঠাওর করতে পারছিল না। অগত্যা ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর বসে পড়ল। ভয় তার মোটেই পাচ্ছিল না। শুধু পা দুটো ভারী টনটন করছিল। পায়ের আর দোষ কী! কাল রাত থেকে যা ধকল যাচ্ছে! জগন্নাথ বলে তাই। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে ফুট-কড়াই হয়ে যেত!

জগন্নাথের চোখদুটো যেন ছলছল করছে! কাঁদছে নাকি জগন্নাথ? ও তো সে-ছেলে নয়! অত সহজে তো সে মুষড়ে পড়ে না!

কিন্তু বলো, বাবার জন্যে কার না মন কেমন করে? ও নিজের চোখে দেখেছে, ঘোড়ার পিঠ থেকে বাবা ছিটকে পড়েছে। জগন্নাথও পড়েছিল। তবে জগন্নাথের একটুও লাগেনি। কিন্তু আর উঠতে পারেনি ওর বাবা! তারপর ওর বাবার যে কী হল, কিচ্ছু জানে না জগন্নাথ। ভাবতে-ভাবতে সত্যিই ওর চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠেছে। চাটাইয়ের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল জগন্নাথ। হয়তো কেঁদে ফেললে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছে। চমকে গেছে। কখন যে দিন ফুরিয়ে রাত ঘনিয়ে এসেছে, সে কিছুই জানতে পারেনি। কী ঘুম দেখো! উঃ! কত জমাট অন্ধকার! চোখ মেলে কিছুই দেখা যায় না! এই অন্ধকার ঘরে মানুষ থাকে! এটা মানুষের বাসা না চামচিকির আড্ডাখানা বোঝাই দায়! ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকি ঘরের চারপাশে গোঁত্তা মেরে উড়ে বেড়াচ্ছে! চাটাই ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জগন্নাথ। কী মনে হল, দরজা ডিঙিয়ে ঘর থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এল। উঁকি মারলে। কাউকে দেখতে পেলে না। জগন্নাথ বুঝতে পেরেছে অনেক রাত হয়েছে। কিন্তু সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা, সেটা জানতে পারছে না। সকলে বলতে তো সেই বাঁদরটা, পাখিটা আর তাল-ফুলুড়ি মামা। তাছাড়া অন্য কাউকে তো সে এখানে দেখেনি! কিন্তু বলো, তাল-ফুলুড়ি মামা লোকটা

কী রকম পয়সাপিশাচ। কিছুতেই কৌটোটা দেখাল না। জেনেশুনে জগন্নাথের মত একটা ছোট্ট ছেলের কাছে অমন হ্যাংলাপনা করতে তোর একটু বাধল না? তা যেমন মানুষের ছিরি, তার চাল-চলনও তো তেমনি হবে! ওদের লজ্জাসরম কিচ্ছু নেই। নাই থাক। কিন্তু ওই কৌটোটা জগন্নাথের চাই-ই চাই। ওই কৌটোটার মধ্যে সত্যিই ওদের বাড়ির রাস্তাটা দেখা যায় কিনা, ও দেখবে! দেখবে, কৌটোর মধ্যে ভেল্কি না লোকটা মারল ভড়কি!

যদিও অন্ধকারটা বাইরেও ঘুটঘুট করছিল, কিন্তু ঘরের মতন অমন জমাট না। জগন্নাথ ঠুক ঠুক করে পা বাড়িয়ে এগিয়ে এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কোনদিকে যাবে, কোনদিকে সেই তাল-ফুলুড়ি মামার ঘরটা। সত্যি অন্ধকারে সব ধাঁধিয়ে যাচ্ছে!

অবিশ্যি এটা তো আর গড়ের মাঠ নয় যে, এ-পার থেকে ও-পার যেতে ঘড়ির কাঁটা ঝুলে পড়বে। তাই অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়ে, আলতো পায়ে ডিঙি মারলে! যতদূর দেখা যাচ্ছে কাছে-পিঠে কোন নজরদারই জগন্নাথের নজরে পড়ছে না। তাই আরও এগিয়ে চলল।

কিন্তু হঠাৎ যে এমন বেটপকা হুমড়ি খাবে জগন্নাথ, ভাবতে পারেনি। একটা ভেজানো দরজায় হাত পড়ে গেছে। হাট হয়ে দরজাটা খুলে যেতেই জগন্নাথ টলে পড়েছে। ভাগ্যিস ডিগবাজি খায়নি। তাহলে যে আবার কী কাণ্ড হত, কে বলতে পারে!

দরজাটা হাট হয়ে খুলে যেতেই, ঝট করে আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে জগন্নাথ। নিঃসাড়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। না, মনে হচ্ছে কেউ টের পায়নি। উঁকি মারল জগন্নাথ। ঘরের ভেতরে টিমটিম করে লম্ফ জ্বলছে। কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ঘরে কেউ নেই। কিন্তু বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছে না, এইটাই সেই তাল-ফুলুড়ি মামার ঘর। এই ঘরেই সেই কৌটোটা আছে! জগন্নাথের বুকের ভেতরটা নেচে উঠল হয়তো ওই কৌটোটার কথা ভেবে, আনন্দে! তবু হুট করে ঘরে ঢুকতে সাহস হল না। আরও কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল জগন্নাথ।

ঘরে যে কেউ নেই, ও ঠিক বুঝতে পেরেছে। থাকলে কি এতক্ষণ জগন্নাথকে ছেড়ে কথা বলত! ঘাড় ধরে টানতে টানতে কখন জেলখানায় পাঠিয়ে দিত।

জগন্নাথ সুড়ুত করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখতে পেল না, তার পেছনে একটা ছায়া। জগন্নাথ লম্ফটা তাড়াতাড়ি হাতে নিলে। খুব সাবধানে পা ফেলে-ফেলে সেই কৌটোটা খুঁজতে লাগল। জগন্নাথের পেছনে পেছনে সেই ছায়াটাও নড়ে নড়ে ঘুরছে। ঘরের মধ্যে ছিল একটা উঁচু চৌকি, একটা কাঠের দেরাজ, কতকগুলো কাঁচের গেলাস, কাঁচি, ছুরি, আরও সাতসতেরো নানান জিনিস। জগন্নাথ দেরাজের হাতলটা ধরে টান দিলে। চাবি আঁটা। উঁচু চৌকিটার নীচের দিকে একটা তোরঙ্গ। টেনে বার করলে। তার ভেতর ছেঁড়া-ময়লা কাপড়-চোপড়। দেরাজের মাথায় একটা মাটির হাঁড়ি উল্টে পড়ে আছে। কৌটোটা ওর ভেতর লুকানো থাকলেও থাকতে পারে। জগন্নাথ উঁচু চৌকিটার ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে। অমনি আচমকা—ঠকাস! জগন্নাথের পিঠে যেন কে খোঁচা মারল। চমকে হাত ফসকে লম্ফটা মাটিতে পড়েই দপ করে নিভে গেল। ধড়ফড়িয়ে উঠেছে জগন্নাথ! চৌকি থেকে তড়াং করে লাফিয়ে পড়েছে। পালাতে যাবে কী, দেখে দুটো জলজ্যান্ত চোখ অন্ধকারে জ্বলছে। প্যাটপেটিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। প্রথমটা বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি, এটা সেই ঢ্যাপসা-ঢুপসো পাখির চোখ। পাখিটা এতক্ষণ ছায়ার মত ওর দিকে নজর রেখে ঘুরেছে, ও সেটা জানতেই পারেনি।

আচমকা একেবারে ঝপ করে পাখিটা ডানা দিয়ে জগন্নাথকে জাপটে ধরলে। ঝাড়লে ঠোঁটের বাড়ি এক ঠোক্কর! উফ! আর একটু হলেই চোখে লেগেছিল। এক ঘায়েই কুপোকাত জগন্নাথ! মাথাটা ঝনঝন করে উঠেছে। জগন্নাথ নিজেকে সামলাতে-না-সামলাতে পাখিটা মারলে আর এক ঘা! এবারে জগন্নাথের মুখের ওপর। আর রক্ষে আছে! জগন্নাথ মরিয়া! জগন্নাথের হাত দুটো যদিও পাখিটার ডানার মধ্যে জাপটানো ছিল, কিন্তু পা দুটোর তো কিচ্ছু হয়নি। জগন্নাথ তেড়েমেড়ে লাফিয়ে উঠে, নিজের পা দিয়ে দিয়েছে পাখিটার ঠ্যাং মাড়িয়ে! এমন মাড়ান মাড়াল যে, পাখির ঠ্যাং চেপটে চিঁড়ে চ্যাপটা! যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে, পাখি ডানার ভেতর থেকে জগন্নাথকে ছেড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ পাখিটাকে জড়িয়ে ধরেছে। ধরেই চিৎপটাং! কিন্তু পাখিও কি ছাড়বার পাত্তর! ফুড়ুত করে লাফিয়ে উঠে জগন্নাথের সঙ্গে ঝটাপটি লাগিয়ে দিলে। পাখিও ছাড়ে না, জগন্নাথও হারে না। পাখির অপলকা পালকগুলো জগন্নাথের হাতের টানে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফড় ফড় করে উঠে পড়ছে! তবু কি গোঁ ছাড়ছে!

কিন্তু যতই হোক, পাখি তো! তার আর কত ক্ষমতা! কতক্ষণ যুঝবে জগন্নাথের সঙ্গে! মানুষের কাছে দমে পারে! হাঁপিয়ে গেছে। তাল পেয়ে জগন্নাথও ধরেছে পাখির গলাটা টিপে! পাখি আর ট্যাঁও করতে পারে না, টুঁও করতে পারে না! জগন্নাথ তখন রেগে চাপা গলায় দাঁত কড়মড় করতে করতে বললে, "এবার তোকে কে বাঁচায়? বল সেই কৌটোটা কোথায়?"

পাখিটা জগন্নাথের হাতের রামটিপুনি খেয়ে বললে, "লক্ষ্মীটি, আমায় মারিসনি বাপ! একটা তুচ্ছ কৌটোর জন্যে

একটা পাখির প্রাণ নিসনি! আমায় ছেড়ে দে! আমি তোকে কৌটো দেব।"

জগন্নাথ পাখিটার গলায় টেনে আর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "মিথ্যে বলছিস?"

পাখির চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল। ঢোঁক গিলে উত্তর দিলে, "কক্ষনো না! হরে-কেষ্ট! আমি মিথ্যে বলি না।"

ঠাকুর-দেবতার নাম করলে, কে আর অবিশ্বাস করে! জগন্নাথও পাখির কথায় বিশ্বাস করে, ওর গলাটা ছেড়ে দিলে। বেশ সাহসের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বললে, "বার কর কৌটো!"

জগন্নাথের কোঁতানি খেয়ে বেচারা পাখি একদম ঠান্ডা! বয়েস যে হয়েছে, তা দেখলেই বোঝা যায়! কোঁকাতে কোঁকাতে জগন্নাথকে বললে, "আয় বাছা, ইদিকে আয়।"

জগন্নাথ জিগ্যেস করলে, "কোন দিকে?"

পাখি উত্তর দিলে, "ইদিকে।"

জগন্নাথ সিদিকে গেল।

পাখি বললে, "এইখানে হাঁটু মুড়ে বস।"

জগন্নাথ সেইখানে হাঁটু মুড়ে বসল।

পাখি বললে, "এইটারে ধরে প্যাঁচা।"

জগন্নাথ সেইটারে ধরে প্যাঁচালো। হুস-স-স!

দেওয়ালের গায়ে একটা আংটা। জগন্নাথ পাখির কথা শুনে আংটাটা প্যাঁচাতেই চিচিং ফাঁক! দেওয়ালের ভেতর সুড়ঙ্গ! পাখি ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গের ভেতরে! জগন্নাথকে ডাকলে, "আয়!"

জগন্নাথ প্রথমটা দোনো-মনো করলে। কারণ ভেতরটা ভীষণ অন্ধকার! তারপর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে জগন্নাথও সুড়ঙ্গে সেঁদিয়ে গেল!

জগন্নাথ সেঁদিয়ে গেলে পাখি জিগ্যেস করলে, "ভয় করছে?"

জগন্নাথের একটু-একটু গা-ছমছম করলেও জানতে দেবে কেন পাখিকে! গলায় বেশ জোর দিয়েই বললে, "না।"

তখন পাখি বললে, "দেখ জগন্নাথ, তোর সাহস দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি! খুশি হয়েছি, তুই আমায় গায়ের জোরে কাত করে দিয়েছিস বলে। আমি যদিও পাখি, কিন্তু জানিস, এককালে বাঘা-বাঘা দত্যি-দানো গায়ের জোরে আমার কাছে কানা হয়ে ঘরে ভেগেছে। অবিশ্যি এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি। বয়েস হয়ে গেছে তো! এই আজকে আমার বয়েস হল সাতশো সাতান্ন বছর আট দিন।"

অন্ধকারেও হাঁ করে জগন্নাথ পাখিটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পাখি আবার শুরু করলে, "আসলে কী জানিস, আমি এখানে চাকরি করি! চাকরি করি মানে, এই যে কৌটোটা চাই-ছিস, সেইটার নজরদারি করি। দেখ, কৌটোর দিকে নজর রাখতে রাখতে আমার নিজের নজরটাও এত ছোট হয়ে গেছে যে, মনে হয় এই পৃথিবীটাই বুঝি একটা কৌটো! এখন আমার মনে হচ্ছে আমি তোর সঙ্গে পালাই।

জগন্নাথ বললে, "চলুন।"

এতক্ষণ জগন্নাথ পাখিটাকে "তুই-তুই" করছিল। হঠাৎ চলুন বলতে পাখি বললে, "ভদ্রতা করলি বুঝি?"

জগন্নাথ উত্তর দিলে, "দেখুন, আমার বয়েস সবে সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে। আর আপনার সাতশো সাতান্ন বছর আট দিন। যতই হোক বয়েসে তো আমি আপনার কড়ে আঙুলের যুগ্যি নই! আপনার বয়েসটা আগে জানতুম না। তাই তুই-তোকারি করে ফেলেছি!"

"এই নে।" পাখির ঠ্যাংয়ে কৌটো!

আরে! সেই কৌটোটা। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে।

কৌটোটা হঠাৎ কোত্থেকে বার করল পাখি? জগন্নাথের চোখ দুটি কৌটো দেখে চকচক করে উঠেছে। হাত বাড়াল জগন্নাথ। কিন্তু পৌঁছল না হাত কৌটো পর্যন্ত। থমকে গেছে জগন্নাথের হাত। যেন দুটো জ্বলন্ত চোখ অন্ধকারে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে! জগন্নাথ স্পষ্ট দেখল, তার হাতে একটা ছুরি! আরি সব্বনাশ। এ যে তাল-ফুলুড়ি মামা! ছুরি উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে! পাখি চিৎকার করে উঠল, "জগন্নাথ, পালা!"

জগন্নাথ তাপ্পি খেতে খেতে জিগ্যেস করলে, "কো-কো কোন দি-ই-ই কে?"

পাখি বললে, "এই দিকে।"

মানে সেই দেওয়ালের ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা! জগন্নাথ পাখির ঠ্যাং থেকে কৌটোটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে দে ছুট! মামা তাই দেখে ছুরি উঁচিয়ে, ধাঁ করে দেওয়ালের গর্তে সেঁদিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস। মামা চিৎপটাং! পাখি মামার ঠ্যাং-এ মেরেছে এক লেংগি! তার-পর লেগে গেল ঝটাপটি! পাখি মামার ঠ্যাং ধরে টানে তো মামা পাখির ল্যাজ ধরে ঝোলে! টেনে-ঝুলে, গড়িয়ে-শুয়ে মামাতে-পাখিতে মারামারি লেগে গেছে! আর ইদিকে ততক্ষণে জগন্নাথ হাওয়া!

অবিশ্যি হাওয়া হব বললেই হাওয়া হওয়া যায় না। কেন-না, সুড়ঙ্গটা পেল্লাই লম্বা! শেষ হয় না। জগন্নাথ ভেবেছিল এক ছুটেই কেল্লা ফতে করে ফেলবে। কিন্তু শেষ হওয়া তো দূরের কথা, যেন বেড়েই চলেছে! বাবা! যেন ধাঁধা!

না, ধাঁধা নয়! সুড়ঙ্গের অন্ধকার কেটে গেছে। অন্ধকার থেকে ও যখন বাইরে পৌঁছল, তখন নিশুতি রাতের কালো অন্ধকার কেটে আকাশে সকালের আলো ফুটছে! দিন আসছে।

জগন্নাথ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! ও এখন থামল। ভাবল, হয়তো আর বিপদ নেই। রাস্তা-ঘাটে লোকজন চলাফেরা করছে। অনেক লোকের মুখ দেখে ওর বুকের ভারটাও যেন অনেক হালকা হয়ে গেছে। এখন ও নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারবে। যদিও সে এদিককার রাস্তা-ঘাট কিছুই চিনতে পারছে না, তবু তার ভাবনা নেই। কেননা, তার হাতে কৌটো। কৌটোর ভেতরে যন্তর-মন্তর! এতক্ষণে কৌটোটা ভালো করে দেখার সুযোগ পেয়েছে জগন্নাথ। কৌটোটা এমন কিছু বড় না। হাতের মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে রাখতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ওই কৌটো দিয়ে কী করে কী করতে হয়, কিছুই জানে না জগন্নাথ। ও বাবার কাছে গল্প শুনেছে, আরব দেশের ছেলে আলাদিন মাটিতে এক আশ্চর্য প্রদীপ ঘষল, অমনি এক বিরাট দত্যি বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলে, "হুজুর, হুকুম তামিল করার জন্যে আমি হাজির। আজ্ঞা করুন কী করতে হবে?" এই কৌটোটাও বোধ হয় তেমনি। প্রদীপের মত। কৌটোটার মধ্যেও হয়তো জাদু আছে। তবে তখন সে নিজের কানে শুনেছে, তাল-ফুলুড়ি মামা নাড়া দিতেই, কৌটোর ভেতর টুং টুং করে ঘণ্টা বেজে উঠছিল। জগন্নাথেরও ইচ্ছে হচ্ছিল, এখনই নাড়া দিয়ে ঘণ্টা বাজায়। কিন্তু সাহস হল না। কেননা, এই লোকজনের চোখের সামনে ঘণ্টা বাজালে, আবার যদি কিছু অঘটন ঘটে! বলা যায়!

একটা খুব নিরিবিলি জায়গা খুঁজে বার করল জগন্নাথ। এদিকে কেউ নেই। মনে হয়, কেউ আসবেও না। একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ভালো করে কৌটোটা পরখ করল। কাঠের কৌটো। চেপে বন্ধ করা। ঢাকনিটা টান দিল জগন্নাথ। খুলল না। আবার চেষ্টা করল তবু খুলল না। এঁটে গেছে, না চাবি আঁটা জগন্নাথ বুঝতে পারে না। তবে নেড়ে দেখি, ঘণ্টা বাজে কিনা! হাত ঝাঁকাল জগন্নাথ।

হাত ঝাঁকাতেই, হো-হো-হো!

চমকে গেছে জগন্নাথ। কে যেন হেসে উঠল! আর কথা আছে, মার ছুট!

ছুট দিতেই, হাসিটা আবার তেমনি হো-হো করে গড়িয়ে গড়িয়ে জগন্নাথের কানে তাড়া লাগালে। তারপর থেমে গেল!

হাসি থামতে জগন্নাথও থামল। একদম হাঁদা হয়ে গেছে সে। ও বুঝতেই পারল না, কোত্থেকে হাসি এল, কেউ তাকে দেখে হাসল, না কেউ হাসতে-হাসতে তাকে দেখল, এ-কথা-ও ভেবেই পাচ্ছে না। সুতরাং ও আবার হাঁটল। ভাবল, এক জায়গায় বোকার মত বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে লোকের তো সন্দেহ হতে পারে! কী বিপদ দেখো! কোথায় ও এতক্ষণে ঘরে পৌঁছে যাবে, তা না, খালি একটার পর একটা বাধা আসছে! আর নিরিবিলি জায়গার দরকার নেই। সামনে একটা ফাঁকা জায়গা। জগন্নাথ এবার সেইখানেই দাঁড়াল। আর ভাবল এবার কৌটোটা নাড়া দেওয়া যেতে পারে!

এবার সত্যি-সত্যিই জগন্নাথ কৌটোটায় ঝাঁকানি দিল। কিন্তু আশ্চর্য, বাজা দূরে থাক, ঘণ্টা, ফুট-ফাট কি খুট-খাট একটু আওয়াজ পর্যন্ত করল না। জগন্নাথ ঘাবড়ে গেছে। কীরে বাবা! শেষকালে পাখিটা কি তার সঙ্গে হড়কুষ্টি করলে! এ-কথা মানতে মন চায় না জগন্নাথের। মানতে মন চায় না যে, পাখিটা তার হাতে একটা নকল কৌটো ধরিয়ে দিয়ে তাকে ধাপ্পা দেবে! তা যদি হত, তাহলে মামা যখন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ছুরি নিয়ে তেড়ে এল, তখন ইচ্ছে করলে তো পাখি তাকে মামার হাতে মার খাওয়াতে পারত! তবে বাবা কার ভেতরে কী আছে, কে বলতে পারে! মানুষের কথাই মানুষ বলতে পারে না, তো পাখি! সে তো একটা তুচ্ছ জীব!

পাখিকে এত বিশ্বাস করেছে বলেই জগন্নাথ আরও কবার চেষ্টা করল। কৌটোটা নাড়ল, উল্টে-পাল্টে দেখল, ঢাকনিটা নিয়ে টানাটানি করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তখন ভীষণ মন-মরা হয়ে গেছে জগন্নাথ। ভাবলে, ভালো মনে বিশ্বাস করলে, এই ফল! দূর ছাই, এই জঞ্জাল থাকার চেয়ে, যাওয়াই ভালো! কৌটোটা ছুড়ে ফেলে দিল জগন্নাথ!

কৌটোটা ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "ফেলিস না, ফেলিস না।"

জগন্নাথ থতমত খেয়ে গেছে। কে কথা বলল? কাছে-পিঠে, কেউ তো নেই! আড়ালে বা আশ-পাশে যে কেউ লুকিয়ে থাকবে, এমনও তো জায়গা নয় এটা! তবে? তবে কি কৌটো-টার ভেতর থেকে কেউ চেঁচাল!

ছুটে গিয়ে কৌটোটা কুড়িয়ে নিল জগন্নাথ। অবাক হয়ে কৌটোটার দিকে তাকিয়ে "কী করি, কী করি" ভাবতে-না-ভাবতেই জগন্নাথ শুনতে পেলে কৌটোটার ভেতর থেকেই কে যেন কথা বললে। বললে, "জগন্নাথ, আমার নাম কর্বুর। আমার হাত নেই, পা নেই। মাথা নেই, ধড় নেই। আমি শুই না, জাগি না। খাই না, ফেলি না। কিন্তু আমি জানি, যারা একটুতেই ভেঙে পড়ে, তারা যা চায়, তা পায় না।"

জগন্নাথের বুকের ভেতরটা কীরকম ছটফট করে উঠল। ভয়ে না আনন্দে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। তার খালি মনে হচ্ছিল, তবে কি সে-ও আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত, একটা আশ্চর্য কিছু পেয়েছে! সে-কথাটা মনে হতেই বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল জগন্নাথ। বেশ গম্ভীর গলায় উত্তর দিলে, "শোনো কর্বুর, আমার নাম যদিও জগন্নাথ, আমার দুটো হাত, দুটো পা। একটা মাথা, একটা ধড়। আমি রোগা যত, ছোট্ট তত। আমার খিদে পায়, ঘুমও পায়। আমি খেলতে পারি, পড়তে পারি। আমি জানতে চাই আমার বাড়ি কোনদিকে? আমার বাবা কোথায়?"

কৌটোর ভেতর থেকে তখন সেই কর্বুর উত্তর দিলে, "কোনো কাজ কঠিন নয়, কোনো কাজ সহজ নয়। যে রাস্তা লম্বা যত, সে রাস্তা খাটো তত। কোনো চেষ্টা নিষ্ফল নয়, কোনো কাজই বিফল নয়। তবে এখনও অনেক বাধা পেরুতে হবে, অনেক কাঁটা ভাঙতে হবে।"

জগন্নাথ কর্বুরের কথা শুনে কেমন যেন চাঙ্গা হয়ে বললে, "আমি বাধা পেরুব, আমি কাঁটা ভাঙব, তুমি আমায় সাহায্য করবে?"

"তোমার মুখখানা আমি একবার দেখব।"

"কেন, দেখতে পাচ্ছ না? তুমি আমার নাম জানতে অথচ মুখটা কেমন জানতে না?"

কর্বুর উত্তর দিলে, "জগন্নাথ, আমার নাম কর্বুর। নাম আমি সবার জানি। কিন্তু মুখ কারো দেখতে পাই না। দেখা সম্ভবও নয়। এই কৌটোর মধ্যে আমি বন্দী হয়ে আছি। চারিদিকে জমাট অন্ধকার। এখান থেকে কিচ্ছু দেখা যায় না।"

"কিন্তু আমিও তো এই কৌটোটা খুলতে পারি না।"

কর্বুর বললে, "জগন্নাথ, আমি তো তোমায় আগেই বলেছি, কোনো কাজ কঠিন নয়, কোনো কাজ সহজ নয়! তাই খোলা যত সহজ, তত কঠিন।"

"কেন?"

"কেন না, তুমি ভালো করে দেখোনি. কৌটোটা প্যাঁচ দিয়ে আঁটা। চাকার মতো ঘুরুলেই যে খুলে যাবে, এটা তুমি জানবার চেষ্টা করনি।"

জগন্নাথ অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে, "তাই নাকি? তাহলে এতক্ষণ আমি হাঁদার মত কৌটোটা টানামানিই করেছি!"

"যারা দেখেশুনে, বুঝে সুঝে কাজ করতে চায় না, তারা কাজ নিয়ে টানামানিই করে।"

"আচ্ছা কর্বুর, আমি যদি কৌটোটা খুলে দিই, তুমি পালিয়ে যাবে না তো?"

"আমি পালাবও না পালালে হারাবও না।"

কর্বুরের এই কথাটা শুনে জগন্নাথের কেমন যেন সন্দেহ হল। বললে, "তুমি এমন হেঁয়ালির মত কথা বলছ কেন? তোমার মতলবটা খুলে বল তো!"

"আগের কথা আগে, পরের কথা পরে।"

"আগের কথাটা কী শুনি? সোজা কথা সোজাসুজি না বললে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"মনে বিশ্বাস রেখে আমায় যদি তোমার মুখখানা দেখবার জন্যে এই কৌটোটা খুলে দাও, তবে তোমার ভালো হবে।"

"ঠিক বলছ?"

"কর্বুর কখনও বেঠিক বলে না।"

"বেশ খুলে দিচ্ছি।" বলে, জগন্নাথ কৌটোটার প্যাঁচ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খুলতে লাগল। খুলতে খুলতে ভাবতে লাগল, "কী জানি বাবা, ভেতরে আবার কী দেখি!"

প্যাঁচ খুলে গেল। জগন্নাথ কৌটোর ঢাকনিটা টেনে তুলতেই, ঝন ঝন করে ঝংকার দিয়ে এক ভয়ংকর বাজনা বেজে উঠল। তারপরেই জগন্নাথের চোখ ঝলসে সেই ছোট্ট কৌটোটার ভেতর থেকে এক ঝলক রঙের ধোঁয়া বেরিয়ে এল। কত রকমের রঙ, লাল, নীল, হলদে, সবুজ। সেই রঙের ধোঁয়া হাওয়ার সঙ্গে মিশে জগন্নাথের মাথার ওপর ঘূর্ণি খেয়ে ভাসছে। ভাসতে ভাসতে জগন্নাথের চোখের সামনে এক ময়ূরকণ্ঠী রঙের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জগন্নাথ চেঁচিয়ে উঠেছে, "তুমি কে?"

মূর্তি বললে, "আমি কর্বুর।"

"তুমি এত সুন্দর?"

"জগন্নাথ, আমি তোমারই জন্যে সুন্দর হয়েছি। তুমি আমায় মুক্তি দিয়েছ। আমি সাতশো আটান্ন বছর আট দিন এই কৌটোর মধ্যে বন্দী ছিলুম। আজ আমার ছুটি।"

"তুমি এই কৌটোর মধ্যে আর থাকবে না?"

"না।"

"তাহলে তুমি আমায় মিথ্যে বললে?"

"না, জগন্নাথ। এই কৌটোর মধ্যে না-থাকলেও আমি তোমার সঙ্গে আছি। তোমার যখন বিপদ হবে, আমি আসব।"

জগন্নাথ বললে, "আমার এখনই তো বিপদ! আমার বাবা কোথায়, বাড়ি কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না। মানুষের আর কী বিপদ হবে?"

কর্বুর উত্তর দিলে, "জগন্নাথ, বলেছি তো অত সহজে মুষড়ে পড়লে চলবে না। পথ হাঁটতে আরও কত বিপদ আসবে। বিপদের মধ্যে সাহসে বুক বেঁধে যারা হাঁটে, তাদের জয় হবেই। আমি তোমার মনের ভেতরটা দেখতে পেয়েছি। তুমি সাহসী, বীর, সৎ আর সুন্দর। যারা সৎ তারা কখনও হার স্বীকার করে না। তারা এগিয়ে চলে। তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে।"

"কোথায়?"

"সামনে।"

"আর তুমি?"

"তুমি আমায় দেখতে পাবে, আকাশের ওই নীলে, কিংবা কালো মেঘের জটায়, রঙিন ফুলের পাপড়িতে অথবা সবুজ পাখির পালকে!"

"তোমায় ডাকব কেমন করে?"

"শোনো জগন্নাথ, দেখো, ওই কৌটোর মধ্যে রেশমী সুতোয় বাঁধা ছোট্ট একটা ঘুঙুর আছে। ওইটা বার করে তোমার কাছে রাখো। ওই ঘুঙুর তুমি বাজালেই বাজবে না। ঠিক সময়ে, ঠিক দরকারে যদি নাড়া দাও, ওই ঘুঙুর বাজবে। আর তখনই আমি আসব। আমি জানি, তুমি ঠিক বুঝবে, কখন ওটিতে নাড়া দিতে হবে। জেনো, যারা বার বার নাড়া দেয়, তারা ভীরু! বিপদকে জয় করতে তারা পারে না। তবে একটা কথা শুনে রাখো জগন্নাথ, যারা অন্যের উপকার করার জন্যে, অন্যের ভালোর জন্যে ওই ঘুঙুর যখনই বাজায়, তাদের কাছে তখনই আমি আসি। যারা অন্যের ভালো করতে চায়, তাদের সঙ্গে আমি সব সময় আছি। তুমি এগিয়ে চলো জগন্নাথ, এগিয়ে চলো।" বলতে বলতে সেই রঙিন ময়ূরকণ্ঠী মূর্তি জগন্নাথের চোখের সামনে থেকে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল।

জগন্নাথ অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেই দিকে। তারপর সেই ছোট্ট কাঠের কৌটোর ভেতর হাত দিয়ে দেখল, সত্যিই তার ভেতর রেশমী সুতোয় বাঁধা একটা সোনার ঘুঙুর। ঝকঝক করছে। জগন্নাথ চটপট সেটা বার করে কোঁচড়ে বেঁধে ফেললে। ফেলে দিল কৌটোটা। হাঁটা দিল জগন্নাথ। এগিয়ে চলল আর মনে মনে ভাবতে লাগল, আশ্চর্য প্রদীপের মত এও যেন আর-এক আশ্চর্য সোনার ঘুঙুর!

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। কর্বুরের কথামত সে অনেক পথ হেঁটেছে। অনেক কাঁটা সে পথের থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কিংবা ভেঙে ফেলেছে। এমনি হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্রীষ্ম গেছে, বর্ষা এসেছে। শরৎ কাটল, তবু সে বাবাকে খুঁজে পায়নি। সে হয়তো কেঁদেছে। কিন্তু জগন্নাথের সেই চোখের জল কেউ দেখেনি কোনদিন। পথ হারিয়ে ও একা-একা কাজ করেছে। হাত পাতেনি কারো কাছে। বিপদ এসেছে। কিন্তু বিপদের কাছে হার মানেনি জগন্নাথ। কর্বুর বলেছে বিপদের মধ্যে সাহসে বুক বেঁধে যারা হাঁটে তাদের জয় হবেই। তাই কর্বুরের কথায় বিশ্বাস করেই জগন্নাথ ওর কোঁচড়ে বাঁধা সোনার ঘুঙুর কোনদিনই বাজায়নি। ও বাজাবে সময় এলে। কিন্তু সে সময় কবে আসবে?

সেই সময় এল না। কিন্তু শীত এল।

সেদিন যখন সেই শীতের রাতে একা - একা হাঁটছিল জগন্নাথ, তখন কোয়াকে কুড়িয়ে পেলে। খুঁজছিল একটু আশ্রয়, নিজের জন্য নয়, ওই ছোট্ট কুকুরছানা কোয়ার জন্যে।

"ঘেউ, ঘেউ!" হঠাৎ কোয়া এমন করে ডেকে উঠল কেন? এতক্ষণ তো শীতে কিঁউ-কিঁউ করছিল। এমন রাগ-রাগ কেন তার ডাকে?

নীলুর চিঠি

বাবলু,

তোর চিঠিটা প'ড়ে ইলেক্ট্রিকের 'শক' খেলাম বলতে পারিস। লিখেছিস—"মাফ কর রাজা, কলকাতায় আমি সহজে ফিরছি না। ঘেন্না করে, গা ঘিন-ঘিন করে। কি বিচ্ছিরিই না শহরটা হয়েছে।" কোন কিচ্ছু না ভেবে, না বুঝে কলকাতার যারা নিন্দে করে তুইও শেষে তাদের দলেই ভিড়লি বাবলু? তাছাড়া কলকাতার নিন্দে করার 'রাইট' তোকে দিলোটা কে, শুনি?

সেই সত্তর সালে তো কলকাতা ছেড়ে চলে গেলি। চলে গেলি অমুক নগর, তমুক মন্দির মার্গের দেশে। আর ইচ্ছেও করল না একবার ঘুরে দেখে যেতে যে-কলকাতাটাকে '৭০ সালের বিভীষিকার মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেলি তার কি হাল হ'ল?

'৭৬-এর মাঝামাঝি আর যখন চুপ করে থাকতে পারলি না, দিল্লীতে বসে থেকেও কানে গেল কলকাতার সুখ্যাতি, তখন 'রাবণের শক্তিশেল'-এর মত ছুঁড়ে দিলি তোর পত্র-বাণখানা—। ভাবলি এতেই বুঝি নীলু কাত হয়ে যাবে।

হ্যাঁ ফ্র্যাংক্লি বল্ তো পাতাল রেল সারা ভারতে একমাত্র কলকাতাতেই হচ্ছে শুনে তোর টনক নড়েছে—তাই না?

তবে শোন, শুধু পাতাল রেলই নয়রে, সারা কলকাতা জুড়ে এখন এক কাজের মেলা চলছে। দু'শ বছরের ব্যবহার করা একটা জীর্ণ কলকাতায় তুই আজন্ম কাটিয়ে গেলি ঠিকই, কিন্তু যে কলকাতা তার পুরোনো খোলস ছেড়ে প্রায় বাল্মীকির মত নব-জীবন লাভ করতে যাচ্ছে তার হদিস তুই জানলি না। আমরা যারা কলকাতার ছেলে, তারা কলকাতার দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নিয়েছিলাম কলকাতার দুঃখের দিনে। তাই আবার কলকাতার শ্রীবৃদ্ধিও আমাদের মন কানায় কানায় ভরে তুলছে।

কাব্য করছি? তা বলতে পারিস। একটা শহর যাকে কাঁধে তুলে 'হরিবোল' দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল এখন তার কেমন রমরমা অবস্থা দেখে যা।

বেহালার ডায়মণ্ড হারবার রোড—হাঁটতে গেলে মনে হ'ত দুপাশ থেকে দোকানপত্র বাড়ী ঘরদোর শাঁড়াশীর মত গলা চেপে ধরতে আসছে। এখন, এখন কি যে বলি, তুই ভাববি বানিয়ে বলছি—বিশ্বাস কর, চওড়ায় প্রায় সেকেণ্ড চৌরঙ্গী হয়ে গেছে। আর, কতগুলো যে নতুন ব্রীজ হয়ে গেছে তুই চিনবিও না। উল্টোডাঙ্গা, চেতলা, যাদবপুরে সি.এম.ডি.এ যা করছে তার জন্যে তোর আজ গর্ব হ'তে পারত।

ইচ্ছে করেই তোকে আর একটু 'বোর' করছি। মন দিয়ে শোন—খাবার জল, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, নতুন রাস্তাঘাট তৈরী, সেতু নির্মাণ, বস্তী উন্নয়ন ইত্যাদি যা যা হয়েছে তুই চিঠিতে প'ড়ে সে সব বিশ্বাসও করতে পারবি না।

কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল, এ শহরটাকে তোরই মত কেউ ভালবাসল না। সবাই নিংড়ে রসটুকু টেনে নেবার ধান্দায় থেকে গেল রে বাবলু। 'ইন রিটার্ন' কানাকড়িটাও করলো না কেউ। কুমীরের কান্নায় তো কাজ হয় না—জানিসই তো?

তবে ভাবিস না সে জন্যে কলকাতা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে। কলকাতার আছে "ভোলাবাবা" অর্থাৎ কিনা সি.এম.ডি.এ'র চেয়ারম্যান শ্রীভোলানাথ সেন, যিনি কিনা সত্যি সত্যিই কলকাতাকে, কার্টুনে নয়, এবার বাস্তবেই পার করছেন। আছে যুবসমাজ কলকাতার 'জঞ্জাল' হটাতে। আর আমরা—কলকাতার লোকে 'এলার্ট' হচ্ছি 'এলার্ট' করছি।

এবার এক মেমসাহেবের কথা বলে চিঠি শেষ করি। বিদেশীদের এদেশ প্রেম নিশ্চই অগ্রাহ্য হবে না আমাদের বাবলু সাহেবের কাছে। হ্যাঁ যা বলছিলাম—এক মেমসাহেব এসেছিলেন আমাদের স্কুলে। বল্লেন—'আসবার আগে রীতিমত 'নার্ভাস' লাগছিল। যা সব শুনেছিলাম কলকাতা সম্পর্কে! অথচ এসে দেখছি, এমন একটা প্রাণবন্ত শহর, আশ্চর্য এর ঐতিহ্য! নতুন আর পুরোনোর সার্থক সমাবেশ।' মহিলাটি সাংবাদিক। দেশে গিয়ে কাগজে কাগজে লিখবেন বল্লেন—"ক্যালকাটা—দি বিউটিফুল সিটি।" তারপর যে কথাটা বল্লেন সেটা আরও মারাত্মক—"I am madly in love with your City" অর্থাৎ কিনা 'আমি তোমাদের নগরীর প্রেমে পাগলা হয়ে গেছি।' কিরে? সাহেবমেমেদের কথা—বোঝ ব্যাপারখানা!

এবার তোর কবে কলকাতার জন্যে মন কেমন করবে সেই অপেক্ষায় রইলাম।

ভালবাসা নিস।

তোর নীলু

কোয়া আবার ডাকল, "ঘেউ, ঘেউ!" ডাকতে ডাকতে জগন্নাথের কাঁধের ওপরে ছটফটিয়ে উঠল।

জগন্নাথ জিগ্যেস করলে, "কী রে, কী হল? শিকার দেখেছিস?" জগন্নাথ কাঁধ থেকে নামিয়ে কোয়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে। যা ছটফট করছে! যদি মুখ থুবড়ে পড়ে!

কিন্তু জগন্নাথ তো নিজেই থতমত খেয়ে গেছে! দাঁড়িয়ে পড়ল জগন্নাথ। কান পেতে কী যেন শুনছে! অনেকগুলো বেড়াল একসঙ্গে কাঁদলে যেমন শোনায়, তেমন যেন কান্না শুনতে পাচ্ছে জগন্নাথ।

কোয়া আবার চেঁচাল, "ঘেউ, ঘেউ।"

বেড়ালও কাঁদছে, "ম্যাঁও-ও, মিঁও-ও, মিঁউ-উ!"

জগন্নাথ ভাবলে, "এ আবার কী। এত বেড়াল কাঁদে কোথায়!"

আবার হাঁটা দিল জগন্নাথ। যত হাঁটছে, কান্না তত বাড়ছে। অথচ এদিক-ওদিক, আশে-পাশে বেড়াল ছেড়ে একটি টিকটিকিও নজরে পড়ছে না। জগন্নাথ ভাবলে, শীতে কাচ্চা-বাচ্চা ছেড়ে বেড়াল-মা বোধহয় ভেগেছে! দেখো দিকিনি, এক কুকুরছানা নিয়েই সে ব্যতিব্যস্ত, আবার বেড়াল! শেষে কি কুকুর-বেড়াল নিয়েই তাকে ঘর করতে হবে!

হঠাৎ চমকে তাকায় জগন্নাথ! মনে হচ্ছে সামনে একটা কোঠা-বাড়ি! কুয়াশায় ঢেকেছিল বলে এতক্ষণ দেখতে পায়নি জগন্নাথ। জগন্নাথের ঠিক মনে হল, বেড়ালের কান্না ওখান থেকেই ভেসে আসছে! ওই দিকেই চলল জগন্নাথ। কোয়ার মুখের কাছে হাত রেখে ফিসফিসিয়ে বললে, "চেঁচাস না।"

কোয়া কী বুঝলে কে জানে! সত্যিই আর চেঁচাল না।

বাড়িটার সামনে এসেই দাঁড়াল জগন্নাথ। ও দেখল ওই ওপরে একটা খুপরি। সেখান দিয়ে আবছা-আবছা আলো আসছে। বেড়ালের কান্না যে এই বাড়ির ভেতর থেকেই শোনা যাচ্ছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে কে যেন বেড়াল-গুলোকে মারছে আর ওরা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে!

জগন্নাথ ওই ওপরের খুপরিটার দিকেই চাইল। ইচ্ছে, ওখান দিয়েই উঁকি মারে! কিন্তু কথা হচ্ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো জগন্নাথ নাগাল পাবে না খুপরিটার। ব্যস্ত হয়ে উঠল জগন্নাথ। বাড়ির দরজাটা কোন দিকে দেখতে হয় তো!

দরজা সামনেই। মস্ত উঁচু আর পেল্লাই। লোহার কপাট। বন্ধ। বন্ধ কপাটে ধাক্কা দিল জগন্নাথ। দরজা নড়ে না, খোলেও না। খুব জোরে ঠেলা দিল। লোহার কপাট শক্ত আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোয়াকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বললে, "তুই এখানে চুপটি করে বস। কোথাও যাসনি!"

কোয়া বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে, চুপটি করে বসে, জগন্নাথের দিকে জুলজুল করে চেয়ে রইল।

জগন্নাথ বেশ করে কাপড়ে মালকোচা মারল। তারপর লাফ দিল। লাফ দিল ওই উঁচু খুপরিটার দিকে। মতলব, লাফিয়ে খুপরির উপর উঠবে। কিন্তু হাত ফসকে গেল। আবার লাফাল, পারল না। কাছে-পিঠে কিছু দেখতেও পাচ্ছে না যে, তার ওপর পা রাখবে! জগন্নাথ আবার লাফ দিল। এবার খুপরির খাঁজটা ধরে ফেলেছে! দেওয়ালের গায়ে পা ঘষতে ঘষতে জগন্নাথ খুপরির মধ্যে মাথাটা সেঁদিয়ে দিল। বুকটা একটু ছড়ে-ছিঁড়ে গেল বটে, তবু ঘাবড়াল না। উঁকি মেরেই চক্ষুঃস্থির! ঘরের মধ্যে একটা ল্যাংচা-মার্কা ছেলে, একটা লাঠি দিয়ে বেদম বেড়াল ঠেঙাচ্ছে। তা-ও কি এক-আধটা বেড়াল! গোনাগুনতি সাত-সাতটা। বেড়ালগুলো ঠেঙানি খাচ্ছে, প্রাণের ভয়ে চেঁচাচ্ছে, লাফাচ্ছে, আর ঘরের মধ্যেই চরকি খাচ্ছে। একটা ভুসো-কালি-ভর্তি ঝোলা-লণ্ঠনের আবছা আলোয় জগন্নাথ যদিও দেখতে পাচ্ছে ঘরটা বড়ো, তবুও ওদিকটা এত অন্ধকার যে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওই অন্ধকারের মধ্যে কী আছে, কে আছে, কে জানে!

কিন্তু আর দেখতে পাচ্ছে না জগন্নাথ! ঈশ্! ছিঃ ছিঃ! বেড়ালগুলোকে বুঝি মেরে ফেলবে! কী জল্লাদ ছেলে রে বাবা!

খুপরির ভেতর থেকেই জগন্নাথ চেঁচিয়ে ধমকে উঠল, "এই ছেলেটা, বেড়ালগুলোকে মারছিস কেন রে!"

বয়ে গেছে! কানে কথাই নিল না।

ব্যাপারটা তো ভালো ঠেকছে না। থাকতে পারল না জগন্নাথ। ওর দেহটা খুপরির মধ্যে গলিয়ে দিল। তারপর ওই ওপর থেকে ঘরের মধ্যে মারল লাফ! লাফ মেরেই ছেলেটাকে ধরে ফেললে।

জগন্নাথকে দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে সেই ল্যাংচা-মার্কা ছেলেটা।

জগন্নাথ ছেলেটাকে টেনে ধরে বললে, "খবরদার বলছি মারবি না!"

ছেলেটা জগন্নাথের মুখের দিকে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, "ছেড়ে দে আমায়।" বলে ছেলেটা জগন্নাথকে এমন এক ধাক্কা মারল, জগন্নাথ চিৎপাত! অমন ল্যাংচা-মার্কা দেখতে হলে কী হবে, ছেলেটার গায়ে কী ক্ষমতা রে বাবা!

জগন্নাথ উঠে পড়েছে। উঠতেই ছেলেটা আচমকা জগন্নাথের মাথায় ধাঁই করে লাঠিটা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিল। জগন্নাথের মাথাটা ঝনঝন করে উঠল। কিন্তু জগন্নাথও কি দাঁড়িয়ে মার খাবার ছেলে! নিজেকে সামলে নিয়েই ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছেলেটার হাতের লাঠি হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গেল জগন্নাথ। কিন্তু তার আগেই ছেলেটা জগন্নাথের পেটে টেনে ঘুঁষি কষিয়ে দিল। জগন্নাথ জাপটে ধরল ছেলেটাকে। বেড়াল ছেড়ে শেষে জগন্নাথ আর সেই ছেলেটায় মারামারি লেগে গেল।

বোঝা যাচ্ছে, ছেলেটার গায়ে জোর বেশি। যতই হোক, জগন্নাথের চেয়ে ও মাথায় বড়। তবু বলতে হবে বাহাদুর ছেলে জগন্নাথ। বেড়ালগুলোকে বাঁচাবার জন্যে লড়ে তো যাচ্ছে! বেড়ালগুলো ভয়ে কী কাঁপান কাঁপছে দ্যাখো!

পারল না জগন্নাথ। ছেলেটা ওকে চিত করে ফেলেছে। জগন্নাথের মুখে, পিঠে, হাতে, বুকে যেখানে পাচ্ছে কিল, চড়, ঘুঁষি চালাচ্ছে। কী সব্বনাশ! মেরে ফেলবে নাকি জগন্নাথকে! ওর কাছে তো কবুরের দেওয়া আশ্চর্য জাদু আছে। এখন তো সে সত্যি-সত্যি বিপদে পড়েছে। দিক না সেই জাদুর ঘুঙুর বাজিয়ে!

বাজাল না জগন্নাথ। ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কেমন যেন নিঃঝুম হয়ে গেল। ওর কি দম আটকে গেছে!

না, ওর ভীষণ লেগেছে। ওর চোখের পাতা দুটি আঘাত সইতে না-পেরে বুজে গেছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর। নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল জগন্নাথ।

হঠাৎ যখন চমকে উঠে জগন্নাথের চোখ দুটি আবার চাইল, তখন ও বুঝতে পারল না কতক্ষণ সে এমনি করে পড়েছিল। চোখ চাইতেই সে অবাক হয়ে গেছে। একী! সেই ছোট্ট ছোট্ট বেড়ালগুলো কেমন আদর করে জগন্নাথকে জড়িয়ে আছে! আঃ! নরম তুলোর মতন তুলতুল করছে! জগন্নাথের সারা শরীরে আঘাত লেগেছে! কষ্ট পাচ্ছে! ওরা যেন কষ্ট পেতে দেবে না জগন্নাথকে। ওরা ভালোবাসবে

সন্ধ্যা ভালবাসেন!

প্রিয় ফিল্মঃ সংসার সীমান্তে
ঘরের কাজঃ ফুল সাজান
বিলাসিতাঃ প্রতিদিন সকালে ৫ মিনিটের মটকা
তাঁর সৌন্দর্য সাবানঃ মোলায়েম **লাক্স**

"আমার রূপ-লাবণ্যের পক্ষে **লাক্স** সত্যিই অপূর্ব," বলেন সন্ধ্যা রায়। "চমৎকার মোলায়েম **লাক্স** সত্যিকারের স্নিগ্ধ, শুদ্ধ সাবান…"

শুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স-চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

HLL-9636 A

জগন্নাথকে। ছেলেটার হাত থেকে ওদের বাঁচাবার জন্যেই তো জগন্নাথের এই বিপদ! ওর কপালে রক্ত! সে রক্ত মাটিতে পড়তে দেয়নি ওই ছোট্ট বেড়ালগুলো। ওরা মুছে দিয়েছে। জগন্নাথের কপালের রক্ত ওদের গায়ে মুছে মুছে ছড়িয়ে পড়েছে!

ধড়ফড় করে উঠে বসল জগন্নাথ। সঙ্গে-সঙ্গে তড়বড় করে এদিক-ওদিক ছুটে পালাল বেড়ালগুলো। দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে কেমন যেন ছলছল চোখে তাকিয়ে রইল জগন্নাথের দিকে। জগন্নাথও থ হয়ে গেছে। ওর দৃষ্টি থমকে-থমকে ওই বেড়ালগুলোর চোখের কাছে এসে স্থির হয়ে যাচ্ছে। বেড়ালগুলো কাঁদছে নাকি! এতক্ষণ কি ওরা জগন্নাথের বুকের ওপর মাথা রেখে কাঁদছিল!

হ্যাঁ, কাঁদছিল। আর সেই ছেলেটা? সে কোথা গেল?

ওই তো ছেলেটা!

কী করছে ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে?

কাঁদছে!

জগন্নাথের নজরটা হঠাৎ-ই পড়ল ছেলেটার দিকে। দাঁড়িয়ে ছিল, একটু দূরে। তাকিয়ে ছিল জগন্নাথের মুখের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদছিল।

কাঁদছে কেন ছেলেটা?

দাঁড়াবার জন্যে চেষ্টা করছে জগন্নাথ। এখনও ব্যথা করছে। পারছে না। ছেলেটা ছুটে এল। জগন্নাথের হাত দুটি জড়িয়ে ধরেছে। ছেলেটার চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা হয়ে জগন্নাথের হাতের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। কেমন শিউরে উঠল জগন্নাথ। কী করবে বুঝতে পারছে না। জগন্নাথ ভাবছে, কাঁদছে কেন ওরা! ছেলেটাও কাঁদছে, বেড়ালগুলোও কাঁদছে। কী হয়েছে ওদের?

ছেলেটাই কথা বললে, "আমার নাম মাকু।" কান্নায় ভিজে আছে ওর গলার স্বর। জগন্নাথের চোখের দৃষ্টি ওর মুখের ওপর নরম হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ছেলেটা আবার বললে, "আসলে আমার নাম মানিক। আমায় সবাই মাকু বলে ডাকে। তোর?"

জগন্নাথ ছেলেটার মুখের দিকে চেয়েই রইল। কোন উত্তর দিলে না।

"বলবি না?"

এবার জগন্নাথ মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

"তোর লেগেছে, খুব?"

জগন্নাথ উঠে দাঁড়াল।

ছেলেটা বললে, "দেখ, সত্যি বলছি আমি তোকে মারতে চাইনি। আমি—আমি," বলতে বলতে সব বলা হল না। হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে।

ওর কান্না দেখেই বোধহয় জগন্নাথ এতক্ষণে কথা বললে, "আমি যাব।"

"কোথায়?"

"বাইরে। রাত হয়েছে, শীত বাড়ছে। বাইরে যাবার দরজা কোথায়?"

ছেলেটা জগন্নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিগ্যেস করলে, "তোর মা আছে?"

"আমার কে আছে না-আছে, সে দেখবার তোর কী দরকার!" একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিলে জগন্নাথ।

"তুই রাগ করেছিস, না?"

"কার ওপর রাগ করব?"

"আমার?"

"না।"

"সত্যি বলছিস? কিন্তু জানিস, আমাদের কথা শুনলে তোর হয়তো রাগ হবে না।" বলে ছেলেটা চুপ করে গেল। জগন্নাথ ঘরের সেই যেদিকটা অন্ধকার, সেইদিকে কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকাল একবার। থমথম করছে সেই অন্ধকারটা। থমথম করছে সারা ঘরটা।

ছেলেটা আবার বললে, "ওই যে বেড়ালগুলোকে দেখছিস, ওদেরও যেমন মা আছে, আমারও তেমনি মা আছে। কিন্তু জানিস, আমরা হারিয়ে গেছি। আর একটু পরে তোরও সব কিছু হারিয়ে যাবে।" বলে ছেলেটা একটু ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে।

কথাটা কেমন অদ্ভুত ঠেকল জগন্নাথের কানে। জিগ্যেস করলে, "মানে?"

"মানে, এখান থেকে তুই তো আর বেরিয়ে যেতে পারবি না। তুই এখন বন্দী। একটু পরে তুইও বেড়াল হয়ে যাবি।"

ভীষণ অবাক হয়ে গেল জগন্নাথ। মানুষ আবার বেড়াল হবে কী করে!

"সত্যি। ওই যে বেড়ালগুলো দেখছিস, ওরা সব মানুষ। তোর মত, আমার মত মানুষ। ওদের ধরে এনেছে। আমাকেও ধরে এনেছে!"

বলবার সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ালগুলো জগন্নাথের মুখের দিকে চেয়ে একসঙ্গে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে জগন্নাথের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। জগন্নাথের বুকটা কেমন যেন ভার হয়ে গেল। বেড়ালগুলোকে পায়ের কাছ থেকে তুলে নিলে। জিগ্যেস করলে, "কে ধরে এনেছে?"

ছেলেটা বললে, "জানি না।"

"তাকে দেখিসনি?"

"না। ওই অন্ধকারে সে লুকিয়ে থাকে। ওই অন্ধকারটা যেমন অন্ধকার, সেই মূর্তিটাও তেমনি অন্ধকার! অন্ধকারে অন্ধকার হয়ে সে গর্জন করে! তাকে দেখতে পাই না।"

"এখনও সে ওই অন্ধকারে আছে?"

"না, এখন সে নেই। একটু পরে আসবে।"

"তাহলে তুই বেড়ালগুলোকে মারছিলি কেন?"

"আমাকে হুকুম করে গেছে ওই বেড়ালগুলোকে মেরে রাখতে। সে এসে খাবে। তুই বেড়াল হলে তোকেও খাবে। আমাকেও খাবে।" বলতে বলতে ছেলেটা জগন্নাথের হাত ধরলে। বললে, "আয় আমার সঙ্গে।" জগন্নাথকে টানতে টানতে ওই অন্ধকারে নিয়ে গেল। অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একটা মস্ত গর্তের সামনে এসে দাঁড়াল ছেলেটা। বললে, "এই যে গর্তটা দেখছিস, তোকে চ্যাংদোলা করে তুলে এনে এই গর্তে ফেলে দিয়ে ওই পাথরটা চাপা দিয়ে দেবে। তারপর তোকে যখন তুলবে, তুই তখন একটা বেড়াল হয়ে গেছিস! তোর ভয় করছে না?"

জগন্নাথ বললে, "না, ভয় পাই না আমি।"

"তুই তো জানিস তুই আর বাঁচবি না, তবু তোর ভয় করছে না?"

জগন্নাথ তখন বুক ফুলিয়ে বললে, "তোর নাম যদি মানিক হয়, আমার নাম জগন্নাথ। কোন বিপদই আমার কাছে বিপদ নয়। কেননা, কোন ভয়কেই আমি ভয় বলে মনে করি না। আমায় কেউ মারতে পারবে না। যারা ভিতু, তারাই তো মরে!

"তুই তো এখন ঘরের মধ্যে বন্দী।"

"তাতে কী হয়েছে! ওই যে বেড়ালগুলোকে দেখছিস ওরা তো আরও বিপদে পড়েছে। আমি ওদের বাঁচাব।"

"কেমন করে?"

সাহস থাকলে সব হয়।"

"আর আমাকে?"

জগন্নাথ বললে, "দেখ মানিক, তুই আমায় মেরেছিস, তাই বলে আমি প্রতিশোধ নেব, একথা যেন ভাবিস না। মানিক, আমার মাকে আমার মনে পড়ে না। আমি যখন খুব ছোট্ট, আমার মা হারিয়ে গেছে। আজ তোর মা তো আমারই মা। মানিক, তুই আমার ভাই। চ আমার সঙ্গে।" বলে, জগন্নাথ মানিকের হাত ধরে অন্ধকার থেকে আবার সেই ঘরে ফিরে এল।

কী জানি কেন, হঠাৎ দেখি বেড়ালগুলো যেন কত খুশি হয়ে উঠেছে। জগন্নাথ মানিকের হাত ধরে সেইখানে এসে দাঁড়াতেই বেড়ালগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে জগন্নাথকে আদর করতে লাগল। জগন্নাথ ওদের জড়িয়ে ধরলে। মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলে, "পারবি, আমি যা বলব তাই করতে?"

বেড়ালগুলো একসঙ্গে "ম্যাঁ-ও, ম্যাঁ-ও" করে চিৎকার করে উঠল।

জগন্নাথ বললে, "তবে আয়।"

এগিয়ে গেল জগন্নাথ। এগিয়ে গেল ঘরের সেই দরজাটার দিকে। লোহার দরজা। লোহার খিল আঁটা। অনেক উঁচু। ওখানে হাত যাবে না জগন্নাথের। গেলেও একা জগন্নাথ পারবে না ওই খিল খুলতে। জগন্নাথ বললে, "মানিক, তুই আমার কাঁধে বোস।" তারপর বেড়ালগুলোকে বললে, "আমার ঘাড়ে, পিঠে চাপ।"

মানিক কাঁধে বসল। বেড়ালগুলো লাফিয়ে-ছুটে ঘাড়ে-পিঠে উঠে পড়ল। জগন্নাথ বললে, "এখন তোরা সবাই মিলে খিলটা ঠেলে-ঠেলে খোল।"

তারপর মানিক হাত দিয়ে আর বেড়ালগুলো মাথা লাগিয়ে সেই ইয়া পেল্লাই লোহার খিলটা ঠেলতে-ঠেলতে খুলতে লাগল। কী সাংঘাতিক ভারী! কিন্তু লোহাই হোক আর ভারীই হোক, ওরা আজ কিচ্ছু মানবে না। ওরা হারবে না। ওরা আজ সবাই এক। সবাই মিলে ওরা আজ এই অন্ধকার থেকে আলোয় যাবে। ওরা বাঁচবে!

হঠাৎ একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে! হাজার হাজার ভীমরুল একসঙ্গে ডেকে ডেকে উড়ে এলে যেমন শুনতে লাগে, গর্জনটা তেমনি যেন ছুটে-ছুটে এগিয়ে আসছে।

মানিক চেঁচিয়ে উঠল, "জগন্নাথ, সে আসছে!"

জগন্নাথও চেঁচিয়ে উত্তর দিলে, "আসতে দে। আমাদের দরজা খুলতেই হবে। জোরে জোরে, আরও জোরে হাত লাগা।"

মানিক আর বেড়ালগুলো চেঁচিয়ে উঠল, "হেঁই-হো, ম্যাঁও-হো!" ওরা যতই জোরে সেই লোহার খিলে ঠেলা মারছে, ভীমরুলের মত আওয়াজ করে সেই গর্জনটাও ততই দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসছে। জগন্নাথের কানে তালা লেগে গেল! গর্জনটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ভূমিকম্প হলে যেমন ঘর-দোর সব কেঁপে ওঠে, সেই গর্জন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই তেমনি দুরু দুরু করে সব কাঁপতে লাগল!

মানিক চেঁচিয়ে উঠল, "জগন্নাথ!"

জগন্নাথের গলা সেই ভয়ংকর গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল, "ভয় নেই মানিক! আমরা সবাই এক। আমরা জিতব, জিতব, জিতব।"

অমনি ঝন-ঝন-ঝনাৎ! সেই লৌহ কপাটের লোহার খিল ভেঙে মাটিতে ঠিকরে পড়ল। ওরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু তারপরেই থতমত খেয়ে গেল। কে যেন ওদের ধাক্কা মারলে। জগন্নাথের কাঁধ থেকে, পিঠ থেকে এ-ধার ও-ধার ছিটকে পড়ল। জগন্নাথকে অন্ধকারে কে যেন ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে মিলিয়ে গেল। মানিক চেঁচিয়ে উঠল, "জগন্নাথ!"

জগন্নাথ অন্ধকার থেকে উত্তর দিলে, "মানিক, ভয় নেই! আমরা আজ এক হয়েছি। আমরা জিতবই—"

হয়তো জগন্নাথের কথা শেষ হল না। তার আগেই কে যেন ওর মুখটা চেপে ধরলে। চেপে ধরে সেই অন্ধকার গর্তটার মধ্যে ফেলে দিয়ে পাথর চাপা দিয়ে দিলে।

অন্ধকারটা যত জমাট, গর্জনটা ততই ভয়ংকর। ভয়ংকর গর্জন এবার মানিকের দিকে এগিয়ে আসছে। মানিক ভয় পেল না। মানিক হেঁকে উঠল, "গর্জন, তোমায় আমি ভয় পাই না। আমরা এক।"

গর্জনটা এগিয়ে আসছে অন্ধকারের ভেতর থেকে আর বেড়ালগুলো গুড়িগুড়ি আলতো পায়ের ডিঙি মেরে ডুব দিচ্ছে অন্ধকারের ভেতরে। আজ আর ওদের ভয় নেই। অন্ধকার তো ওদের কোনদিন অন্ধ করে দিতে পারে না। ওরা আজ জিতবেই! ওদের শত্রু একটাই। আর তা হল—

গর্জনটা হঠাৎ একেবারে ওদের সামনে এসে পড়ল। ওরা দেখে ফেলেছে। দেখল, ভয়ংকর দুটো চোখ। লাল টকটকে। ঠিকরে বেরিয়ে এসে ঝুলছে আর অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। নেকড়ের মুখের মত মুখটা হিংস্র! জিবটা লকলক করছে। বাদুড়ের মত দুপাশে ডানা। তার হাত দুটো ডানার সঙ্গে উঠছে নামছে! ঠিক যেন একটা রাক্ষুসে বাদুড়! এক্ষুনি খুঁচিয়ে শেষ করে দেবে ওই বেড়ালগুলোকে!

একেবারে আচমকা একটা বেড়াল লাফ মারল। লাফ মারল ওর চোখের ওপর! খামচে ধরল। টেনে উপড়ে ফেলল চোখ দুটোকে। রাক্ষুসে বাদুড়টা যন্ত্রণায় হুংকার ছেড়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে তুলকালাম শুরু করে দিলে। সেই তক্কে আর-একটা বেড়াল ওর ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর লকলকে জিবটা হ্যাঁচকা-মেরে ছিঁড়ে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে খামচে-ছিঁড়ে, কামড়ে-আঁচড়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লে রাক্ষুসে বাদুড়টাকে। বাদুড় তখন অন্ধকারে অন্ধ হয়ে মাটিতে চিৎপাত! তবু ওরা ছাড়ছে না। লৌহ কপাটের লোহার খিলটা টেনে এনে, ওর মুণ্ডুটার ওপর ধাঁই করে পিটিয়ে দিলে। মুণ্ডুটা গুঁড়িয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল। আর কোন গর্জন নেই, কোন হুংকার নেই। সেই রাক্ষুসে বাদুড় মরার আগে শেষবারের মত ছটফটিয়ে হাত-পা ছুড়ে ঠান্ডা মেরে গেল! শেষ হয়ে গেল তার শয়তানি। বাদুড় মরল।

এবার ছুটল ওরা সেই অন্ধকার গর্তে। অন্ধকার গর্তে সেই রাক্ষুসে বাদুড় জগন্নাথকে ফেলে দিয়েছে। তাকে উদ্ধার করবে মানিক আর সাত বেড়াল। তাই তারা গর্তের সামনে এসে একসঙ্গে হাত লাগাল। গর্তের মুখ থেকে সরিয়ে ফেলল সেই মস্ত ভারী পাথরটা। হাত বাড়াল মানিক। মানিকের হাত ধরে উঠে এল জগন্নাথ।

একী! সে তো বেড়াল হয়নি! জগন্নাথ তো জগন্নাথই আছে।

হ্যাঁ, জগন্নাথ যেমন ছিল, তেমনি আছে! কর্বুরের দেওয়া জাদু যে তার কোঁচড়ে বাঁধা। কর্বুর-তো বলেছে, তার কোনদিন বিপদ হবে না!

জগন্নাথ মানিকের হাত ধরে সেই গর্ত থেকে উঠে আসতেই সাতটা বেড়াল আর মানিক ওকে জড়িয়ে ধরলে আনন্দে। মানিক বললে, "জগন্নাথ, আমরা জিতে গেছি।"

জগন্নাথ উত্তর দিলে, "না, মানিক, আমরা এখনও জিতিনি! আরও কাজ আছে। আয় আমার সঙ্গে।" বলে সেই রাক্ষুসে বাদুড়টাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্ধকার গর্তটার সামনে। ঠেলা মেরে ফেলে দিল সেই মরা বাদুড়টাকে গর্তের মধ্যে। তারপর পাথর চাপা দিয়ে দিলে।

কাজ শেষ হলে জগন্নাথ বললে, "এক্ষুনি আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

মানিক জিগ্যেস করলে, "কোথায়?"

জগন্নাথ উত্তর দিলে, "বাইরে।"

ওরা সবাই মিলে হাত লাগিয়ে, অন্ধকার ঘরের, মরচে ধরা লোহার কপাট ঠেলতে-ঠেলতে খুলে ফেললে। অন্ধকার থেকে ওরা আলোয় বেরিয়ে এল।

"কোয়া, কোয়া, আ-তু-তু!" জগন্নাথ ডাকল কোয়াকে।

ওহো ভুলেই গেছি। কোয়া তো এতক্ষণ বাইরেই ছিল। জগন্নাথ ডাকতেই কোয়া ছুটে এল। জগন্নাথ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললে, "আয়! আমাদের সঙ্গে।" বলে জগন্নাথ সাত বেড়াল আর মানিককে সঙ্গে নিয়ে, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে চলল। পায়ে-পায়ে কোয়াও চলল। অবশ্য আড়চোখে বেড়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। কোয়া বলে তাই, অন্য কুকুর হলে এতক্ষণে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া লাগিয়ে দিত!

আকাশে যদিও এখনও ভোরের ছোঁয়া লাগেনি, তবু রাত কাটছে। আর একটু পরে উজাড় করে আলো উপচে পড়বে ওই আকাশ থেকে মাটিতে।

মানিক জগন্নাথকে জিগ্যেস করলে, "এ-পথে কোথায় যাচ্ছিস?"

জগন্নাথ উত্তর দিলে, "এবার থামব।"

"কোথায়?"

"সামনে।"

সামনে এসে থামল জগন্নাথ। থামল সাতটা বেড়াল, মানিক আর কোয়া। জগন্নাথ বললে, "মানিক, যে-পথে আমরা এসেছি, সে-পথ এখানে শেষ হয়ে গেছে। এবার আমাদের বিদায় নেবার সময় এসেছে।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই সাতটা বেড়াল কেমন যেন করুণ চোখে জগন্নাথের মুখের দিকে চাইল। ছলছল করছে ওদের চোখ। ওরা কাঁদছে।

জগন্নাথ সাত বেড়ালের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। ওদের কাছে টেনে নিল। আদর করল, তারপর বললে, "আমি তোদের চিনি না, আমি তোদের জানি না। তবু তোদের দুঃখ, আমারও দুঃখ! তোদের সে-দুঃখ আজ শেষ হবে। আমরা অন্ধকারকে জয় করেছি। এবার দুঃখকে জয় করব। আমরা আবার জিতব।" বলে, জগন্নাথ উঠে দাঁড়াল।

এতক্ষণে জগন্নাথ কর্বুরের দেওয়া রেশমী সুতোয় বাঁধা সেই সোনার ঘুঙুরটা কোঁচড় থেকে বার করলে। নিজের অনেক বিপদের মধ্যেও জগন্নাথ কোনদিনই মনে করেনি, এই ঘুঙুর বাজাতে হবে। আজ মনে হয়েছে। মনে হয়েছে বলেই রেশমী সুতোয় সে দোলা দিল। ঘুঙুর বেজে উঠল।

সমুদ্রের অনেক ঢেউ একসঙ্গে তোলপাড় করে যেমন গর্জে ওঠে, তেমনি ভীষণ শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল। ভয় পেয়ে গেল মানিক, ভয় পেল সাতটা বেড়াল আর ছোট্ট কোয়া। তারপর ধীরে ধীরে সেই শব্দ মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে সকলের চোখের সামনে, শূন্যে ছড়িয়ে গেল, রঙ-রঙ আর রঙ! সেই রঙ দিয়ে কে যেন আলপনা এঁকে দিল ওই শূন্যে। সেই আলপনা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ময়ূরকণ্ঠী রঙের কর্বুরের সেই মূর্তি ভেসে উঠল। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেই মূর্তির দিকে। আঃ! কী সুন্দর!
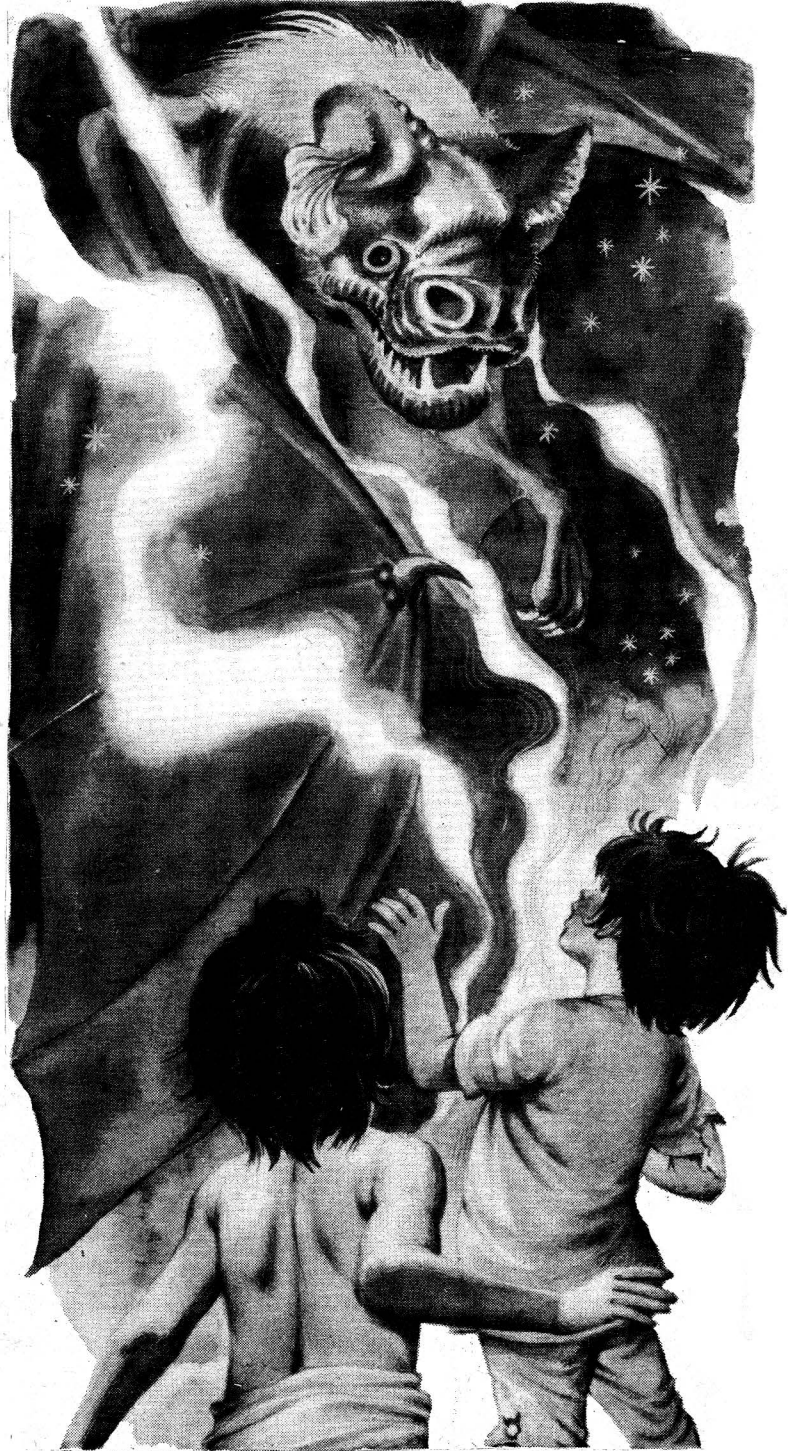
মূর্তি কথা বলল, "জগন্নাথ, আমি কর্বুর! আমি এসেছি। বলো, তুমি কী চাও?"

জগন্নাথ উত্তর দিলে, "কর্বুর, আমি তোমার কথা রেখেছি। আমি বিপদে পড়েছি, তবুও তোমায় ডাকিনি। আজ আমি বিপদ জয় করে তোমায় ডেকেছি। কেন ডেকেছি, সে তো তুমি জানো কর্বুর!"

কর্বুর উত্তর দিলে, "হ্যাঁ জগন্নাথ, তোমার সাহস দেখে আমি আবার খুশী হয়েছি। আমি জানি, তুমি আমায় কেন

ডেকেছ। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গে শূন্যের সেই রঙ এক দমকা হাওয়ায় ঘূর্ণি খেতে খেতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে ছড়িয়ে সেই সাত বেড়ালকে ঢেকে ফেললে। গাঢ় রঙের জমাট ধোঁয়ায় আর দেখা যায় না তাদের। বেড়ালগুলো রঙের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন হারিয়ে গেছে!

একটু পরেই আবার ধীরে ধীরে সরে গেল সেই রঙের ঝিলমিল। ধীরে ধীরে কর্বুরের রঙিন মূর্তি আবার শূন্যে ভেসে উঠল। ছুটে গেল জগন্নাথ বেড়ালগুলোর দিকে আনন্দে! একী! বেড়াল তো আর বেড়াল নেই। তারা যে মানুষ! ছোট্ট-ছোট্ট সাতটি ফুটফুটে ছেলেমেয়ে, সাদা ধবধবে পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে গেল জগন্নাথ, অবাক হয়ে গেল মানিক। খুশিতে কোয়া ডেকে উঠল, "ঘেউ-ঘেউ।"

কেঁদে ফেলল তারা। সেই ফুটফুটে সাতটি ছেলেমেয়ে। কাঁদতে কাঁদতে জগন্নাথকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, "জগন্নাথ, তুমি আমাদের সত্যিকারের বন্ধু।"

জগন্নাথ ওদের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে উত্তর দিলে, "তোমরাও আমার বন্ধু।"

কর্বুর আকাশের ওপর থেকে এবার বললে, "জগন্নাথ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। তোমার আর কি কিছু চাইবার আছে? তুমি আর কী চাও?"

"কর্বুর, আমি বাবার কাছে যাব।"

"এসো আমার সঙ্গে।"

কর্বুর আকাশে রঙ ছড়িয়ে ভেসে চলল। জগন্নাথ, মানিক, ওদের সাত বন্ধু আর কোয়া সেই রঙ দেখে-দেখে পথ হাঁটল।

একটি পাখি ডাকল।

আকাশে ভোর আসছে।

কর্বুর দাঁড়াল। কর্বুর বললে, "জগন্নাথ এবার দাঁড়াতে হবে।"

ওরা দাঁড়াল।

দুটি পাখি ডাকল।

আকাশে ভোর এসেছে।

কর্বুর জিগ্যেস করলে, "জগন্নাথ, তোমার বাবাকে দেখতে পাচ্ছ?"

জগন্নাথ বললে, "কই না!"

অনেক পাখি ডেকে উঠল।

ভোরের আকাশ রঙিন হল।

কর্বুর বললে, "সামনে এগিয়ে এস।"

জগন্নাথ এগিয়ে গেল। সূর্য উঠল। সূর্যের রঙের ছটায় চোখ মেলে সামনে চাইতেই স্থির হয়ে গেল জগন্নাথের চোখ দুটি। ওই ওপরে পাথরের বেদীতে ঘোড়ার পিঠে কে বসে আছে! কার মূর্তি ওই পাথরে! জগন্নাথের মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এল, "বাবা!"

কর্বুর উত্তর দিলে, "হ্যাঁ জগন্নাথ, তোমার বাবা। আর ওই তাঁর ঘোড়া, বাদামী। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তোমার বাবার একটি পা নষ্ট হয়েছে। আর নিরীহ মানুষকে লুঠেরাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। তোমার বাবা বীর। তাই এদেশের মানুষ সেই বীরের মূর্তি গড়ে ওই বেদীর ওপর তাঁর আসন করে দিয়েছে। দ্যাখো, তিনি ওই নীল আকাশে মাথা তুলে আছেন। যে বীর, যে দেশকে ভালোবাসে, দেশের মানুষকে আপন করে নেয়, তার মৃত্যু নেই। তোমার বাবাও বেঁচে আছেন জগন্নাথ। বেঁচে থাকবেন চিরদিন। কোন দুঃখ করো না জগন্নাথ। দুঃখ করতে নেই। তুমি এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, তোমার জয় হবে।" বলতে-বলতে কর্বুরের সেই রঙিন মূর্তি সোনালী সূর্যের ছটায় হারিয়ে গেল।

জগন্নাথ ওপর দিকে চাইল, ওর বাবার মুখের দিকে। তারপর সেই উঁচু বেদীর একটি-একটি সিঁড়ি পেরিয়ে ও বাবার পায়ের কাছে পৌঁছে গেল। বাবার পায়ে সে মাথা ঠেকাল। তারপর কেঁদে ফেললে। কাঁদতে কাঁদতে দুটি জল-ভরা চোখে বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "বাবা, আমিও তোমার মত হব।" বলতে বলতে ডুকরে ডুকরে উঠল।

ধীরে ধীরে মানিক উঠে এসেছে ওর কাছে। সঙ্গে সাত বন্ধু আর কোয়া। মানিক ওর হাতটি ধরে ডাক দিলে, "জগন্নাথ।"

জগন্নাথ উঠে দাঁড়াল।

মানিক বললে, "চ।"

জগন্নাথ জিগ্যেস করলে, "কোথা?"

"বাড়িতে।"

"আমার তো বাড়ি নেই।"

"আছে জগন্নাথ। আমার বাড়িই তোর বাড়ি। তুই তো বলেছিস, আমার মা তোরও মা। মায়ের কাছে চ।"

জগন্নাথ চোখের জল মুছে ফেললে। কোয়াকে বুকে তুলে নিল। তারপর সাত বন্ধুর সঙ্গে, মানিকের হাত ধরে এগিয়ে চলল।

তখন রোদ উঠে গেছে। শীতের সকালে ফুটন্ত ফুলের পাপড়ির ওপর শিশির ছড়িয়ে আছে। রোদের আলোয় হাজার হাজার মুক্তা যেন আনন্দে দুলে দুলে উঠছে। জগন্নাথ যে মায়ের কাছে যাচ্ছে আজ!

ছবি এঁকেছেন বিমল দাশ

গুপির টুপি

আশা দেবী

পরেন টুপি খান বাহাদুর,
পরেন টুপি পিটার গোমেশ,
ভজার মামার মাথায় টুপি
টাকে টুপি পরছে মহেশ।
আমার টুপি নেইকো কেন
এই না বলে দাপায় গুপি,
পরীক্ষাতে গোল্লা খেয়ে
পরলো মাথায় গাধার টুপি॥

হেড এগজামিনার

কী করে নম্বর বাড়াতে হয়

কী করে নম্বর বাড়াতে হয়? এবারেও এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা চার-চারজন হেড এগজামিনারের কাছে গিয়েছিলাম। পড়াশুনোর ধাঁচ, আগের তুলনায়, অনেক পালটে গিয়েছে। সেই-সঙ্গে আমূল পালটে গিয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের ধরনও। এখন আর সেই বেছে-বেছে গোটাকয়েক প্রশ্ন মুখস্থ করে, কপাল ঠুকে, পরীক্ষার হল্-এ যাবার উপায় নেই। এমন-ভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে, যাতে বাজার-চলতি নোটবই কিংবা না-বুঝে মুখস্থ করবার বিদ্যা কাজে লাগে না।

এই অবস্থায় "কী করে নম্বর বাড়াতে হয়", এই প্রশ্ন করলে তো যে-কোনও লোক বলবেন, "ভাল করে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লেখাপড়া করো, তাহলেই নম্বর বাড়বে।" ঠিক কথা। কিন্তু তারপরেও একটা কথা থেকে যায়। সেটা এই যে, দুটি ছেলে হয়ত একইরকম পড়াশুনো করল, এবং দুজনের বুদ্ধিও মোটামুটি একই রকমের, তবু একজন আর-একজনের চেয়ে কিছু বেশী নম্বর পায় কেন?

পায়, তার কারণ, সে—অন্যজনের তুলনায়—হয়তো ঠিক-ঠিক প্রশ্ন বাছাই করে নেয়, এবং তার হাতের লেখাও হয়ত আর-একটু পরিচ্ছন্ন। ফলে সে হয়তো তিন-চার নম্বর বেশী পেয়ে যায়। তা, এক-একটা পত্রে তিন-চার নম্বর বেশী পেলে সর্বমোট সংখ্যাটা কিন্তু নেহাত কম হয় না। বলতে কী, তারই উপরে অনেক সময় নির্ধারিত হয়ে যায় যে, কে প্রথম বিভাগে যাবে, আর কে দ্বিতীয় বিভাগে।

বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত আর অঙ্কের যে চারজন হেড এগজামিনারের সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম, তাঁরাও সেই কথাই বললেন। প্রত্যেকেই বললেন যে, যে যেটুকু পড়াশুনো করেছে, সেইটুকুর জোরেই সে কিন্তু—একটু বুদ্ধি খাটালে কিছু-না-কিছু বেশী নম্বর তুলে নিতে পারে। উত্তর লেখার তো কতগুলি কৌশল থাকে, সেগুলি জানা দরকার। কোন্ প্রশ্নটা ছেড়ে কোন্‌টার উত্তর লিখব, সেটা বোঝা দরকার। কোন্ প্রশ্নের উত্তরে ঠিক কী লিখব, সেটাও জানা চাই। হেড এগজামিনাররা এখানে সেইটেই জানিয়ে দিচ্ছেন,- বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী যদি উত্তর লেখো, তাহলে—তাঁরাই বলছেন—প্রতি পত্রে কিছু-না-কিছু নম্বর বাড়বেই।

চারটি প্রধান বিষয়ের চারজন হেড্ এগজামিনারের বক্তব্য এখানে আমরা প্রকাশ করলাম। তাঁদের কথাগুলি তোমরা বেশ মন দিয়ে বুঝে নাও।

বাংলার হেড এগজামিনার বলছেন

মাধ্যমিক পরীক্ষার ধরনধারণ অনেকটা বদলেছে। দুশোর মধ্যে ৪০ নম্বরের পরীক্ষা মৌখিক, আগেই হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় ভাগে ১৬০ নম্বর লেখার পরীক্ষা। মৌখিক জানুয়ারি নাগাদ, লেখা মার্চ—এপ্রিলে।

মৌখিক আর লেখার পরীক্ষা একেবারে জাতে আলাদা। লেখার পরীক্ষায় যেমন লিখতে জানা চাই, তেমনি মৌখিকের বেলায় জানা চাই বলতে কইতে। চটপট বলা। চটপটে ভাবটাও থাকা চাই। তার জন্য ৫ নম্বর তো আলাদা করে রাখাই আছে। শুধু তা-ই নয়, ঐ তৎপর আচরণের জন্য (সেটা মোটেই 'ওপর-চালাকি' নয়) পরীক্ষকের মনকে বশ করে অন্যত্রও দু-এক নম্বর বেশী আদায় করা যেতে পারে। মৌখিকে পরীক্ষককে খুশী করা নম্বর বাড়াবার বড় উপায়। উত্তর দিতে গিয়ে থতমত খেলে চলবে না। ভাববার সময়টুকুতেও অবিচল ভাবটি বজায় রাখা চাই। ঘাবড়ালেই মুশকিল। এর জন্য বাচনভঙ্গি একটু ঘষেমেজে নেওয়া দরকার। গদ্যপাঠ, কবিতা আবৃত্তির কিছু অভ্যাস থাকলে ভালো। পুঁথিপড়ার মতো পড়ে বা বলে গেলে, নির্ভুল হলেও, পুরো নম্বর মেলে না। তাছাড়া লেখকদের নামে-পদবীতে গোলমাল না হয়—

এককথায় যার উত্তর হয়, এককথায়ই তা বলতে হবে। বেশী বললেই নম্বর—এই ভুল ভাঙার সময় এসেছে। ছাত্র যা বলছে বুঝে বলছে, বোঝার ভাবার চেষ্টা করছে, এই ধারণা পরীক্ষকের জন্মালে নম্বর বাড়বেই। মৌখিকে একটু চর্চা আর সতর্কতায় ৫ নম্বর পর্যন্ত বেড়ে যাওয়া সম্ভব বলে মনে করি।

দু-তিনমাস আগে মৌখিক হয়ে যাচ্ছে। এ পরীক্ষায় ভালো করতে পারলে লেখার পরীক্ষায় জোর আর সাহস আসবে। যদি মৌখিক খারাপ হয়ে যায়, তাহলেও সময় পাওয়া যাবে ক্ষতি-পূরণ করার, আরও তৎপর হবার। মৌখিক কেমন হল, পরীক্ষার পরেই বড়দের সঙ্গে কথা বলে তা খতিয়ে দেখা ভালো।

লেখার পরীক্ষা ভালো করার চারটে সূত্র।

১। **বানান** ॥ বানান ভুলে সাধারণ ½ করে কাটা যায়, মোট নম্বরের এক-চতুর্থাংশের বেশী কাটাও চলে না। কিন্তু বিপরীতার্থক শব্দ লিখতে, 'দরিদ্রে'র উল্টো 'ধনি' লিখলে কি কিছু পাওয়া যাবে? পদান্তর, সমাস-নির্ণয় এমনি নানা জায়গায় বানান ভুলে পুরো নম্বর চলে যাবে। কেউ 'কর্মধারায়' বা 'বহুব্রিহী' লিখলে শুধু বানান ভুলের খেসারত দিয়ে রেহাই পাবে না। তাছাড়া গত বছরেই বলেছিলাম, রবিন্দ্রনাথ, বঙ্গিম-চন্দ্র, মধুসুদন বা মধুসুধন লিখলে (এরকম শতকরা দশটা খাতায় দেখা যায়) লেখকের নামের জন্য নির্দিষ্ট ½ নম্বর তো যাবেই, পরীক্ষক মশাইকে নিদারুণ চটিয়ে দেওয়া হবে।

২। **ভাষা** ॥ প্রথম কথাই হল সাধু-চলিতে মেশানো চলবে না। যদি সাধুগদ্য লেখা অভ্যাস হয়ে যায়, তা এখন আর বদলানো যাবে না। না হলে চলিত ভাষায় লেখারই পরামর্শ দেব। তাতে অনেক স্বাভাবিকভাবে মনের কথা বলা

যাবে, ভাষাটা অনেক তাজা হবে, বইঘেঁষা জড়তা থাকবে না। অকারণে ফাঁপানো ভাষা বা জোর-করা কবিত্বে পাকা পরীক্ষক ভোলেন না। জটিল ও দীর্ঘবাক্য এড়িয়ে যাওয়া ভালো, কারণ গঠনে ভুল হবার আশংকা। অলংকারে সাজানো বা আবেগে উচ্ছ্বসিত ভাষাই ভালো ভাষা—এই চিন্তা ঠিক নয়। সরল সিধে বুদ্ধিদীপ্ত এবং যুক্তিসিদ্ধ ভাষাই পুরস্কারযোগ্য। পরীক্ষার্থীর স্টাইল তার নিজের হোক—ধার-করা স্টাইলে নম্বর বাড়ে না।

৩। **যথাযথ উত্তর, প্রতি অংশের উত্তর ॥** দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় নতুন ধরনের প্রশ্ন হচ্ছে। বাগাড়ম্বর এবং লম্বা উত্তর পছন্দ করা হচ্ছে না। আসলে পরীক্ষক একটা জিনিসই চাইছেন, প্রশ্নে যা আছে তার ঠিকঠাক জবাব। সংক্ষিপ্ত জবাব। তাছাড়া নানা ছোট আর মাঝারী টুকরো জুড়ে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। ব্যাখ্যার বদলে আসছে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর। দেখতে হবে প্রতিটি অংশের উত্তর যেন দেওয়া হয়। অংশগুলি অনুচ্ছেদে ভাগ করে দিলে পরীক্ষক আরও স্পষ্ট দেখবেন—ছাত্র প্রশ্নের ঢঙটা ঠিক ধরেছে।

৪। **সময় ॥** সময়কে হিসেব করে ব্যবহার না করে অনেক ভাল ছেলে পরীক্ষায় ঠকে গিয়েছে এমনটি দেখা যায়। যেমন নম্বর তেমন মাপের সময়, এই হচ্ছে মোদ্দা কথা। তবে কোথাও একটু অন্যরকম করতে হয়। ব্যাকরণে কম সময় লাগে, প্রবন্ধ লেখায় কিছু বেশী। এখানে একটা সময়ের মোটামুটি হিসেব দেওয়া হচ্ছে। প্রতি নম্বরের জন্য গড়ে ২ মিনিট সময় দেওয়া যায়। তাতেও প্রতিপত্রে হাতে ২০ মিনিট সময় থাকবে সংশোধনের জন্য। প্রথম পত্রে—কাব্যের প্রশ্নোত্তরের জন্য মোট ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট, প্রবন্ধ লেখায় ৫০ মিনিট, বঙ্গানুবাদে ২০ মিনিট, সারাংশ-ভাবসম্প্রসারণের জন্য ২০ মিনিট। দ্বিতীয় পত্রে—ব্যাকরণের (পাঠ্যান্তর্গত এবং সাধারণে মিলে ১০+২৫=৩৫ নম্বর) জন্য মোট ৫০ মিনিট যথেষ্ট। বাকী সব সময়টাই হাতে থাকবে গদ্যের উত্তরের জন্য। অঢেল সময়। অপচয় না-হলে সমস্যা নেই।

নিজের মতো করে উপরের হিসেবটা অল্পসল্প বদলে নিয়ে ঘড়ি ধরে লেখালেখির অভ্যাস করা দরকার, তাহলে সময়ের ফাঁকিতে পড়তে হবে না। অনেক ছেলে কোনো প্রশ্নের জন্য বেহিসেবী বেশী সময় খরচা করে ফেলে। তাতে ২ নম্বর বাড়তি যদি মেলেও, ১০ নম্বরের প্রশ্ন না-ছোঁয়া থেকে যাবে। সেখানে ৪ নম্বর অন্তত পাওয়া যেত। এ-ভুল এড়াতেই হবে।

আমি নিজে একজন প্রধান-পরীক্ষক। পরীক্ষকদের ঝোঁক-প্রবণতা-মর্জি ইত্যাদির খবর রাখি। জানি, ঠিক কোন্ ধরনের উত্তরে তাঁরা খুশী হন। পরীক্ষার্থীরা যে ছোটখাটো ভুলের জন্যও অনেক সময় পরীক্ষকদের বিরাগভাজন হয় এবং যতটা নম্বর তুলতে পারত তা তুলতে পারে না, তাও আমার অজানা নয়। এইসব কথা জেনেই এখানে দরকারী কিছু পরামর্শ দিলাম। পরামর্শগুলি মনে রাখলে কিছু-না-কিছু নম্বর বাড়বেই।

ইংরেজীর হেড এগজামিনার বলছেন

প্রশ্নপত্র বেশ দীর্ঘ। এবছর ছিল বারো পৃষ্ঠা। সামনের বছরেও তাই থাকবে ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং প্রশ্নপত্র একবার পড়তেই অনেকটা সময় চলে যাবে। তবে এতে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বেশী তো লিখতে হবে না। উত্তর হবে খুব ছোট ছোট। লিখতে কম সময় লাগবে।

আগে প্রশ্নপত্রের যে ধরন ছিল তাতে তিন ঘণ্টার প্রায় পুরো সময় ধরেই শুধু লিখতে হত। এখন নতুন ধাঁচের প্রশ্নপত্র পেয়ে তিন ঘণ্টা ধরে কেবল লেখা নয়, লেখা এবং পড়া। অর্থাৎ পরীক্ষা দিতে বসেও লেখাপড়া।

প্রশ্নপত্রে দু-রকমের প্রশ্ন থাকছে। অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন এবং এসে টাইপের প্রশ্ন। অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্নে ষাট নম্বর এবং এসে টাইপের প্রশ্নে চল্লিশ নম্বর। ষাট নম্বরের প্রশ্নের উত্তর করতে কম সময় লাগবে। চল্লিশ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর করতে সময় যাবে একটু বেশী। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার ধাঁচটাই আসলে বদলে গেছে।

এই নতুন রকমের পরীক্ষায় ইংরেজীতে কী করলে বেশী নম্বর পাওয়া যাবে?

১। 'ইংলিশ প্রোজ অ্যান্ড ভারস' বইটির যে-কটি গদ্যরচনা ও কবিতা তোমাদের পাঠ্য, তার প্রত্যেকটি অত্যন্ত যত্নে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। প্রত্যেকটির ইংরেজী প্রতিশব্দ এবং বিপরীতার্থক শব্দ নির্ভুলভাবে জেনে রাখতে হবে।

২। পাঠ্য গদ্যরচনা ও কবিতা থেকে অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন থাকছে। এক নম্বরে যেভাবে পড়তে বলছি' সেভাবে পড়লে ওই সব প্রশ্নের নিমেষে নির্ভুল উত্তর দিতে পারবে এবং পুরো নম্বর পাবে। যেমন, "দ্য সেলফিশ জায়ান্ট"-এর মতন গদ্যরচনা থেকে প্রায় পঞ্চাশটি ছোট অবজেকটিভ প্রশ্ন হতে পারে। তার জন্য তৈরী থাকতে হবে।

৩। আগেকার দিনে নোটবই থেকে সারাংশ মুখস্থ করে রাখলে অন্তত পাস-নম্বর পাওয়ার মতন উত্তর লেখা যেত। এখন তা সম্ভব নয়। সুতরাং আগেকার ওই পথ সম্পূর্ণ বর্জন করবে।

৪। শূন্যস্থান পূরণ, পাংকচুয়েশন, ডিগ্রী ও ভয়েস পরিবর্তন, ন্যারেশন ইত্যাদি ব্যাকরণের প্রশ্নের জন্য ইংরেজী ব্যাকরণের প্রাথমিক সূত্রগুলি অন্ধের মতন মুখস্থ না করে বুদ্ধি দিয়ে দৃষ্টান্তসহ বুঝতে হবে। ব্যাকরণের খুব সহজ প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে। যত্ন নিলে পুরো নম্বর পাবে।

৫। এসে টাইপের প্রশ্ন চারটি। ট্রানস্লেশন, প্যারাগ্রাফ, লেটার, সামারি। এগুলিতেই নম্বর কমে যায়। যাতে না কমে তার জন্য বাড়িতে এগুলি সব থেকে বেশী অভ্যেস করতে হবে।

৬। কমপ্রিহেনশন টেস্টের প্রশ্নটিও অবজেকটিভ টাইপের। উত্তর দেওয়াই থাকবে। অনুচ্ছেদটি পড়ে ঠিক উত্তরগুলি বেছে নিয়ে খাতায় লিখতে হবে।

৭। প্রশ্নপত্র হাতে পেয়েই একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া ভালো। কারণ, কী বিষয়ে প্যারাগ্রাফ, লেটার ইত্যাদি লিখতে হবে সে-সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল চেপে রেখে বইয়ের প্রশ্নের উত্তর লিখতে আরম্ভ করলে অন্যমনস্কতার দরুন আজেবাজে ভুল হতে পারে।

৮। যত্ন নিয়ে হাতের লেখা সুন্দর করতে হবে। সুন্দর মানে কায়দা বা 'ফ্লারিশ' নয়। অক্ষরগুলো পরিচ্ছন্ন হবে, শব্দ ও লাইনের মাঝখানে ফাঁক থাকবে।

আমরা হেড-এগজামিনার। আমরা জানি, কীভাবে লিখলে নম্বর বাড়ে। এখানে যে-সব পরামর্শ দিলাম, সেইমতো তৈরী হলে ও লিখলে নম্বর বেশ-কিছু বাড়বেই।

সংস্কৃতের হেড এগজামিনার বলছেন

সংস্কৃত সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীদের সর্বজনীন ভীতির মূল কারণ হল কয়েকটি ব্যাপারে অজ্ঞতা। চলতি ভাষা নয় বলেই সংস্কৃতকে যেমন তারা ভয় পায়, তেমনি মহাপণ্ডিত না হলে সংস্কৃতে ভাল নম্বর পাওয়া যাবে না এইরকম একটা অমূলক

ধারণাও তাদের আছে। অথচ একটু সাবধান এবং সতর্ক হলে, এমন কী পণ্ডিত না হলেও এক সংস্কৃত পত্রেই অন্যান্য বিষয় থেকে অনেক সহজে অনেক বেশী নম্বর অতি সাধারণ ছাত্র বা ছাত্রীও তুলতে পারে।

প্রথমত, পাঠ্যাংশের সংস্কৃত অনুচ্ছেদবিশেষ থেকে ইংরেজী বা বাংলা যে কোন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করতে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মূল রচনাটিকে আক্ষরিক অনুবাদ করতে হবে এবং তা যদি সাবলীল হয় তাহলে অবশ্যই বেশী নম্বর পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, ব্যাকরণ অংশ, যথা কারক, বিভক্তি, সমাস এবং প্রত্যয়, এগুলি শুধুমাত্র জানা থাকলেই চলবে না; প্রশ্নপত্রে কী চেয়েছে, কেন এবং কী—এর পরিষ্কার উত্তর দিতে হবে। শব্দগুলির শেষে অনুস্বার ও বিসর্গ দিতে যেন ভুল না হয় এবং সন্ধি ও প্রকৃতি-প্রত্যয় থাকলে শব্দটির শেষ অংশও যেন ঠিকভাবে লেখা হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, অবজেকটিভ প্রশ্নোত্তরের বেলাতে প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের মধ্যে উত্তর-অংশ থাকলেও তাকে গদ্যে ঠিকমতো সাজিয়ে বাক্য গঠন করে উত্তর দিতে হবে। এছাড়া পাঠ্যাংশের প্রশ্নের উত্তরের সময়ে উত্তরগুলিকে ছোট ছোট বাক্যে লিখলে তাতে ভুলের সংখ্যা কমে যাবে।

চতুর্থত, শ্লোক মুখস্থ লেখার প্রশ্নে অনুস্বার বিসর্গ-সমেত পুরো যে শ্লোক নির্ভুলভাবে মুখস্থ আছে, তাই লিখবে।

পঞ্চমত, ব্যাখ্যার বেলায় প্রসংগ উল্লেখ করে লিখলে নিশ্চয় ভালো নম্বর পাওয়া যাবে।

ষষ্ঠত, ইংরেজী বা বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময়ে অনুচ্ছেদটিকে কয়েকবার পড়ে প্রথমে তার অর্থ বুঝে নিতে হবে। তারপর ছোট ছোট বাক্যে ভাগ করে সংস্কৃত করলে তাতে ভুল কম হবে। তাছাড়া উদ্দেশ্য বা বিধেয় অংশে বিশেষণ পদ করে সরল বাক্য গঠন করলে তাতেও ভুলের সংখ্যা কমে যাবে এবং নম্বর বেশী উঠবে।

সপ্তমত,পাঠ্যাংশের বহির্ভূত যে সংস্কৃত অনুচ্ছেদটি অনুবাদ করতে দেওয়া হয়, প্রথমেই তার সমাপিকা ক্রিয়াটি বার করতে হবে। অতঃপর বিভক্তির চিহ্ন দেখে অন্যান্য পদ অর্থাৎ কর্তা, কর্ম ইত্যাদি বুঝে নিতে হবে। তাহলেই তার অর্থ সহজেই বোধগম্য হবে। তখন যথাযথভাবে সাজিয়ে যদি বাক্য গঠন করা হয় এবং ভাষাটি যদি সাবলীল হয় তাহলে তাতে নিশ্চয়ই বেশী নম্বর পাওয়া যাবে।

এই সামান্য কটি নিয়ম মেনে চললে সংস্কৃতপত্রে অনায়াসে ভাল ফল করা যাবে। আমি একজন হেড-এগজামিনার। আমার অভিজ্ঞতা থেকেই এই কথা জানালাম। যে-রকম বলছি, সেইভাবে লিখলে কিছু-না-কিছু নম্বর যে বেশী উঠবেই, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

অঙ্কের হেড এগজামিনার বলছেন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রবর্তিত দশ ক্লাসের নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী প্রথমবারের পরীক্ষা এ-বছর হয়ে গেছে।

এবারের প্রশ্নমালা দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগটি অবজেকটিভ—মোট নম্বর ১৬। এখানে প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নপত্রেই লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নগুলির উত্তর করতে হলে কিছুটা রাফ ওয়ার্ক-এর প্রয়োজন, এবং তা উত্তরপত্রের প্রথম দু পৃষ্ঠায় করতে হবে।

উত্তরপত্রে প্রশ্নের নম্বর বসিয়ে রাফ ওয়ার্কগুলি পরপর করতে হবে। রাফ ওয়ার্ক সবসময় পরিষ্কার হওয়া দরকার, যাতে প্রয়োজনবোধে পরীক্ষকের পরীক্ষার কোনও অসুবিধা না হয়।

উত্তরগুলি প্রশ্নপত্রের নির্দেশ মত টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে অথবা লিখে প্রশ্নপত্রটি প্রত্যেকের নিজের নিজের উত্তর পত্রের সংগে গেঁথে দিতে হবে।

গণিতের সাধারণ বিষয়গুলি রপ্ত থাকলে অল্পসময়ে এই প্রশ্নের সমাধান সম্ভব। সুতরাং অবজেকটিভ বিভাগের প্রশ্নপত্র দীর্ঘ হলেও মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

দ্বিতীয় বিভাগের প্রশ্নগুলির সমাধানে কিছুটা সময় লাগবে। প্রশ্নপত্রটি মন দিয়ে পড়ে নাও। তারপর যে-সব প্রশ্নের সমাধান সম্ভব মনে হবে, তার পাশে দাগ দিয়ে উত্তর করতে আরম্ভ করো। তাতে সময় বাঁচবে।

উত্তরপত্রের বাম পৃষ্ঠায় রাফ ওয়ার্ক করবে। ডান পৃষ্ঠায় ফেয়ার করে নিয়ে রাফ ওয়ার্কটি কোনাকুনি কেটে দেবে।

এছাড়া গণিতের বিভিন্ন শাখার উত্তর করার সময় কতকগুলি বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। সেগুলি এবার শুনে নাও।

বীজগণিত ও পাটিগণিত

(ক) পাটিগণিতের প্রশ্ন বীজগণিতের পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারো।

(খ) উত্তরটিতে কোন একক চাওয়া হলে তা অবশ্যই উল্লেখ করবে। না হলে কিছু নম্বর কাটা যাবে।

(গ) বীজগণিতের সমীকরণ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী বীজগণিতের নিয়মেই সমাধান করবে। পাটিগণিতের নিয়মে করলে কিন্তু কোন নম্বর পাবে না।

(ঘ) এবছর সমীকরণ ও অসমীকরণ (ইনইকোয়েশন) সংক্রান্ত প্রশ্নের লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধানের জন্য ১৭ নম্বর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পরীক্ষার্থীদের লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধানের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধানের সময় কতগুলি বিষয় মনে রাখবে।

(ক) লেখচিত্রের উপর অক্ষের অবস্থান, মূলবিন্দু এবং অক্ষের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিক ছক-কাগজে চিহ্নিত করবে।

(খ) বর্গাংকিত ছক-কাগজে বর্গক্ষেত্রের কটা বাহুকে একক ধরা হয়েছে তার উল্লেখ করবে।

(গ) লেখচিত্রটি সুন্দর করে পেন্সিলে আঁকবে। নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন লেখচিত্র হলে পুরো নম্বর পাওয়া যায়।

জ্যামিতি

(ক) উপপাদ্য বিষয়ক প্রশ্নের সমাধানে চিত্রটি পেন্সিলে পরিষ্কার করে আঁকবে। চিত্রে নামকরণ প্রশ্নানুযায়ী করবে। নাহলে পুরো নম্বর কাটা যাবে।

(খ) যুক্তিগ্রাহ্য এবং গণিতের নিয়ম মেনে চলে এমন যে কোন প্রমাণ দিলেই নম্বর পাবে।

(গ) অংকন-বিষয়ক প্রশ্নের সমাধানে চিত্রটি অবশ্যই সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। অংকনের প্রতিটি চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে দেবে। একটি বাদ পড়লে পুরো নম্বর কাটা যাবে।

উপরের নিয়মগুলি মেনে উত্তর করবে। প্রশ্ন সমাধানের সংগে প্রয়োজনীয় রাফ ওয়ার্ক করবে এবং উত্তরপত্রটি যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখবে। তাহলেই গণিতে ভাল ফল করতে পারবে।

গণিতের মূল বিষয়গুলি আয়ত্তে থাকলে এই নতুন ধরনের প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া সহজ হবে। এবং বেশী-বেশী নম্বর উঠবেই।
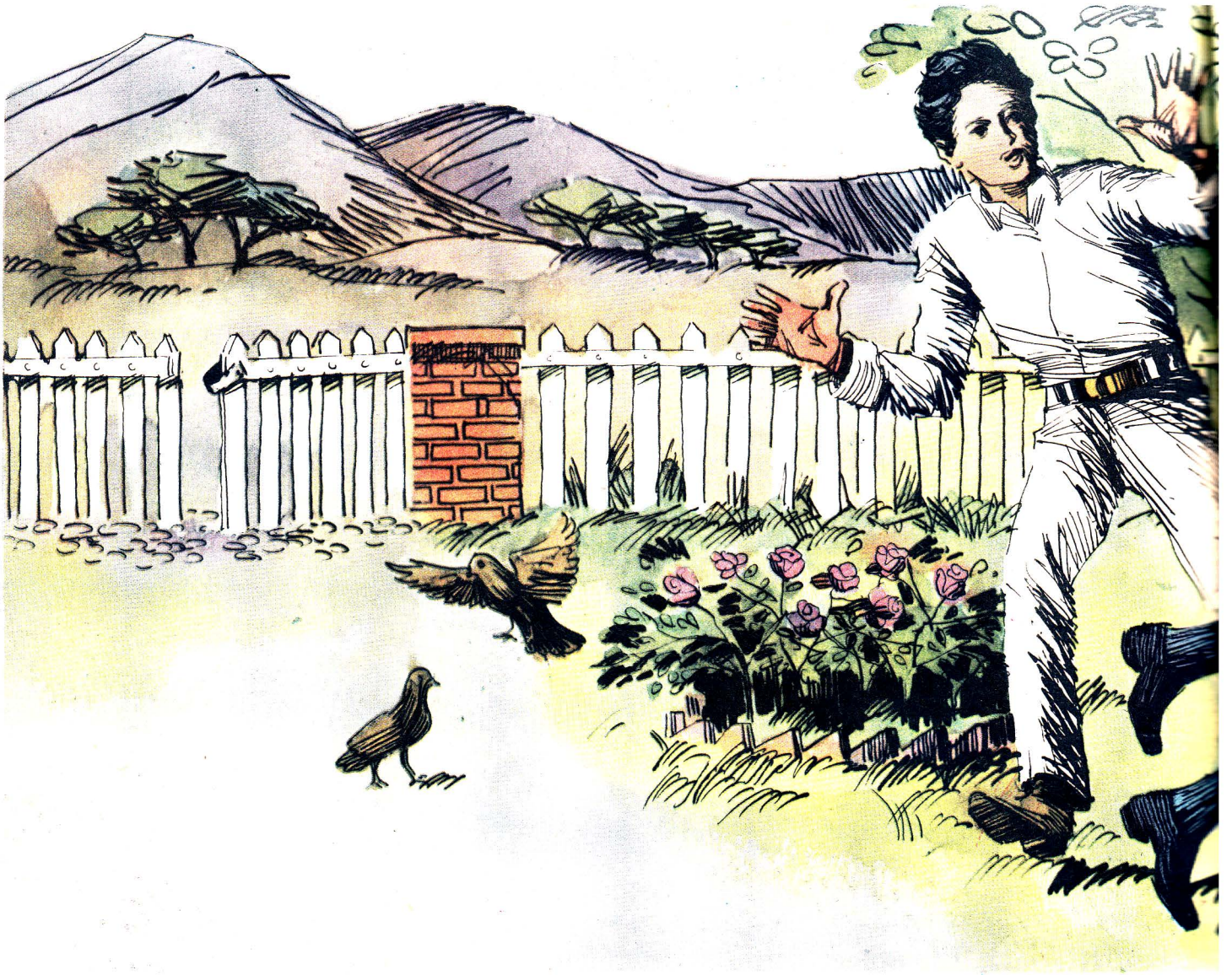
উপন্যাস

হলদে বাড়ির রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিমান বলল, "তা হলে আমরা কালই যাচ্ছি তো?"

স্বপন একটু আমতা আমতা করে বলল, "কালই? কেন আর দু-একদিন দেরি করলে হয় না?"

বিমান বলল, "আর দেরি করে কী হবে? কাল তো আমাদের কিছুই করবার নেই!"

স্বপন বলল, "সাত তারিখে প্রিয়ব্রতদা এসে যাবেন। তার মানে আর তিনদিন বাদে!"

"প্রিয়দা এলে কী হবে? প্রিয়দা দারুণ কুঁড়ে, তুই জানিস না! কোথাও যেতে চাইবে না, আমাদেরও যেতে দেবে না!"

"প্রিয়দা কুঁড়ে? পুলিশের লোক কখনো কুঁড়ে হয়?"

বিমান হাসল। যেন স্বপনটা একটা বাচ্চা ছেলে, কিছুই জানে না।

হাসতে হাসতে বিমান বলল, "তুই তো প্রিয়দাকে আমার চেয়ে বেশী চিনিস না! কোনো রহস্য কিংবা খুন-টুন থাকলে প্রিয়দা খুব ছোটাছুটি করে বটে, কিন্তু অন্য সময় পড়ে পড়ে ঘুমোয়। বেড়াতে ভালবাসে না, কোনো নতুন জায়গায় যেতে চায় না। চল, আমরা কালই বেরিয়ে পড়ি।"

স্বপন বলল, "বড্ড দূর! একদিনে কি পৌঁছোতে পারব?"

বিমান বলল, "কত আর দূর হবে? জায়গাটা এখান থেকে চোখে দেখা যায়—"
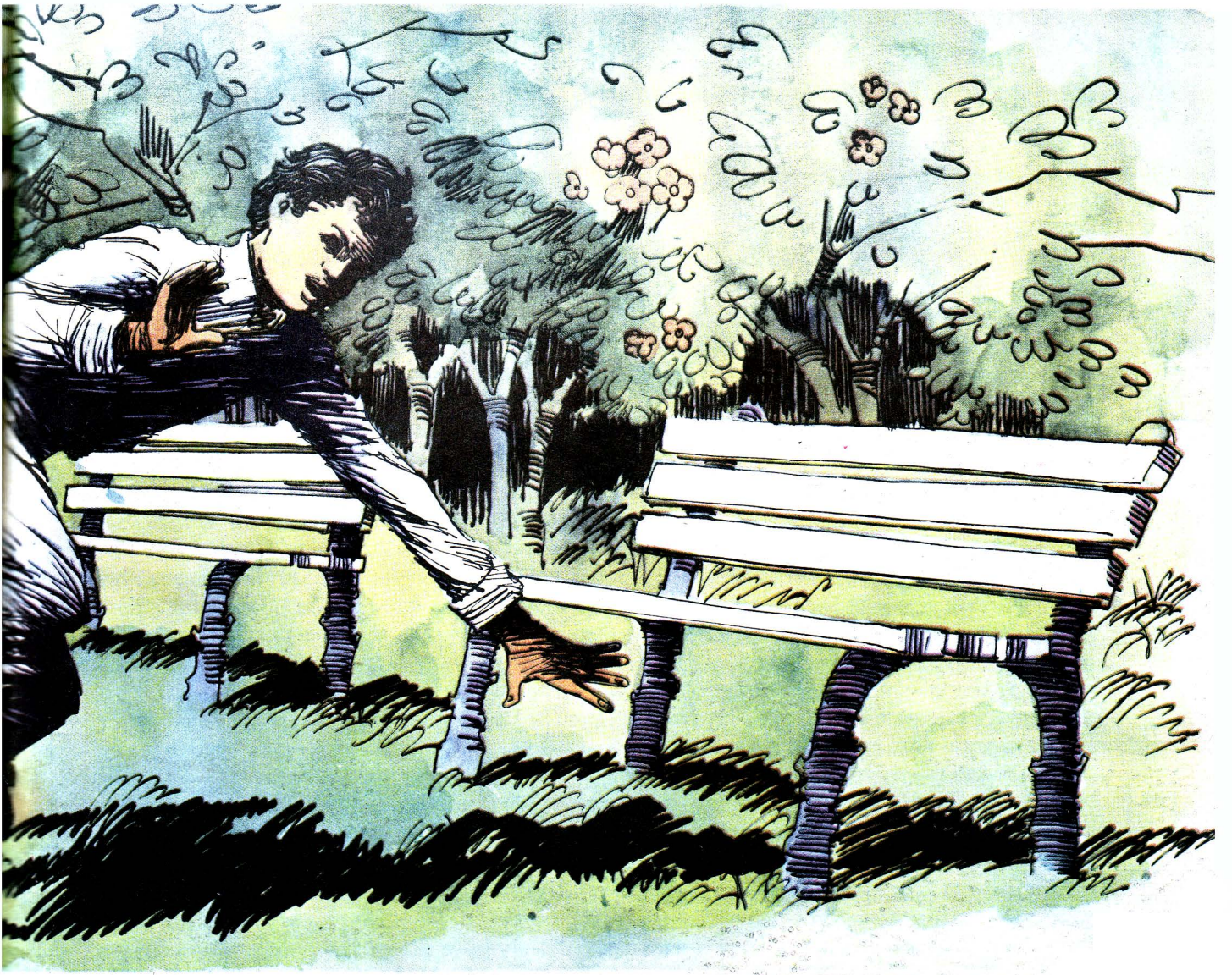
"তুই জানিস না, বিমান, পাহাড়ী জায়গায় খালি চোখে দূরত্ব বোঝা যায় না। যে-পাহাড়কে মনে হয় খুব কাছে, আসলে সেটা অনেক দূর। পড়িসনি, সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন—"

"সঞ্জীবচন্দ্র একথা লেখার ফলে কী হয়েছে জানিস তো? যে-পাহাড়টা আসলে খুব কাছে, সেটাও বাঙালীরা মনে করে খুব দূরে! এই তো লাটু পাহাড়টা আমি এখান থেকে খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি, তা বলে কি এটা অনেক দূর? মাত্র দেড় মাইল তো—"

"দেড় মাইল না, অন্তত আড়াই মাইল!"

"তুই মেপেছিস?"

"তুই মেপেছিস?"

"আমি মাপিনি, কিন্তু আমার আন্দাজ আছে।"

"আমারও আন্দাজ আছে।"

"তবে আয় মেপে দেখি, কারটা ঠিক!"

"এই রোদ্দুরে বেরিয়ে পাহাড় মাপতে আমার বয়ে গেছে! আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি!"

"কাল আমরা রোদ্দুর ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়ব। খুব ভোরে।"

"ঐ জায়গাটা কত দূরে হবে বলে তোর আন্দাজ?"

"লাটু পাহাড়ের ওপর থেকে জায়গাটা দেখা যায়। আমার তো মনে হয়, সাত-আট মাইলের বেশী হবে না। বড় জোর দু-তিন ঘণ্টা লাগবে। ভোরবেলা বেরুলে, সব দেখে-শুনে আমরা বিকেলের আগেই ফিরে আসতে পারব।"

"এই পাহাড়ী রাস্তা আর মাঠের মধ্য দিয়ে সাত-আট মাইল হাঁটা—কোনো মানে হয়? তোর যত অদ্ভুত শখ! কেন, ওখানে যেতে হবে কেন?"

"বাঃ, জায়গাটা রয়েছে কেন? রয়েছে বলেই যেতে হবে!"

স্বপন হঠাৎ বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "নাঃ, আমি যাব না ভাবছি!"

"কেন?"

"এমনিই। ভাল লাগছে না!"

বিমানও একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমাকে অবশ্য যেতে হবে। আমি যেটা একবার ঠিক করি, সেটা সহজে ছাড়ি না। তুই যেতে না চাস, আমি একাই যাব। তুই তাহলে যাবিই না?"

"এখনো পুরোপুরি ঠিক করিনি। যদি কাল সকালে মুড ভাল থাকে, তা হলে যাব। না হলে যাব না!"

"ফেয়ার এনাফ্। আমি অবশ্য কাল যাচ্ছিই।"

এই সময় কেষ্ট এসে জিজ্ঞেস করল, "দাদাবাবু, আপনাদের চা দেব?"

স্বপন বলল, "এখানে না। বাগানে দাও! চায়ের সঙ্গে আর কী আছে?"

কেষ্ট বলল, "বিস্কুট!"

স্বপন বিরক্ত হয়ে বলল, "ধুৎ, বিস্কুট! প্রত্যেকদিনই কি

বিস্কুট খাব? কেন, পেঁয়াজি কি ফুলকপি ভাজা আর মুড়ি-টুড়ি দিতে পারো না?"

কেষ্ট বলল, "নুচি তরকারি করে দেব?"

"নুচি নয় কেষ্ট, লুচি। যতদিন না তুমি লুচি বলতে পারবে ততদিন আমি তোমার হাতে লুচি খাব না। আমার ঠাকুর্দা নুচি বলতেন বলে তুমিও নুচি বলবে? আমার বাবা বলেন না, আমি বলি না—দ্যাখো, এই দাদাবাবু তোমার কথা শুনে হাসছেন—"

বিমান সত্যিই তখন মিটিমিটি হাসছিল। স্বপন তার দিকে তাকাতেই বিমান বলল, "আমার বাবা কিন্তু এখনো নুচি বলেন, শুধু তাই নয়, বলেন নেবু. নংকা—আমার তো শুনতে বেশ ভালই লাগে—"

স্বপন তখন কেষ্টর দিকে ফিরে বলল, "ঠিক আছে কেষ্ট, তুমি এই দাদাবাবুকে যত খুশী নুচি—নেবু—নঙ্কা খাওয়াও, আমাকে দেবে মুড়ি, পেঁয়াজ, নারকোল!"

বাড়ির সামনে অনেকখানি চওড়া বাগান। অনেক গোলাপ আর জুঁই ফুল ফুটে আছে। বাগানের মাঝে-মাঝে সাদা রঙের বেঞ্চ পাতা। সেখানে বসলে অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়, আর ছোট ছোট পাহাড়।

বিমান আর স্বপন মাত্র দু-দিন আগে এখানে বেড়াতে এসেছে। এই বাড়িটা স্বপনদের। আর কয়েক দিনের মধ্যে স্বপনের মা-বাবা ও আরও অনেকে এখানে চলে আসবেন কলকাতা থেকে। ওরা দুজন শুধু একটু আগে আগে এসেছে। জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর।

কাছেই লাট্টু পাহাড়। ওরা সকালে বিকেলে সেই পাহাড়ের ওপর বেড়াতে যায়। সেই পাহাড়ের ওপর থেকে দূরে আর-একটা ছোট পাহাড়ের ওপর একটা হলদে রঙের বাড়ি দেখা যায়। সেদিকটায় আর কোনো বাড়ি ঘর কিচ্ছু নেই। শুধু মাঠ আর পাহাড়—তার মধ্যে ঐ রকম একটা একলা-একলা বাড়ি কেন? বিমান ভেবেছিল, ওটা একটা দুর্গ। কিন্তু দুর্গের রং তো ওরকম হলদে হয় না! কেউ কেউ বলে, ওটা কোনো এক জমিদারের বাড়ি ছিল। এক সময় এক জমিদার শখ করে বানিয়েছিলেন নিরালায় থাকার জন্য, এখন আর সেই জমিদার-বংশের কেউ নেই। বাড়িটা এমনিই পড়ে আছে।

বিমান তাই চায় বাড়িটার মধ্যে ঢুকে দেখে আসতে।

ওরা দুজন বাগানে বেরিয়ে এসে একটা বেঞ্চে বসতে গেল। স্বপন একটা হোঁচট খেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মাটি মানে তো পাথর, এখানে একটু পড়ে গেলেই খুব জোর লাগে। স্বপনের কপালটা একটু কেটে গেছে।

বিমান বলল, "উঃ, তোকে নিয়ে আর পারি না! চশমা আনতে ভুলে গেছিস তো?"

স্বপন বলল, "দ্যাখ তো, চশমাটা বোধহয় টেবিলের ওপর ফেলে এলাম!"

বিমান দৌড়ে বাড়ির ভেতর গিয়ে চশমাটা নিয়ে এল। সেটা স্বপনের হাতে দিয়ে বলল, "চশমা ছাড়া একটুখানি গেলেই তো তুই গুঁতো খাস কিংবা আছাড় খাস্। তবু সব সময় চশমা পরে থাকার কথা তোর মনে থাকে না?"

স্বপন বেঞ্চে বসে পড়ে রুমাল দিয়ে কপালের রক্ত মুছল।

বিমান বলল, "ওষুধ লাগাবি না?"

"কোনো দরকার নেই। ঐ দিকে দেখ একটা গাঁদা ফুলের গাছ আছে। তার থেকে ক'টা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আয়।"

বিমান গাঁদা ফুলের গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে কচলে লাগিয়ে দিল কাটা জায়গাটায়। স্বপন কপালটা চেপে ধরে থেকে বলল, "এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। আমার ওরকম কত কাটে!"

বিমান বলল, "তুই তো রাত্তিরে ঘুমোবার সময় চশমা খুলে রাখিস! তাহলে স্বপ্ন দেখিস কী করে?"

স্বপন হেসে বলল, "ঘুমের মধ্যে যেই এক-একটা স্বপ্ন এসে ঝিলিক মারে, অমনি আমি হাত বাড়িয়ে চশমাটা পরে নিই!"

"তোর অনেক কম বয়েস থেকেই চোখ খারাপ, না রে?"

"হ্যাঁ। সেইজন্যই তো খুব সুবিধে হয়েছে।"

"সুবিধে?"

"সুবিধে নয়? চোখে ভাল দেখতে পাই না বলেই তো মনে মনে অনেক কিছু দেখতে পাই! তোদের সব কিছু দেখতে হয় হেঁটে-হেঁটে ঘুরে-ঘুরে—আর আমি এক জায়গায় বসে থেকে মনে-মনেই অনেক কিছু দেখে নিই।"

"মনে-মনে আর কতটা দেখা যায়? যে-জায়গায় তুই কখনো যাসনি, সে-জায়গা দেখতে পাবি?"

"তাও পাই। আমার চোখের জোর কম বলেই মনের জোর বেশী। যেমন ধর না, ঐ যে পাহাড়ের ওপর হলদে বাড়িটা—আমি এখান থেকেই বলে দিতে পারি ওর মধ্যে কী আছে!"

"যা যা, আর বাজে গুল ঝাড়তে হবে না!"

"আমি বলে যাচ্ছি, তুই মিলিয়ে নিস কাল। বাড়িটার সামনে—"

এই সময় কেষ্ট খাবার নিয়ে এল। সত্যি সে দু প্লেটে দুরকম খাবার নিয়ে এসেছে। এক প্লেটে লুচি বেগুনভাজা, আর এক প্লেটে মুড়ি নারকোল।

সেই খাবার দেখে দুজনে হেসে উঠল।

বিমান বলল, "দ্যাখ, আমি তোর চেয়ে ভাল খাবার পেয়ে গেলাম। তুই কেন কেষ্টকে বকতে গেলি!"

স্বপন বলল, "আমি মুড়ি নারকোলই বেশী পছন্দ করি।"

চায়ে চুমুক দিয়ে বিমান বলল, "কী রে স্বপন, তুই চোখ বুজে আছিস কেন? খাচ্ছিস না?"

স্বপন বলল, "বাড়িটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের গা থেকেই থাক-থাক সিঁড়ি ভাঙা। বড়-বড় ঘাস গজিয়ে গেছে। ওপরে উঠেই একটা বেশ চওড়া উঠোন। সেই উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা গাছ। তুই এ গাছ দেখেছিস?"

বিমান বলল, "ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। দেখিনি কখনো।"

"এই রকম বড় সাদা রঙের ফুল হয়, ঠিক হাঁসের ডিমের মতন সাইজ। জমিদারটি খুব শৌখিন ছিলেন। তারপর উঠোন পেরিয়ে বাড়িটার মধ্যে ঢুকতে গেলে......না, তুই ঢুকতে তো পারবি না! সদর দরজায় মস্ত বড় একটা তালা ঝোলানো। সেই তালাতে মরচে ধরে গেছে, তবু ভেঙে ফেলা সহজ নয়।"

"তুই এত সব দেখতে পাচ্ছিস?"

"একেবারে স্পষ্ট। ঠিক সিনেমার ছবির মতন। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই ঢুকতে পারবি ভেতরে—একটা উপায় আছে, বাড়িটার ডানদিকে একটু গেলেই দেখবি একটা ঘরের জানলা একদম ভাঙা—তার মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়া যায়। সেই ঘরে ঢুকেই দেখবি, ছাদের কাছে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ—"

"তার মানে ভূত?"

"অত সহজে ভূত দেখা যায় না। ঐ চোখ দুটো হুতোম প্যাঁচার। ঐ বাড়িতে হুতোম প্যাঁচার বাসা আছে। সেটা এক-

পক্ষে খুব ভাল, তার মানে সাপ-টাপ নেই। প্যাঁচা থাকলে সাপ থাকে না সেখানে। ইঁদুরও থাকে না।"

"ঠিক আছে, আর শুনতে চাই না!"

স্বপন তখনো চোখ বুজে আছে। বিমানের দিকে হাত তুলে বললে, "শোন না, আর একটা খুব মজার জিনিস দেখছি —সারা বাড়িতে অনেক তুলো ছড়ানো—মনে হয় যেন অনেকগুলো তাকিয়া আর বালিশ কেউ ফালা-ফালা করে ছিঁড়েছে—সেই তুলো ছড়িয়ে গেছে বাড়িময়—আর দোতলার সিঁড়িতে ভাঙা আয়নার কাচ—দোতলায় অনেকগুলো ঘর, একটা, দুটো ......সবশুদ্ধু আটটা। সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালেই কিন্তু দড়াম করে একটা শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। আসলে কিন্তু বাড়িটাতে কোনো লোক নেই। জন্তু-জানোয়ারও নেই।"

স্বপন এবার চোখ খুলে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "শব্দটা তাহলে কিসের?"

"তুই ভূত ভাবছিস তো?"

"আমি কিছুই ভাবিনি। তুই-ই তো বানিয়ে বানিয়ে এতক্ষণ এত সব বলে গেলি।"

"এক বর্ণও বানাইনি। আমি দূরের জিনিস মনে মনে স্পষ্ট দেখতে পাই। ছাদের দরজাটা খোলা, হাওয়ায় সেই দরজাটায় দড়াম-দড়াম করে আওয়াজ হয়। এই তো আছে বাড়িটার মধ্যে, আমি এখানে বসেই বলে দিলাম, তাহলে আর শুধু শুধু অতদূরে যাবি কেন?"

"তুই কতটা গুল ঝাড়লি, সেটা মিলিয়ে দেখার জন্যও তো যাওয়া দরকার।"

"ঠিক আছে, গিয়ে দেখিস, আমার প্রত্যেকটা কথা মিলে যাবে, তোর ভূত দেখার শখ তো! অত সহজে তাদের দেখা যায় না! ভূতরা এখন আর এই পৃথিবীতে থাকে না।"

বিমান মনে মনে ভাবল, গত বছরই সে জলপাইগুড়িতে বুধ সিংয়ের ভূতকে দেখেছে। কিন্তু সে-কথা স্বপন নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না। তাই সে চুপ করে রইল।

স্বপন বলল, "দাঁড়া, আরও খবর তোকে জোগাড় করে দিচ্ছি।"

গলা চড়িয়ে সে ডাকল, "কেষ্ট, কেষ্ট!"

কেষ্ট এসে দাঁড়াতেই স্বপন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কেষ্ট, দূরে পাহাড়ের ওপর যে হলদে বাড়িটা দেখা যায়, সেটাতে ভূত আছে?"

কেষ্ট বলল, "কোনটা? পুতুলহাটের রাজার বাড়ি?"

"ওটা আবার রাজার বাড়ি নাকি?"

বিমান বলল, "তার মানে কোনো জমিদারের বাড়ি। আগেকার অনেক জমিদারকেই রাজা বলা হতো। এই শিমুলতলায় সেরকম জমিদারদের অনেক বাড়ি আছে।"

স্বপন বলল, "ঐ বাড়িতে ভূত নেই কেষ্ট?"

কেষ্ট ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, "না তো, শুনিনি তো দাদাবাবু?"

"শোনোনি? ঐ বাড়িতে কেউ যায়?"

"অতদূরে কে যাবে? রাস্তাও তো নেই!"

"রাস্তা নেই? তাহলে জমিদারবাবুরা যেতেন কী করে?"

"তেনারা তো যেতেন হাতির পিঠে কিংবা পালকিতে। গাড়িটাড়ি যেতে পারে না।"

"এখানে তো আরও অনেক বাড়ি খালি পড়ে আছে। আর কোনো বাড়িতে ভূত নেই?"

কেষ্ট একগাল হেসে বলল, "না দাদাবাবু, এদিকে ভূত কোথায়?"

স্বপন বলল, "দেখলি, দেখলি বিমান! আজকাল গ্রামের লোকরাও ভূত মানে না! তাহলে তুই আর কী দেখতে অত দূরে যাবি?"

"এমনিই। ঠিক করেছি যখন যাব।"

"তোকে ঐ বাড়িটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে মনে হচ্ছে।"

বিমান বলল, "বোধহয় তাই!"

পরদিন খুব ভোরে বিমান চোখ মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল। স্বপন তখনও ঘুমোচ্ছে, তাকে বিমান ডাকল না। স্বপনের যখন যাবার ইচ্ছে নেই, তখন তাকে বিমান শুধুশুধু জোর করবে কেন?

সাদা প্যান্ট শার্ট আর বুটজুতো পরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল একটা ব্যাগ। তার মধ্যে এক প্যাকেট বিস্কুট, চারটে কমলালেবু আর এক বোতল জল। বিমানের কোমরে মোটা বেল্ট আর ডান পায়ের মোজার নীচে লুকোনো আছে একটা ব্লেড। প্রিয়ব্রতর কাছ থেকে বিমান শিখেছে যে, হঠাৎ বিপদে পড়লে এই দুটো জিনিস অনেক কাজে লাগে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, কেষ্ট এর মধ্যেই উঠেপড়ে বাগানের গাছে জল দিচ্ছে। বিমানকে দেখে সে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "দাদাবাবু, কোথায় যাচ্ছেন এত সকালে?"

বিমান বলল, "একটু ঘুরে আসছি।"

"চা খাবেন না?"

"না। শোনো কেষ্ট, আজ দুপুরেও কিছু খাব না। বিকেলবেলা আমার জন্য জলখাবার তৈরি রেখো।"

"দুপুরে খাবেন না? আজ যে মুর্গী কাটব ভেবেছিলাম—"

"স্বপন দাদাবাবু তো থাকছেন। তাঁকে দিও।"

কেষ্টর পছন্দ হল না ব্যাপারটা। সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিমান ততক্ষণে বাগানের গেটের কাছে চলে গেছে।

এখনো সূর্য ওঠেনি, কিন্তু সারা আকাশে ছড়িয়ে আছে নতুন আলো। ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে। ঘাসগুলো শিশিরে ভেজা। হাঁটতে বেশ ভাল লাগছে বিমানের।

স্বপনটা এল না? সঙ্গে আর একজন কেউ থাকলে বেশ ভাল হত। স্বপন স্কুল থেকে বিমানের সঙ্গে পড়ে, এখনো কলেজে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে ওরা দু'জন। স্বপনের বেশ বুদ্ধি আছে, কিন্তু একদম হাঁটতে ভালবাসে না। সবচেয়ে বেশী ভালবাসে ঘুমোতে। ঘুমোক্ পড়ে-পড়ে।

একটুখানি হেঁটে আসার পর বিমান এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দিক ঠিক করে নিল। সেই হলদে বাড়িটা এখান থেকে দেখা যায় না। সেই পাহাড়টাও দেখা যায় না। লাট্টু পাহাড়ের ওপরে চড়লে তখন চোখে পড়ে। তা বলে এখন আর লাট্টু পাহাড়ের ওপরে চড়বার দরকার নেই, পাহাড়ের ডান দিক দিয়ে সোজা হেঁটে গেলে কয়েক মাইল পর নিশ্চয়ই সেই বাড়িটা দেখা যাবে।

আর একটুখানি এগোতেই বিমান পেছনে একটা চ্যাঁচামেচি শুনতে পেল। ফিরে তাকিয়ে দেখল, স্বপন ছুটতে ছুটতে আসছে আর তার নাম ধরে ডাকছে।

কাছে এসে স্বপন বলল, "তুই আচ্ছা ইডিয়ট তো! আমাকে কিছু না বলে চলে এসেছিস?"

বিমান বলল, "বাঃ, কাল সন্ধেবেলাই তো সব বলা হয়ে গেছে। তাই তোকে আর ডাকলাম না।"

"উঃ, এত ভোরবেলা কোনো মানুষ ওঠে? চা-টা খাওয়া হয়নি, কিছু না! চল চল চল, আগে চা-টা খেয়ে নিই।"

"আমি আর যাব না রে, স্বপন। তুই গিয়ে চা খেয়ে নে-না!"

স্বপন মুখ ভেঙচে বলল, "আমি একলা-একলা চা খাবো? তাহলে এতদূরে ছুটতে ছুটতে এলাম কেন?"

বিমান হেসে বলল, "তাই তো, এলি কেন?"

"আমি না-এলে তোর খুব মজা হত, তাই না? যত ইচ্ছে গুল চালাতে পারতি?"

"তার মানে?"

"তুই এই মাঠ-ফাটের মধ্যে খানিকটা ঘুরে-টুরে এসে আমাকে বলতি যে, হলদে বাড়িটা দেখে এসেছিস।"

"কিন্তু আমি তো বাড়িটা দেখতেই বেরিয়েছি। তোর কাছে গল্প করবার জন্য তো—"

"না হয় ধরেই নিলাম তুই হলদে বাড়িটা পর্যন্ত গেলি। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলি না। এমনি সাধারণ একটা খালি বাড়ি! আমার কাছে এসে কি তা স্বীকার করতি? বানিয়ে-বানিয়ে বলতিস যে ভুত আছে, পেত্নী আছে, সাপ আছে—আমি যা যা বলেছি তা কিছুই মেলেনি। সেইজন্য আমি নিজে তোর সঙ্গে গিয়ে চেক করে দেখতে চাই!"

"বেশ তো, চল না!"

স্বপন তবু গজ-গজ করতে লাগল। "মুখ ধোওয়া হল না, দাঁত মাজা হল না, কিছু খাওয়া হল না, এই রকম ভাবে কেউ বেরোয়! কেন বাবা, ভাল করে খেয়ে-টেয়ে নিয়ে একটু পরে বেরুলে কী হত?"

"বেশী রোদ্দুর উঠে গেলে হাঁটতে কষ্ট হবে!"

"খালি পেটে আরও বেশী কষ্ট হয়।"

"আমার সঙ্গে বিস্কুট আর কমলালেবু আছে, তাই খেয়ে নে!"

"মুখ না-ধুয়ে আমি খাবার খাব? আমি কি জংলী নাকি? তুই নিমগাছ চিনিস? একটা নিমগাছ দেখলে তার একটা ডাল ভেঙে দে তো!"

"আমি ভাই নিমগাছ-টিমগাছ চিনি না!"

স্বপন একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এই তো একটা নিমগাছ। যা, একটা ডাল ভেঙে নিয়ে আয়।"

বিমান বলল, "তুই আনতে পারছিস না?"

নিমগাছ কিনা কে জানে, গাছটা বেশ বড়। ডাল ভাঙতে হলে গাছের ওপরে উঠতে হবে।

স্বপন সেদিকে তাকিয়ে বলল, "আমার এখন মুড ভাল নেই। মুড ভাল না থাকলে আমার গাছে চড়তে ইচ্ছে করে না।"

"আমি তোকে কোনোদিন গাছে চড়তে দেখিনি!"

"দেখবি, একদিন দেখবি! সেরকম একটা পছন্দসই খুব বড় গাছ পাই, তার মগডালে উঠে তোকে দেখাব। এখন একটা ডাল ভেঙে নিয়ে আয়।"

বিমান জুতো খুলে তরতর করে গাছে উঠে গেল। তার-পর একটা বেশ বড় ডাল ভেঙে সেটা ফেলে দিল স্বপনের মাথার ওপরে। স্বপন তাড়াতাড়ি মাথাটা সরাতে যাওয়ায় তার চশমাটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে।

স্বপন চশমাটা তুলে নিয়ে দেখল ভেঙেছে কিনা। ভাঙেনি, কিন্তু চশমার একটা ডাঁটি একটু আলগা হয়ে গেছে। সে বলল, "চশমাটা ভাঙলে আর আমার যাওয়াই হত না! কী করছিলি বল তো?"

বিমান বলল, "তোর এত কষ্ট করে যাওয়ার কী দরকার? তুই এখনো ফিরে যেতে পারিস।"

"তুই একা যেতে চাইছিস কেন? তোর মতলবখানা কী? আমি কিছুতেই ফিরব না!"

স্বপন খানিকটা ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করল। তারপর বিমানের দিকে হাত নেড়ে বলল, "উঁ, উঁ উঁ.."

বিমান বলল, "কী?"

স্বপন মুখ বন্ধ করে ফেলেছে, আর কথা বলবে না। হাতের ভঙ্গি দিয়ে বোঝাল যে তার জল চাই।

বিমানের ব্যাগে এক বোতল খাবার জল আছে। তা মুখ ধোবার জন্য নষ্ট করবে? কিন্তু উপায় কী, স্বপন ছাড়বে না।

পুরো এক বোতল জল দিয়ে স্বপন মুখ চোখ ধুয়ে ফেলল। তারপর সে দুটো কমলালেবু ও পাঁচখানা বিস্কুট খেয়ে ফেলে বলল, "চা ছাড়া কেউ বিস্কুট খেতে পারে? তোর যা বুদ্ধি, বিমান! ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এলেই তো হত!"

বিমান বলল, "তুই বুদ্ধি করে সেটা আনলি না কেন?"

"সে-সময়টুকু দিলি কোথায়? ঘুম থেকে উঠেই তো দৌড়োলাম! বললাম, চল ফিরে যাই, আর একটু বাদে বেরুবো—"

"একবার যখন বেরিয়ে পড়েছি, আর ফিরব না কিছুতেই।"

"কিন্তু কমলালেবু আর বিস্কুট এখনই খেয়ে ফেললাম, দুপুরে কী খাব?"

"আরও বিস্কুট আছে!"

"আবার বিস্কুট!"

এবার কিছুক্ষণ চুপচাপ করে হাঁটল ওরা। এদিকে আর বাড়ি ঘর কিছু নেই। এবরো-খেবরো মাঠ। হলদে বাড়িটা এখনো দেখা যাচ্ছে না। দূরে-দূরে কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড়। এদিককার মাটিতে চাষও হয় না। একটু-একটু রোদ উঠেছে। যতদূর দেখা যায়, ঢেউ-খেলানো মাঠের মধ্যে ওরা দুজন মাত্র প্রাণী।

আরও খানিকটা পথ যাবার পর স্বপন বলল, "তোকে বলেছিলাম না, সাত-আট মাইলের অনেক বেশী দূর!"

বিমান বলল, "মোটেই না। আমরা কতটা আর এসেছি, বড় জোর দু'তিন মাইল।"

"দেড় ঘণ্টা ধরে হাঁটছি, তাতে মোটে দু'তিন মাইল হয়?"

"তুই যা আস্তে হাঁটছিস, তাতে আর কত বেশী হবে?"

"কিন্তু সেই বাড়িটা এখনো দেখা যাচ্ছে না কেন?"

সে ব্যাপারে অবশ্য বিমানও একটু চিন্তিত। সত্যিই বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। শিমুলতলা থেকে দেখা যায়—অথচ এতখানি রাস্তা হেঁটে এসেও সেটা আর চোখে পড়ছে না কেন? পথ ভুল হয়ে যায়নি তো? কিন্তু চারপাশ ঘুরে তাকালেও কোনো দিকেই সে-বাড়ির চিহ্ন নেই।

ওরা যেদিকে এগোচ্ছে, তার সামনের দিকে পাশাপাশি দুটো পাহাড়। দুটোরই ওপর দিকটা ন্যাড়া।

তবু বিমান জোর দিয়ে বলল, "এই দুটো পাহাড়ের কোনো একটার ওপরেই আছে সেই বাড়িটা।"

স্বপন বলল, "সেটা কি তবে অদৃশ্য হয়ে আছে? দেখা যাচ্ছে না কেন?"

"হয়তো সেই বাড়িটা এর কোনো একটা পাহাড়ের পেছন দিকে। আমরা উঁচু থেকে দেখছি কিনা, তাই বুঝতে পারিনি।"

"তাহলে একটা পাহাড়ে না-পাওয়া গেলে আর-একটা পাহাড়ে উঠে দেখতে হবে।"

"তা হতে পারে।"

এই দুটো পাহাড়ে উঠতে গেলে বিকেলের আগে কিছুতেই হবে না, এর মধ্যে আমার আবার খিদে পেয়ে যাচ্ছে।"

এমন সময় একটা মোটা গলায় গ্যাঁ আওয়াজ হতেই ওরা চমকে উঠল। ডান পাশে তাকিয়ে দেখল, এক গাছ তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটা মোষ, তার পিঠের ওপর ন'দশ বছরের একটা সাঁওতাল ছেলে। তার পেছন দিকে আরও কয়েকটা মোষ ঘাস খাচ্ছে।

স্বপন বেশ খুশী হয়ে উঠল। সেদিকে ফিরে বলল, "মোষের ডাকটা আমার এত মিষ্টি লাগল, ঠিক মনে হল যেন কোকিলের ডাক।"

"কেন?"

"বুঝলি না? মোষ আছে, তার পিঠে একটা ছেলে বসে আছে, তার মানে কাছেই কোনো বাড়িঘর আছে। তার মানে সেখানে খাবার আছে। তার মানে দুপুরটা আর আমাদের না-খেয়ে থাকতে হবে না!"

বিমান ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই ভাই, ইধার গাঁও হ্যায়?"

ছেলেটি অবাক হয়ে ওদের দেখছে। কালো তেল-চুকচুকে চেহারা। সে বলল, "হ্যায়।"

"কিধার?"

ছেলেটি নিজের পিঠের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, "উধার!"

স্বপন তক্ষুনি সেই দিকে পা বাড়াচ্ছিল, বিমান বলল, "দাঁড়া, দাঁড়া, ওটা তো উল্টো দিক হয়ে যাচ্ছে। আবার অত-দূরে যাব?"

স্বপন বলল, "বাঃ, দুপুরে খেতে হবে না? সাঁওতালদের গ্রামে মুর্গীর মাংসের ঝোল আর ভাত, আঃ, দারুণ!"

বিমান ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই ভাই, এখানে পাহাড়ের ওপর একটা বড় বাড়ি আছে না? কোন পাহাড়ের ওপর বলো তো?"

ছেলেটি বলল, "কোঠি? কোঠি তো নেই ইধার!"

বিমান বলল, "নেই? পাহাড়কা উপর!"

ছেলেটি বলল, "পাহাড়কা উপর? ও তো দুধুবাবু কা মোকান!"

"দুধুবাবু? তিনি থাকেন ঐ বাড়িতে?"

ছেলেটি দু' দিকে মাথা নাড়ল।

"তিনি থাকেন না? তবে কে থাকেন?"

ছেলেটি মুখখানা কুঁচকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন সে এই বিষয়ে কথা বলতেই চায় না। তারপর বিরক্ত ভাবে বলল, ওখানে এখন 'পরমাত্মা'রা থাকে।

স্বপন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে হেসে বলল, "তার মানে কী বুঝলি তো, বিমান? এবার আরম্ভ হল ভূতের গল্প। এরা ভূতকে পরমাত্মা বলে। আগে থাকতেন দুধুবাবু, এখন থাকেন ভুতুবাবুরা! তাই না?"

ছেলেটা আর কিছু উত্তর না দিয়ে 'হেই হ্যাট ট্ ট্ রে...' বলে চেঁচিয়ে মোষটার পিঠে খোঁচা মারল। মোষটা চলতে শুরু করে দিল অমনি।

স্বপন বলল, "চল, আমরা ঐ গাঁয়ের দিকে যাই।"

বিমান বলল, "আরে, একটা কথা তো জানা হল না! ছেলেটা চলে যাচ্ছে—"

দৌড়ে গিয়ে সে আবার ছেলেটার কাছে গিয়ে বলল, "এই খোকা, ঐ দুধুবাবুর মোকান কোন্ পাহাড়টার ওপর?"

ছেলেটি একটি পাহাড়ের ওপর আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, "বহুৎ দূরে হ্যায়!"

"ঠিক হ্যায়!"

স্বপন এর মধ্যেই খানিকটা এগিয়ে গেছে। বিমান তার কাছাকাছি আসতেই স্বপন বলল, "কাছাকাছি নিশ্চয়ই একটা নদী আছে।"

বিমান জিজ্ঞেস করল, "কী করে জানলি?"

"খুব বেশী দূরে নয়, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেয়ে যাব।"

"তুই কি আজকাল জ্যোতিষী হয়ে উঠলি নাকি?"

"এর জন্য জ্যোতিষী হওয়ার দরকার হয় না। একটু চিন্তা করার ক্ষমতা থাকলেই বোঝা যায়।"

সত্যিই আর-একটু এগিয়েই একটা নদী দেখা গেল। খুব বড় নদী নয়, জলও বেশী নেই, শুধু মাঝখান দিয়ে তির তির করে স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

বালির চড়ায় এক ঝাঁক বক বসে ছিল, ওদের দেখে এক সঙ্গে উড়ে গেল। স্বপন দৌড়ে গিয়ে জলে নামল। তার-পর বলল, "এটা হেঁটেই পার হওয়া যাবে। আমার নদী পার হতে খুব ভালো লাগে।"

বিমান সত্যি অবাক হয়ে গেছে। নদীটা দূরে থেকে দেখা যায় না, তবু স্বপন এটার কথা জানল কী করে? ও কি আগে দেখেছিল?

শিমুলতলায় এসে বিমান হলদি ঝর্না বলে একটা জায়গার নাম শুনেছে কয়েকবার। সেখানে সবাই পিকনিক করতে যায়। এটাই কি সেই হলদি ঝর্না? সেই কথা বিমান জিজ্ঞেস করল স্বপনকে।

স্বপন বলল, "না, না, হলদি ঝর্না তো পাহাড়ের দিকে। আমি এই নদীটার কথা কী করে জানলাম, তুই সেই কথা এখনো ভাবছিস তো? খুব সোজা। ঐ ছেলেটা যে মোষটার পিঠে বসেছিল, সেই মোষটার পা দুটো লক্ষ করিসনি? মোষটার দু পায়ে অনেকখানি ভিজে কাদা লেগে ছিল। এখানে বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি হয়নি তা হলে কাদা আসবে কোথা থেকে। নিশ্চয়ই মোষটা কোনো নদী পেরিয়ে এসেছে!"

ঠিকই তো বলেছে স্বপন, সে এ-ব্যাপারটা খেয়ালই করেনি। অবশ্য, কাছেই যে একটা নদী আছে, সেটা একটু আগে জেনে কী-ই বা এমন লাভ হয়? স্বপনটা বড্ড বাজে-বাজে ব্যাপারে বুদ্ধি খরচ করে।

প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে বিমান জলে নেমে পড়ল। স্বপন মাঝখানে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বিমান স্বপনের কাছে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "চল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?"

স্বপন বলল, "আমার কী ইচ্ছে করছে জানিস? আমার ইচ্ছে করছে এই নদীর ধার দিয়ে-দিয়ে হাঁটতে। নদীটা কোথা

থেকে জন্মেছে, দেখে এলে বেশ ভাল হয়, না?"

বিমান বলল, "ঠিক আছে, আর একদিন যাব।"

"আর একদিন না, আজই।"

"একটা কাজ করতে বেরিয়ে অন্য কাজ করা আমি পছন্দ করি না। আজ হলদে বাড়িটা দেখতে বেরিয়েছি, সেটাই দেখব।"

"কী হবে একটা ফাঁকা বাড়ি দেখে? তার চেয়ে একটা নদীর জন্মস্থান দেখা অনেক বেশী ইণ্টারেস্টিং!"

"ঠিক আছে, স্বপন, তুই এই নদীর জন্মস্থানটা দেখতে যা। আমি হলদে বাড়িটাতে যাই!"

"ধুৎ! একা-একা কোনো কাজ করতে আমার ভাল লাগে না।

"আমার সঙ্গে যেতে হলে তোকে ঐ হলদে বাড়িতেই যেতে হবে আজ!"

"তুই বড্ড গোঁয়ার, তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। আমি যা যা বলেছি, ঐ বাড়িটাতে গিয়ে তো তাই-ই দেখবি! শুধু-শুধু তবু অতটা যেতে হবে!"

"দেখাই যাক্ না!"

নদী পেরিয়ে খানিকটা হেঁটে এসে ওরা সাঁওতালদের গ্রামটা পেয়ে গেল। কিন্তু সেই গ্রামে একটাও দোকান নেই। গ্রামের লোকেরা খুব গরিব. তারা কোনোদিনই বোধহয় মুর্গীর ঝোল আর ভাত খায় না।

দোকান নেই দেখে স্বপনের খিদে উপে গেল। সে কিছুতেই কোনো বাড়িতে খাবার চাইবে না। লোকের কাছে খাবার চেয়ে খেতে তার লজ্জা করে।

একটা কুঁড়েঘরের সামনে একজন বুড়ো সাঁওতাল রোদ্দুরে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। সে ওদের জিজ্ঞেস করল, "বাবুরা কোথায় যাবে?"

বিমান বলল, "এই এমনি বেড়াতে বেরিয়েছি।"

বুড়ো বলল, "ঐ যে বটগাছটি দেখছ, ওর পাশ দিয়ে চলে যাও, ঝাঁঝা যাবার রাস্তা পেয়ে যাবে!"

বিমান বলল. "ঝাঁঝা? ঝাঁঝা এদিকে নাকি?"

বুড়ো দু বার মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ গো। এই পাঁচ ক্রোশ পথ হবে।"

একবার ট্রেনে দ্বারভাঙ্গা যাবার সময় বিমান ঝাঁঝা নামে একটা স্টেশন দেখেছিল। সেটা এখানে নাকি?

স্বপন বলল, "ঝাঁঝা তো শিমুলতলার পরের স্টেশন! চল্, সেখানে যাবি? ঝাঁঝার রসগোল্লা খুব বিখ্যাত!"

বিমান তাকে একটু ধমক দিয়ে বলল, "তোর খালি অন্য কথা! এখন ঝাঁঝায় আমরা রসগোল্লা খেতে যাব? কেন, কলকাতায় রসগোল্লা পাওয়া যায় না? পাঁচ ক্রোশ মানে জানিস? দশ মাইল! অতখানি রাস্তা হেঁটে যাব রসগোল্লা খাবার জন্য?"

স্বপন বলল, "তবু তো সেখানে গেলে কিছু খাবার পাওয়া যাবে। তোর ঐ পাহাড়ে উঠলে কী পাওয়া যাবে? কিচ্ছু না!"

বুড়ো সাঁওতালটির বাড়িটা ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার, ঝকঝকে। ঘরের বাইরে মাটির দেয়ালে সাদা রং দিয়ে একটা ছাগলের ছবি আঁকা। কিংবা হয়তো হরিণ আঁকতে চেয়েছিল, ছাগল হয়ে গেছে।

বাড়িটার উঠোনে তিনটি কলাগাছ। তার মধ্যে একটা গাছে এক কাঁদি কলা ঝুলে আছে। পেকে গেছে কলাগুলো। বিমান এর আগে কোনো গাছে পাকা কলা ঝুলতে দেখেনি।

বিমান সেই দিকে তাকিয়ে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এখানে কোনো দোকান নেই, যেখানে কলা-টলা কিনতে পাওয়া যায়?"

বুড়ো বলল, "তোমরা কলা কিনবে? আমার কাছ থেকে কেনো। এক টাকা পুরো দিতে হবে কিন্তু!"

"এক টাকায় কটা?"

"আমাকে এক টাকা দাও, তোমরা যে-কটা ইচ্ছে ছিঁড়ে নিয়ে যাও!"

এ তো বেশ মজার ব্যাপার। এক টাকায় তারা যে-কটা ইচ্ছে কলা নিতে পারে। যদি সবগুলো নেয়? তবে সবগুলো নিল না অবশ্য, ওরা দুজনে চারটে করে পাকা কলা ছিঁড়ে নিল। বেশ বড়-বড় কলা।

বুড়ো বলল, "তোমরা একটু তাড়াতাড়ি চলে যাও বাবু! আমার ছেলে এসে পড়লে আবার আমাকে বকাবকি করবে!"

বিমান বলল, "আমরা ঝাঁঝায় যাব না। আমরা পাহাড়ে উঠব। দুদ্ধুবাবুর মকান আছে যে-পাহাড়ে, সেটাতে যাবার রাস্তা আছে এদিক দিয়ে?"

বুড়োর চোখ গোল গোল হয়ে গেল। সে দুদিকে মাথা নেড়ে বলল, "ওদিকে যেও না। ওখানে পরমাত্মারা থাকেন।"

স্বপন বিমানের দিকে চেয়ে চোখের ইসারা করল। বিমান বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, "পরমাত্মারা থাকলে কী হয়? তারা কি মানুষকে মেরে ফেলে?"

বুড়ো বলল, "পরমাত্মারা রাগ করলে বাড়িতে আগুন লাগে।"

"আমাদের বাড়ি অনেক দূরে। সেখানে আগুন লাগবে না। তুমি কোনোদিন উঠেছিলে সেই পাহাড়ে?"

বুড়ো বলল, "বাবু, তোমরা এখন যাও না! আমার ছেলে এসে পড়লে আমাকে বকবে যে!"

ওরা দুজনে কলা খেতে-খেতে আবার এগোল নদীর দিকে। স্বপন হাসতে হাসতে বলল, "বুড়োটা খুব মজার, তাই না?"

"আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিল।"

"সেজন্য নয়। বারবার বলছিল, আমরা থাকতে-থাকতে ওর ছেলে এসে গেলে ওকে বকবে। কেন বল্ তো?"

"কেন?"

"আমাদের কাছ থেকে কলার দাম হিসেবে এক টাকা নিল তো! ছেলেকে সে-কথা বলবে না। ছেলেকে বলবে বাঁদর-টাঁদর এসে কলা খেয়ে গেছে!"

"হ্যাঁ রে, নইলে আমাদের চলে যেতে বলছিল কেন? ওর ছেলে আমাদের দেখলেই সব বুঝে ফেলত!"

"এরা খুব পরমাত্মার ভয় করে দেখছি!"

"ভয় জিনিসটা খুব ভাল। তাতে বেশী কষ্ট করতে হয় না। দ্যাখ্ না, তুই যদি পরমাত্মার নাম শুনে ভয় পেতি, তাহলে আর তোকে কষ্ট করে ঐ পাহাড়ে উঠতে হত না!"

কলাগুলো খেয়ে ওদের পেট অনেকটা ভরে গেল। নদীটার কাছে এসে বিমান ওর বোতলে সেই নদীর জলই ভরে নিল খানিকটা। নদীর জলে স্রোত আছে। যে জলে স্রোত থাকে, তা কখনো খুব অপরিষ্কার থাকে না।

নদী পেরিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল ডান দিকে। পাশাপাশি পাহাড় দুটো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেই বাড়িটা এখনো চোখে পড়ে না। বাড়িটা সত্যিই তাহলে পাহাড়ের উল্টো দিকে।

এখানকার মাটি ক্রমেই উঁচু হয়ে যাচ্ছে। বেশ খানিকটা যাবার পর ওরা দেখল, সামনে একটা জঙ্গল। খুব ঘন জঙ্গল নয়, কিন্তু অনেকখানি জায়গা জুড়ে। পাহাড় দুটোর কাছে
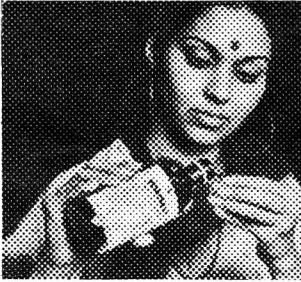
যেতে হলে এই জঙ্গলটা পেরিয়ে যেতে হবে। ওরা যেই জঙ্গলে ঢুকে পড়ল, তখন আর পাহাড় দুটোও দেখা গেল না।

স্বপন বলল, "এইবার আরও মজা হবে। এবার আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলব। তারপর জঙ্গলের মধ্যেই ঘুরতে থাকব। হয়তো চলে যাব পাহাড়টার উল্টো দিকে।"

বিমান বলল, "এরা বলছে বাড়িটা দুন্ধুবাবুর। কেষ্ট বলেছিল ওটা পুতুলডাঙা না কোথাকার যেন রাজার বাড়ি। কিন্তু সেই সময় তারা যাতায়াত করত কী করে? নিশ্চয়ই অনেক লোকজন যেত ঐ বাড়িতে, তার জন্য রাস্তা থাকবে না?"

স্বপন বলল, "নিশ্চয়ই ঝাঁঝার দিক থেকে রাস্তা আছে। বুঝতে পারছিস না, আমরা উল্টো দিক থেকে এসেছি। এদিক থেকে বাড়িটা দেখাই যায় না! চল্, আমরা ফিরে যাই! কাল সকালে আমরা ট্রেনে করে ঝাঁঝা যাব, তারপর সেদিক থেকে ঠিক রাস্তা পেয়ে যাব!"

বিমান গম্ভীর ভাবে বলল, "আমি একবার বেরিয়ে পড়ে কক্ষনো ফিরি না!"

"ঠিক আছে, জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ঘুরে মরবি, তখন ভাল হবে!"

"কিছুতেই রাস্তা হারাব না। আমি সোজা এই দিকে যাব, একটুও বেঁকব না।"

"গাছগুলো কি ভেদ করে চলে যাবি নাকি?"

"পাশ কাটিয়ে যাব। কিন্তু কিছুতেই দিক বদলাব না।"

জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর এগোতেই হঠাৎ দড়াম করে একটা গুলির শব্দ হল। অনেকগুলো পাখি উড়ে গেল ঝট-পটিয়ে।

গুলির শব্দ শুনে ওরা ভয় পাবার বদলে অবাকই হয়েছে বেশী। এই সাধারণ জঙ্গলে দিনের বেলা কে গুলি করবে? কোনো শিকারী এসেছে শিকার করতে? এই জঙ্গলে কি সেরকম কোনো জন্তু-জানোয়ার আছে?

দুই বন্ধু চোখাচোখি করল একবার।

স্বপন বলল, "নিশ্চয়ই বাঘ!"

বিমান বলল, "গুলির শব্দটা কোন্ দিক থেকে এল, বল তো?"

স্বপন চারদিকে মাথা ঘোরাল। ঠিক বোঝা যায় না। শব্দ যেদিক থেকে আসে, তার উল্টোদিক থেকে প্রতিধ্বনি বেশী হয়।

স্বপন বলল, "নিশ্চয়ই এখানে কেউ বাঘ-টাঘ শিকার করতে এসেছে। আমরা হয় বাঘের সামনে পড়ব, না হয় শিকারীর গুলি খেয়ে মরব।"

বিমান বলল, "হয়তো বাঘ নয়, কেউ পাখি শিকারেও আসতে পারে। কিন্তু শিকারীকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, আমরা এখানে আছি।"

বিমান চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই স্বপন বলল, "দ্যাখ দ্যাখ!"

সে একটা গাছের দিকে হাত তুলে দেখাল। গাছের গুঁড়ির খানিকটা চাকলা উড়ে গেছে। এক্ষুনি। কারণ, এখানো রস গড়াচ্ছে। গাছটা ওদের খুবই কাছে।

স্বপন চোখ বড় বড় করে বিমানের দিকে তাকিয়ে বলল, "গুলিটা কি তা হলে আমাদের দিকেই ছুঁড়েছিল? ফসকে গিয়ে এই গাছে লেগেছে?"

বিমান বলল, "না! মানুষকে কেউ ইচ্ছে করে গুলি করে নাকি? নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে পায়নি!"

"কিন্তু গুলিটা আমাদের গায়ে লাগলে কী হত?"

"মরে যেতাম, আর কী হত! বোকা কোথাকার!"

স্বপন সঙ্গে সঙ্গে বিমানের হাত টেনে মাটিতে শুয়ে পড়ল! সেই টানের চোটে বিমান প্রায় ধড়াস করে পড়ে গেল মাটিতে। একটু রেগে গিয়ে বলল, "এটা কী ব্যাপার হল?"

স্বপন ফিসফিস করে বলল, "আবার যদি কেউ গুলি চালায়? মাটিতে শুয়ে পড়লে সহজে গুলি গায় লাগে না. জানিস না! আমি বোকা থাকতে চাই, মরতে চাই না!"

দুজনে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল মাটিতে। কান খাড়া। কিন্তু আর কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। গুলির আওয়াজ তো দূরের কথা, কোনো লোকের হাঁটা চলার আওয়াজও না। শুধু টি-টি-টি-টি করে একটা পাখি ডাকছে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা আবার উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। খুব সাবধানে চারদিকে তাকাল। না, কেউ নেই।

স্বপন বলল, "এবার কি আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত না?"

বিমান সংক্ষেপে বলল, "না।"

সে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। ঠিক যেন মাটির ওপর একটা দাগ কাটা আছে, সেইরকম ভাবে সে সোজা হাঁটছে। স্বপনও তার সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে এল। বিমান আর কোনো কথা বলছে না। স্বপন শুধু একবার জিজ্ঞেস করল, "যদি এই বনে বাঘ থাকে?"

বিমান বলল, "তুই চিড়িয়াখানার খাঁচার বাইরে আর কোথাও বাঘ দেখেছিস?

"না।"

"তা হলে আজ আমাদের বাঘ দেখা হয়ে যাবে!"

"আমরা বাঘ দেখব, আর বাঘও আমদের দেখবে। তারপর?"

"তুই বড্ড বাজে কথা বলিস, স্বপন!"

"আমার একদম মরে যেতে ভাল লাগে না!"

"মরা অত সোজা নয়। আচ্ছা, তুই জানলি কী করে যে মাটিতে শুয়ে পড়লে গায়ে গুলি লাগে না?"

"বই পড়ে! বই পড়েই আমার সব কিছু জানতে বেশী ভাল লাগে। এমন কী, বনের মধ্যে সত্যিকারের বাঘ দেখার বদলে বইতে বাঘের গল্প পড়া অনেক ভাল!"

আরও বেশ খানিকটা হেঁটে আসার পরও ওরা কোনো বাঘ দেখতে পেল না বটে, কিন্তু একজন মানুষকে দেখল। একটা শাল গাছে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক, তার কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা বন্দুক।

লোকটার খালি গা, কোমরে একটা ছোট্ট কাপড়। লোকটার কী দারুণ সুন্দর চেহারা! তার কালো রঙের শরীরটা যেন পাথরের তৈরি। বুকটা চকচক করছে। লোকটা ওদের দেখে একটুও নড়ল না, চড়ল না, একটা কথাও বলল না। এমন কী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

ওরাও প্রথমে কোনো কথা বলল না। একটু দূরে লোকটাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। স্বপনের একবার শুধু মনে হয়েছিল, লোকটা হয়তো কাঁধ থেকে বন্দুকটা নিয়ে আবার গুলি করবে। তা হলেই ও বিমানের হাত ধরে মাটিতে শুয়ে পড়বে।

লোকটা কিন্তু বন্দুকটাও আর নামাল না।

বিমান আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "আপ পাখি শিকার করতা হ্যায়?"

লোকটা কোনো উত্তর দিল না।

স্বপন বলল, "এখানকার সাঁওতালরা সবাই বাংলা বোঝে।"

তারপর সে নিজেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি, মানে, আপনি একটু আগে গুলি করেছিলেন?"

লোকটা তবুও কোনো উত্তর দিল না।

বিমান বলল, "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?"

তবু কোনো উত্তর নেই।

"একটু আগে কে গুলি করেছে?"

"গুলি আমাদের গায়ে লাগতে পারতো!"

লোকটি কিছুতেই একটাও শব্দ করল না। ঠিক মনে হয় যেন পাথরের মূর্তি। পাথরের নয় অবশ্য, কারণ ওর নিশ্বাস পড়ছে।

স্বপন বলল, "লোকটা নিশ্চয়ই বোবা। যারা বোবা হয় তারা কালাও হয়। ও আমাদের কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না।"

বিমান বলল, "একটা বোবা-কালা লোক এখানে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে কেন?"

আরও কিছুক্ষণ ধরে ওরা লোকটাকে অনেক প্রশ্ন করল। অনেক ভাবে চেষ্টা করল কথা বলাবার। কিন্তু লোকটা একেবারে চুপ। একটু নড়াচড়াও করছে না।

শেষ পর্যন্ত বিমান বিরক্ত হয়ে বলল, "যাক গে, আর দেরি করবার কোনো মানে হয় না। চল আমরা যাই!"

লোকটাকে ফেলে রেখে ওরা আবার এগিয়ে গেল। খানিকটা দূর গিয়ে ওরা মাথা ঘুরিয়ে দেখল, লোকটা এবার পেছন ফিরে ওদের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কী রকম অদ্ভুত চোখ, মনে হয় যেন পলক পড়ছে না।

স্বপন বলল, "বিমান, ঐ লোকটা যদি পেছন থেকে হঠাৎ গুলি করে? চল দৌড়োই!"

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে খুব জোরে ছুটল। বিমানই বেশী জোরে দৌড়য়। এর মধ্যে আবার স্বপনের চশমাটা খুলে পড়ে গেল একবার। কিন্তু ওরা অনেক দূর চলে এসেছে, লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

এবার আর খানিকটা দৌড়তেই বন শেষ হয়ে গেল। সামনেই সেই দুটো পাহাড়। বিমান বনের মধ্যেও রাস্তা ঠিক রেখেছে, অন্য দিকে চলে যায়নি।

কোনো পাহাড়ের ওপরেই সেই বাড়িটা নেই। অদ্ভুত ব্যাপার, বাড়িটা কি অদৃশ্য হয়ে যাবে? তা হতেই পারে না।

বিমান বলল, "আমি এই ডান দিকের পাহাড়টা ঘুরে সামনের দিকে যেতে চাই। তা হলে নিশ্চয়ই বাড়িটা দেখতে পাব।"

স্বপন বলল, "তারপর ঐ দিকে গিয়ে দেখব, বাড়িটা বাঁ দিকের পাহাড়ে। তখন আবার উল্টো ঘুরে আসতে হবে।"

"তা হলে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাই?"

"সেটা মন্দ না।"

কিন্তু দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাওয়া খুবই মুশকিল। সেখানটা এবড়ো-খেবড়ো পাথর আর কাঁটাগাছে ভর্তি। এত বেশী কাঁটাগাছ যে তার মধ্যে দিয়ে হাঁটা যায় না। বরং ডান পাশের পাহাড়ের দিকটাতেই একটা সরু পায়ে-চলা রাস্তা আছে মনে হল।

বিমান বলল, "আমি এই দিকেই যাব। যদি উল্টো দিক দিয়ে ঘুরে আসতে হয়, তাও ভাল।"

এবার স্বপনই একটা জিনিস আবিষ্কার করল। খানিকটা এসে সে চেঁচিয়ে উঠল, "সিঁড়ি! ঐ দ্যাখ! আমি বলেছিলাম না, পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি থাকবে?"

সত্যি, এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে খাঁজ-কাটা-কাটা সিঁড়ি আছে।

বিমান বলল, "পাহাড়ের ওপর বাড়ি থাকলে তো পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি থাকবেই। সব জায়গাতেই থাকে।"

স্বপন বলল, "দেখিস, আমার সব কথা মিলে যাবে! আমি মনে মনে যা দেখেছিলাম, এখানে এসেও তুই তাই দেখবি!"

দুজন এবার বেশী উৎসাহ পেয়ে দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। স্বপন অবশ্য খানিকটা গিয়েই থেমে গেল। সে চেঁচিয়ে বলল, "বিমান, আস্তে চল, পাহাড়ের ওপর দৌড়তে নেই, তা হলে দম ফুরিয়ে যায়।"

বিমান সে-কথা শুনল না। সে-ই আগে উঠে গেল পাহাড়ের ওপর।

স্বপন যখন এসে পেঁছল, তখন বিমান সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে। বাড়িটা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে এখন। রীতিমতন বিশাল বাড়ি। খুব একটা ভেঙে-টেঙেও যায়নি। ছাদের কাছে দেয়াল থেকে কয়েকটা গাছ বেরিয়েছে—সেখানকার দেয়ালে ফাটল ধরেছে। দেখেই বোঝা যায়, অনেকদিন এ-বাড়িতে মানুষজন থাকেনি।

ওরা অবশ্য এসে পেঁছেচে বাড়িটার পেছন দিকে। এদিকটা মস্ত বড় একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এদিক দিয়ে বাড়িতে ঢোকা যাবে না।

ওরা ঘুরে বাড়িটার সামনে এসে পেঁছল। এখানে অনেকখানি বাগানের মতন জায়গা। নিশ্চয়ই এক সময় অনেক ফুলটুলের গাছ ছিল, কারণ ছোট-ছোট ইঁট দিয়ে দিয়ে সব জায়গা ভাগ করা আছে। একটা ফুলগাছও এখন নেই। সব শুকিয়ে গেছে—শুধু মাঝখানে একটা বড় গাছ।

স্বপন সেই গাছটার কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল, "কী, আমি বলেছিলাম না, সামনে একটা ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা গাছ থাকবে? এই দ্যাখ, মিলে গেছে!"

বিমান কাছে এসে ভুরু কুঁচকে সেই গাছটা দেখল। সে ঠিক বিশ্বাস করল না। বলল, "এটা তোর ঐ সেই গাছ?"

"নিশ্চয়ই!"

"কিন্তু তুই যে বলেছিলি, হাঁসের ডিমের মতন সাদা সাদা ফুল হয়? কোথায় সেই ফুল?"

"বাঃ, এখন ফুল ফোটেনি।"

"আমার তো দেখে মনে হচ্ছে এটা কাঁঠাল গাছ!"

"মোটেই না। তাহলে কাঁঠাল কোথায়?"

"এখনো কাঁঠাল হয়নি!"

মোট কথা, ওটা ম্যাগনোলিয়া না কাঁঠাল গাছ, তা ঠিক করা গেল না। কারণ ওরা দুজনে কেউই ভাল গাছ চেনে না। কাজেই কেউই নিজের মতটা বলতে পারল না জোর দিয়ে।

স্বপন অবার হাত ছুঁড়ে বলল, "ঐ দ্যাখ! সদর দরজায় মস্ত বড় তালা ঝুলছে। এ-কথাটাও আমি বলেছিলাম কিনা?"

বিমান বলল, "ফাঁকা বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া থাকবে না? এ তো একটা বাচ্চা ছেলেও বলতে পারে।"

স্বপন বলল, "আ-হা-হা! দরজাটা তো একদম ভাঙাও থাকতে পারত। যে-বাড়িতে অনেকদিন মানুষ থাকে না, সে-সব বাড়ির দরজা জানলা সব ভাঙা থাকে।"

বিমান বলল, "ঠিক আছে, এবার দেখা যাক, তুই যে ভাঙা জানলাটার কথা বলেছিলি, সেটা পাওয়া যায় কিনা!"

প্রথমে বিমান এসে সদর-দরজার তালাটা পরীক্ষা করল। তালাটা বেশ বড়, ভাঙা যাবে না। তারপর সে এদিক-ওদিক তাকাল।

স্বপন তার কাঁধে এসে হাত দিয়ে বলল, "একটা কথা কিন্তু আগে মনে পড়েনি। খুব সীরিয়াস!"

বিমান বলল, "কী?"

"এটা অন্য লোকের বাড়ি। দরজায় তালা বন্ধ। এই বাড়িতে কি আমাদের ঢোকা উচিত?"

"কেন?"

"বাঃ, পরের বাড়িতে কেউ না বলে-কয়ে ঢোকে নাকি? সে তো চোরেরা ঢোকে!"

বিমান খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, "আমরা তো আর চোর নই। আমরা কিছু নিতেও আসিনি। এ-বাড়িতে তো এখন আর কেউ থাকে না, এখন আমরা ঢুকলে কী হয়েছে?"

স্বপন বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় ঢোকা উচিত নয়।"

এবার বিমান একটু অনুনয় করে বলল, "এতদূর এসেও ভেতরটা না দেখে চলে যাব? আমার পুরনো ভাঙা বাড়ি দেখতে খুব ভাল লাগে। স্বপন, একবার একটু দেখে এলে কী দোষ হয়েছে, বল?"

স্বপন বলল, "যদি সত্যিই কোনো জানলা-টানলা ভাঙা থাকে, তবেই কিন্তু ঢুকব। মানে ভেতরে ঢোকার যদি রাস্তা আগে থেকেই থাকে। আমরা নিজেরা কিছু ভেঙে ঢুকব না।"

বিমান বলল, "চল, দেখাই যাক না।"

যাবার আগে স্বপন একবার উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এত উঁচু থেকে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। চতুর্দিকেই পাহাড়। এরই মধ্যে এক জায়গায় রেল-লাইন, তার ওপর দিয়ে ঠিক এই সময়েই একটা ট্রেন যাচ্ছে। এত দূর থেকে ঠিক মনে হয় খেলনার ট্রেন।

অনেক পাহাড়ই দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু কোনটা যে লাটু পাহাড় সেটা বোঝবার উপায় নেই। মাথার ওপর অনেকখানি ছড়ানো আকাশ। এখন একেবারে লক্‌লক্ করছে দুপুরের রোদ।

বিমানের কিন্তু আকাশ দেখার ধৈর্য নেই।

সে বাড়িটার পাশের দিকে এগোল। সদর দরজার দু' পাশে দুটো জানলা। দুটোই বন্ধ। বিমান একটা জানলা টেনে দেখল। না, খোলা যাবে না।

8

সামনের দালানে কয়েকটা মোটা-মোটা থাম। সে থামের গায়ে পেন্সিলে কী সব হিজিবিজি লেখা। স্বপন সেগুলো পড়ার চেষ্টা করল। বাংলাতেই কতকগুলো লোকের নাম লেখা, জয়নন্দন, দেবকীপ্রসাদ, বুলা, কানাই। এক জায়গায় লেখা আছে 'শুক্রবার, দুপুর দেড়টা'। স্বপন একটু চমকে গেল, আজও তো শুক্রবার, আর এখন দুপুর দেড়টার কাছাকাছিই হবে।

দূরে ঘটাং করে একটা শব্দ হল। বিমান চেঁচিয়ে ডাকল, "এই স্বপন, এদিকে আয়।"

স্বপন দৌড়ে বাড়িটার ডান পাশে ঘুরে গিয়ে দেখল, বিমান একটা খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জানলা-টার একটাও শিক নেই।

স্বপন নিজেও এতটা আশা করেনি। তার সব কথা মিলে যাচ্ছে। সে সত্যিই চোখ বুজলে অনেক কিছু দেখতে পায়, কিন্তু সব সময় তো সব জিনিস মেলে না। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগের দিন সে চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধ্যান করার পর, অঙ্কের কোশ্চেন পেপারটা দেখতে পেয়েছিল পুরো-পুরি। কিন্তু পরীক্ষায় তার থেকে অঙ্ক এসেছিল মোটে দুটো।

বিমান বলল, "এই জানালাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। আয়, ভেতরে ঢুকি।"

ঘরের ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ স্বপনের একটু গা-ছমছম করে। এর ভেতরে কী আছে কে জানে।

বিমানই প্রথমে পা বাড়াল ভেতরে। তারপর সে হাততালি দিয়ে হুশ্‌হুশ্‌ শব্দ করে উঠল।

স্বপন জিজ্ঞেস করল, "ওরকম করছিস কেন?"

"দেখছি, প্যাঁচা আছে কিনা। তুই বলেছিলি না প্যাঁচা থাকবে?"

অন্ধকারের মধ্যে কোনো জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল না। কিন্তু দূরে পাশের কোনো ঘরে রুনঝুন শব্দ হল। যেন কাচের চুড়ির আওয়াজ। ওরা কান পেতে সেই শব্দ শুনল। শব্দটা অবশ্য থেমে গেল তক্ষুনি।

স্বপন ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "বাড়িতে অন্য কোনো লোক আছে মনে হচ্ছে!"

বিমান বলল, "সদরদরজা বন্ধ, ভেতরে লোক থাকবে কী করে?"

"তা হলে কিসের শব্দ হল?"

"দেখা যাক!"

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ভেতরে যাবার দরজাটা পাওয়া গেল। সেটাও খোলা। দরজা ঠেলে এ-পাশে আসতেই অন্ধকার কেটে গেল। দু'পাশে দুটো লম্বা টানা বারান্দা, তার পাশে অনেকগুলো ঘর। মাঝখানে চৌকোমতন উঠোন। ওপর থেকে সেই উঠোনে রোদ এসে পড়েছে।

কাছের সেই রুনঝুন শব্দটা এখন আর-একবার শোনা গেল। মনে হয় অন্য কোনো ঘর থেকে। বিমান আর-একটা ঘরের দরজা ঠেলে দেখল। ফাঁকা ঘর। তার পরেরটাও তাই।

স্বপন এসে উঠোনে দাঁড়াল। ওপরে তাকালে আকাশ দেখা যায়। বাড়িটা মস্ত বড়, দোতলা তিনতলাতেও ঐ রকমই অতগুলো ঘর। স্বপন ওপরের বারান্দাগুলো দেখছে, হঠাৎ তার বুক কেঁপে উঠল। দোতলার বারান্দায় একটা মুখ তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। মুখটা মোটেই সাধারণ মানুষের মতন নয়, তার থেকেও বড়, কুচকুচে কালো রং, হিংস্র দুটি চোখ।

স্বপনের যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এরকম ভয়ঙ্কর মুখ সে আগে কখনো দেখেনি। অনেকটা মা দুর্গার পায়ের নীচে যে মহিষাসুরের মূর্তি থাকে, তার মুখের মতন। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে দৌড়ে চলে এল বারান্দায়। তারপর বিমানের হাত ধরে বলল, "শিগগির চল্‌।"

বিমান কিছুই বুঝতে পারল না। সে বলল, "কী হয়েছে। কী ব্যাপার?"

"চল, সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। এক মুহূর্তও আর এখানে নয়!"

বিমান জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "কী ব্যাপার আগে বল। পালাব কেন?"

স্বপন কোনো রকমে বলল, "ওপরে কে একজন...... আমাদের দেখছে......খুব হিংস্র!"

বিমান উঠোনে এসে ওপরে তাকাল, চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল খুব ভাল করে। তারপর বলল, "কই, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না!"

স্বপন তাকিয়ে আছে সিঁড়ির দিকে। সে ভাবছে, এক্ষুনি কেউ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসবে।

কিন্তু কেউ এল না।

বিমান বলল, "কই, কেউ নেই তো! তুই ভুল দেখেছিস।"

"মোটেই আমি ভুল দেখিনি!

"চল্‌, তা হলে ওপরে গিয়ে দেখে আসি।"

"বিমান, এই ধরনের খালি বাড়িতে অনেক সময় চোর ডাকাতের আড্ডা হয়।"

"সেই আড্ডাটাই তা হলে একবার দেখে যাওয়া দরকার।"

বিমান তখুনি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সিঁড়িটা সোজা উঠে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে। কাঠের সিঁড়ি, মাঝে মাঝে পেতলের আংটা বসানো। তার মানে এক সময় এই সিঁড়িতে কার্পেট পাতা থাকত। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় মচ্‌মচ্‌ শব্দ হচ্ছে।

ওরা ওপরে উঠে এসে দেখল, ওপরেও একটা লম্বা টানা বারান্দা একদম ফাঁকা। ওরা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে নিল। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মানুষজনের কোনো চিহ্ন নেই, তবু গা'টা কী রকম ছম্‌ছম্‌ করে। একটু আগে স্বপন এখানে একটা বিচ্ছিরি মানুষের মুখ দেখেছিল। তা কখনো চোখের ভুল হতে পারে?

স্বপন বারান্দার মেঝেটা ভাল করে দেখতে লাগল। একটু আগে বারান্দার ওপর দিয়ে কোনো লোক হেঁটে গেলে নিশ্চয়ই ধুলোর ওপর তার পায়ের ছাপ থাকবে। কিন্তু তা নেই। এরকম একটা ফাঁকা বাড়ির মেঝেতে যত ধুলো থাকা উচিত ছিল, তাও নেই, বরং বেশ পরিষ্কারই মনে হয়। শুধু কয়েকটা ছেঁড়া-ছেঁড়া কাগজ এখানে সেখানে ছড়ানো।

বিমান কয়েকটা কাগজের টুকরো তুলে তুলে দেখতে লাগল। একটা বড় কাগজ তুলে নিয়েই সে বলল, "এই দ্যাখ, স্বপন!"

কাগজটার একদিক সাদা, আর এক দিকে একটা মুখোশ। একটা ভয়ংকর চেহারার মানুষের মুখ আঁকা। হ্যাঁ, স্বপন এই মুখটাই দেখেছিল।

স্বপন বলল, "এই তো! এই মুখোশ পরেই কেউ এখানে দাঁড়িয়ে ছিল।"

বিমান সঙ্গে-সঙ্গে পেছন ফিরে চারদিকটা একবার দেখে নিল। না, কোনো লোক নেই তো! কোনো লোক শুধু শুধু মুখোশ পরে তাদের ভয় দেখাবে কেন?

বিমান বলল, "আমার মনে হয়, এই মুখোশ-আঁকা কাগজটা উড়ে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এ আটকে ছিল, তুই তখন দেখেছিস।"

স্বপন বলল, "তারপর আমাদের ওপরে উঠতে দেখেই মুখোশটা আবার আপনা আপনি বারান্দায় এসে পড়ে রইল?"

"তা ছাড়া আর কী হবে? হাওয়াতে এরকম হতেই তো পারে।"

"আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না। আমার একদম ভাল লাগছে না এ-জায়গাটা। দেখা তো হয়ে গেছে, এবার চল্‌।"

"দাঁড়া, আর-একটু দেখে নিই!"

স্বপন সেই মুখোশটা মুড়ে তার ঝোলার মধ্যে রেখে দিল।

এই সময় কাছেই একটা ঘরের মধ্যে শব্দ হল, ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌। তারপরই মেয়েদের হাতের চুরির মতন রুনুঝুনু আওয়াজ।

স্বপন বিমানের হাত চেপে ধরল। এবার বিমানও একটু ঘাবড়ে গেছে। সে সেই ঘরের দরজাটার দিকে চোখ রেখে আস্তে-আস্তে নিজের কোমর থেকে বেল্টটা খুলে হাতে নিল। এইটাই তার অস্ত্র।

সে চাপা গলায় বলল, "স্বপন, তুই এক পাশে সরে দাঁড়া। আমি দরজাটা খুলছি, ভেতরে কী আছে দেখতে হবে!"

দরজাটা ভেতর থেকে খিল বন্ধ আছে ভেবে, বিমান খুব জোরে লাথি কষাল। সেই ঝোঁকে সে নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কারণ দরজাটা ভেজানো ছিল শুধু। স্বপন পাশ

জেমসের মজার আসর
৫০০টি পুরস্কার জিতে নাও!
সেই সঙ্গে অতিরিক্ত বড় রকম পুরস্কারের সম্ভাবনা।
এর মধ্যে কোন্‌টি বেখাপ্পা চিত্র বলতে পারো ?
1
2
3
4
5
Cadbury's
MILK CHOCOLATE
GEMS
শিগ্‌গির!
তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস জেমসের একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ৫০০ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে। আর যদি তোমার বরাত ভাল, তোমার গিফ্‌ট চেকের উপর আরো ৪০০ টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে—ভাগ্যবান বিজেতাদের অতিরিক্ত পুরস্কার।
বড় স্পষ্ট হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে।
এই ঠিকানায় পাঠাও:
"Fun with Gems" Dept. D-52
Post Box No. 56, Thane 400 601.
উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ:
১৬ই অক্টোবর, ১৯৭৬।
রঙ বেরঙের, চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস
CHAITRA-C-39 BEN
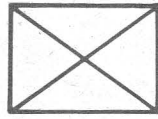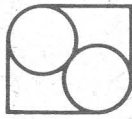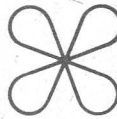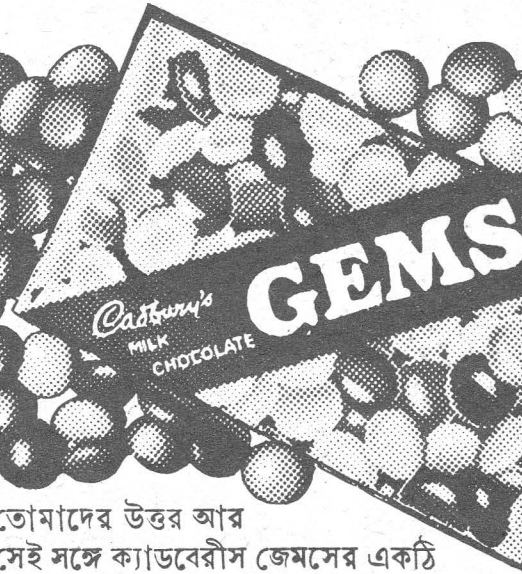
থেকে খপ্ করে বিমানের হাত ধরে ফেলল বলে সে পড়ে গেল না। ঘরের মধ্যে তখন খট্ খট্ ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ আরও জোরে চলছে।

ঘরের মধ্যে প্রথমেই ওদের চোখে পড়ল, তুলো উড়ছে। একটা বড় গোল টেবিলের ওপর কয়েকটা তাকিয়া আর বালিশ রাখা। সেগুলোর চারদিকে ফুটো হয়ে তুলো বেরিয়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে লোকজন কেউ নেই।

বিমান বলল, "তুলো! স্বপন তুই বলেছিলি না, এ বাড়ির মধ্যে তুলো থাকবে?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম।"

"এই দ্যাখ, তুলো রয়েছে। তোর সাধারণ বুদ্ধিটা বেশ জোরালো। একটা খালি বাড়িতে কী কী থাকতে পারে, তা তুই ঠিক আন্দাজ করতে পারিস।"

"কিন্তু এটা খালি বাড়ি নয়। শব্দ হচ্ছিল কিসের?"

"সেটা দেখতে হবে।"

ওরা ঘরের মধ্যে পা বাড়াতেই বালিশের ফুটোর মধ্য থেকে বেরিয়ে দুটো বিরাট ইঁদুর মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে পালাল। সারা মেঝেতে কাচ ছড়ানো। একটা বড় আয়নার কাচের টুকরো। ইঁদুরগুলো তার ওপর দিয়ে দৌড়বার সময় রুনুঝুনু শব্দ হচ্ছে।

বিমান বলল, "সাবধান! এখানে অনেক ধাড়ী ধাড়ী ইঁদুর আছে!"

ঘরের কোণে একটা নর্দমার ঝাঁঝরি নেই। ইঁদুরগুলো সেই গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

বিমান বলল, "ইঁদুররা তুলো ঘাঁটতে ভালবাসে। আমি আগেও দেখেছি।"

স্বপন বলল, "একটা বিচ্ছিরি গন্ধ পাচ্ছিস?"

"হ্যাঁ, কী রকম যেন একটা গন্ধ।"

ঘরটা বেশ বড়। বড় গোল টেবিলটা ছাড়া সেই ঘরে রয়েছে একটা ছবির ফ্রেম। এক সময় তাতে কোনো আঁকা-ছবি ছিল, কে যেন ইচ্ছে করে ছবিটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে মনে হয়। যেন একটা ছুরি দিয়ে সেটাকে ফালা-ফালা করেছে। কী ছবি যে ছিল, এখন আর তা বোঝাই যায় না।

সেই ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওদের পায়ের কাছ থেকে ভন্ ভন্ করে এক ঝাঁক মাছি উড়ে গেল। নাকে এসে লাগল একটা বোঁটকা গন্ধ। ওরা নীচের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল।

প্রথমে মনে হচ্ছিল একটা মোটা দড়ি। তারপরেই বোঝা গেল, দড়ি নয়, সাপ। একটা মরা সাপ, পচে গেছে, সেটার গায়েই মাছি বসেছিল!

শুধু গন্ধের জন্যই নয়, ঐ পচা সাপটাকে দেখেই ওদের প্রায় বমি এসে গেল। ওরা পিছিয়ে এল খানিকটা।

বিমান বলল, "সাপ? এখানে সাপ এল কী করে? অদ্ভুত ব্যাপার!"

স্বপন বলল, "কেন, ফাঁকা বাড়িতে সাপ আসতে পারে না? ঐ ইঁদুরগুলোকে খাওয়ার লোভে সাপ এসেছিল।"

"দোতলার ওপর সাপ আসে? তাও, ইঁদুরগুলো মরল না, সাপটাই মরে গেল?"

"ইঁদুরগুলোই বোধহয় সবাই মিলে আক্রমণ করে ওকে মেরে ফেলেছে।"

"অসম্ভব! ইঁদুরের সে সাহস হবে না কোনোদিন।"

"তাহলে বোধহয় সাপটা অনেক ইঁদুর খেয়ে-খেয়ে এমন পেট ভরিয়ে ফেলেছিল যে, শেষকালে পেট ফেটে মরে গেছে।"

"কিংবা কেউ সাপটাকে পিটিয়ে মেরেছে।"

"সাপ মেরে কেউ ঘরের মধ্যে রেখে দেয় না। তা হলে যে মেরেছে সে নিশ্চয়ই মরা সাপটাকে বাইরে ফেলে দিত।"

"চল, এই ঘর থেকে যাই।"

ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সেই সময়।

দুই বন্ধু দুজনের চোখের দিকে তাকাল। বাইরে থেকে কেউ দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। এবার আর কোনো সন্দেহ নেই।

বিমান দৌড়ে গেল দরজাটা খোলবার জন্য। আর স্বপন উঃ শব্দ করে পা চেপে বসে পড়ল, মাটিতে। তার পায়ে কী যেন কামড়ে দিয়েছে। একটা ইঁদুর দৌড়ে গেল তার পাশ দিয়ে।

নর্দমা দিয়ে ইঁদুরগুলো আবার উঠে আসছে। বিমান সেদিকে চেয়ে বলল, "বেল্ট! স্বপন, বেল্ট খুলে ওদের মার।"

নিজে সে বেল্টটাকে চাবুকের মতন ধরে শপাশপ করে পেটাতে লাগল ইঁদুরগুলোকে। সারা ঘর ইঁদুরের কিচকিচ আওয়াজে ভরে গেল। স্বপনও এবার উঠে দাঁড়িয়ে ইঁদুর পেটাতে শুরু করেছে। রীতিমতন একটা যুদ্ধ। একটু বাদে ইঁদুরগুলো আবার পালাতে লাগল নর্দমা দিয়ে।

দরজাটা টানতেই খুলে গেল। ওরা সাবধানে আগে একটু বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিল, কেউ আছে কিনা। কেউ নেই। তখন বাইরে বেরিয়ে এল।

বিমানের ভুরু কুঁচকে আছে। দরজাটা নিজে-নিজেই হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে, এটা সে মানতে পারছে না। ঠিক যেন মনে হল, কেউ দরজাটা টেনে বন্ধ করল।

সে বলল, "ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না রে, স্বপন! এ বাড়িতে সত্যিই কি কোনো মানুষ আছে? কেউ থাকলে এতক্ষণ আমরা টের পেতাম না?"

স্বপন বলল, "তা হলে এসব কাণ্ড হচ্ছে কী করে? প্রথমে একটা মুখোশ, তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া?"

"ভুতুড়ে ব্যাপার নয় তো?"

"এই দিনের বেলা ভূত আসবে! দূর! আমি ভূতের ভয় পাই না, মানুষকেই বেশী ভয় পাই। যদি কোনো চোর ডাকাত থাকে—"

বিমান গলা চড়িয়ে বলল, "চোর-ডাকাতকে ভয় পাবার কী আছে? আমরা যে এ-বাড়িতে এসেছি, তা তো অনেকেই জানে। আমাদের কোনো বিপদ হলে সবাই খুঁজতে আসবে এখানে। প্রিয়ব্রতদা পুলিশে কাজ করে। তার সঙ্গে তো আর কারুর চালাকি চলবে না!"

এ-কথা বলে বিমান চুপ করে গেল। তার এরকম চেঁচিয়ে কথা বলার উদ্দেশ্য স্বপন বুঝে নিয়েছে। যদি কাছাকাছি কেউ থাকে, তাহলে কথাগুলো শুনবে।

ওরা কান পেতে রইল। না, তবুও কোনো লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল না। সামনে পরপর অনেকগুলো ঘর, দরজাগুলো বন্ধ, যদিও বাইরে থেকে তালা দেওয়া নেই। প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যেই যেন কোনো রহস্য আছে। একতলার চেয়ে এই দোতলাতেই বেশী গা ছমছম করা ভাব। আড়াল থেকে কেউ যেন ওদের দেখছে।

বিমান বারান্দার এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত হেঁটে গেল। প্রায় দশখানা ঘর আছে এখানে। বারান্দার একেবারে ও-পাশে একটা দরজা খোলা। সেখানে কোনো ঘর নেই। একটা ছোট ছাদ। বিমান বলল, "স্বপন এদিকে আয়। এখান থেকে বাইরেটা দেখা যাবে।"
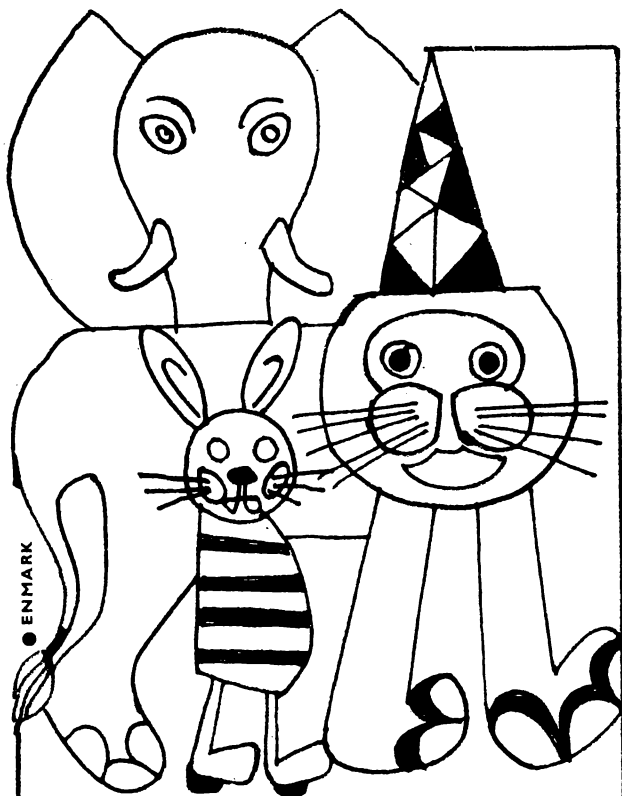
স্বপনের বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলে ইঁদুরটা কামড়ে দিয়েছিল, সেইখানটা বেশ জ্বালা করছে। একটা কিছু ওষুধ লাগালে হত।

ছাদটা গোল ধরনের। সামনের দিকটায় কাঠের রেলিং। বিমান সেই রেলিংয়ের কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখতে যাচ্ছে, স্বপন পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "এই বিমান, ওদিকে যাস না!"

বিমান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন? কী হয়েছে?"

"যাস না বলছি!"

বিমান তবু সে-কথা না শুনে রেলিংটা ধরে ঝুঁকতে যেতেই রেলিংয়ের খানিকটা অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল নীচে। বিমানও সেই সঙ্গে পড়ে যাচ্ছিল, স্বপন পেছন থেকে দৌড়ে তার জামাটা খামচে ধরল। ফ্যাস করে জামাটা ছিঁড়ে গেল, খানিকটা অংশ থেকে গেল স্বপনের হাতে। তবু সেইটুকু বাধা পাওয়াতেই বিমান সোজা নীচে পড়ল না, তার মাথাটা বেরিয়ে গেলেও হাত দিয়ে সে ছাদের কোণটা ধরে ফেলল।

স্বপন তার পা ধরে টেনে এদিকে নিয়ে এসে ধমক দিয়ে বলল, "বারণ করলাম না রেলিংটা ধরতে!"

বিমানের বুকটা ধকধক করছে। এখান থেকে নীচে পড়লে আর দেখতে হত না। সে কল্পনাই করতে পারেনি যে, রেলিংটা হঠাৎ এরকমভাবে ভেঙে পড়তে পারে।

সে স্বপনকে জিজ্ঞেস করল, "স্বপন, তুই আগে থেকে কী করে বুঝলি? তুই কেন আমাকে ওখানে যেতে বারণ করলি রে?"

স্বপন বলল, "কী জানি! আমার হঠাৎ মনে হল, ওখানে একটা কিছু বিপদ আছে। পুরনো কাঠের রেলিং, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পচে গেছে।"

"কিন্তু দেখে তো বেশ শক্ত মনে হচ্ছিল।"

"আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলুম!"

"তুই কী করে এত সব বুঝতে পারিস! যাক গে, চল এবার যাই! আমার শখ মিটে গেছে। আর এখানে থাকতে চাই না।"

"বাঁচলুম। আমিও আর এখানে এক মুহূর্তও থাকতে চাই না?"

ছাদটা থেকে বেরিয়ে আবার ওরা বারান্দায় এল। এবার দেখা গেল, ওদের ঠিক পাশের ঘরটারই দরজা খোলা। একটু আগে ওরা দরজাটা বন্ধ দেখেছিল।

এই বাড়ির হাওয়া তো খুব অদ্ভুত। যখন-তখন দরজা খোলে আর বন্ধ হয়! দরজাটা এমনভাবে খোলা যে, মনে হয় যেন ঘরটা ওদের ডাকছে ভেতরে ঢুকে দেখবার জন্য।

বিমান দরজা দিয়ে ঘরটার মধ্যে শুধু মুখ বাড়াল।

স্বপন তার হাত টেনে ধরে বলল, "আর দরকার নেই. চল্!"

বিমান বলল, "দ্যাখ, একটা অদ্ভুত জিনিস!"

সত্যিই ব্যাপারটা অদ্ভুত। ঘরটার এককোণে একটা বিছানা পাতা। সেই বিছানায় শুয়ে আছে একটা কুকুর।

এই ঘরের ভেতরের দিকেও একটা দরজা আছে, যা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়। সেই ঘরটা অন্ধকার।

কুকুরটা ওদের দেখে উঠল না, জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল।

স্বপন বলল, "বোধহয় বাইরে থেকে একটা কুকুর এসে এখানে ঢুকে পড়েছে।"

বিমান বলল, "কুকুরটা কি এইমাত্র এল? এত ঘর থাকতে এই ঘরেই কেন? কে ওর জন্য বিছানা পেতে রেখেছে?

কুকুরের জন্য বিছানা? মাথায় বালিশ পর্যন্ত রয়েছে।"

বিমান বেল্টটা আবার হাতের মুঠোয় ধরে রাখল, বলা যায় না, কুকুরটা পাগলও হতে পারে।

স্বপন বলল, "চল না, আর দাঁড়িয়ে থেকে কী লাভ?"

"কুকুরের জন্য কে বিছানা পেতে রেখেছে, তা আমি দেখতে চাই।"

বিমান ঘরের মধ্যে পা দিতেই কুকুরটা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। সাধারণ দিশী কুকুর। খুব একটা গাঁট্টাগোঁট্টাও নয়।

কুকুরটা কিন্তু ওদের দিকে তেড়ে এল না। খানিকক্ষণ ওদের দিকে চেয়ে রইল। চোখের ভাব দেখলে মনে হয়, যেন সে বলতে চাইছে, কেন আমাকে বিরক্ত করতে এসেছ? তারপর সে নিজেই শান্তভাবে লেজ গুটিয়ে মাঝখানের দরজাটা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

বিমান বিছানাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিছানাটা অবশ্য বহু পুরোনো, অনেক দিন আগে কেউ পেতে রেখে গেছে। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় তো কেউ বিছানা পেতে রেখে যায় না। বিছানার চাদরে-বালিশে শ্যাওলা ধরে গেছে—অনেক-দিন এখানে কোনো মানুষ শোয় না, তা বোঝা যায়। কুকুরটাও কি আজই প্রথম এল?

বিমান বলল, "কুকুরটা কেন এখানে এল বল তো? আমাদের গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছে?"

স্বপন বলল, "খালি বাড়িতে অনেক সময়ই এরকম কুকুর এসে ঢুকে পড়ে।"

"কিন্তু যেখানে মানুষ থাকে না, সেখানে কুকুররা খাবার পাবে কী করে? এখানে কি কুকুরের কোনো খাদ্য আছে?"

"খাবার বাইরে গিয়ে খেয়ে আসে।"

"বাইরে খাবার খায়, আর এখানে বিছানায় শুতে আসে? কোনোদিন শুনেছিস এরকম কথা?"

"কুকুরটা গেল কোথায়?"

বিমান মাঝখানের দরজাটা দিয়ে অন্য ঘরটায় উঁকি দিল। এ-ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। ভেতরের কিছু দেখা যায় না। শুধু এককোণে জ্বল জ্বল করছে দুটো চোখ। অন্ধকারে সেই চোখ দুটো ভয়ংকর দেখায়।

কুকুরটাই ঐ রকম চোখে ওদের দেখছে। এবার হঠাৎ ঘাউ-ঘাউ করে ডেকে উঠল। সে কি গলার জোর। বাড়িটাতে কোনো শব্দ ছিল না, এবার কুকুরের ডাকে যেন কেঁপে উঠল সারা বাড়িটা!

বিমান চমকে পিছিয়ে আসতে গিয়ে ধাক্কা মেরে বসলো স্বপনকে। সেই ধাক্কায় স্বপনের চশমাটা পড়ে গেল মাটিতে। স্বপন আর চশমাটা তোলার সময় পেল না, তাদের মনে হল কুকুরটা তেড়ে আসছে তাদের দিকে।

দুজনেই দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কুকুরটাও দারুণ জোরে-জোরে ডেকে যাচ্ছে। বিমান বলল, "স্বপন, দৌড়ে নীচে নেমে চল।"

স্বপন বলল, "আমি দৌড়োব কী করে? তুই আমার চশমাটা ফেলে দিলি! চশমা ছাড়া আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না! চশমাটা নিয়ে আসতেই হবে!"

বিমান বলল, "এই রে! আবার ঢুকতে হবে ঐ ঘরে? কুকুরটা যদি পাগলা হয়?"

স্বপন বলল, "তা বলে আমি চশমাটা ফেলে মোটেই যাব না।"

"আমার মনে হয়, ঐ অন্ধকার ঘরটাতে এমন কিছু আছে,

কুকুরটা যা পাহারা দিচ্ছে। আমাদের ঐ ঘরটায় ঢুকতে দিতে চায় না।"

"আমার চশমাটা তো পড়েছে এই ঘরে। আমি নিয়ে আসছি।"

কিন্তু স্বপনকে একলা ঐ ঘরে ঢুকতে দেওয়াটাই ভুল হল বিমানের। চশমা ছাড়া ও কিছু দেখতে পায় না চোখে। ঘরের মধ্যে ঢুকেই ও হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সংগে সংগে কুকুরটাও লাফিয়ে এসে পড়ল ওর ঘাড়ে।

বিমান সংগে-সংগে ছুটে গিয়ে বেল্ট চালাতে লাগল কুকুরটার ওপরে। কুকুরটা তখন স্বপনকে ছেড়ে বিমানকে আক্রমণ করল। ছাড়া পেয়ে স্বপন মাটি হাতড়াতে লাগল। চশমাটা তার আগে চাই।

বিছানাটার ওপরে পেয়ে গেল চশমাটা। ভাগ্যিস বিছানার ওপর পড়েছিল তাই ভাঙেনি। চশমাটা পরে নিয়ে স্বপন ঘুরে তাকিয়ে দেখল, কুকুরটা বিমানের একটা পা কামড়ে

ধরেছে, বিমান যদিও শপাশপ করে তাকে বেল্ট দিয়ে পেটাচ্ছে, তবু সে ছাড়ছে না।

ফুটবল খেলোয়ারের ভঙ্গিতে ছুটে এসে স্বপন কুকুরটার পেটে এক লাথি কষাল দারুণ জোরে। কুকুরটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দেয়ালে। সে বিমানের হাত ধরে বলল, "ছোট্!"

কুকুরটা সঙ্গে-সঙ্গে আবার তাড়া করে এসেছে, পুরো বারান্দাটা ওরা ছুটে পার হবার আগেই কুকুরটা ওদের ধরে ফেলবে! ডান দিকে একটা ছাদে ওঠার সিঁড়ি দেখে ওরা সেটা দিয়েই উঠে পড়ল—কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গে আসছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে বেল্ট পেটা করে আটকাচ্ছে সেটাকে।

ছাদের দরজার কাছে এসে যদি দেখত দরজাটা বন্ধ, তা হলে আর ওদের বাঁচবার কোনো উপায়ই থাকত না। ভাগ্যিস দরজাটা খোলা ছিল। কুকুরটাকে বাইরে রেখে ওরা কোনো রকমে দরজাটা বন্ধ করে দিল ছাদে উঠে। কুকুরটা প্রচণ্ডভাবে ডাকতে লাগল।

৫

ছাদটা বিরাট বড়, ইচ্ছে করলে ফুটবল খেলা যায়।

এর ওপরেও একটা গম্বুজ রয়েছে। দুর্গ-টুর্গতে যে-রকম থাকে। ওরা দুজনে সেই গম্বুজের সিঁড়িতে বসে হাঁপাতে লাগল।

বিমানের পায়ে কুকুরের পায়ের দাগ বসে গেছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। আর-একটু হলে বোধহয় মাংস ছিঁড়ে নিত। বিমানের ব্যথা করছে খুব, কিন্তু মুখে কিছু বলছে না।

স্বপন বলল, "কুকুরটা এমন অদ্ভুত ব্যবহার করল কেন? প্রথমে আমাদের দেখে শান্ত হয়ে ছিল, তারপর হঠাৎ কীরকম রেগে গেল।"

বিমান বলল, "নিশ্চয়ই পাগলা কুকুর! পাগলা কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়! কী হবে তা হলে?"

স্বপন বলল, "ফিরে গিয়ে ইঞ্জেকশান নিয়ে নিলেই হবে।"

"কিন্তু ফিরব কী করে? সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলেই তো কুকুরটা আবার কামড়াবে।"

"একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। তখন তোকে বললাম, তাড়াতাড়ি নেমে যেতে!"

"বিছানায় একটা কুকুরকে শুয়ে থাকতে দেখেও চলে যাওয়া যায়?" তোর মাথার ওপরেও তো ওটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তোকে কামড়েছে?"

"না বোধহয়।"

স্বপন মাথাটা ঝুঁকিয়ে দেখাল। স্বপনের ঘাড়ে কয়েকটা নখের আঁচড়ের দাগ আছে, কিন্তু কুকুরটা ওকে কামড়াতে পারেনি। বিমান এমনিতে খুব সাহসী ছেলে হলেও কুকুরের ব্যাপারে একটু ভয় পায়। এই কুকুরটা পাগলা হলে তো আর রক্ষে নেই। বারোটা ইঞ্জেকশান নিতে হবে বিমানকে। ইঞ্জেকশান নিতে তার একটুও ভাল লাগে না।

এবার ফেরা যাবে কী করে? একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ওরা পুরো ছাদটা ঘুরে দেখল। যদি অন্য কোনো দিক দিয়ে নেমে যাবার উপায় থাকে। না, নেই। সে-রকম কোনো পাইপও নেই, যা বেয়ে নেমে যাওয়া যায়। যেতে হবে ঐ দরজা দিয়েই। সেখানে এখনো কুকুরটা ডাকছে।

বিমান বলল, "চল, এই গম্বুজটায় উঠে দেখি একবার।"

গম্বুজটা গোল, প্রায় দেড়তলার সমান উঁচু। ছোট্ট একটা দরজা রয়েছে, কিন্তু সেটা তালাবন্ধ। তা হলেও দরজাটা একটু ঠেলে ফাঁক করা যায়, ভেতরে দেখা যায় ঘোরানো সিঁড়ি।

বিমান বলল, "এ বাড়িতে আর কোনো ঘর তালাবন্ধ নেই, শুধু এখানে একটা তালা ঝুলছে কেন?"

স্বপন বলল, "বোধহয় অনেক আগে থেকেই তালাবন্ধ ছিল, যখন এ বাড়িতে লোকজন থাকত, তখন কোনো বাচ্চা ছেলে যাতে হঠাৎ একা-একা এটাতে না উঠে পড়ে।"

"তালাটা ভাঙব? ছোট তালা, মরচে ধরে গেছে, ভেঙে ফেলা যায় সহজেই।"

"কিন্তু অন্যের বাড়ির তালা ভাঙা কি উচিত?"

"দ্যাখ্ স্বপন, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে, এ-বাড়িতে কোনো লোক থাকে না।"

"কী করে বোঝা গেল?"

"কুকুরটার ঐ রকম চ্যাঁচামেচি শুনে কেউ-না-কেউ বেরিয়ে আসতই। আর যদি চোর-ডাকাতের আস্তানা হয়ে থাকে, তা হলে তারাও এতক্ষণে ইচ্ছে করলে ধরে ফেলত আমাদের।"

"হয়তো তারা লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের লক্ষ করছে। আমার আর-একটা কথা কী মনে হচ্ছে জানিস বিমান? আমরা ছাদে এসে ভুল করেছি খুব। এখন আর আমাদের পালাবার পথ নেই। মনে কর, এখন যদি কেউ ছাদের দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ করে দেয়, তা হলে আমাদের কী উপায় হবে? এইখানেই দিনের পর দিন না খেয়ে আমাদের শুকিয়ে মরতে হবে।"

আমাদের শুধু-শুধু মেরে কারুর লাভ কী? না, তুই এমনি-এমনি ভয় পাচ্ছিস! লোকজন নেই এখানে।"

"চল্ ছাদের দরজাটা একটু দেখে আসি তবু।"

কুকুরটা তখনও দরজার ওপাশে ঘেউ ঘেউ করছে। বড্ড

একগুঁয়ে কুকুর ওটা, কিছুতেই ও জায়গা থেকে সরবে না মনে হয়।

বিমানরা দরজার এ-পাশ থেকে শিকল দিয়ে দিয়েছে। দরজাটার মাঝখানে একটু ফাঁক আছে। সেখানে চোখ রেখে ওরা বুঝল, ওপাশ থেকে দরজাটায় খিল-টিল কিছু দেওয়া হয়নি। লোকজনেরও কোনো চিহ্ন নেই।

কুকুরটা ওদের গায়ের গন্ধ পেয়ে আরও খেপে গিয়ে দড়াম-দড়াম করে দরজার ওপর লাফিয়ে পড়তে লাগল। ভাগ্যিস কুকুরটার বেশী বড়-সড় চেহারা নয়। তাহলে দরজাটা ভেঙেই পড়ত।

বিমান বলল, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। জন্তু-জানোয়ারদের স্বভাব হচ্ছে, ওদের গা থেকে যদি হঠাৎ রক্ত বেরোয়, অমনি ওরা খুব ভয় পেয়ে যায়। এই কুকুরটার গা থেকে রক্ত বার করা দরকার।"

স্বপন বলল, "কী করে ওর রক্ত বার করবি ?"

"সে-ব্যবস্থা আমি করছি। তুই এক কাজ কর। তুই কুকুর-টাকে আরও বেশী রাগিয়ে দে।"

স্বপন "হুস, হাস্, এই যা ভাগ্। যাঃ"—এই রকম করতে লাগল, তাতে কুকুরটা আরও রেগে গিয়ে আরও জোরে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল দরজায়।

বিমান এক পায়ের জুতো খুলে ফেলল। মোজার নীচ থেকে বেরুলো একটা ব্লেড। পা থেকে মোজাটা খুলে নিয়ে হাতে পরে নিল। তারপর সেই হাতে ব্লেডটা ধরে দরজার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিল ব্লেডটা।

কুকুরটা না-জেনে সেই ব্লেডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই দারুণ আর্তনাদ করে উঠল। তার ঠিক নাকে লেগেছে। কুকুরের নাকই সবচেয়ে নরম জায়গা, সেখানে গেঁথে গেছে ব্লেডটা। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। সেই অবস্থায় কুকুরটা আপ্রাণ চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পিছন ফিরে হুড়মুড় করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

বিমান বলল, "দেখলি কাজ হল কিনা!"

স্বপন বলল, "কিন্তু এতে তো কুকুরটা আরও রেগে গেল। এবার ও কামড়াবেই!"

"আর ও ভয়ে এদিকে আসবে না!"

"আমি কিন্তু এক্ষুনি যেতে চাই না। কুকুরটা যদি সিঁড়ির নীচে বসে থাকে—"

"আর একটু অপেক্ষা করে দেখি তা হলে। আমি জানি, ও আর আসবে না।"

তুই ব্লেডটা সঙ্গে করে এনেছিলি ?"

"আমি যখন কোথাও যাই, জুতোর মধ্যে একটা রেড রাখি। এটা প্রিয়ব্রতদার কাছ থেকে শিখেছি। খুব কাজে লাগে।"

"সত্যি তো কাজে লেগে গেল আজ দেখছি! আমরা এখানে আরও অন্তত আধঘণ্টা অপেক্ষা করব। যদি তার মধ্যে কুকুরটার আর কোনো সাড়া শব্দ না পাই, তখন নামার চেষ্টা করব।"

বিমান আবার জুতো-মোজা পরে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, "চল, ততক্ষণে গম্বুজের ওপরটায় উঠে একবার দেখে আসি।"

"তালাটা ভাঙবি তা হলে ?"

"ঐটুকু একটা তালা ভাঙলে কী আর এমন হবে ?"

গম্বুজের কাছে এসে বিমান তালাটা নেড়েচেড়ে দেখল, টান মারল দুবার। কিন্তু মরচে-ধরা ছোট তালা হলেও সেটা

বেশ শক্ত। ভাঙা যাবে না সহজে।

বিমান বলল, "একটা কোনো লোহার ডান্ডা-ফান্ডা পেলে হত!"

কিন্তু ছাদটায় সেরকম কিচ্ছু নেই। এক টুকরো ইঁটও পড়ে নেই কোথাও।

স্বপন একটুখানি পিছিয়ে গিয়ে তারপর ছুটে এসে লাথি কষাল দরজাটায়। তাতেই কিন্তু কাজ হল। তালাটা ভাঙল না, দরজার একটা কড়া খুলে বেরিয়ে এল।

ভেতরে ঢুকবার আগে বিমান বলল, "সাবধান, দেখিস স্বপন, এর ভেতরে বাদুড় কিংবা চামচিকে থাকতে পারে। এরকম জায়গায় ওদের বাসা থাকে।"

সঙ্গে-সঙ্গে গম্বুজটার ভেতর থেকে কড়্‌ড়্‌র করে একটা শব্দ হল।

চামচিকে বা বাদুড় নয়, তার থেকেও বড় জিনিস। গম্বুজটার ওপর একটা শকুনের বাসা। একটা শকুন লম্বা ঘাড় ঝুঁকিয়ে ওদের দেখছে। বিচ্ছিরি দেখতে শকুনটাকে, ঘাড়ে একটাও লোম নেই। চোখ দুটো লাল লাল।

স্বপন বলল, "কাজ নেই আর ওপরে গিয়ে। অত বড় শকুন যদি ঠুকরে দেয়!"

বিমান বলল, "শকুন কখনো জ্যান্ত মানুষকে ঠোকরায় না। শকুন শুধু মরা জিনিস খায়।"

"না রে, আমি শুনেছি, শকুন বাচ্চা ছেলেদের চোখ ঠুকরে নেয় অনেক সময়।"

"কিন্তু আমরা তো বাচ্চা ছেলে নই। শকুনকে ভয় পাবার কী আছে?"

"যদি আরও অনেক শকুন মিলে তাড়া করে আসে?"

"এত ভয় পাচ্ছিস কেন? শকুন আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না। ওরা আসলে ভিতু পাখি। এর থেকে চিল অনেক হিংস্র।"

"শকুনের বাসা তো তালগাছে হয়। মানুষের বাড়িতে বাসা বাঁধবে কেন?"

"জেনে গেছে যে, এ বাড়িতে মানুষ থাকে না। এর থেকেই আরও বোঝা গেল যে এ-বাড়িতে কোনো মানুষজন এমনকী চোর ডাকাতও থাকে না। পশু-পাখিরা এসব জিনিস ঠিক টের পেয়ে যায়।

বেল্ট ঘুরিয়ে হুস-হুস শব্দ করতেই শকুনটা ডানা ঝট-পটিয়ে উড়ে গেল।

ওরা সাবধানে গোল ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে। শকুনের বাসায় কোনো বাচ্চা নেই। বাচ্চা থাকলে অবশ্য একটু অসুবিধে হত, মা-শকুনী এত সহজে উড়ে যেতে রাজি হতো না!

গম্বুজটার ওপর দাঁড়িয়ে দেখা যায় বহু দূরে পর্যন্ত। চোখ একেবারে ভরে যায়। চতুর্দিকে ছোট-ছোট পাহাড় আর জঙ্গল। অনেক দূরে একটা ছোট্ট নদী। রোদ্দুরে তার জল রুপোর মতন চকচক করছে। একটা রেল-স্টেশনও দেখা যায় এখান থেকে। ঐটাই বোধহয় ঝাঁঝা স্টেশন।

বিমান বলল, "বাড়িটা সত্যিই দুর্গের মতন। এই গম্বুজ-টার ওপর দাঁড়ালে এ-বাড়ির দিকে কখন কোন্ লোক আসছে, তা আগে থেকেই দেখে ফেলা যাবে।"

স্বপন কোনো উত্তর দিল না। সে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। শকুনটা মাথার ওপর গোল হয়ে ঘুরছে। শকুনরা সাধারণত দল বেঁধে থাকে, এখানে কিন্তু এটা একা-শকুন। স্বপন ভাবছে, ওরা একটু অন্যমনস্ক হলেই যদি শকুনটা হুস্ করে নীচে এসে ঠুকরে দেয়! এ-বাড়িতে এসে এর মধ্যেই ইঁদুরের কামড় আর কুকুরের কামড় খেতে হয়েছে, এর পর যদি আবার শকুনের কামড় খেতে হয়, তাহলে আর সহ্য করা যাবে না!

স্বপন বলল, "চল, আমরা এবার নেমে পড়ি।"

বিমান বলল, "আর একটু দাঁড়া। আমার খুব ভাল লাগছে দেখতে। ঐ দ্যাখ ঐ মাঠটার মধ্যে কী রকম ধুলো উড়ছে। ওখানে বোধহয় ঘূর্ণি আছে।"

স্বপন বলল, "ঝড়ও উঠতে পারে। তার আগে নেমে পড়া দরকার!"

গম্বুজের ওপরের গোলমতন জায়গাটা কোমর-সমান লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। এখানটায় খুব হাওয়া, তাই স্বপন রেলিংটা শক্ত করে চেপে ধরে আছে। হঠাৎ তার মনে হল, রেলিংটা একটু যেন নড়ে উঠল।

সে ভাবল, "কী রে বাবা, এই রেলিংটাও ভেঙে পড়বে নাকি? কিন্তু এটা তো কাঠের নয়, লোহার!

তারপর তার মনে হল, পায়ের তলার জায়গাটাও কাঁপছে। পুরো গম্বুজটাই দুলছে একটু-একটু!

স্বপন বড়-বড় চোখ করে বিমানকে জিজ্ঞেস করল, "তুই টের পেয়েছিস?"

"কী?"

"গম্বুজটা একটু একটু দুলছে।"

"দূর পাগল! ইঁট সিমেন্টের গম্বুজ কখনো দুলতে পারে নাকি?"

"তুই দ্যাখ, ভাল করে লক্ষ করে দ্যাখ্!"

"কই, আমি কিছু বুঝতে পারছি না তো!"
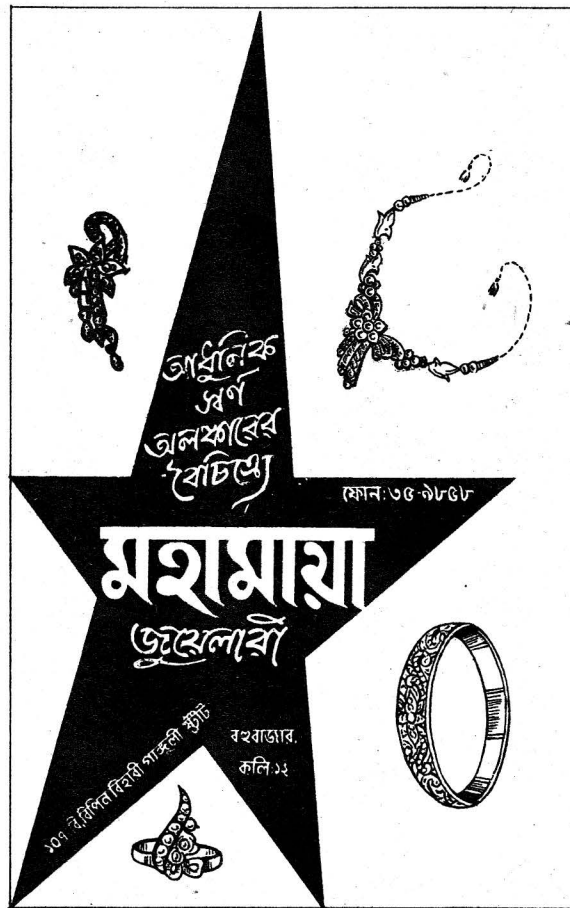
বাড়িটার নীচ তলার দিক থেকে দুম্ করে একটা শব্দ হল; যেন কেউ বিরাট একটা পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। এ-শব্দটা বিমানও শুনতে পেয়েছে, সে কান খাড়া করে রইল।

স্বপন বিমানের হাত খপ্ করে চেপে ধরে বলল, "শিগগির নীচে চল!"

বিমান আর বাধা দেবার সময় পেল না। স্বপন তাকে টানতে টানতে নামিয়ে নিয়ে এল গম্বুজটা থেকে।

সঙ্গে-সঙ্গে গম্বুজটার গা থেকে একটা ইঁট খসে পড়ল মাটিতে। স্বপন বলল, "পুরনো বাড়ি থেকে এ রকম ইঁট-ফিট তো মাঝে-মাঝে ভেঙে পড়েই!"

স্বপন চিৎকার করে বলল, "ইডিয়েট, বুঝতে পারছিস না? ভূমিকম্প হচ্ছে। এক্ষুনি আমাদের ফাঁকা জায়গায় চলে যেতে হবে, না হলে মরব!"

"ভূমিকম্প? যাঃ!"

বিমান ঐ কথা বলা মাত্রই পুরো ছাদটা মোষের পিঠের মতন একবার কেঁপে উঠল। বিমানও এবার স্পষ্ট বুঝতে পেরে বলল, "তাই তো!"

স্বপন বলল, "পুরনো বাড়ি, এক্ষুনি ভেঙে পড়বে!"

কুকুর থাক বা না-থাক, আর চিন্তা করার সময় নেই। ওরা দৌড়ে এসে ছাদের দরজার শিকলটা খুলে ফেলল। তারপর দুপদাপ করে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

কুকুরটা বসে আছে দোতলার বারান্দায়। নাক থেকে ব্লেডটা খসে পড়ে গেছে, কিন্তু তখনো রক্ত ঝরছে।

বিমান আর স্বপন দুজনের হাতেই বেল্ট। একদৃষ্টে চেয়ে আছে কুকুরটার দিকে। লাফিয়ে তেড়ে এলেই ওরা বেল্ট চালাবে।

কিন্তু কুকুরটা এবার আর তেড়ে এল না। সেই এক জায়গাতেই বসে থেকে হাঁ করে মুখটা একটু বেঁকিয়ে খ্যাঁ খ্যাঁ শব্দ করতে লাগল। বোঝাই যায়, কুকুরটা ভয় পেয়েছে এবার।

কুকুরটার পাশ দিয়েই ওদের যেতে হবে একতলার সিঁড়িতে। বেল্ট বাগিয়ে ধরে ওরা পা টিপে-টিপে এগোতে লাগল। কুকুরটা ওদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সেই রকম শব্দ করছে। ওরা এক ছুটে চলে এল সিঁড়ির কাছে। তরতর করে নেমে গেল।

ওরা একতলায় পৌঁছনো মাত্রই এক জায়গার দেয়াল থেকে অনেকখানি ইঁট সুরকির চাপড়া ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। খানিকটা দূরে অবশ্য।

বিমান বলল, "কোন ঘরটা দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকে-ছিলাম?"

পরপর অনেকগুলো ঘরের দরজা খোলা। সব একরকম ঘর। কোন্ ঘরের ভাঙা জানলা দিয়ে ওরা ভেতরে এসেছিল, তা বুঝতে পারছে না। কিন্তু আর দেরি করবার সময় নেই। যে-কোনো সময় মাথার ওপর বাড়িটা ভেঙে পড়তে পারে।

এক-একটা ঘরে ওরা উঁকি মেরেই বেরিয়ে আসতে লাগল। সে-সব ঘরের জানলা বন্ধ। ঘরগুলো অন্ধকার। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

স্বপন বলল, "হাওয়ায় বোধহয় সেই জানলাটা বন্ধ হয়ে গেছে। যে-কোনো একটা ঘরের জানলা ঠেলে দেখা যাক।

একটা জানলা খুলতেই দেখা গেল তাতে লোহার শিক আছে। আবার একটা জানলা। এরকমভাবে একটা জানলায় দেখা গেল, একটা শিক ভাঙা। সেই ফাঁক দিয়েই মাথা গলিয়ে ওরা বাইরে লাফিয়ে পড়ল। তারপর প্রাণপণে ছুটল।

ছুটতে ছুটতে ওরা সেই বাড়ির বাগান পেরিয়ে এসে, পাহাড়ের গা ধরে খানিকটা নেমে এসে তারপর থামল। স্বপন হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল একটা পাথরের ওপর। বিমান জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছল। বুকের ভেতরটা দারুণ ভাবে কাঁপছে। এক্ষুনি একটা-কিছু হয়ে যেতে পারত। সবচেয়ে বেশী ভয় লাগছিল নীচতলাতে এসেও সেই ভাঙা জানলাটা খুঁজে না-পেয়ে।

বিমানও স্বপনের পাশে বসে পড়ে বলল, "এখানকার মাটি তো কাঁপছে না!"

স্বপন বলল, "থেমে গেছে মনে হচ্ছে।"

"বাড়িটা ভেঙে পড়ল না তো।"

"বাড়িটা আমাদের মাথার ওপর ভেঙে পড়লে বুঝি তুই খুশী হতি?"

"না, আমরা বেরিয়ে আসবার পরই সব থেমে গেল মনে হচ্ছে!"

"দাঁড়া আর-একটু জিরিয়ে নিই।"

"তোর পাল্লায় পড়ে আর-একটু হলে প্রাণটা যাচ্ছিল! একটা বিচ্ছিরি, ভুতুড়ে বাড়ি!"

"কোথায়, ভূত দেখলাম না তো!"

"ভূত না-থাকলেও ভুতুড়ে। বাড়িটার মধ্যে সব সময় আমার গাটা শিরশির করছিল। যেই বেরিয়ে এসেছি, তারপর থেকে ভালো লাগছে। চল্!"

পাহাড়ের যে-দিকটায় সিঁড়ি কাটা, ওরা সেদিকে আসেনি। দৌড়ের ঝোঁকে অন্যদিকে চলে এসেছে। কিন্তু এখান থেকেও পাহাড়ের পেছনের জঙ্গলটা দেখা যায়। ওর মধ্য দিয়ে ওদের ফিরতে হবে।

পাহাড়ের গা দিয়ে নামতে-নামতে বিমান বলল, "আমার সবচে আশ্চর্য লেগেছে কোন্‌টা জানিস? একটা ঘরের মধ্যে কতকগুলো জ্যান্ত ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর একটা সাপ সেখানে মরে পড়ে আছে—এটা খুবই অদ্ভুত না?"

স্বপন বলল, "আর মানুষের বিছানায় একটা কুকুরের শুয়ে থাকাটাই বা কম অদ্ভুত কিসের? তাও পাগলা কুকুর!"

কুকুরটা বিমানের পায়ের যে-জায়গাটা কামড়ে দিয়েছিল, সেখানে রক্ত শুকিয়ে জমে আছে। বেশ ব্যথা। আবার তার ভয় করে উঠল। বারোটা ইঞ্জেকশান!

স্বপন বলল, "কুকুরটা যে অন্ধকার ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘেউঘেউ করছিল প্রথমে, সেই ঘরটা কিন্তু আমাদের দেখা হল না। হয়ত সেখানে কিছু আছে। চল্, আবার ফিরে যাবি নাকি? দেখে আসি, যদি সেখানে গুপ্তধন-টুপ্তধন পাওয়া যায়!"

বিমান বলল, "আবার? তুই যেতে চাস?"

"কেন? তোর আপত্তি আছে?"

"তুই-ই তো বেশী ভয় পাচ্ছিলি!"

"এবার ভয় কমে গেছে। আবার যেতে পারি আমি!"

এই সময় দূর থেকে সেই কুকুরটার ডাক শোনা গেল। এখন তার ডাকটা খুব করুণ মনে হয়।

বিমান বলল, "ওরে বাবা, ঐ পাগলা কুকুরের সামনে আমি আর যেতে পারব না!"

স্বপন হাসতে-হাসতে বলল, "তা হলে দ্যাখ্, তুইও ভয় পাস! ফিরে গিয়ে তো সবার কাছে বলবি, আমিই শুধু একলা ভয় পেয়েছিলুম!"

"আমার পায়ে বেশ ব্যথা করছে, এখনো অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। একটু আস্তে আস্তে হাঁট, স্বপন!"

"ফিরতে-ফিরতে তো তাহলে অনেক রাত হয়ে যাবে। যা

খিদে পেয়েছে না! পেটের নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাবে!"

"মনে হচ্ছে কতদিন ভাত খাইনি!"

কথা বলতে-বলতে ওরা পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে এল। ডান দিকেই সেই জঙ্গলটা। বিকেলের আলো হঠাৎ খুব গাঢ় হয়ে উঠেছে, এর পরেই সন্ধে নামবে। হাওয়া বইছে বেশ জোরে, এক্ষুনি ঝড় উঠতে পারে। ঝড়ের আগেই ওদের জঙ্গলটা পার হয়ে যেতে হবে।

এক জায়গায় একটা ছোটমতন ডোবা। এক-হাঁটু সমান জল আছে। ওদের দেখেই কয়েকটা ব্যাঙ ডোবার পার থেকে টুপ্‌টুপ্‌ করে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

স্বপন বলল, "এই বিমান, এই জলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখ তো!"

"কী দেখব?"

"জল দেখে তোর ভয় করছে?"

"কেন, ভয় করবে কেন? এইটুকু জল! তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস না? আমি সাঁতারে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম। আমি জল দেখে ভয় পাব?"

"তাহলে ঐ কুকুরটা পাগলা নয়। পাগলা কুকুরে কামড়ালে এতক্ষণে তোর নিশ্চয়ই জলাতংক হত!"

"এখনো তো চব্বিশ ঘণ্টা কাটেনি!"

তবু, বিমান যে জল দেখে ভয় পাচ্ছে না সেটা প্রমাণ করবার জন্য সে ঐ ডোবার মধ্যে নেমে পড়ল। অনেকখানি দৌড়োবার জন্য ওদের সারা গা ঘেমে গিয়েছিল—ঐ জলে ওরা দু জনেই হাত-পা-মুখ ধুয়ে নিল ভাল করে।

তারপর ওরা জঙ্গলে ঢুকল। এবার জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলার ভয় আছে। কিন্তু উপায় তো নেই, যেতেই হবে একদিকে। এর মধ্যেই জঙ্গলটা আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে।

একটুখানি যাবার পরেই ওরা দেখল, গাছতলায় একটা লোক শুয়ে আছে। সেই লোকটা। পাশে বন্দুক।

লোকটার কথা ওরা ভুলেই গিয়েছিল। দু জনেই চমকে উঠল লোকটাকে দেখে। পা টিপে-টিপে লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বিমান টপ করে বন্দুকটা তুলে নিল ওর পাশ থেকে। প্রিয়ব্রতদার সঙ্গে থেকে-থেকে বিমান বন্দুক-পিস্তল নাড়াচাড়া করতে শিখেছে। এটা একটা গাদা বন্দুক, একবারে একটার বেশী গুলি বেরয় না। এখন বন্দুকটার মধ্যে গুলি ভরা নেই।

বিমান ফিসফাস করে বলল, "এই লোকটাও কী রকম অদ্ভুত। তখন থেকে এই বন্দুক নিয়ে সেই এক জায়গায় রয়েছে। কোথাও যায়নি। আমার মনে হয় এই লোকটা ঐ বাড়িটাকে পাহারা দেয়!"

স্বপন বলল, "বাড়িটাকে পাহারা দিতে যাবে কীজন্যে? বাড়িটাতে তো কিছুই নেই। তা ছাড়া, আমরা যখন গেলাম, তখন তো ও বাধা দেয়নি।"

"কিন্তু এই লোকটাই বন্দুক ছুঁড়ে প্রথম আমাদের ভয় দেখিয়েছিল! আমার মনে হয়, ও অনেক কিছু জানে!"

বিমান লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই, এই!"

লোকটি চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু খুব একটা অবাক হল না। চেয়েই রইল ওদের দিকে।

বিমান বলল, "এই, তুমি এখানে ঘুমোচ্ছ কেন?"

লোকটা চুপ।

"তুমি কি ঐ হলদে বাড়িটায়, ঐ পিলা কোঠিতে থাকো?"

তবু কোনো উত্তর নেই।

"ঐ বাড়িটাতে কী কী আছে? ওখানে কি পরমাত্মারা থাকে?"

লোকটা তবুও উত্তর দিচ্ছে না দেখে বিমানের খুব রাগ হয়ে গেল। লোকটা তাদের যেন গ্রাহ্যই করছে না।

সে বলল, "স্বপন, তুই লোকটার একটা হাত ধর তো! দেখাচ্ছি মজা!"

লোকটার যদিও লোহার মতন বুক, দারুণ স্বাস্থ্য, তবু কিন্তু সে ওদের কোনো বাধা দেবার চেষ্টা করল না। বিমান আর স্বপন দুজনে তার দু হাত ধরে মাটি থেকে টেনে তুলল, তারপর হাত দুটো পেছন দিকে মুচড়ে ধরল।

বিমান বলল, "কথা বলছ না কেন? ইয়ার্কি পেয়েছ?"

লোকটা হঠাৎ মস্ত বড় হাঁ করল। যেন ওদের কামড়ে দেবে!

ওরা দারুণ চমকে গেল লোকটার মুখের ভেতরটা দেখতে পেয়ে। মুখের মধ্যে কোনো জিভ নেই। হয় ওর জিভটা একদম গোড়া থেকে কাটা, অথবা জন্ম থেকেই জিভ ছিল না। এ কথা বলবে কী করে?

ভয় পেয়ে গিয়ে ওরা লোকটাকে ছেড়ে দিল। লোকটার সামনে আর দাঁড়াতেও ওদের গা শিরশির করছে।

বন্দুকটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ওরা ছুটল। ঝড়ও শুরু হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। ওরা ছুটতে ছুটতে, একবারও না থেমে, জঙ্গলটা পার হয়ে গেল। এবার আর রাস্তা চিনতে ভুল হবে না।

হলদে বাড়িটা ওদের কাছে রহস্যময়ই রয়ে গেল। ওরা ওখানে ভূত দেখেনি, কোনো মানুষ দেখেনি, অথচ কী যেন আছে! একটা পুরনো মুখোশ, কিছু ইঁদুর, একটা মরা সাপ আর একটা পাগলা কুকুর। যে-কোনো পুরনো নির্জন বাড়িতেই এসব থাকতে পারে। তবু ওদের মনে হয়েছিল, বাড়িটাই যেন জ্যান্ত, ও বাড়িটাই ওদের বেশীক্ষণ ভেতরে রাখতে চায় না।

আরও একটা কথা। বিমান আর স্বপন পরে অনেককে জিজ্ঞেস করে জেনেছে যে, সেদিন বিকেল সাড়ে চারটের সময় আর কেউ কোথাও ভূমিকম্প টের পায়নি। খবরের কাগজেও কোনো ভূমিকম্পের কথা নেই। ওরাই শুধু ঐ বাড়িটার মধ্যে ভূমিকম্প দেখেছে। সেটাও একটা রহস্য। বাড়িটা ওদের সত্যিই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল?

ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

বুদ্ধমূর্তি

অরবিন্দ গুহ
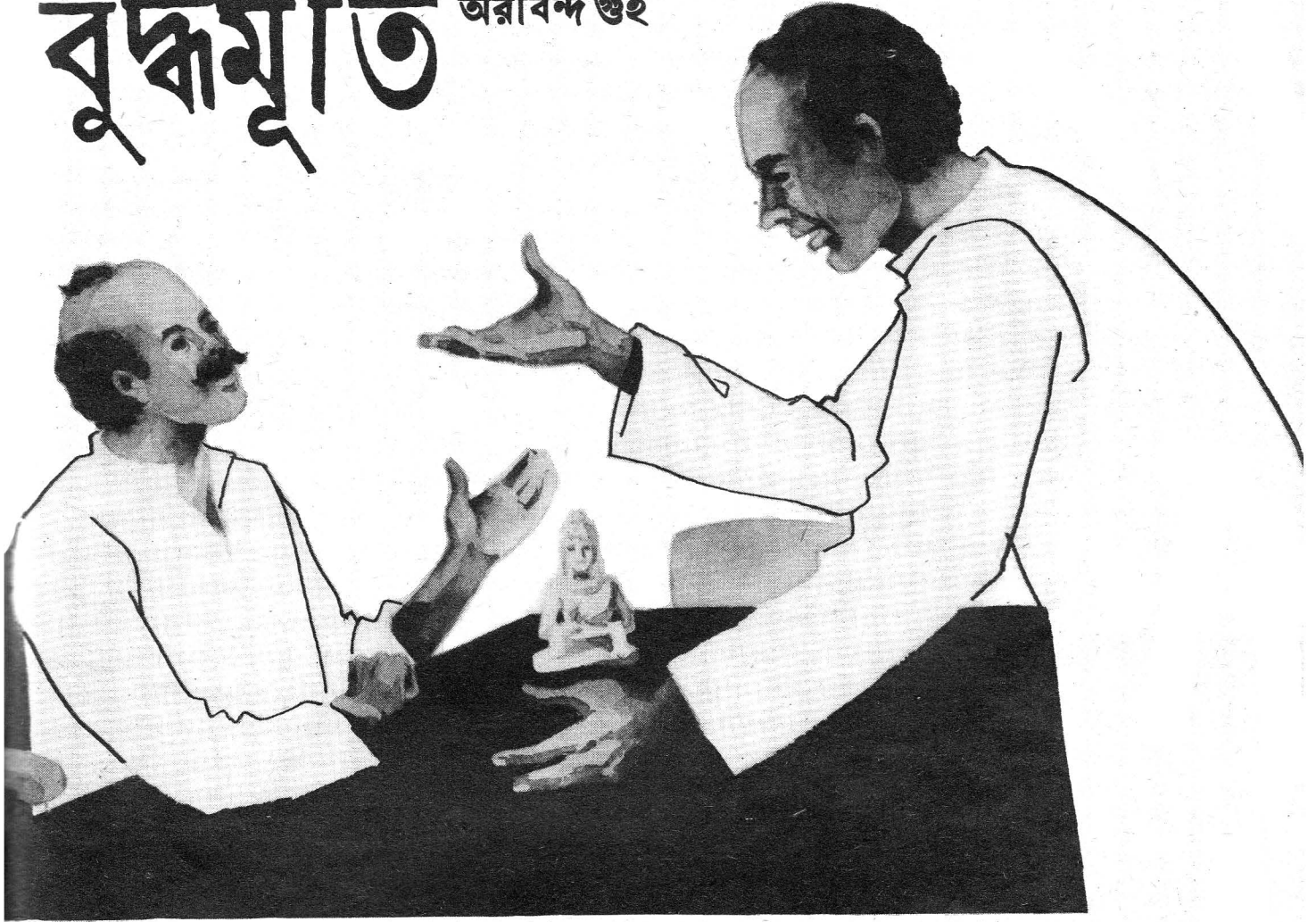
পাঁচজন ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করে এনে দেখানোর মতো জিনিস—একটি নেপালী বুদ্ধমূর্তি। কলকাতার শৌখিন দোকান থেকে কেনা নয়, এই বুদ্ধমূর্তিটি আনন্দবাবু জলজ্যান্ত নেপাল থেকে কিনে এনেছেন। ছোট্ট ধবধবে বুদ্ধমূর্তি, বড়ো মাপের হাতের মুঠোয় ধরে যায়। কিন্তু জিনিস একখানা, একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। এমন সুন্দর ছোট্ট বুদ্ধমূর্তি কেউ কখনো কলকাতায় চোখে দেখেছে?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। টেবিলের দুদিকে সাত-আটজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক খেতে বসেছেন। টেবিলের মধ্যিখানে বুদ্ধমূর্তিটি চমৎকার বসে আছে। আনন্দবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে-খেতে সাত-আটজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক বুদ্ধমূর্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

ইতিহাসের অধ্যাপক অবিনাশবাবু বললেন, "জীবনে বিস্তর বুদ্ধমূর্তি দেখেছি। কিন্তু এমন চমৎকার বুদ্ধমূর্তি আগে কখনো দেখিনি, পরেও কখনো দেখবার ভরসা করি না। জীবন আমার সার্থক হয়ে গেল। ভজহরি, আরেকটা চিংড়ির কাটলেট দিয়ে যাও। এমন চমৎকার জিনিস কেমন করে জোগাড় করলেন মশাই?"

আনন্দবাবু বিগলিত হয়ে বললেন, "চিংড়ি আমি কখনো বাঙালীর কাছে কিনি না। আমার চেনা একজন চিংড়িঅলা চীনেম্যান আছে। চিংড়ির ব্যাপারে ওই চীনেম্যান একজন জহুরী।"

চিংড়ির কাটলেটে কামড় দিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, "আমি চিংড়ির কথা বলিনি। জুলজি কি আমার সাবজেক্ট? আমি বুদ্ধমূর্তির কথা জানতে চেয়েছি।"

আনন্দবাবু হেঁ-হেঁ করে বললেন, "ভুল হয়ে গেছে স্যার, মাপ করে দিন। কপালের জোরে এই বুদ্ধমূর্তি পেয়ে গেলাম। আমার মতো গোমুখ্যুর তো এই অমূল্য জিনিস পাওয়ার কথা নয়।"

সাত-আটজন ভদ্রলোক পলকের জন্য খাওয়া থামিয়ে তুমুল আপত্তি করে উঠলেন, "আপনার তিন লাখ টাকা দামের বাড়ি, বিরাশি হাজার টাকা দামের গাড়ি, অন্য জিনিসপত্রের কথা নাই বা তুললাম, এবেলা-ওবেলা প্লেনে চড়ে সমস্ত দুনিয়া ঘুরে বেড়ান, আপনার মাথাজোড়া টাকা, পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে কোন্ সাহসে আপনি নিজেকে গোমুখ্যু বললেন?"

পাঁচজন ভদ্রলোকের আপত্তিতে আনন্দবাবু নিতান্ত বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন যে, তিনি গোমুখ্যু নন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।

সকলের অনুরোধে তারপর আনন্দবাবু নেপালী বুদ্ধমূর্তিটি সংগ্রহের ইতিহাস খুলে বললেন। খুব রোমাঞ্চকর ইতিহাস। মস্ত মোটা বই লেখা যায়। কিন্তু মোটা বই দিয়ে আর দরকার নেই, আপাতত মোটামুটি এটুকু জেনে রাখলেই যথেষ্ট যে, দারুণ একটা বর্ষার রাত্রে নেপালের এক সরাইখানায়

একজন বুড়ো সওদাগরের কাছ থেকে আনন্দবাবু এই বুদ্ধ-মূর্তিটি কিনেছেন। বুড়ো সওদাগর কিছুতেই বেচবে না, আনন্দবাবুও নাছোড়বান্দা, শেষ পর্যন্ত অবশ্যি আনন্দ-বাবুরই জয় হল। তিন হাজার টাকা দিয়ে আনন্দবাবু বুদ্ধ-মূর্তিটি কিনে ফেলেছেন।

"তিন হাজার টাকা?" দুচোখ কপালে তুলে অবিনাশবাবু বললেন, "জলের দরে পেয়েছেন মশাই। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বুদ্ধমূর্তিটি বহুযুগ আগে তিলৌরাকোটের কোনো পাকা কারিগর বানিয়েছে।"

হালদারসাহেব বসেছেন অবিনাশবাবুর উল্টোদিকে। তিনি বললেন, "আমি কখনো তিলৌরাকোটের নাম শুনিনি"

"আপনারা কেউ তিলৌরাকোটের নাম শুনেছেন?"

অবিনাশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সকলেই ঘাড় নেড়ে জানালেন, না।

অবিনাশবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "বুদ্ধদেবের নাম শুনলেই কপিলবস্তুর নাম মনে আসে। কিন্তু কপিলবস্তু জায়গাটা কোথায় ছিল? কোথায় ছিল শাক্য রাজধানী কপিলবস্তু? পাঁচজনে অবশ্যি পাঁচ কথা বলবেন, কিন্তু কারো কথায় কান দেবেন না, আমার কাছে পাকা খবর শুনে রাখুন, কপিলবস্তু ছিল নেপালের তিলৌরাকোটে।"

সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যাক, তিলৌরাকোট বিষয়ে পাকা খবর পাওয়া গেল।

অবিনাশবাবু তারপর বুদ্ধদেব নিয়ে পড়লেন, "বুদ্ধদেব, বয়সে, আমার যতদূর মনে পড়ছে, যীশুখৃীস্টের চেয়ে অন্তত সাড়ে পাঁচ শো বছরের বড়। বেঁচে থাকলে আজ বুদ্ধদেবের বয়স হত আড়াই হাজার বছরেরও বেশী। আজ যদি বুদ্ধদেব বেঁচে থাকতেন এবং কলকাতায় আসতেন তো তাঁকে দেখার জন্য এমন ভিড় হত যে, ঠ্যালা সামলাতে পুলিশ হিমসিম খেয়ে যেত।"

পুডিং খেতে খেতে বিষ্ণুপদ গোস্বামী বললেন, "তা তো হতই, অমন মহাপুরুষকে দেখার জন্য ভিড় হবেই।"

"আরেকটা কারণেও ভিড় হত," নিরঞ্জন রায় উদাস গলায় বললেন, "আড়াই হাজারেরও বেশী বছর বয়সের জ্যান্ত মানুষ তো সচরাচর দেখা যায় না।"

সচরাচর কলকাতায় যা দেখা যায়, তারপর তাই হল। ঝপ করে অন্ধকার। লোডশেডিং।

আনন্দবাবু চিৎকার করে বললেন, "ভজহরি, তাড়াতাড়ি মোমবাতি নিয়ে এসো।"

অবিনাশবাবুর গলা শোনা গেল, "ধীরে সুস্থে আনলেও চলবে। খাওয়া-দাওয়া তো হয়ে গেছে। অন্ধকার মন্দ কী।"

অন্ধকার ঘরে ভজহরি কখন এসেছে কে জানে। ভজহরি নিরীহ গলায় বলল, "বাবু, বাড়িতে মোমবাতি নেই। আমি যাই, দোকান থেকে নিয়ে আসি।"

"যাও। তাড়াতাড়ি এসো।"

ভজহরি চলে গেল।

বিষ্ণুপদ গোস্বামী বললেন, "আনন্দবাবু, আমি এবার উঠি, অনেকদূর যেতে হবে।"

বিষ্ণুপদ গোস্বামী বিদায় নিলেন।

ভজহরির দেখা নেই। ও কি তাজা মৌচাক থেকে মোম-আনবার জন্য সটান সুন্দরবন চলে গেল?

খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর অন্ধকারে কে আর মোমবাতির জন্য পরের বাড়িতে বসে থাকে। একে-একে সকলেই বিদায় নিয়ে গেলেন। একা ঘরে বসে আনন্দবাবু অন্ধকারে মশা মারতে লাগলেন।

ঘণ্টাখানেক বাদে ভজহরি মোমবাতি নিয়ে এল।

"এত দেরি হল কেন ভজহরি?"

"আজ্ঞে, পাড়ার কোনও দোকানে মোমবাতি নেই। একটা মোমবাতির জন্য বিস্তর ঘোরাঘুরি করতে হল।"

কিন্তু মোমবাতি আর জ্বালতে হল না। ফট করে আলো জ্বলে উঠল। ঘরভর্তি আলোর মধ্যে আনন্দবাবু চোখে অন্ধকার দেখলেন। বুদ্ধমূর্তি নেই।

আনন্দবাবু বললেন, "ভজহরি, দরজা বন্ধ করে দাও। ঘুমিও না। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। জরুরী দরকার।"

একটানে নিরঞ্জন রায়ের বাড়িতে এসে হাজির হলেন আনন্দবাবু। নিরঞ্জন রায় বাঘা উকিল, পাকা পরামর্শ দিতে ওস্তাদ। আনন্দবাবু হাউ-হাউ করে বললেন, "নিরঞ্জনবাবু, সর্বনাশ, আমার বুদ্ধমূর্তি উধাও হয়ে গেছে।"

ঘণ্টা দেড়েক আগে আনন্দবাবুর বাড়িতে নিরঞ্জনবাবুও নেমন্তন্ন খেয়েছেন, বুদ্ধমূর্তি দেখে তারিফ করেছেন। চোখের পলকে সেই বুদ্ধমূর্তি উধাও হয়ে গেল? চোখ বন্ধ করে নিরঞ্জনবাবু খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "ভজহরি উধাও হয়ে যায়নি তো?"

"ভজহরি উধাও হবে কেন? সে আমার বহুকালের বিশ্বাসী লোক। তার পক্ষে উধাও হওয়া অসম্ভব।"

নিরঞ্জনবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "ব-হু-কা-লে-র বি-শ্বা-সী লো-ক। জীবনে বহু বিশ্বাসী লোকের অবিশ্বাস্য কীর্তি আদালতে প্রমাণ হতে দেখেছি। তা ভজহরিকে আপনার সন্দেহ হয় না?"

নিরঞ্জনবাবু চোখ বুজে আবার কী যেন ভাবলেন। ভেবে-চিন্তে বললেন, "হুঁ, আমার যেন মনে হচ্ছে ভজহরিকে আমি অন্ধকারে বুদ্ধমূর্তি সরাতে দেখেছি। হুঁ-হুঁ, সেইরকমই তো মনে হচ্ছে। বারবার আমার যে একই কথা মনে হচ্ছে মশাই।"

আনন্দবাবুর মুখে আর কথা নেই।

"আচ্ছা আনন্দবাবু, মোমবাতি নিয়ে ভজহরি কতক্ষণ বাদে ফিরেছে?"

আনন্দবাবু নরম হয়ে বললেন, "পাড়ার কোনও দোকানে মোমবাতি পাওয়া যায়নি বলে ভজহরি বিস্তর ঘোরাঘুরি করে একটা মোমবাতি নিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরেছে।"

"ইস্‌স্‌!" নিরঞ্জনবাবু টেবিলে ঘুষি মেরে বললেন, "ওই সময়ে মাল নির্ঘাত পাচার করে দিয়েছে। মাল গেছে, যাক, চোরকে আমি পালাতে দেব না। চোরের শাস্তি না হলে সাধুর সর্বনাশ। আপনি আর দেরি করবেন না. আজই থানায় একটা ডায়েরি করে রাখুন, কালই আদালতে মামলা ঠুকে দেব।"

আনন্দবাবু কিন্তু-কিন্তু হয়ে বললেন, "সাক্ষী লাগবে না?"

নিরঞ্জনবাবু হা-হা করে হাসলেন। বললেন, "আনন্দবাবু, কেবল আসামী আর জজসাহেবে মামলা হয় না, উকিলও চাই, সাক্ষীও চাই। যাক, আমি যখন আছি, ওসব নিয়ে আপনাকে কোনও চিন্তা করতে হবে না. আপনি শুধু খরচ জুগিয়ে যাবেন. সাক্ষীটাক্ষীকে আমিই শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব. কিন্তু সাবধান, ভজহরি যেন কিছু টের না পায়, ওকে কিছু বলবেন না।"

জজসাহেবের নাম নিশিকান্ত হালদার। খুব কড়া জজ-সাহেব। বিচারে একচুল এদিক-ওদিক করেন না। তাঁর কাছে সাক্ষ্যপ্রমাণ আর আইনকানুন ছাড়া আর সব কিছু নস্যাৎ।

আসামীর কাঠগড়ায়, বলা বাহুল্য, ভজহরি।

বিষ্ণুপদ গোস্বামী গড়গড় করে সাক্ষ্য দিলেন যে. তিনি সামনা-সামনি ভজহরিকে স্পষ্ট আলোয় বুদ্ধমূর্তি নিয়ে যেতে দেখেছেন। অবিনাশবাবু হুবহু একইরকম সাক্ষ্য দিলেন।

সামনা-সামনি? হুঁ, উকিলবাবু আগেই শিখিয়ে দিয়েছেন যে,আসামীকে সামনা-সামনি না-দেখে থাকলে সাক্ষ্য কাটা হয়ে যাবে।

স্পষ্ট আলোয়? হ্যাঁ, উকিলবাবু আগেই শিখিয়ে দিয়েছেন যে,আসামীকে অন্ধকারে দেখলে মামলা টিকবে না।

বাপ্‌, মামলায় জিততে হলে আইনের বিস্তর ঘোর-প্যাঁচ জানতে হয়।

খেলা দেখালেন বটে নিরঞ্জন রায়। পাকা উকিল বলে অযথা নাম হয়নি। এমন চমৎকার সওয়াল-জবাব করলেন যে, ভজহরি ছাড়া আর সকলেই নিঃসন্দেহ হলেন যে, ভজহরিই বুদ্ধমূর্তি সরিয়েছে।

বিচারে ভজহরির তিন মাস জেল হয়ে গেল।

পরদিন বিকেলের দিকে হালদারসাহেবের খাশকামরায় যেতে হল নিরঞ্জনবাবুকে। হালদারসাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন।

হালদারসাহেব বললেন, "নিরঞ্জনবাবু, বিস্তর সওয়াল-জবাব শুনেছি, কিন্তু বুদ্ধমূর্তির মামলায় আপনার সওয়াল-জবাব চিরকাল আমার মনে গাঁথা থাকবে। ওয়াণ্ডারফুল, মার-ভেলাস, নিখুঁত। একটা শোনবার মতো জিনিস।"

নিরঞ্জনবাবু হেঁ-হেঁ করে হাত কচলাতে লাগলেন।

হালদারসাহেব বললেন, "সাক্ষ্যপ্রমাণ এমন মজবুত, আইনকানুনের নজির আপনি এমন সুন্দর তুলে ধরেছেন যে, ভজহরিকে জেলে না-পাঠিয়ে আমার আর উপায় রইল না। কিন্তু..."

আবার কিন্তু কেন। নিরঞ্জনবাবু ঢোক গিলে চুপচাপ বসে রইলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হালদারসাহেব বললেন, "কিন্তু আমি জানি, ভজহরি বুদ্ধিমূর্তি চুরি করেনি।"

নিরঞ্জনবাবু অবাক হয়ে বললেন, "অ্যাঁ!"

হালদারসাহেব ঘাড় নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ। আমি জানি। অমন সুন্দর জিনিস দেখে লোভ সামলানো খুব কঠিন। কিন্তু, গ্যারাণ্টি দিয়ে বলছি, ভজহরি চুরি করেনি।"

নিরঞ্জনবাবু থতমত খেয়ে বললেন, "তবে কে চুরি করেছে?"

"আপনার হয়তো মনে পড়বে ওই সন্ধ্যায় আনন্দবাবুর বাড়িতে আমারও নেমন্তন্ন ছিল, চমৎকার খাওয়া-দাওয়া, অসামান্য বুদ্ধমূর্তি, লোডশেডিং, অন্ধকার।" হালদারসাহেব বুদ্ধমূর্তিটি পকেট থেকে বের করে টেবিলের উপর রাখলেন, "লোভ সামলাতে পারিনি, পকেটস্থ করেছি।"

ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

ঝুমুর

শেখর বসু

সব্বাই বলে, হাসপাতালে গেলে সব্বাই রোগা আর কালো হয়ে যায়। কিন্তু কই, মা তো রোগাও হয়নি, কালোও হয়নি। বরং মাকে কেমন যেন নতুন-নতুন লাগছে। হাসপাতালের সাদা বিছানায় মা বসে আছে পিঠে বালিশ দিয়ে। পায়ের শব্দে মা তাকিয়ে দেখে, অমু। আর অমু দেখে, মায়ের মুখে হাসি। হাসি দেখেই ওর ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু না, পেছনে আছে মাসী, পিসী আর ছোটকাকু। মায়ের আদর খেতে দেখলে সবাই হেসে উঠবে। তা ছাড়া অমু তো এখন বড়, বড় না?

মায়ের বিছানার তিনদিকে চেয়ার পেতে বসল সবাই। রাঙা পিসী চেয়ার থেকে একটু সরে গিয়ে অমুকে বলল, "তুই এখানে বোস্।" অমু নিজেকে বড়দের মতো ভাবছিল, তাই গম্ভীর হয়ে বলল, "না-না, তুমি বোসো।" মনে মনে বলল, "আহা, বড়রা বুঝি ওইটুকু জায়গায় বসতে পারে!"

ঘরটা কী বিরাট! অমু গুনে দেখল, ঘরে সবশুদ্ধ কুড়িটা খাট পাতা। সব খাটেই কেউ না কেউ শুয়ে কিংবা বসে। প্রায় সবার কাছেই বাড়ির লোক। সবাই গল্প করছে, তবে খুব নিচু গলায়। এখানে কি জোরে কথা বলা বারণ? হতে পারে, তবে জোরে হাঁটায় বোধ হয় নিষেধ নেই। সিস্টাররা সাঁ সাঁ করে হাঁটছে। অমু হাসপাতালে আসার আগেও সিস্টার দেখেছে। অন্তুর দিদি সন্ধ্যাদিই তো সিস্টার। ঠিক এইরকম জামাকাপড় আর টুপি পরে। কী ভাল্ লাগে দেখতে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কবিতাটা পড়ে অমুরও সিস্টার হবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কী করে হবে, ছেলেরা তো আর সিস্টার হতে পারে না!

হঠাৎ সামনের ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল এক সিস্টার, হাতে ইনজেকশন দেবার সিরিঞ্জ। ইনজেকশন দেবার আগে পিচকিরির মতো একটুখানি জল ছিটিয়ে দেওয়া দেখতে অমুর খুব ভাল লাগে, কিন্তু সূঁচ ফোটানোটা বিচ্ছিরি। পনেরো নম্বর বেডের বউটির হাতে সূঁচ ঠেকাতে না ঠেকাতেই তিনি "উঃ লাগছে, লাগছে, ভীষণ লাগছে" বলে চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকার শুনে সবাই তাকাল ওঁর দিকে। আর ঠিক তক্ষুনি কে-যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। অমু তাকিয়ে দেখল মায়ের ঠিক পাশের বেডের ছোট্ট মেয়েটা। খিলখিল করে হাসছে, আর হাসির ফাঁকে ফাঁকে ওই বউটার গলা নকল করে বলছে "উঃ লাগছে, লাগছে, ভীষণ লাগছে।" কেউ কষ্ট পেলে অমুর খুব কষ্ট হয়। আর কেউ যদি কারও কষ্ট পাওয়া নিয়ে মজা করে, তাহলে তার ওপর অমুর রাগ হয়ে যায় ভীষণ। এখন যেমন এই মেয়েটার ওপর ও চটে গেল। মেয়েটার হাসি আর থামে না, হাসছে তো হাসছেই।

মা চাপা গলায় মেয়েটাকে ধমক দিয়ে বলল, "এই ঝুমুর, কী, হচ্ছে কী! চুপ কর, চুপ কর বলছি। চুপ করবে না? আমি তাহলে আর তোমার মা হব না।" শেষের কথাটা বলতেই মেয়েটা হাসি থামিয়ে একদম চুপ করে গেল।

মা পিঠের বালিশটা একটু উঁচু করে কোলের ওপর দুহাত রেখে বসল। তারপর বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুলে ডান-হাতের পাঁচ আঙুল ঢুকিয়ে নিচু গলায় বলল, "উফ্! এই মেয়েটাকে নিয়ে

আর পারা যায় না।" মায়ের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে গেলে আর গলার স্বর নিচু হলেই অমু বুঝতে পারে, এক্ষুনি একটা গল্প শুরু হবে। ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে রাঙা পিসীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

মা বলল, "সত্যি, মেয়েটার জন্যে ভীষণ কষ্ট হয়। জন্মের পর থেকে মেয়েটা হাসপাতালেই আছে। কী যে অসুখ, ভগবান জানে! না পারে উঠতে, না পারে বসতে, এমন কী নিজে-নিজে পাশ ফিরতেও পারে না। শুয়ে-শুয়েই মেয়েটা এত বড় হয়ে উঠেছে। পাঁচ-ছ বছর বয়েস পর্যন্ত কথাও বলতে পারত না। অথচ মেয়েটা শুনেছি রাজার ঘরে জন্মেছে। বাবা বিরাট বড়-লোক, এখন অবিশ্যি বিদেশে থাকে। মা নেই। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের তো মাঝেমধ্যে ওকে দেখে যাওয়া উচিত! কেউ আসে না ওর কাছে, অথচ আর সবার কাছে কত লোক আসে রোজ। ওর বাবা হাসপাতালে অনেক টাকা দিয়ে রেখেছে, তাতেই নাকি ওর সারাজীবন চলে যাবে।

"সিস্টাররাই ওর নাম রেখেছে ঝুমুর, ওরাই ওকে কথা বলতে শিখিয়েছে। মেয়েটার সব ভাল, হাসিখুশি, সবার সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলে, কিন্তু ওই এক দোষ—কেউ কষ্ট পেলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে আর মজা করে। সবাই তো আর সহ্য করতে পারে না, অনেকেই ওর নামে ডাক্তারবাবুদের কাছে নালিশ করেছে। ডাক্তারবাবুরা তাই ঠিক করেছেন ওকে এবার একটা আলাদা ঘরে সরিয়ে দেবেন। আলাদা মানে একেবারে আলাদা। সে-ঘরে ও ছাড়া আর কেউ থাকবে না। সে কথা শুনে ওর কী কান্না! বলে, একা থাকলে আমি কার সঙ্গে কথা বলব, আর কথা বলতে না পারলে আমার কষ্ট হবে, আর কষ্ট হলেই আমি মরে যাব। ওইটুকু বাচ্চা, এইসব কথা বললে কার না মন খারাপ হয়ে যায়! আমি ওকে কত বুঝিয়েছি, তুমি আর দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী হয়ে থাক, তাহলে কেউ আর তোমাকে এ-ঘর থেকে নিয়ে যাবে না। সব শোনে, বোঝে, কিন্তু কাউকে কষ্ট পেতে দেখলেই ওর হাসি শুরু হয়ে যায়। আজ তিনদিন ধরে আমাকে আবার মা বলতে শুরু করেছে।"

মার কথা শেষ হতেই সবাই একবার আড়চোখে ঝুমুরকে দেখে নিল। ঝুমুর শুকনো মুখ করে জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু আগেই এই মেয়েটার ওপর অমুর খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন আর একটুও রাগ নেই।

মা বলল, "এই অমু, ওকে দুটো কমলালেবু দিয়ে এস তো।" মায়ের বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলটার ওপরে একগাদা ফল, ছোটকাকু আর মাসীমণি নিয়ে এসেছে। মা তার থেকে দুটো লেবু তুলে নিয়ে অমুর হাতে দিল।

অমু জানে ওর নাম ঝুমুর, কিন্তু নাম ধরে ডাকতে কেমন যেন লজ্জা করছিল, তাই ওর খাটটা ঘুরে ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুমুর জানলার দিকে মুখ করে শুয়ে ছিল, হঠাৎ পাশে অমুকে দেখে অবাক হয়ে গেল। অমু বলল, "নাও. মা দিয়েছে।" কমলালেবু হাতে নিয়ে ফিক করে হাসল ঝুমুর, তারপরে বলল, "তোমার নাম কী?"

"আমার? অমু—অমৃত মিত্র।"

"কী?"

"অমৃত।"

"এমা! কী বিচ্ছিরি নাম।"

শুনে অমু গম্ভীর হয়ে গেল। আর অমুকে গম্ভীর হতে দেখেই ঝুমুর খিল-খিল করে হেসে বলল, "তোমার নামটা বিচ্ছিরি হলে কী হবে, তুমি খুব ভাল ছেলে। আচ্ছা, তুমি চিড়িয়াখানায় গেছ, সাদা বাঘ দেখেছ? আচ্ছা, সাদা বাঘ কি সত্যি-সত্যি সাদা?"

নামটা বিচ্ছিরি বলার জন্যে অমু ঝুমুরের ওপর একটু চটে গেলেও শেষপর্যন্ত ওর সঙ্গে অমুর খুব ভাব হয়ে গেল। ঝুমুর একটানা গল্প করতে পারে. এক কথা শেষ হতে-না-হতেই আর-এক কথায় চলে যায়। প্রথমে অমু ভেবেছিল, দু-একটা কথা বলেই চলে আসবে। কিন্তু ঝুমুর কথা বলতে শুরু করে আর থামছিলই না, আর কেউ কথা না-থামালে তো উঠে আসা যায় না! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলতে-বলতে অমু পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল, তারপরেই ওদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

এমন সময় টুং টুং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘণ্টা বাজলে বাইরের লোকদের চলে যেতে হয়। অমু উঠে দাঁড়াতেই ঝুমুর বলল, "এরপর যেদিন আসবে সেদিন তোমাকে একটা মজার গল্প বলব।"

অমু দুষ্টুমি করে বলল, "কী করে বলবে?"

"কী করে আবার, যেভাবে সবাই গল্প বলে।"

"বারে, তুমি তো আমাকে দেখতেই পাবে না।"

"কেন পাব না?"

"তোমাকে তো ডাক্তারবাবুরা অন্য ঘরে সরিয়ে দেবে।"

বলতেই ঝুমুরের মুখ শুকিয়ে এইটুকু হয়ে গেল। ও মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে।

আবার টুং টুং করে ঘণ্টা বেজে উঠল, এবার বেশ জোরে। ছোটকাকুরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। মাসীমণি ডাকল, "অমু এসো।" ঝুমুরকে আর কিছু বলা গেল না, ওরা সবাই বেরিয়ে এল হাসপাতাল থেকে।

রাস্তায় পা দিতেই অমুর ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। ঝুমুরকে ওসব না-বললেই হত, ও হয়ত এখন কাঁদছে। মায়ের কাছে শোনা ঝুমুরের সব কথা ওর মনে পড়তে লাগল। ঝুমুরের এমনিতেই কত কষ্ট, ও শুধু-শুধু ওর কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিয়ে এল। বাড়ি ফিরে এসে ঝুমুরের কথা ওর আরও বেশি করে মনে পড়তে লাগল।

অমু একবার বাবার সঙ্গে প্লেনে চড়ে দিল্লিতে গিয়েছিল। তখন ও ঠিক করেছিল যে, বড় হয়ে পাইলট হবে। তারপর মায়ের যখন অসুখ করল, তখন ও ঠিক করল, ডাক্তার হবে। ডাক্তার হয়ে সব্বার অসুখ সারিয়ে দেবে। কিন্তু ডাক্তাররা তো সবরকম অসুখ সারাতে পারে না, যদি পারত তাহলে ঝুমুরকে কবে ভাল করে দিত।

ঝুমুরকে ভাল করে দেবার জন্যে ওর একটা-কিছু হতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কী হবে? অমু বইয়ে পড়েছে, বিজ্ঞানীরা কত কিছু আবিষ্কার করে। আবিষ্কার করে লোকের ভাল করে। অমু ঠিক করল, বড় হয়ে ও বিজ্ঞানী হবে, হয়ে এমন কিছু একটা বার করবে, যাতে ঝুমুরের অসুখ একেবারে সেরে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী হতে গেলে তো অনেক দেরি, তদ্দিন ঝুমুর একা-একা একটা ঘরে থাকবে কী করে! একা-একা থাকার নামেই ঝুমুরের মুখ শুকিয়ে এইটুকু হয়ে গেছে, সত্যি-সত্যি থাকতে হলে তো বেচারার খুব কষ্ট হবে।

আচ্ছা, অমু যদি বড় ডাক্তারবাবুকে বলে, ঝুমুর আর দুষ্টুমি করবে না, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, তাহলে? কিন্তু বড় ডাক্তারবাবু যদি ওর কথা না শোনে! তাছাড়া তিনি যদি খুব রাগী-রাগী হন, গলার স্বর যদি গম্ভীর হয়, তাহলে তো এত কথা ও গুছিয়েই বলতে পারবে না। তার চাইতে চিঠি লেখাই ভাল। বড় ডাক্তারবাবুর ঘরের দরজায় একটা চিঠির বাক্স আছে, সেখানে ফেলে দেবে। অমু ছাতের ঘরে বসে লুকিয়ে-লুকিয়ে একটা চিঠি লিখল।

পূজনীয় বড় ডাক্তারবাবু,

আমার নাম শ্রীঅমৃত মিত্র। আমার মা আপনাদের

হাসপাতালে আছেন। মার বেড নম্বর দশ। এগারো নম্বরে থাকে ঝুমুর। ঝুমুর আর দুষ্টুমি করবে না। কেউ কষ্ট পেলে ও আর হাসবে না। মজা করবে না। খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকবে। ওকে আপনি অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেবেন না। একা-একা থাকতে ওর ভীষণ কষ্ট হবে। ও কাঁদবে, শুধু কাঁদবে। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি—অমৃত

চিঠিটা অমু ওর বইয়ের ব্যাগে যত্ন করে রেখে দিল।

হাসপাতালে ছোটদের রোজ-রোজ যাবার নিয়ম নেই। ছোটরা যেতে পারে শুধু রোববার আর বুধবার। কাল সোম, পরশু মঙ্গল—এই দুদিন অমুর আর কাটতেই চাইছিল না। শেষকালে বুধবার এল। দুপুরে এল মাসীরা, পিসীরা আর অনুদি। বিকেল হতে না হতেই সবাই হাসপাতালে যাবে বলে বেরিয়ে পড়ল। অনুদির সঙ্গে অমুর খুব ভাব। অমু আস্তে-আস্তে বলল, "অনুদি, তুমি আমাকে একটা ক্যাডবেরি কিনে দেবে?" অনুদি ওকে একটা ক্যাডবেরি কিনে দিল। অমু সেটা রেখে দিল ডানদিকের প্যাণ্টের পকেটে, বাঁ দিকের পকেটে আছে বড় ডাক্তারবাবুকে লেখা চিঠিটা।

মিনিবাসে চড়ে ওরা হাসপাতালে পৌঁছে গেল খুব তাড়াতাড়ি। মার কাছে যাবার পথে বড় ডাক্তারবাবুর ঘরটা পড়ে। ঘরের দরজার একটা পাল্লা খোলা। অমু দেখল, ডাক্তারবাবু চেয়ারে বসে কী যেন লিখছেন, আর টেবিলের সামনে তিনজন বসে আছে চুপ করে। লিখতে-লিখতে হঠাৎ উনি একবার বাইরের দিকে তাকালেন. তাকাতেই অমুর বুকটা ঢিব্‌ঢিব্ করে উঠল। ওর মনে হল, পকেটের চিঠিটার কথা উনি বোধহয় টের পেয়ে গেছেন। অমু তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গেল।

হাসপাতালের বারান্দাটা কী লম্বা! এত লম্বা বারান্দা ও আগে কোনদিন দেখেনি। হাঁটছে তো হাঁটছেই। বারান্দার একদম শেষের ঘরটায় মা থাকে।

ঘরে ঢুকে দেখে, মা সেই দিনের মতো বিছানায় বসে আছে। কিন্তু ঝুমুর কোথায়? বিছানাটা খালি। ওকি কোথাও গেছে? কিন্তু যাবে কী করে? হাঁটা দূরের কথা, ও তো বসতেই পারে না। ফাঁকা বিছানা মাসীমণিরও চোখে পড়েছে। মাসীমণি মাকে জিজ্ঞেস করল, "আরে! ওই মেয়েটা কোথায়?" মা বলল, "আর বোলো না, মেয়েটাকে কাল অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেছে। যাবার সময় সে কী কান্না! বেচারা এখানে তবু দুটো কথা বলতে পারত, এখন আর সে সুযোগও পাবে না। একা একটা ঘরে ওই মেয়ে থাকবে কী করে!"

"ঘরটা কোথায়?"

"বারান্দার ওই কোণায়, তিন নম্বর ঘর। ভেবেছিলাম একবার দেখা করে আসব, কিন্তু অন্দ্রে তো আমার হাঁটা বারণ। সামনের রোববার আমাকে ছেড়ে দেবে বলেছে, সেদিন যদি পারি একবার দেখা করে যাব।"

শুনে সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর অনুদি কী-একটা বলতেই কথা ঘুরে গেল অন্যদিকে। কতরকম গল্প হচ্ছিল, কিন্তু অমুর কিচ্ছু শুনতে ভাল লাগছিল না। ও এদিক-ওদিক হাঁটতে-হাঁটতে ঘর থেকে টুক করে বেরিয়ে পড়ল, তারপর বারান্দা ধরে এগিয়ে চলল সোজা। বারান্দার কোণের দিকে তিন নম্বর ঘর। ঘরে পর্দা ঝোলানো। পর্দায় হাত দিতেই ওর কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল, ও হাত সরিয়ে নিল। তারপর সাহস করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

ছাতের দিকে তাকিয়ে ঝুমুর চুপ করে শুয়ে ছিল। কী রোগা আর কালো হয়ে গেছে ও এর মধ্যেই। অমু খুব আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকেছে তো, তাই ঝুমুর ওর পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। ও ঝুমুরকে অবাক করে দেবার জন্যে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। কিন্তু একটুখানি এগোবার পরেই টের পেয়ে গেল ঝুমুর। হঠাৎ অমুকে দেখে খুশিতে ওর চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠল। কিন্তু অমু যেই না জিজ্ঞেস করেছে. "কেমন আছ?" অমনি ঝুমুরের দুচোখ জলে ভরে গেল। দেখতে-দেখতে ওর দুগাল ভেসে গেল চোখের জলে। কাউকে কাঁদতে দেখলে অমুরও কান্না পেয়ে যায়, গলার ভেতরটা কেমন যেন ভার-ভার হয়ে ওঠে। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে অমুর চোখে ঠিক জল এসে যাবে। ও পকেট থেকে ক্যাড্‌বেরিটা বার করে ঝুমুরের হাতে দিয়ে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমুর প্যাণ্টের ডানদিকের পকেট এখন খালি. বাঁদিকের পকেটে আছে বড় ডাক্তারবাবুকে লেখা চিঠিটা। চিঠি হাতে নিয়ে ও এগিয়ে চলল। বড় ডাক্তারবাবুর ঘরের দরজার এক দিকটা আগের মতোই খোলা, কিন্তু ঘরে কেউ নেই। চিঠির বাক্সটা একটু উঁচুতে লাগানো। অমু যেই না চিঠিটা ফেলতে যাবে অমনি কে যেন ওর কাঁধে হাত রাখল। ও চমকে তাকিয়ে দেখে বড় ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলেন. "কী ফেলছিলে?"

"চিঠি।"

"কার?"

"আপনার।"

"আমার! দেখি।"

চিঠিটা হাতে দিতেই ডাক্তারবাবু আরও মোটা গলায়
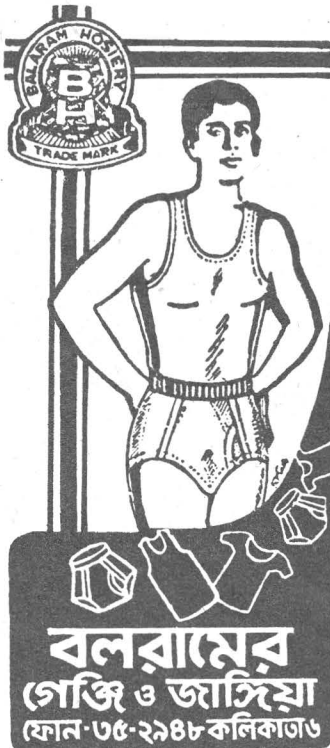
বললেন, "ভেতরে এস।" ডাক্তারবাবু টেবিলের ওদিকের চেয়ারে বসে চোখের ইশারায় অমুকে বসতে বললেন। অমু সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। ওর বুকের ভেতর আবার ঢিব্‌ঢিব্‌ করতে শুরু করেছে। চিঠি পড়ে ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে লিখেছে এ চিঠি? তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"এইটুকু তো চিঠি, কিন্তু অর্ধেকটা সবুজ আর অর্ধেকটা কালো কালিতে লেখা কেন?"

"কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই...।"

"তোমার পুরো নাম লিখেছ, কিন্তু ঝুমুরের পুরো নাম কোথায়? ঝুমুর কী—ঘোষ, বোস না মিত্তির?"

প্রশ্ন শুনে অমু লজ্জায় মাথা নিচু করল। সত্যিই তো ঝুমুররা কী ও জানে না। ডাক্তারবাবু এবার একটু মুচকি হেসে বললেন, "তবে তোমার চিঠিতে একটাও বানান-ভুল নেই, পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেণ্ড কিছু হও?"

"হই, সেকেণ্ড।"

"ফার্স্ট নয় কেন? এবার ফার্স্ট হতে পারবে?"

"পারব।"

"বেশ। বড় হয়ে কী হবে তুমি?"

অমু গত রবিবারেই ঠিক করেছিল, বড় হয়ে ও বিজ্ঞানী

হবে। কিন্তু 'বিজ্ঞানী' শব্দটা ওর কিছুতেই মনে পড়ল না, তাই ও চুপ করে থাকল। এমন সময় একটা টেলিফোন এল। ডাক্তারবাবু ফোনে কী সব শুনে চটে গিয়ে বললেন, "সে কী! আমাকে এতক্ষণ জানাননি কেন?" বলেই লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যাবার সময় ডাক্তারবাবু অমুকে কিচ্ছু বলে গেলেন না। এমন কী, ওর দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। অমু এখন কী করবে, বসে থাকবে না চলে যাবে? কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর অমুর আবার ভয় করতে লাগল। ডাক্তারবাবু যাবার সময় রেগে গেছেন, যদি আরও রেগে ফেরেন!

অমু ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল, তারপর ফিরে এল মায়ের কাছে। ও ভেবেছিল, ফিরে এসে বকুনি খাবে। সবাই হয়ত ওর খোঁজ করছিল এতক্ষণ। কিন্তু কই, কেউ কিছু বলল না তো। কাছে এসে অমু দেখল মায়ের এক হাতের পাঁচ আঙুলে আর-এক হাতের পাঁচ আঙুল ঢোকানো। তার মানে মা গল্প করছে। মা গল্প করছে আর সবাই শুনছে মন দিয়ে।

অমু জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে নিচু-বাড়ির ছাত, আরও নীচে রাস্তা। রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে, কিন্তু গাড়িগুলো এখান থেকে কী ছোট-ছোট লাগছে দেখতে।

একটু পরেই টুং টুং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। এবার বাইরের লোকদের চলে যেতে হবে। মায়ের কাছে যেতেই মা আদর করে বলল, "কী, তুমি এত চুপচাপ কেন? মন খারাপ?"

ওর সত্যিই মন খারাপ, কিন্তু মা কী করে জেনে ফেলল! ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মা বলল, "সামনের রোববারেই আমি বাড়ি চলে যাব, তুমি আমাকে নিতে আসবে, কেমন?"

অমু বলল, "আচ্ছা।"

বাড়ি ফিরে এসে অমুর শুধু ঝুমুরের কথা মনে পড়ছিল। ঝুমুরের ঘরটা কী ছোট্ট আর বাজে। বিছানার ধারে একটা জানলা পর্যন্ত নেই। ওই ঘরে কি কেউ একা-একা থাকতে পারে? একদিন থেকেই ও কী রোগা আর কালো হয়ে গেছে। ওখানে থাকতে ওর নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে, না হলে ও অমন করে কাঁদত না। হঠাৎ অমুর 'বিজ্ঞানী' শব্দটা মনে পড়ে গেল। ও মনে মনে তিনবার বলল—বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী। বড় হয়ে ও বিজ্ঞানী হবেই হবে। তার-পরে একটা-কিছু আবিষ্কার করে ঝুমুরকে ও একেবারে ভাল করে দেবে।

রাত্তিরে শোবার সময় অমু হাত জোড় করে বলল, "ঠাকুর, তুমি ঝুমুরকে বড় ঘরটাতে ফিরিয়ে নিয়ে এস। একা-একা থাকতে ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।" পরদিন সক্কাল-বেলায় ও ছাতে উঠে অনেকগুলো কাক আর চড়াইকে পেট ভরে রুটির টুকরো খাওয়াল। তার পরদিন ভোরে ফুলগাছে জল দিল। তার পরদিন সকালে ও ওদের পোষা কুকুর মিংককে নিজের ভাগের ডিমটা খেতে দিল। ঠাকুমা বলেছে, ভাল কাজ করলে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। তিন দিনে তিনটে ভাল কাজ করে অমু মনে-মনে একটা কথাই শুধু বলল—ঝুমুর যেন আবার আগের ঘরে ফিরে আসে।

রোববার আসতেই বাড়ির সবাই খুশি হয়ে উঠল—আজ মা আসবে। মা আসবে জেনে অমুর খুব আনন্দ হচ্ছিল, কিন্তু ঝুমুরের কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আবার। ঝুমুরকে যদি বড় ঘরে ফিরিয়ে না আনে। শুধু তাই নয়, ডাক্তারবাবু যদি ভাবে ঝুমুরই অমুকে চিঠি লেখার কথা শিখিয়ে দিয়েছে, আর তাই ভেবে যদি ঝুমুরকে বকুনি দেয়। এইসব ভাবতে ভাবতে বিকেল হয়ে গেল। আর বিকেল
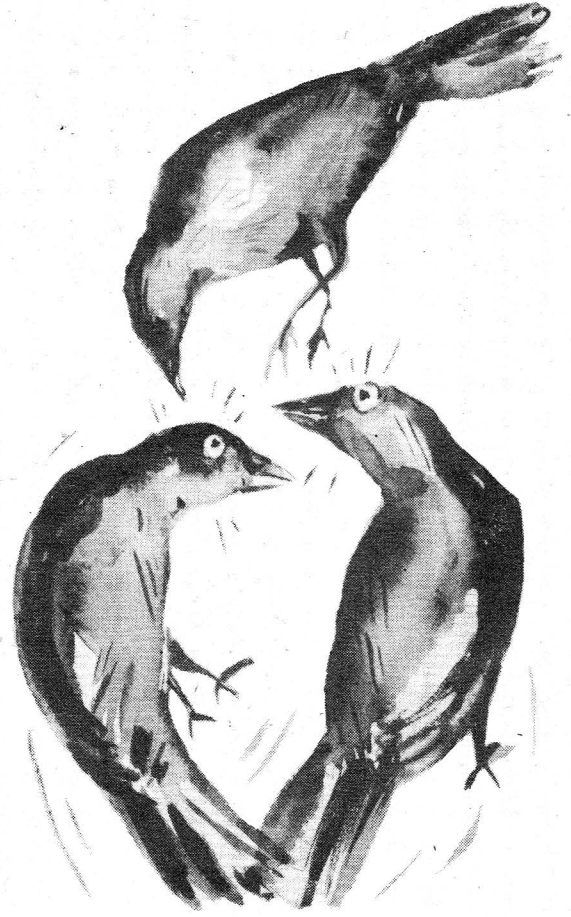
তিন শালিকের গল্প

সুব্রত চক্রবর্তী

দুইটি শালিক সাতসকালে
তুচ্ছ
বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে,
পুচ্ছ
ফুলিয়ে—ঐ ঘাড় বেঁকিয়ে
চাইছে
এ ওর দিকে। আরেক শালিক
নাইছে
উলুত-পুলুত রাতের জলে।
উড়লো—
আপনমনে, এদিক-ওদিক
ঘুরলো;
বসলো গিয়ে নীল আকাশের
আলসেয়—
আবার বুঝি আসবে নেমে
কাল সে!

ছবি এঁকেছেন অসিত পাল

হতেই অমু আর অমুর বাবা হাসপাতালে যাবে বলে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

হাসপাতালের লম্বা বারান্দায় পা দিতেই অমুর আবার বুক ঢিব্‌ঢিব্‌ করতে শুরু করে দিল। সে-দিনও করেছিল, তবে আজকে আরও বেশী, অনেকক্ষণ ধরে ফুটবল খেললে যেমন হয় ঠিক সেইরকম। বড় ডাক্তারবাবুর ঘরের দরজার দুটো পাল্লাই আজ বন্ধ। হাঁটতে হাঁটতে বাবা কী যেন বলছিল, অথচ অমু ঠিক বুঝতে পারছিল না।

মায়ের ঘরে ঢুকতেই অমু প্রথমে দেখতে পেল মাকে, তারপরেই ঝুমুরকে। মা বসে আছে, আর পাশের বিছানায় শুয়ে আছে ঝুমুর। ঝুমুর ওকে দেখতে পেয়েই হাসল। ওকে আবার পুরোনো জায়গায় দেখতে পেয়ে অমুর এত আনন্দ হচ্ছিল যে, ও আর-একটু হলেই চিৎকার করে উঠত।

বাবা মায়ের টেবিলের ওপর থেকে কয়েকটা কাগজ তুলে নিয়ে মাকে বলল, "তুমি তাহলে তৈরি হয়ে নাও, আমি একেবারে ট্যাক্সি ডেকে নিয়েই ফিরব।" বাবা চলে যেতেই মা "অমু বোসো" বলে টুকিটাকি জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দিল।

অমু বসল না, ঝুমুরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুমুর হাসছিল. ও আবার আগের মতো ফর্সা হয়ে গেছে। অমু জিজ্ঞেস করল, "কবে এলে এখানে?"

"কাল।"

"ভাল লাগছে?"

"হ্যাঁ, খুব ভাল।"

"কেউ কষ্ট পেলে আর হাসবে?"

"না।"

একটু থেমে ঝুমুর আবার বলল. "আমি সব জানি।"

"কী?"

"বড় ডাক্তারবাবু সব বলেছে আমাকে, তুমি কী ভাল!"

কেউ ভাল বললে অমুর খুব লজ্জা করে। লজ্জা পেয়ে ও মুখ নিচু করল, তারপরেই হঠাৎ ওর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

"আচ্ছা, ঝুমুর তোমরা কী?"

"কী মানে?"

"এই যেমন আমরা মিত্র।"

"আমরা রায়, ঝুমুর রায়।"

অমুর ভীষণ ইচ্ছে করছিল বড় হয়ে ও কী হবে, কার জন্যে হবে—এইসব বলতে। কিন্তু বলি-বলি করেও বলা হল না।

এমন সময় বাবা ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে মাকে বলল, "চলো এবার, ট্যাক্সি এসে গেছে।"

মা বিছানা থেকে নেমে ঝুমুরের কাছে গেল, তারপর ওর চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে বলল, "তুমি আর একটুও দুষ্টুমি করবে না, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, কেমন। আমরা মাঝেমধ্যে এসে তোমাকে দেখে যাব।"

ঝুমুর কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না, ওর দু-চোখ ভরে গেল জলে। কিন্তু ও কাঁদল না, জলভর্তি চোখ নিয়ে একটুখানি হাসল।

অমুরা আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ছবি এ'কেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত
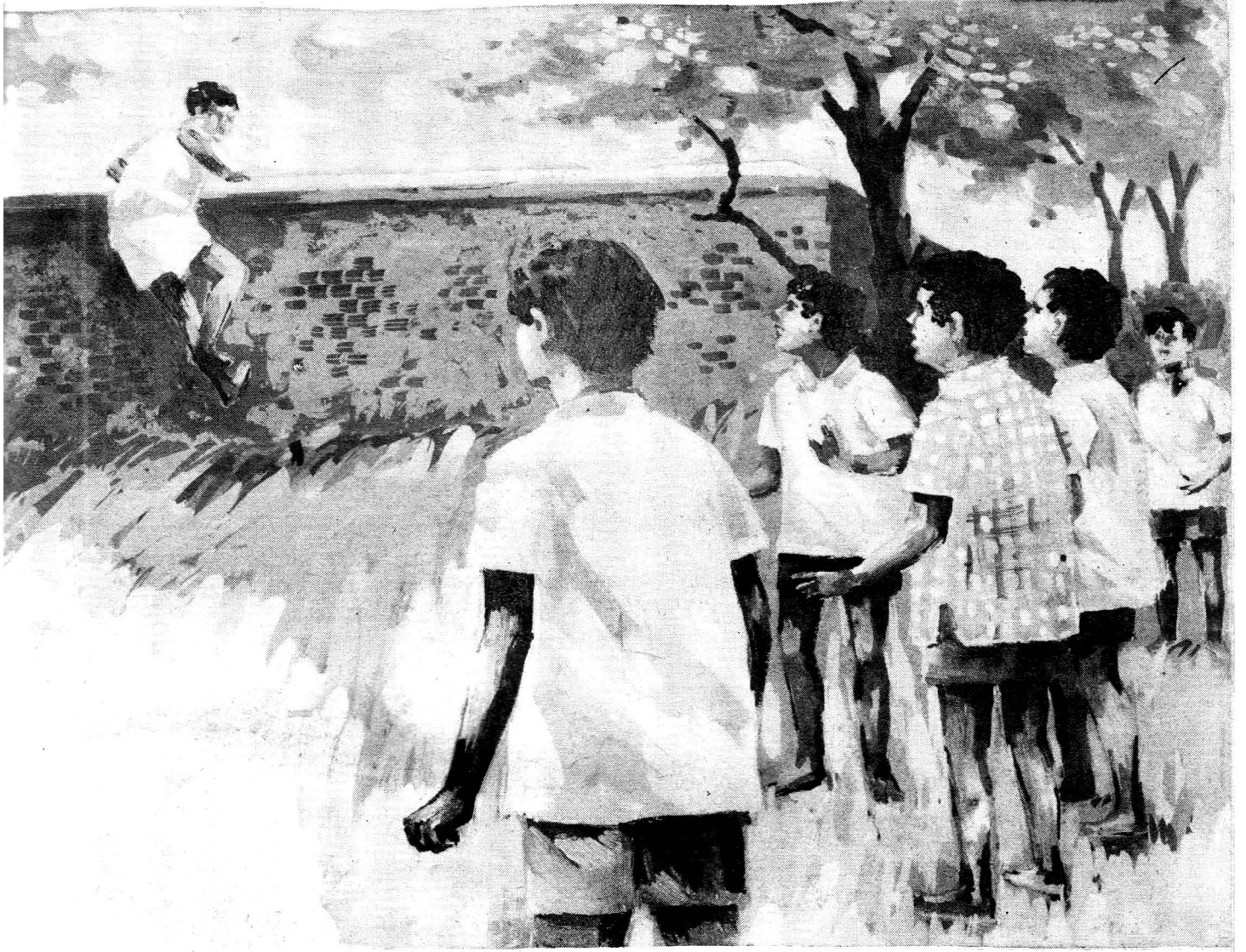
দিব্যেন্দু পালিত

কান-নাচিয়ে

ছোটবেলায় যাদের সঙ্গে আমাদের ভাব-ভালবাসা হয়েছিল, তাদের একজনের নাম ফেলু। আমাদের সহপাঠী। স্কুলের খাতায় একটা ভাল নাম থাকলেও সবাই ডাকত ফেলু বা ফ্যালারাম ব'লে। আরও কিছুদিন পরে সে হয়ে গেল কান-নাচিয়ে ফ্যালারাম।

ফেলুকে চেনা যেত তার মুখের বসন্তর দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে। যখনকার কথা বলছি, তখন কলেরা বসন্ত এই রোগগুলো হত খুব। এখনকার মত ইঞ্জেকশন টিকে এত সব বেরয়নি, কিংবা বেরলেও পাওয়া যেত না তত। শীতের শেষে হাওয়ায় ফুরফুরে ভাব জাগলেই আমরা ধরে নিতুম এখন বসন্ত হবার পালা। ভাবনাটা ফলে যেত। স্কুলে প্রায়ই অ্যাবসেণ্ট হত কেউ-কেউ। তবে, ফিরে আসত প্রায় সকলেই।

ফেলুর কবে বসন্ত হয়েছিল তা অবশ্য আমরা জানি না। নিশ্চয়ই খুব ছোটবেলায়। স্কুলে যেদিন ও প্রথম এল সেদিনই চোখে পড়ল মুখের দাগগুলো। কোমর থেকে গলা পর্যন্ত ডাকাবুকো চেহারা, তুলনায় পা দুটো বড়ই রোগা আর সরু।

ছোট, গোল মুখ; তাতে বসানো লম্বা ও কোনাকুনি তেড়ে-ওঠা কান দুটো দেখলে কিসের কথা মনে পড়ত তা আর নাই বা বললুম! বসন্তের ঘা শুকিয়ে নাকটা হয়ে গিয়েছিল বোঁচা। সব মিলিয়ে বয়সের তুলনায় দেখাত অনেক বড়। কথা বলত অল্প নাকী সুরে, চন্দ্রবিন্দু মিশিয়ে। যেমন ধরো তুমি জিজ্ঞেস করলে ফেলুকে, "কীরে, কেমন আছিস?" ফেলু জবাব দিল, "তোঁর তাঁতে কী দরকার!"

কথার ধরনে কি তোমাদের মনে পড়ছে ঠাকুরমার ঝুলি'র রাক্ষস-খোক্কসদের কথা? না, না, তেমন নয়। তবে যদি ভাবো, 'কী কথার কী উত্তর! আচ্ছা গোঁয়ার তো ছেলেটা', তবে ভুল করবে না। ফেলু ছিল ওই রকমই। বছর বারো-তেরো বয়স হলে হবে কী, বড্ড গোঁয়ার আর বিদ্ঘুটে বদরাগী, রেগে যেত হুটহাট। সত্যিই যেন কেমন-কেমন!

এই কেমন-কেমন ব্যাপারটা ধরা পড়ল ও ক্লাস সেভেনে ভর্তি হবার দিন কয়েকের মধ্যে।

ফেলু তখন নতুন এলেও ওর মামাতো ভাই বিশু আগে থেকেই পড়ত আমাদের সঙ্গে। আহ্লাদে-গড়া, চুপচাপ, নিরীহ ছেলেটি—চেহারায় ডিঙডিঙে. ফেলুর একেবারে উল্টো। একটু ছুকছুকে আর চুকলি-কাটা বাই ছিল, এই যা। কাণ্ডটা ঘটল বিশুকে নিয়েই।

প্রত্যেক বছরই সরস্বতী পুজোর দিনে থিয়েটার হত আমাদের স্কুলে। সেবার হঠাৎ ঝড়বৃষ্টির জন্যে শুধু পুজোই যে মাটি হল তা নয়, থিয়েটারও গেল পিছিয়ে। ঠিক হল মাসখানেক বাদে আবার হবে। যেদিন থিয়েটার, তার আগের দিন দুপুরে রিহার্সালের সময় খাবার জন্যে পান্তুয়া আনা হয়েছিল এক হাঁড়ি—সেটা রাখা হয়েছিল লাইব্রেরি-ঘরে লুকিয়ে। হঠাৎ কে যেন আবিষ্কার করল, লুকিয়ে-লুকিয়ে সেই পান্তুয়া সাবাড় করছে বিশু! ধরা পড়ার সময়েও ওর মুখের মধ্যে অন্তত খান আষ্টেক খোয়াভরা নধর পান্তুয়া—গলবার তল পাচ্ছে না, জেলির মত রস গড়াচ্ছে কশ বেয়ে; চোখ দুটোরও অবস্থা এই যায় কি সেই যায়! আমরা তো অবাক। ওই অবস্থাতেই গাঁট্টাগোট্টা চেহারার শ্যামাদাস লাইব্রেরি-ঘর থেকে টেনে এনে বেদম পিটতে লাগল বিশুকে। চড়-চাপড়ের চোটে মুখভর্তি পান্তুয়া উগ্‌রে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল বিশু।

কান্না শুনে ছুটে এলেন আমাদের নতুন ভূগোলের স্যার গোপালদা। কলকাতা থেকে আসা, ভারী নরম মনের মানুষ। শ্যামাদাসকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "ছেলেমানুষ লোভে পড়ে খেয়ে ফেলেছে! মেরো না। আমি টাকা দিচ্ছি, বাবুয়ার দোকান থেকে আনিয়ে নাও আরও।"

আমাদের স্কুলের মাঠটি ছিল বড়। ছাড়া পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠের মধ্যে দিয়ে অনেকটা ছুটে গেল বিশু। যখন বুঝল কেউ আর তার নাগাল পাবে না, তখন থেমে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকিয়ে ছড়া কাটল—

"শ্যামাদাস
খায় ঘাস,
করে চুরি
বারো মাস।"

চোখে তখনো লেগে আছে কান্নার জল। জামা তুলে মুছতে মুছতে বলল, "এই ব্যাটা পান্তুয়া-চোর শ্যামাদাস, তোর মাথায় হাঁড়ি ভাঙব।"

শ্যামাদাস আবার-ছুটে যেতেই পিছন ঘুরে ছুটে স্কুলের ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে অদৃশ্য হল বিশু। গোপালদা বললেন, "থাক, থাক। কালই ভাব হয়ে যাবে আবার। এ-নিয়ে আর মাথা গরম করো না।"

ব্যাপারটা আমরা ভুলেই গেলুম প্রায়। মাঠে যেখানে স্টেজ বাঁধছে মজুররা, সেখানে গিয়ে জটলা করতে লাগলুম। হঠাৎ দেখি পাঁচিল ডিঙিয়ে খ্যাপা মোষের মতো ছুটে আসছে ফেলু, আর চিৎকার করছে, "কার সাধ্যি আমার ভাইয়ের গায়ে হাত তোলে! চলে আয়—চলে আয়—"

কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। প্রকাণ্ড এক লাফ মেরে শ্যামাদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফেলু, আর চ্যাঁচাতে লাগল, "আমি ফ্যালারাম। তোর টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত চুষে খাবো—।"

ফেলুর শরীরের চাপে মাটিতে পড়ে অমন গাঁট্টাগোট্টা চেহারার শ্যামাদাসেরও ছেড়ে-দে-মা গোছের অবস্থা! আলগা পা দুটো শূন্যের দিকে ছুঁড়ছে মাঝে-মাঝে, আর মাঝে-মাঝে দমবন্ধ গলায় কী যেন বলবার চেষ্টা করছে।

সেদিন গোপালদা-স্যার না-ছাড়ালে ফেলু হয়ত সত্যি সত্যিই মেরে ফেলত শ্যামাদাসকে। আর ছাড়ালেই কি সত্যিই ছাড়ে নাকি! তার বায়নাক্কা কত! থেকে-থেকেই হাত-পা নাড়ে, আর জিজ্ঞেস করে, "শ্যামাদাস কোথায়?"

আজ বাদে কাল থিয়েটার। সব পণ্ড হয়ে যাবার ভয়ে ঘুষ দেওয়া শুরু হল তাকে। তাতেই যেন আরও পেয়ে বসল ফেলু। গণ্ডা চারেক পান্তুয়া সাঁটিয়ে আর-কিছু না পেয়ে বলল, "আঁমাকেও থিঁয়েটার করতে দিতে হবে—"

এতক্ষণ চুপচাপ থাকলেও এবার মনে হল গোপালদাও রেগেছেন একটু। চোখ পাকিয়ে বললেন, "ফ্যালা, ঝামেলা করিস না বেশী। কাল থিয়েটার, এখন কি না বাবু পোঁ ধরলেন—"

ফেলু বোধহয় ধমকটা আঁচ করতে পারেনি। থতমত খেয়ে বলল, "তাহলে আঁমি কী করব!"

"কিচ্ছু করতে হবে না। বসে থাকবি চুপচাপ।"

বিশু কখন ফিরে এসে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ করিনি। ফ্যালারামের কীর্তিকলাপ দেখে বোধহয় সাহস পেয়েছিল মনে। হঠাৎ টিপ্পনী কেটে বলল, "ফ্যালাদা ভাল কান নাচাতে পারে, স্যার—"

কান নাচানো ব্যাপারটা যে কী, আমরা কেউই জানতুম না তখনও। অবাক হয়ে সবাই তাকাচ্ছিল এর ওর মুখের দিকে। গোপালদা বললেন, "তোর সবই যেন অদ্ভুত, ফ্যালা! দেখা দেখি তোর কান নাচানো। ভাল হলে লাগিয়ে দেব—"

কথা শুনে ধন্যি-হয়ে-যাওয়া ভঙ্গিতে এক গাল হাসল ফেলু। বলল, "বিশে, নম্বর ডাকবি—"

তার পরেই ঘটল একটা অদ্ভুত মজার ব্যাপার। গোপালদার নির্দেশে আধা চাঁদের ভঙ্গিতে সার বেঁধে দাঁড়ালুম আমরা। মাথার ওপর ঠা-ঠা রোদ্দুর। সামনে দুটো সরু, রোগা ঠ্যাঙের ওপর বড়সড় চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফেলু। এতটুকু নড়নচড়ন নেই; এমন কী, লম্বা ও মাথার দিকে কোনাকুনি-ছুঁচলো-হয়ে-যাওয়া কান দুটোও স্থির। তারপর বিশু এক-দুই-তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুর কান দুটো শিবমন্দিরের পতাকার মতো নাচতে লাগল পত্‌পত্‌ করে। নাচছে তো নাচছেই! মিনিট খানেক নাচিয়ে সে যখন থামল, আমাদের মুখে আর কথা ফোটে না। বোকা-বোকা মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফেলু। বিশুর মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে কৃতিত্বটা তারই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে গোপালদা বললেন, "তুই একটা

জিনিয়াস. ফ্যালা! আর কী কী পারিস বল তো?"

ওজন বুঝে ফেলু বলল, "বর্ষার রাতে শিয়াল-কুকুরের ডাক ডাকতে পারি—"

"ডাক, ডাক দেখি!"

তখন লম্বা হাতের তালু দুটো মুখের কাছে চোঙার মত করে ধরে অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল ফেলু। ডাক শুনে কে বলবে সেটা দুপুর, চারদিকে ঠা-ঠা করছে রোদ্দুর। বরং মনে হবে জানলা-দরজা-বন্ধ-করা অন্ধকার বৃষ্টির রাত থমথম করছে চারদিকে; আর, দূরে-দূরে পালা করে ডেকে উঠছে ভয়-পাওয়া শিয়াল আর কুকুর।

সেটা থামতে-না থামতেই ফেলু বলল, "স্যার, ট্যাঁ-ট্যাঁ করব?"

"থাক, থাক, হয়েছে—" গোপালদা বললেন, "এখন বাড়ি গিয়ে প্র্যাকটিস করগে যা। কাল তোকে স্টেজে নামাব।"

এক শ্যামাদাস ছাড়া আমরা সকলেই ফেলুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলুম।

পরের দিন সন্ধ্যায় টানা পাঁচ মিনিট কান নাচিয়ে, আরও মিনিট পাঁচেক জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডেকে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল ফেলু। হাততালি পড়ল প্রচুর। ভাগনের পৈতের জন্যে স্কুলের সেক্রেটারি ভূপতি হাজরাকে থিয়েটারের আগেই চলে যেতে হল। কিন্তু, যাবার আগে ফেলুর জন্যে একটা মেডেল ঘোষণা করে গেলেন তিনি।

সেই থেকে গোঁয়ার ফেলু শহরের প্রায় সকলেরই চেনা হয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে ডেকে বলত, "এই যে ফেলু, এসো—একটু কান নাচিয়ে যাও দেখি—" এক গাল হেসে ফেলুও দাঁড়িয়ে পড়ত তখুনি।

ছবি এঁকেছেন মদন সরকার
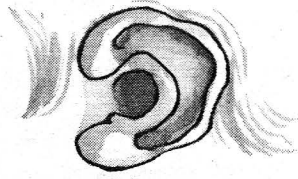
দিদিমণির গল্প-বলা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

অঙ্কের দিদিমণি ভীষণ মেজাজ কড়া,
সাহস করে না কেউ তাঁর কাছ ঘেঁষতে,
অথচ ইচ্ছে মনে গল্প বলতে বলে,
কে যে প্রস্তাব করে সবই যায় ভেস্তে।

ফুলটুসি একদিন বলল সাহস ভরে,
'গল্প বলতে হবে' বড় আবদার করে,
দিদিমণি একবার কড়া চোখে তাকিয়ে,
বললেন 'বেশ বেশ' সারা মাথা ঝাঁকিয়ে,
'তবে আমি গল্পটা বোর্ডেতে আঁকব,
রাক্ষস থেকে দূরে কন্যাকে রাখব।
গল্প পড়তে আমি বড় ভয় পাই যে,
দৈত্যরা মানুষকে করে খাই-খাই যে।'

ফুলটুসি উঠে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ড মুছল,
এক কোণে রাক্ষস এক কোণে কন্যা,
আঁকলেন, তারপর আনন্দ-বন্যা,
গল্প করেন শুরু, ভয় তাঁর ঘুচল।

ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
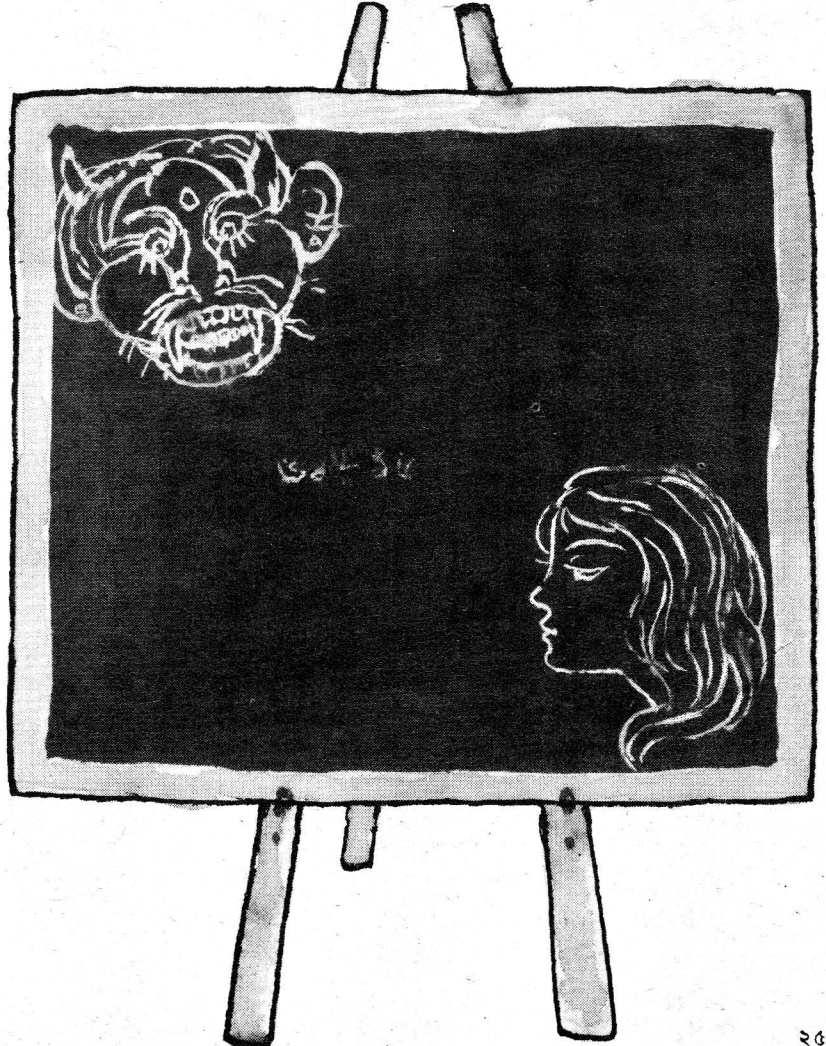
ধাঁধা আর হেঁয়ালি

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম ধাঁধা ॥

নীচের প্রশ্নগুলোর চটপট জবাব দাও।

(ক) কোন্ জায়গার নাম সকলেই জানতে চায়?

(খ) কোন্ জায়গা বেড়েই চলেছে?

(গ) কোন্ দ্বীপ শস্য?

(ঘ) কোন্ নদী ফরসা নয়?

(ঙ) কোন্ পর্বতের মাথা কাটলে উপদ্বীপ হয়?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥

একজন বিপ্লবীর চিঠিপত্র ঘেঁটে একটি সাংকেতিক পত্র পাওয়া গিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কিছু জায়গার নাম পরপর বসানো। কিন্তু একটু অন্য ভাবে পড়লেই গুপ্ত চিঠিটি উদ্ধার করা যায়। দ্যাখো তো, পড়তে পারো কি না! "ভারত ইটাহার ভূপাল পলাশী তিনসুকিয়া, তোপচাঁচি মাদ্রাজ রমনা পিনালী ছত্রিশগড় নেতারহাট চম্বল রংপুর। সাহেবগঞ্জ বজবজ ধাত্রীগ্রাম নন্দীগ্রাম! ইছাপুর তিনপাহাড়—বিলাসপুর মধুপুর লক্ষ্মীকান্তপুর।"

তৃতীয় ধাঁধা ॥

এটাও একটা চিঠি। কিছু-কিছু জায়গায় ড্যাশ চিহ্ন (—) দেওয়া আছে। সেই সব জায়গায় লাগসই কিছু ফুলের নাম বসিয়ে চিঠিটি পড়ে ফেলো তো!

ভাই প্র—,

তোমাকে এর আগেও একটা চিঠি দিয়েছি, —ব পাইনি। আমরা শরীর এ— ভালো যাচ্ছে না। পুজোর ছুটিতে কয়েকদিনের জন্য —তলায় বেড়াতে যাবার ইচ্ছে আছে।

জামাইবাবু —ডাঙায় বদলি হয়ে গেছেন। গত সপ্তাহে দিদিরা মুর্শিদাবাদের নানান জায়গা ঘুরে এলো; —তীতেও গিয়েছিলো। সেখানে জামাইবাবুর ভাই মু—থাকে। বাড়িটা নাকি বিশাল এক প্রাসাদ। সম্ভবত তৈরী করেছিলেন নবা—। বাড়িটার বহি— জীর্ণপ্রায়, কিন্তু ভেতরটা এখনো খুব জমকালো।

ওদের —তলার বাড়িতে এখন ছোটভাই —নাভ থাকে। সেও এখন রীতিমত যু—। পড়াশোনায় চিরকালই ভালো, —য় বৃত্তি নিয়ে পাশ করেছে।

তুমি তো দার্জিলিঙ গিয়েছিলে, কেমন লাগলো —জঙ্ঘা? সব খবর জানিয়ে —ব দিও। আমার হাতে এখন বহু ব—কাজ। ইতি

সু—

চতুর্থ ধাঁধা ॥

এ যদি না থাকে তবে পুরো দমবন্ধ,
মধ্যম পদ-লোপে জেগে থাকে গন্ধ,
পা ভেঙে বাখারি, আর মাথা ভেঙে ফেলাতে
সময়টা কেটে যাবে নানাবিধ খেলাতে॥

পঞ্চম ধাঁধা ॥

ছাপতে গিয়ে শব্দগুলো সব এদিক-ওদিক হয়ে গিয়েছে। কতগুলো জায়গার নাম, ঠিক-মতো বসিয়ে পড়তে পারো কিনা দ্যাখো।

কানাটাগরা সশন্দেলিখা বেলুয়াড়িউ কমাচানিক গঙগ-হিলঞ্জ মরহপুবর চরন্দগনন কেশানর্তানন্তি সিহরবীং রত্তন-চিঞ্জ নীলবশা

ষষ্ঠ ধাঁধা ॥

এক বৃদ্ধ মৃত্যুকালে তিন ছেলেকে বারোটি মুখবন্ধ থলে দিয়ে বললেন, "এই থলেগুলোর ওপর ১ থেকে ১২ পর্যন্ত নম্বর দেওয়া আছে। থলের নম্বর যত, ভেতরেও তত সংখ্যক মোহর। তোমরা কোনো থলে না খুলে সমান তিন ভাগ করে নেবে মোহরগুলো।

কোন্ ছেলে কোন্ কোন্ থলে নেবে এবং প্রত্যেকে কটি করে মোহর পাবে বার করতে হবে।

সপ্তম ধাঁধা ॥

নীচের বাক্যগুলোতে যেখানে-যেখানে ড্যাশচিহ্ন (—) দেওয়া আছে সেখানে-সেখানে উপযুক্ত শব্দ বসাতে হবে। কিন্তু শব্দ-বসানোর শর্ত হল, একটি বাক্যে প্রথম অনুক্ত স্থানে যে-শব্দ বসবে, দ্বিতীয় অনুক্ত স্থানে তার উল্টো রূপটি বসাতে হবে। যেমন, প্রথমে 'জবা' বসলে পরে বসবে 'বাজ'।

(ক) নুন দিয়ে—খেতে—লাগে

(খ) এখন—নেমো না, খানিক আগে কুমিরের—দেখা গেছে।

(গ) জলসাঘরে নাচছে—, নাটমণ্ডপে বসেছে—।

(ঘ) —গাছ জড়িয়ে উঠেছে অচেনা—।

(ঙ) —র আদরের—নেই।

(চ) রসগোল্লার—আর দুধের—, দুইয়ের মিশেল যেন মণি-কাঞ্চন যোগ।

(ছ) প্রভুর সেবায় — — জোড়কর।

(জ) — লোকে যেন সুখী —।

(ঝ) ভয় কেটে গেল, মনের মধ্যে — সঞ্চারিত হল —।

(ঞ) ঠাকুরঘরের কাজে —র বাসনের ব্যবহারই —র পছন্দ।

অষ্টম ধাঁধা ॥

৮ লিটার দুধ-ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে বেরিয়েছে এক গোয়ালা। সঙ্গে আরো দুটি খালি পাত্র। একটি পাঁচ লিটারের, অন্যটি তিন লিটারের। দু-জন খদ্দের জুটল। দু-জনেই ৪ লিটার করে দুধ নেবে। মাপার কোনো আলাদা ব্যবস্থা নেই। শুধু এ-পাত্র থেকে ও-পাত্রে ঢালাঢালি করে দুজনকে ৪ লিটার করে দুধ বিক্রি করলো গোয়ালাটি। কী করে করলো?

নবম ধাঁধা ॥

কয়েকজন কবির নাম ও তাদের জন্মস্থান দেওয়া হল। কিন্তু সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে গেছে। ঠিক করে বসাও, কোন্ কবির পাশে কোন্ জায়গার নাম হবে।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	সাগরদাঁড়ি
কৃত্তিবাস ওঝা	কেঁদুলি
কাশীরাম দাস	দামুন্যা
জয়দেব	ফুলিয়া
মধুসূদন দত্ত	সিঙ্গি

দশম ধাঁধা ॥

আদি-অন্ত জানায় সময়,
খাওয়া ভাল, তোলা ভাল নয়॥

(উত্তর ২৫৪ পৃষ্ঠায় দ্যাখো)

চোর ধরতে গিয়ে

অরুণ বাগচী

মেজকাকা বললেন, "ব্যাটাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দে।"

সেজকাকা বললেন, "বোঁয়েং—"

মেজকাকা রেগে গেলেন। "বড্ড কথা বলিস তোরা। একটা চোর। হাতেনাতে ধরা পড়েছে। তাকে নিয়ে কী করা হবে, চোদ্দঘণ্টা ধরে সেই আলোচনা। নদীতে নিয়ে গিয়ে গুলি করে দে। ফেলে দে জলে! মাছচুরির শাস্তি ঠিকমত পাক।"

ছোটকাকা ফুলকাকা রাঙাকাকা সেজকাকা চার ভাই চুপ করে রইলেন। মেজ রেগে গেলে খুব মুশকিল। তখন কথা বললেও চটবেন, না বললেও।

সন্ধে হয়ে আসছে। বাংলোবাড়ির চওড়া বারান্দা। মশা-ঠেকানো মিহি তার দিয়ে চারপাশ মোড়া। দূরে চা-ঝোপ, শিরীষ গাছ, লালরঙা কলঘর অর্থাৎ ফ্যাকটরি, আস্তে আস্তে অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আনারস বাগানের দিক থেকে এক ঝাঁক টিয়া উড়ে গেল বাংলোর উপর দিয়ে। হাঁস-মুরগীর খোঁয়াড়ে দিনান্তের শরিকী ঝগড়া বোধ হয় মিটে গেছে, সবাই চুপচাপ। দাদার পোষা হরিণটা টোকো গাছের

নীচে চুপচাপ শুয়ে ছিল। হঠাৎ উঠে বাংলোর পিছনে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল নুন খাবার লোভে।

মেজকাকা চোখ ফেরালেন চোরের দিকে। বারান্দারই এক কোণে একটা মকাইয়ের বস্তার মত লোকটা পড়ে ছিল। জুলজুল করে চাইছিল ইতিউতি। মেজকাকার দিকে দুহাত জোড় করে বললে, "হুজুর মা-বাপ!"

মেজকাকা চোখ পাকিয়ে এত জোরে 'চো—প্' বলে উঠলেন যে আমরা সবকটা ভাইবোন তাড়াতাড়ি দরজার আড়ালে চলে গেলাম।

"ব্যাটা মাছচোর, আমাকে বাবা বানাতে চাইছিস? এত বড় আস্পর্ধা, চৌধুরীদের বিলে ঢুকেছিলি মাছ চুরি করতে? শয়তান, ইস্টুপিড কোথাকার!"

ফাঁক পেয়ে সেজকাকা আবার বললেন, "বোঁয়ে" মেজদা. ও একলা না, ওর নিশ্চয় একটা দল আছে। তুই মেজদাকে বল্ তো নন্দেশ্বর...গোটা, বোঁয়ে", কাণ্ডটা।"

বেঁটে নন্দেশ্বর সেজকাকার বিশ্বস্ত অনুচর। শিকারের

প্রধান সংগী। ভোর-ভোর উঠে নন্দেশ্বর পোড়া মকাই আর গুড়-চা আরাম করে খাচ্ছিল। হঠাৎ একটা মশা তার পেটে চলে গেল। যে-কোনো লোকেরই এতে রাগ হতে পারে। তায় নন্দেশ্বর অমন বার তের বছর বয়েস থেকে শিকারী সাহেবের চেলা। মশা গিলে বিরক্ত হয়ে বন্দুক হাতে চলে গেল মিরিহারামের জংগলে। মুর্গী মারি, কি পহু (হরিণ) মারি। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে, একটা উঁড়ি-আমগাছের ডালে উঠে—নীচে বড্ড জোঁক—বিড়ি ধরিয়েছে, হঠাৎ জংগুলে রাস্তা ধরে, মাছভর্তি চ্যাঁপা হাতে ও কে যায়? রঙমালা বিলের দিক থেকে আসছে যখন, নির্ঘাত চুরিচামারির কেস। ঝুপ করে গাছ থেকে পড়েই বন্দুক তাগ করলে নন্দেশ্বর। আর ওইভাবেই, তার ডবল সাইজের লোকটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে এসেছে বাংলোতে। এখন সাহেবরা যা ঠিক করেন।

ছবির মত সুন্দর রঙমালা বিল। বাংলা পঞ্চাশ সনের যেমন দুর্ভিক্ষ, ইংরেজী পঞ্চাশ সনের তেমনি ভূমিকম্প-বন্যা। সমগ্র উত্তরপূর্ব আসাম বিপর্যস্ত হয়ে যায় ওই দুর্বিপাকে। কিন্তু রঙমালা বিলের সৌন্দর্য পুরো হরণ করতে পারেনি প্রকৃতির রুদ্ররোষ। মাছভর্তি বিল। জালই ফেল, আর ছিপ বা বঁড়শি নিয়েই যাও, মেহনত করলে থালই-ভরা মাছ পাবেই। বিলের তিনদিকে চৌধুরীবাড়ির প্রাইভেট ফরেস্ট, একদিকে চা-বাগান। সন্ধের আগে বিলের নানা জায়গায় চ্যাঁপা পেতে আসা হয়। বড়-বড় গাছ বুড়ো হয়ে বন্যায় উলটে পড়ে গেছে—বন্যা তো আসামে ফি বছরই হয়—কালো কালো শিকড় জল থেকে কৌতূহলী বিকট জন্তুর মত মুখ বের করে। গুঁড়ি ঘিরে জলের নিজস্ব আবর্ত। ফাঁকে ফোকরে দিব্য আরামে গড়ে উঠেছে মাছের উপনিবেশ।

কিছুদিন থেকেই কাকাদের সন্দেহ হচ্ছিল মাছচুরি যাচ্ছে। ভোরবেলা রাতেপাতা চ্যাঁপা তুলে মনে হয়েছে কম-কম যেন মাছ। নিঃসন্দেহ হওয়া অবশ্য মুশকিল। একজন বা দুজন দারোয়ানের কম্ম নয়, রাতের অন্ধকারে গোটা বিল পাহারা দেয়। এক দংগল লোক লাগাতে হয়। এইসব ভাবনাচিন্তার মধ্যে আচমকাই নন্দেশ্বরের হাতে ধরা পড়ে গেল একটা চোর।

ছোটকাকা ইচ্ছে করলে পুলিশের বেশ সাকসেসফুল দারোগা হতে পারতেন। মেজকাকা যতক্ষণ রাগ করতে এবং সেজকাকা 'বোঁয়ে" বলতে ব্যস্ত, ছোটকাকা একটা কলম-কাটারিতে ধার দিতে দিতে আর মৃদুকণ্ঠে কী সব শাসনবাক্য উচ্চারণ করে চোরটাকে ভয় খাইয়ে পেট থেকে কথা বের করে ফেলেছেন।

সাবরু ঘাট থেকে মাইল দুয়েক উজিয়ে গেলে বিরাট একটা চড়া মেলে। বালি জমে জমে উঁচু হয়ে গেছে। তার উপর গরুছাগলমোষ নিয়ে কলোনি বসিয়েছে পশ্চিমা মানুষ কয়েকঘর। শীতকালে চলে আলুর চাষ। পরে অজস্র ফলে কুমড়ো তরমুজ ফুটি। আসাম যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা, আমার এই দৃঢ়বিশ্বাসের সংগে অনেকেই হয়তো একমত হবেন না। কিন্তু ওই কুমড়ো বা তরমুজ খেলে অতি বড় নিন্দুকও তৃপ্তির ঢেকুর তুলে কবিতা লিখতে রাজী হয়ে যাবেন।

যাই হোক, ওই লোকগুলো শুধু জিলাশহরে আলু-কুমড়ো দুধ-ঘি চালান দিয়ে চুপ করে বসে থাকে না। অতখানি জলজংগল হাতের নাগালে পেয়ে তারা দেহাতী সংস্কার ভুলে আস্তে-আস্তে আমিষাহারী হয়ে পড়েছে।

ধাঁধার উত্তর

(১) (ক) কোন্নগর (কোন্ নগর?) (খ) বর্ধমান (গ) যবদ্বীপ (ঘ) কৃষ্ণা (ঙ) হিমালয়।

(২) প্রতিটি জায়গার প্রথম অক্ষর পড়ে যাও। চিঠিটির গুপ্ত অর্থ এইরকম : "ভাই ভূপতি, তোমার পিছনে চর। সাবধান! ইতি—বিমল।"

(৩) কাশ, জবা, কদম, শিমুল, বেল, পলাশ, কুন্দ, বকুল, রঙ্গন, চাঁপা, পদ্ম, বক, জাতী, কাঞ্চন, জবা, কেয়া, কমল।

(৪) বাতাস

(৫) নাগরাকাটা, সন্দেশখালি, উলুবেড়িয়া, মানিকচক, হিংগলগঞ্জ, বহরমপুর, চন্দননগর, শান্তিনিকেতন, বীরসিংহ, চিত্তরঞ্জন, শালবনী।

(৬) প্রত্যেকে পাবে ২৬টি করে মোহর। প্রথম নেবে, ১, ৫, ৯ ও ১১ নম্বর থলে। দ্বিতীয় ২, ৪, ৮ ও ১২ নম্বর থলে। ৩, ৬, ৭ ও ১০ নম্বর থলে নেবে তৃতীয় জন।

(৭) ক—জাম, মজা খ—জলে, লেজ গ—নর্তকী, কীর্তন, ঘ—তাল, লতা ঙ—মাসী, সীমা চ—রস, সর ছ—দাস, সদা জ—ইহ, হই ঝ—সহসা, সাহস ঞ—তামা, মাতা।

(৮) ঢালাঢালির পর্যায়ক্রম নীচে দেখানো হল :

	আট লিটারী পাত্র	পাঁচ লিটারী পাত্র	তিন লিটারী পাত্র
(ক)	৮	০	০
(খ)	৩	৫	০
(গ)	৩	২	৩
(ঘ)	৬	২	০
(ঙ)	৬	০	২
(চ)	১	৫	২
(ছ)	১	৪	৩
(জ)	৪	৪	০

(৯)

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	দামুন্যা
কৃত্তিবাস ওঝা	ফুলিয়া
কাশীরাম দাস	সিংগি
জয়দেব	কেঁদুলি
মধুসূদন দত্ত	সাগরদাঁড়ি

(১০) পটোল

এবং রক্তে যেহেতু ব্যবসা আর টাকার নেশা, কেউ কেউ মাছের ছোটখাট ব্যবসাতেও নেমে পড়েছে। বালিজান গেটে রোজ আসে মাছের পাইকারি ব্যাপারীর দল। লরি করে সওদা নিয়ে চলে যায় ডিবরুগড়, অথবা তিনসুকিয়া জংশন। তারা দেখে মাছের ওজন, দেখে মাছ টাটকা কি না। বিল থেকে মাছ নিয়ে এল ইজারাদার, না তার অধিকারে সিঁদ দিয়ে চোরাকারবারী, কে মাথা ঘামায়?

ধরাপড়া চোরমশায় কবুল করে ফেলেছে যে, আজ রাত বারোটার পর ওই লোকগুলোর কয়েকজন যাবে রঙমালা নদী ধরে দধিমুখ বিলে মাছ চুরির সাধু উদ্দেশ্যে। ওটাও আমাদের বিল, তবে ইজারা দেওয়া।

রাত আটটা, শহরে কিছু না। কিন্তু চা-বাগানে মাঝ-রাত। গোটা চারেক নৌকো করে হাসপাতাল ঘাট থেকে আমরা যখন রওনা হলাম তখন জলজংগল অন্ধকারে হুতুমথুমো। বাচ্চাভূতের চঞ্চল চোখের মত জোনাকি জ্বলছে এদিক সেদিক। গুনগুনিয়ে 'মানুষের গন্ধ পাঁউ' গান গাইতে গাইতে দলে দলে ছুটে আসছে রক্তলোভী মশা।

সারাদিন ধরে সাধ্যসাধনা করে সেজকাকার নৌকোয় নিজের জন্য জায়গা করে নিয়েছি। নন্দেশ্বর লগি দিয়ে এক খোঁচায় নৌকো এনে ফেলল নদীর স্রোতে। তারপর ফুরফুর করে জল কেটে বড় নদীর দিকে এগিয়ে যাওয়া। একটা বৈঠার আলতো চাপেই নৌকো দিব্য চলছে। মশা-তাড়ানো তেলের শিশি হাতে ধরিয়ে দিয়ে সেজকাকা বললেন, "বোঁয়ে', তুই—"

বললাম, "বুঝেছি। তুমি বলার আগেই তেল মেখে নিয়েছি হাতেমুখে পায়ে। যা মশা। বাব্বা!"

আগে-পিছে অন্য বাহনে যাচ্ছেন অন্যান্যরা। ছোটকাকা রাঙাকাকা চোরটাকে নিয়ে। মেজকাকা ফুলকাকা আর দুটো নৌকোয়। সংগে একগাদা বন্দুক আর নেপালী দারোয়ান প্লাস চকচকে ভোজালি। মনা-বেয়ারার কাছ থেকে আমিও চুপিচুপি একটা ছুরি নিয়ে গুঁজে রেখেছি কোমরে। চোরকে মারবার জন্য নয়। শুনেছি লোহা সংগে রাখলে ভূত আসে না—তাই।

দধিমুখ বিলের প্রবেশপথেই কচুরিপানার বাধা। ঠেলেঠুলে আমরা চলে এলাম ভিতরে। এসব অঞ্চল স্থানীয় মানুষদের কণ্ঠস্থ। কাকারা আগেই ঠিক করে নিয়েছিলেন কে কোথায় নোঙর ফেলে খাপ পেতে থাকবেন। একজায়গায় নৌকো থামিয়ে চা খেয়ে যে যার ঘাঁটিতে চলে গেলেন। রাঙাকাকার কাছ থেকে চেয়ে-নেওয়া সুপারির একটুকরো মুখে পুরে দিলাম। মেজকাকার জ্বলন্ত সিগারেট একটা আগুনের বিন্দুর মত অন্ধকারে জ্বলতে জ্বলতে দূরে মিলিয়ে গেল।

আমাদের বাঁ পাশে ঘনজংগলে সর-সর মড়-মড় আওয়াজ উঠছিল। হাওয়া বইছিল আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল বড় বড় গাছগুলো। বেতঝোপ নুয়ে-নুয়ে একটা নাহর গাছের গা চুলকে দিচ্ছিল। কল্‌কল্‌ করে জল বয়ে যাচ্ছিল। দূরে বানরের কিচমিচ শুনে বোঝা গেল, গাছের নীচ দিয়ে শিকারে বেরিয়েছেন রয়েল বেংগল টাইগার। আরও দূরে, সম্ভবত রিজার্ভ ফরেস্টের দিক থেকে আকাশ থরথরিয়ে বুনো হাতির ডাক শোনা গেল। একটু আগেই মনে হচ্ছিল আমরা কজন ছাড়া বাকি পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। বোঝা গেল সে-ধারণা ভুল। অন্ধকারেও জংগল ভয়ানকভাবে জাগ্রত।

কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল জানি না। স্থির বসে ছিল নন্দেশ্বর। হঠাৎ খাড়া হয়ে বললে, "শিকারীসাহেব।"

সেজকাকা নড়লেন না, চড়লেন না। 'বোঁয়ে' বললেন না। বাঁ হাতে বন্দুকটা টেনে নিলেন কোলের উপর। পাঁচব্যাটারির টর্চটা হাতে তুলে তৈরী হয়ে নিল নন্দেশ্বর। আমার বুকের ধড়াস ধড়াস শব্দ, ভয় হচ্ছিল চোরবেটারাও না শুনে ফেলে।

আওয়াজ বেশ স্পষ্ট হল। চোখে অন্ধকার সয়ে গিয়েছিল। সাদা চাদরে গা মাথা ঢেকে গোটাকয় লোক ছপ্‌ ছপ্‌ করে পোলো দিয়ে মাছ ধরছে বিলে। আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে ভুতুড়ে মূর্তিগুলো। পোলো ফেলছে ছপ করে। তারপর সরু মুখ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে পোলোর ভিতর মাছ খুঁজছে হাতড়ে হাতড়ে।

নন্দেশ্বর উত্তেজিত চাপা গলায় বললে, "শিকারী-সাহেব, অত জলে ওরা হেঁটে হেঁটে পোলো দিয়ে মাছ ধরছে কী করে?"

সেজকাকা বললেন, "ওই লগি-ডোবা জল, আমিও তো তাই, বোঁয়ে—"

আর আমি ঝুঁকে পড়ে স্পষ্ট দেখলাম, খুব কাছের একটা চোর পোলোর ভিতর হাত ঢুকিয়ে একটা সাপ বের করে আনল। সাপটা এঁকেবেঁকে ঝুলছে। সেজকাকা বললেন, "নন্দেশ্বর—।" নন্দেশ্বর লগির এক ধাক্কায় নৌকোটা চোরটার দিকে এগিয়ে নিয়ে এল। সেজকাকা বন্দুক তুলে বললেন, "অ্যাই, কেন ঢুকিছিস আমাদের বিলে?"

সাদা ঘোমটার ভিতর থেকে চোখ নয়, যেন দু টুকরো জ্বলন্ত কয়লা আমাদের দিকে তাকাল। বুকের মধ্যে হিম ধরে গেল। কী হিংস্র ক্ষুধার্ত সেই দৃষ্টি!

দূরে একটা গুলির আওয়াজ। সাদা পোশাকপরা চোর, না পিশাচ, সেই দিকে মুখ ফেরালে। সেজকাকা আর নন্দেশ্বর জাপটে ধরলে তাকে। মাছি তাড়ানোর মত করে হাত ঝাঁকিয়ে মূর্তিটা ছপছপিয়ে চলে গেল সামনে। নৌকোর উপর উলটে পড়ে গেলেন সেজকাকা। নন্দেশ্বর জলে।

হঠাৎ, চোখের সামনে বিলের ঠিক মাঝখানে দপ্‌-দপ্‌ করে আলেয়ার মত কয়েকটা আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম শাদা শাদা মূর্তিগুলো মোটরবোটের মত জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কয়েকজনে মিলে মাথার উপর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা বস্তা। ঠিক যেন মকাইয়ের বস্তা। বস্তাটা থেকে বুকফাটা করুণ চিৎকার: হুজুর, জান বাঁচা দিজিয়ে। হুজুর...

নিভে গেল আলেয়ার আলো। মিলিয়ে গেল সাহায্যের ভয়ার্ত আবেদন। জল জংগল আবার চেতনায় ফিরে এল পরিচিত শব্দঝংকার নিয়ে।

দুদিন বাদে কচুরিপানার ভিতর থেকে পাওয়া গেল মাছে-ঠোকরানো পশ্চিমা চোরটার বীভৎস মৃতদেহ। লোকে বলাবলি করছিল, শরীরে নাকি তার এক ফোঁটা রক্ত ছিল না। ছোটকাকা বললেন, বেঘোরে বেচারার প্রাণটা গেল। অন্য-মনস্কতার সুযোগে আমাদের হাত এড়িয়ে জল সাঁতরে পালাতে গিয়ে বেটা পড়ে গেল ভূতের পাল্লায়। রাঙাকাকা বললেন, "ভূত না। পিশাচ।"

দশদশটা দিন জ্বরে ভুগে উঠলেন সেজকাকা। এবং নন্দেশ্বর। প্রবল বিকারের মধ্যে সেজকাকা বলছিলেন বার-বার, "কী ঠাণ্ডা লোকটার গা। বরফের চাঙর।" নন্দেশ্বর সেরে উঠে বলল, "ভূতের গা, না শীতকালে ব্রহ্মপুত্রের ঠাণ্ডা জল!"

জ্বর সারবার পরেও সেজকাকা অনেকদিন বোঁয়ে' বলে কাউকে কিছু বোঝানর চেষ্টা করেননি।

ছবি এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত
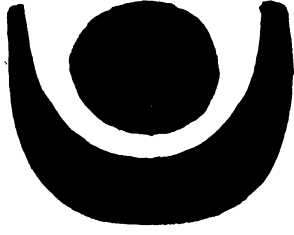
বাংলা বানানে চন্দ্রবিন্দু

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য

বাংলা বানানে চন্দ্রবিন্দু একটা চিহ্নবিশেষ। কুমড়োর ফালির মত যে সরু চাঁদ, তার মধ্যে একটা বিন্দু বসিয়ে এই চিহ্ন লেখা হয়। যে মানুষের নাম পূর্ণচন্দ্র তরফদার, তার নামের আগে যদি চন্দ্রবিন্দু চিহ্নটি থাকে, তা ঈশ্বর বা স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র তরফদার বলে পড়তে হবে। শ্রোতারা বুঝবে মানুষটি আর বেঁচে নেই। দেবতা বা পুণ্যস্থানের আগে আমরা চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করি। যেমন—ঁকালী, ঁকাশী ইত্যাদি। তবে তা পড়ার সময় ঈশ্বর কালী বা ঈশ্বর কাশী উচ্চারণ করি না।

বস্তুত, বাংলা বানানে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার বেশ কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে। রূপকথার বই 'ঠাকুরমার ঝুলি' খুললে দেখা যাবে রাক্ষস আর খোক্কসদের ভাষা চন্দ্রবিন্দু-চিহ্নে ভরপুর ঃ—

আই লোঁ মাঁই লো, নাঁতনি লোঁ নাঁতনি লোঁ,—
তোঁর মঁনে এঁই ছিল লোঁ।

কিংবা,

'বটে! ঘরে কেঁ জাঁগে? কেঁ জাঁগে? কেঁ জাঁগে?'

চন্দ্রবিন্দুর সাহায্য নিয়ে গল্পকুশলী ঠাকুরমারা সেকালে শিশুমনকে অনায়াসে রূপকথার অবাস্তব রাজ্যে পৌঁছে দিতেন। ভূতের গল্পে অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চন্দ্রবিন্দুর ক্ষমতা অপরিসীম।

বাংলা ভাষায় গুরুজনদের সম্পর্কে এবং অপরিচিত লোকের প্রতি সম্মান দেখাতে 'তিনি' এই সর্বনাম শব্দের ব্যবহার হয়। তিনি শব্দের রূপে বিভিন্ন বিভক্তিতে 'সম্ভ্রম' অর্থে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়। যথা—তাঁরা, তাঁদের, তাঁহাদের ইত্যাদি।

চন্দ্রবিন্দুর সঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে একটা নিয়ম সবাই উল্লেখ করেন। সেটা মনে রাখলে বিস্তর সুবিধা হয়। বাংলা ভাষায় গৃহীত অনেক সংস্কৃত শব্দে অনুস্বার অথবা অনুনাসিক বর্ণযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে। যথা—হংস, বন্ধন, চন্দ্র, পঞ্চ প্রভৃতি। এই সব তৎসম শব্দ ছাড়াও এগুলো থেকে জাত তদ্ভব শব্দ বাংলা শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। যথা—হাঁস, বাঁধন, চাঁদ, পাঁচ প্রভৃতি। এগুলো লেখার সময় খেয়াল করে চন্দ্রবিন্দু দিতে হয়। 'ভাণ্ডার' থেকে এসেছে 'ভাঁড়ার। অনুনাসিক বর্ণ 'ণ' 'ভাণ্ডারে' আছে ; সুতরাং তা থেকে জাত শব্দ 'ভাঁড়ার' লিখতে চন্দ্রবিন্দু এসে যাচ্ছে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে।

রেলগাড়ির চাকার নীচে পা 'কাটা' পড়ে ; কিন্তু জঙ্গলে হাঁটলে পায়ে 'কাঁটা' ফোটে। 'কণ্টক' থেকে 'কাঁটা' এসেছে। সুতরাং 'কাঁটা'-ই ফুটবে। রামবাবু লোকটি হয়তো খুব 'চাপা'। কিন্তু 'চাঁপা' ফুল যদি তিনি ভালবাসেন, তবে তিনি যে পুষ্পরসিক, সে-কথাটি আর চাপা থাকে না। 'চম্পক'-বনের চাঁপা চন্দ্রবিন্দুর মুঠির মধ্যে তো আসবেই। সংস্কৃত 'গ্রন্থ্' ধাতু থেকে বাংলায় ক্রিয়াপদ হয়েছে 'গাঁথ্'। 'গাঁথ' ধাতুর সঙ্গে 'আ' যোগ করে হয়েছে গাঁথা'। পদ্য, শ্লোক, গীতিকাব্য ইত্যাদির প্রতিশব্দ 'গাথা'য় চন্দ্রবিন্দু নেই ; কিন্তু মালা গাঁথতে গেলে সেই 'গাঁথা' চন্দ্রবিন্দুর আওতায় আসবেই। চন্দ্রবিন্দু যে কোথায় থাকে বা কোথায় থাকে না, বলা খুব সোজা না-হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা থাকলে অনেক ভুলভ্রান্তি এড়ানো যায়।

তবু চন্দ্রবিন্দুর ব্যাপারটা যে খুব মুশকিলের তাতে সন্দেহ নেই। কারণ অনেক শব্দে পূর্বোক্ত নিয়ম ছাড়াই অকারণে চন্দ্রবিন্দু হয়। 'পেচক' থেকে 'পেঁচা'। 'চোচ' থেকে চোঁচ। অথচ 'পেচকে' বা 'চোচে' চন্দ্রবিন্দু নেই। অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় আছে, যা সংস্কৃত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আসেনি। শব্দগুলো অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। হয়তো তা আদিম জাতির ভাষা থেকে গৃহীত। এই শব্দ-গুলোকে বলে দেশী শব্দ। এগুলোর মূল জানা যায়নি। এই সব অজ্ঞাতমূল শব্দের মধ্যে কয়েকটিতে চন্দ্রবিন্দু আছে। যেমন—কাঁচা, গোঁজা, ঝাঁটা, ঝুঁটি, ঢেঁকি, ডাঁশা, ঢেঁরস প্রভৃতি।

অনেক শব্দ আছে যাতে চন্দ্রবিন্দু না দিলেও চলে। খোপায় চন্দ্রবিন্দু কেউ-কেউ দেন। কেউ-কেউ দেন না। ইট ও ইঁট, দুরকমই লেখা যায়। 'উঁচু'তে চন্দ্রবিন্দু দিলেও চলে, না দিলেও চলে। এ সব ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহারে পণ্ডিতেরা একমত নন। তাঁরা একমত হয়ে খাটাখাটুনি করে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত সমস্ত শব্দের একটা তালিকা তৈরি করে ফেললে ভাল হত। কিছুদিন কষ্ট করে তালিকাটা মুখস্থ করে ফেললেই লেঠা চুকে যেত। বারবার পড়তে-পড়তে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেই আর ভুল হত না।

আমরা অনেক সময় চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নিয়ে ফাঁপড়ে পড়ি। চন্দ্রবিন্দু দেব কি দেব না, বুঝতে পারি না। চন্দ্র-বিন্দুযুক্ত শব্দের অনুকরণে অন্যশব্দে চন্দ্রবিন্দু চাপাতে চেষ্টা করি। খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছে। গরুটা চোঁচোঁ করে জল খাচ্ছে। এই সব দেখে যদি লিখি বেড়ালের বাচ্চাটা চুঁক চুঁক করে দুধ খাচ্ছে, তা হলেই সর্বনাশ। চুকচুক-এ চন্দ্রবিন্দু নেই। ঘুঁটের মধ্যে চন্দ্রবিন্দু আছে, ঘোঁটের মধ্যেও আছে ; কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারে চন্দ্রবিন্দু খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। চন্দ্র-বিন্দু ছাঁদনাতলায় আছে, লেখার ছাঁদেও আছে ; কিন্তু বাড়ির ছাদে একে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পেলে বুঝতে পারা যাবে ছাদে নির্ঘাত ভূত আছে। টাক এবং টাকায় চন্দ্রবিন্দু নেই ; কিন্তু টাঁকশালে আছে। জাঁকে আছে, জাঁদরেলে আছে, কিন্তু জাদুতে নেই। চন্দ্রবিন্দু গাঁজায় আছে, পাঁজায় আছে, পাঁজরেও আছে ; কিন্তু গাজরে নেই। 'হ-য-ব-র-ল'-র গেছো-দাদার মত দেখতে হবে চন্দ্রবিন্দু কোথায় কোথায় নেই ; তারপর খুঁটিয়ে দেখতে হবে চন্দ্রবিন্দু কোথায় কোথায় আছে বা থাকতে পারে। তবেই চন্দ্রবিন্দুর হিসেব ঠিক-ঠিক পাওয়া যাবে।

মউলির রাত

বুদ্ধদেব গুহ

পাকদণ্ডীটা সামনে বড় খাড়া।

দুপুরে ঝর্ণার পাশে খিচুড়ি ফুটিয়ে খাওয়ার পর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল হেঁটেছি আমি আর জুডু; তাও প্রায় বেশির ভাগই চড়াইয়ে-চড়াইয়ে। উৎরাই প্রায় পাইনি বলতে গেলে।

এদিকে বেলা যেতে আর বেশী দেরি নেই। পশ্চিমের দূরের পাহাড় দুটোর মাঝখানে যে একটা ত্রিকোণ ফাঁক, সূর্যটা সেই ফাঁকের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে একটা পাঁচনম্বরী লাল ফুটবলের মতো স্থির হয়ে রয়েছে। বলটা গড়িয়ে পাহাড়ের ঢালে নামলেই ঝুপ করে আলো কমে যাবে।

কিন্তু রাতের মতো তাঁবু খাটাবার জায়গার হদিশ এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

হঠাৎ জুডু বলল, "এখানেই থাকব। আর যাব না।"

এখনও যা আলো আছে, তাতে মিনিট পনেরো-কুড়ি যাওয়া যেত, কিন্তু হঠাৎ জুডুর এমন জোর গলায় "এখানেই থাকব" কথাটার মানে বুঝলাম না।

এতক্ষণ ও আমাদের পাতলা তাঁবু, আমার স্লিপিং ব্যাগ,

জাতির জীবনে

নতুন প্রেরণা 1975-76

আরও শৃঙ্খলার পথে

- শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতায় প্রভূত উন্নতি
- সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় দ্রুত ও ত্বরান্বিত কাজ সম্পাদন
- কর্তব্যের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার চেতনা
- আরও বেশী সহযোগিতার মনোভাব ও অধিস্বামিত্বের চেতনা

davp 76|153

ওর কম্বল ও রসদের ঝুলিটা কাঁধে নিয়ে আমার পিছন-পিছন আসছিল।

হঠাৎ যেখানে ছিল ও সেখানেই থেমে গেল।

দাঁড়িয়ে পড়ে, জায়গাটা ভাল করে দেখলাম। তাঁবু যে ফেলা যায় না, তা নয়; তবে এর চেয়েও ভাল জায়গা নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। জায়গাটা একটা পাহাড়ের একেবারে গায়ে। পূবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীতে উঠে গেছে ঘন জঙ্গলাবৃত পাহাড়টা। পশ্চিমে সোজা গড়িয়ে গিয়ে নীচে মিশেছে একটা উপত্যকায়। উপত্যকায় গভীর জঙ্গল। কত রকম যে গাছ-গাছালি তার লেখাজোখা নেই। সেই উপত্যকার গভীরে-গভীরে বয়ে গেছে একটা পাহাড়ী নদী। জুড়ু তার নাম জানে না।

আসলে ওড়িশার দশপাল্লা রাজ্যের বিড়িগড় পাহাড়ের এই অঞ্চলটা জুড়ুরও যে ভাল জানা নেই, তা আমি জানতাম। আমার তো নেই-ই।

আমি আর জুড়ু কাল বিকেল থেকে সেই বিরাট শম্বরটার খুরের দাগ দেখে-দেখে পেছন-পেছন যাচ্ছি, কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি। আমারও জেদ চেপে গেছে। এ-রকম অতিকায় শম্বর আমার জীবনে দেখিনি আমি। দশ বছর বয়স থেকে জঙ্গলে ঘুরছি, তবুও। আমি তো কোন্ ছার, জুড়ু বলেছিল, সেও দেখেনি। এমন দাড়িগোঁফওয়ালা ও জটাজুট-সংবলিত শম্বর যে এই বিংশ শতাব্দীতেও কোনো জঙ্গলে থাকতে পারে, এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত। আমার এবং আমার বন্ধু জর্জ ট্রিব ও কেন্ ম্যাকার্থির পারমিটে একটা বাইসন, একটা শম্বর, একটা ভালুক ও একটা চিতা মারার অনুমতি ছিল। কিন্তু কাল বিকেলের রোদে একটা পাহাড়ী নদীর নালায় দাঁড়িয়ে প্রায় আটশো গজ দূরে পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা শম্বরটাকে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছিল। জর্জ আর কেন্‌কে বলে, জুড়ুকে সঙ্গে নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম।

আমার সঙ্গে থ্রি-সিক্সটিসিক্স বোরের একটি ম্যানলিকার রাইফেল ছিল। উচিত ছিল প্রথম দর্শনেই তাকে ভূপাতিত করা। রাইফেলটা আমার হাতের রাইফেল এবং নিখুঁত মার মারত। তখন কেন যে মারলাম না, এ-কথা ভাবলেই নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল।

শম্বরটাও অদ্ভুত। এ পর্যন্ত অনেক জানোয়ারকে ট্র্যাকিং করেছি, আহত ও অনাহত, কিন্তু এমনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর থেকে গভীরতর, দুর্গম থেকে দুর্গমতর জঙ্গলে কোনো জানোয়ারই আমাকে টেনে নিয়ে যায়নি। এমনভাবে বরাবর রাইফেলের পাল্লার বাইরেও কেউ থাকেনি। সেই প্রথমবার যে তার চেহারা দেখেছিলাম, তারপর থেকে তার চেহারা সে আর একবারও দেখায়নি। দ্বিতীয়বার দেখা গেলে, সে যত দূরেই হোক না কেন, গুলি আমি নিশ্চয়ই করতাম।

হঠাৎ জুড়ু মালপত্রগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে নাক উঁচু করে বাতাসে কিসের যেন গন্ধ শুঁকতে লাগল কুকুরের মতো।

পরক্ষণেই দেখলাম, তার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে।

আমি কাঁধে-ঝোলানো রাইফেলটাকে তাড়াতাড়ি রেডি-পজিশনে ধরে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

ও কথা না বলে বাঁ হাত দিয়ে রাইফেলের নলটাকে সরিয়ে দিল।

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম, "কী রে জুড়ু?"

জুড়ু মুখে কথা না-বলে শুধু মাথা নাড়তে লাগল জোরে জোরে, দুই পাশে।

পরক্ষণেই মালপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, "বাবু, এখুনি চলো এখান থেকে পালাই। এখানে এক মুহূর্তও নয়।"

আমি তেমনি অবাক হয়ে আবারও শুধোলাম, "কী রে? একলা গুণ্ডা-হাতি? কিসের ভয় পেলি?"

জুড়ু ফ্যাকাশে মুখে বিড় বিড় করে বলল, "মউলি।"

বলেই, পিছন দিকে দৌড় লাগাল।

আমি দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরলাম।

ধমকে বললাম, "কী,হল কী তোর? আমার সঙ্গে তুই কি এই-ই প্রথম এলি জঙ্গলে? আমি সঙ্গে থাকতে তোর কোন্ জানোয়ারের ভয়?"

ওড়িশার জঙ্গলে মউলি বলে কোনো জানোয়ার আছে বলে শুনিনি। প্রায় সব জানোয়ারেরই ওড়িয়া নাম আমি জানি, যেমন শজারুকে ওরা বলে ঝিংক্, নীল গাইকে বলে ঘড়িং, মাউস্-ডিয়ারকে বলে খুরাণ্টি। কিন্তু মউলি? নাঃ। মউলি বলে তো কোনো-কিছুর নাম শুনিনি।

ততক্ষণে জুড়ু থর্‌থর্ করে কাঁপতে শুরু করেছে। ওর বুকে একটা সাদা হাড় ঝোলানো ছিল লকেটের মতো, কালো কারের সঙ্গে, সেটাকে মুঠো করে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঋজুবাবু, এক্ষুনি পালিয়ে চলো। আমরা মউলির এলাকায় এসে পড়েছি। এখানে থাকলে আমাদের দুজনের মৃত্যু অনিবার্য। ঐটা শম্বর নয়, মউলির দূত। ও আমাদের ওর পিছনে-পিছনে দৌড় করিয়ে মউলির রাজত্বে এনে ফেলেছে। এর মানে আমাদের মরণ।"

আমি ওকে ধমকে বললাম, "মউলি কী? আর তোর ব্যাপারটাই বা কী?"

জুড়ু বলল, "মউলি জঙ্গলের দেবতা, জানোয়ারদের দেবতা। জানোয়ারদের রক্ষা করেন মউলি। ওঁর রাজত্বে যে শিকারী ঢোকে, তাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হয় না।"

আমি এবার খুব জোরে ধমক দিয়ে বললাম, "থামবি তুই? তোর মউলির নিকুচি করেছি আমি। শীগগির আগুন কর, কফির জল চড়া; তারপর রান্নার ব্যবস্থা কর। ততক্ষণে আমি তাঁবু খাটিয়ে নিচ্ছি।"

জুড়ু হঠাৎ আমার দিকে একবার চকিতে চেয়েই, হঠাৎ মালপত্র ফেলে রেখে সটান দৌড় লাগাল। পিছন দিকে।

রাইফেলটা হাতেই ছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "জুড়ু, তোকে আমি গুলি করব, যদি পালাস।"

কিন্তু জুড়ু শুনল না।

তখন মুহূর্তের মধ্যে জুড়ুকে ভয় পাওয়াবার জন্যে আমি আকাশের দিকে ব্যারেল করে একটা গুলি ছুঁড়লাম।

গুলির শব্দে জুড়ু থমকে দাঁড়াল। ভাবল, ওর দিকে নিশানা করেই বুঝি বা গুলি ছুঁড়েছিলাম।

আমি বললাম, "এক্ষুনি ফিরে আয়, নইলে তোকে এই জঙ্গলেই মারব আমি, তোর মউলি তোকে মারবার আগে।"

জুড়ু কাঁপতে-কাঁপতে, মউলির ভয়ে, না আমার ভয়ে জানি না, ফিরে এল।

ওকে ভয় দেখানো ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। কারণ, জঙ্গল-পাহাড়ের এদিকটা আমার একেবারেই অচেনা। আমি একা-একা কিছুতেই আমাদের ক্যাম্পে ফিরতে পারতাম না। সেখান থেকে বহু দূরে চলে এসেছিলাম আমরা। সঙ্গের রসদও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এক রাতের মতো তৈরী হয়ে এসেছিলাম। দু রাত কাটাতে হবে ভাবিনি।

বাধ্য হয়ে জুড়ু এবার আগুন করল, কফির জল চাপালো, তারপর তাঁবুটা খাটাতে আমাকে সাহায্য করল।

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। প্রথম রাতেই চাঁদ ওঠার কথা ছিল, কিন্তু আমরা মাথা-উঁচু পাহাড়-ঘেরা এমন একটা খোলের মধ্যে এসে পৌঁছেছি যে, এখান থেকে চন্দ্র-সূর্য

কিছুই সহজে দেখা যাবার কথা নয়।

গরমের দিন হলেও, এ-জায়গাটা বেশ ভিজে স্যাঁতসেতে বোধ হয় অনেক নদী-নালা আছে বলে। নইলে শম্বরটাকে পায়ের দাগ দেখে ট্র্যাক করা সম্ভব হত না আমাদের পক্ষে।

এদিকটা ভিজে-ভিজে হলেও, পশ্চিমের পাহাড়গুলোতে দাবানল লেগেছে।

একটা বড় পাথরে বসে কফি খেতে-খেতে, পাইপটাতে তামাক ভরতে-ভরতে আমি সেই আগুনের মালার দিকে চেয়ে ছিলাম। ভারী চমৎকার লাগছিল এক পাহাড়ের গায়ে বসে, উপত্যকা-পেরুনো দূরের অন্য পাহাড়ের গায়ের আগুনের মালা দেখতে। ঐদিকে আগুন জ্বলাতে চারদিক দিয়ে গরম হাওয়া ছুটে যাচ্ছিল এদিকে।

হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, জুড়ু কফি খাচ্ছে না, হাঁটু গেড়ে বসে সেই পশ্চিমের আগুনের দিকে চেয়ে কী সব মন্ত্র-তন্ত্র পড়ছে।

ওর ঐসব প্রক্রিয়া শেষ করে জুড়ু আবারও আমাকে অনুনয়-বিনয় করে বলল, "ঋজুবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, এখনও পালিয়ে চলো।"

আমি নিঃশব্দে ওকে পাশে-রাখা আমার রাইফেলটিকে ইশারা করে দেখালাম।

ও চুপ করে গেল। রান্নার বন্দোবস্ত করতে লাগল। রান্না মানে চাল ডাল আর তার সঙ্গে দু-একটা আলু পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা ছেড়ে সেদ্ধ করে নেওয়া।

খিচুড়িটা চাপানো হয়ে গেলে, পাইপটা ধরিয়ে, জুড়ুকে ডাকলাম আমি। ব্যাগ থেকে একটা বিড়ির বান্ডিল বের করে ওকে দিয়ে বললাম, "এবার বল দেখি তুই, এই মউলি ব্যাপারটা কী? সব ভাল করে বল, খুলে বল।"

জুড়ু একটা বিড়ি ধরিয়ে পশ্চিমের দিকে পেছন ফিরে উবু হয়ে বসে, বিড়বিড় করে বলতে লাগল।

জুড়ু উপজাতীয় মানুষ। ওরা কন্দ্। ওদের মধ্যে অনেক সব বিশ্বাস, সংস্কার আছে; কিন্তু জুড়ুকে ভিতু আমি কখনোই বলতে পারব না। বরং বলব যে, আমার দীর্ঘ শিকারী জীবনে এমন সাহসী ও অভিজ্ঞ ট্র্যাকার আমি খুব কমই দেখেছি।

তাই পাইপ টানতে-টানতে জুড়ুর এই মউলি-বৃত্তান্ত আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলাম।

জুড়ু চোখ বড় বড় করে, কিন্তু ফিসফিস করে বলছিল। যেন ওর কথা অন্য কেউ শুনে ফেলবে।

বলছিল, "ঋজুবাবু, আমাদের অনেক দেবতা। টানা পেনু, ডারেনী পেনু, টাকেরী পেনু, ম্রিভি পেনু, কাটি পেনু, এসু পেনু, সারু পেনু।

"টানা পেনু আর ডারেনী পেনু একই দেবী। তিনি হচ্ছেন গ্রামের দেবী। গ্রামকে বাঁচান। প্রতি গ্রামের পাশে এই দেবীর পাথরের ঠাঁই থাকে। ডারেনী পেনুর বন্ধু টাকেরী পেনু এবং ডারেনী পেনুর ভাই ম্রিভি পেনু। ম্রিভি পেনুর মারফতই যত পুজো, আর্জি, আবদার করতে হয় আমাদের।

"কিন্তু মউলি," নামটা উচ্চারণ করেই জুড়ু একবার এদিক-ওদিক দেখে নিল, তারপর গলা আরও নামিয়ে বলল, "মউলি জঙ্গলের দেবতা। আমরা তাঁকে বড় ভয় পাই। তাঁকে পুজো দেওয়া তো দূরের কথা, মউলি যেখানে থাকেন আমরা তার ধার-কাছ পর্যন্ত মাড়াই না।"

জুড়ু এই অবধি বলে, থেমে গিয়ে বলল, "ঐ শম্বরটা আসলে শম্বর নয়। ওটা মউলির চর। আজ রাতেই মউলি আমাদের মারবে।"

আমি বললাম, "চুপ কর্ তো। তোর মতো বুড়ো, জবরদস্ত শিকারী—তুইও কিনা ভয় পাস? সঙ্গে রাইফেল নেই? তোর মউলি-ফউলি সকলের পেট ফাঁসিয়ে দেবো হার্ড-নোজড বুলেট মেরে।"

জুড়ু ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো চমকে উঠল। কানে হাত দিয়ে বলল, "অমন বলতে নেই বাবু। ঐ রাইফেলটা সঙ্গে থেকেই যত বিপদ। আজ রাত কাটলে হয়।"

আমি আবার ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, "তোর কোনো ভয় নেই, ভাল করে খিচুড়িটা রাঁধ দেখি, খিদে পেয়ে গেছে। আর আগুনটা জোর কর। অজানা-অচেনা জায়গা, হাতি থাকতে পারে, বাঘ থাকতে পারে, আগুনে আরও কাঠ-কুটো এনে ফেল, যাতে সারা রাত আগুনটা জ্বলে। একেবারে অচেনা জায়গায় তাঁবু ফেলে নিশ্চিন্ত থাকা ঠিক নয়। হয়তো এর ধারেকাছেই জানোয়ার-চলা সুঁড়িপথ থাকবে।"

জুড়ুকে বললাম বটে আগুনটা জোর করতে; কিন্তু মনে হল না, ও এই তাঁবুর সামনে থেকে এক পা-ও নড়বে।

তাই পাইপের ছাই ঝেড়ে উঠে আমিই এদিক-ওদিক গিয়ে শুকনো ডাল-খড়-কুটো কুড়িয়ে আনতে গেলাম। যখন নিচু হয়ে ওগুলো কুড়োচ্ছি, তখন হঠাৎ আমার মনে হল আমার চার পাশে যেন কাদের সব ছায়া সরে-সরে যাচ্ছে। কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে। একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্রই আমার মনে হল আমি যেন আমার সামনের অন্ধকার থেকে সেই অন্ধকারতর অতিকায় শম্বরটাকে সরে যেতে দেখলাম। শম্বরটা সরে গেল, কিন্তু কোনো শব্দ হল না।

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম এক মুহূর্ত।

পরক্ষণেই আমার হাসি পেল। নিজেকে মনে-মনে আমি খুব বকলাম। লেখা-পড়া শিখেছি, বিজ্ঞানের যুগে এ সব কী ভাবনা? তা ছাড়া, এরকম অচেনা পরিবেশে গভীর জঙ্গলে এই-ই তো আমার প্রথম রাত কাটানো নয়। ছোটবেলা থেকে আমি এই জীবনে অভ্যস্ত। এতে কোনো বাহাদুরি আছে বলে ভাবিনি কখনও। বরং চিরদিনই এই জীবনকে ভালবেসেছি। উপরে তারা-ভরা আকাশ, রাত-চরা পাখির ডাক, দূরের বনে বাঘের ডাক আর হরিণের টাঁউটাঁউ, সমস্ত তো চিরদিনই ঘুমপাড়ানী গানের মতো মনে হয়েছে। এ সবের মধ্যে কখনই কোনো ভয় বা অসঙ্গতি তো দেখিনি!

অথচ আজ কেন এমন হচ্ছে?

ফিরে এসে আগুনটা জোর করে দিয়ে পাথরটার উপরে বসে আমি পশ্চিমের পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। দাবানলের মালা পাহাড় দুটোকে যেন ঘিরে ফেলেছে। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে, তা বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার নেই। নীচের খাদ থেকে একটা নাইট-জার পাখি সমানে ডেকে চলেছে—খাপু-খাপু-খাপু-খাপু-খাপু। মাঝে মাঝে বিরতি দিচ্ছে, আবার একটানা ডেকে চলেছে অনেকক্ষণ।

আগুনে ফুট্‌ফাট্ শব্দ করে কাঠ পুড়ছে। আগুনের ফুলঝুরি উঠছে। তারপর ফুলঝুরির মাথায় উঠে কালো ছাইয়ের গুঁড়ো গোলমরিচের গুঁড়োর মতো নীচে এসে পড়ছে।

ঐদিকে তাকিয়ে বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎই আমার খেয়াল হল যে, আজ চারিদিকের পাহাড়-বনে এক একলা নাইট-জারটার খাপু-খাপু-খাপু—খাপু আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। আমাদের পাশেই তিরতির করে একটা ঝর্ণা বইছে. সেটা গিয়ে মিশেছে উপত্যকার নালায়, যেখানে ভাল জল আছে। এই গরমের দিনে সাধারণত এমন জায়গায় বসে থাকলে নীচের উপত্যকায় নানারকম জানোয়ারের চলা-ফেরার বিভিন্ন আওয়াজ শোনা যেত। হায়েনা হেঁকে উঠত

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে বুক কাঁপিয়ে। হয় উইয়ের ঢিবির কাছে নয় মহুয়াতলায় ভাল্লুক নানারকম বিশ্রী আওয়াজ করে উঁই খেত বা মহুয়া খেত। আমলকীতলায় কোটরা হরিণের ব্বাক্ ব্বাক্ ডাক শোনা যেত। শোনাত অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ডাকের মতো। কিন্তু রাতের সমস্ত প্রকৃতি যেন নিথর, নিস্তব্ধ। এমন কী, পেঁচার ডাক পর্যন্ত নেই। চতুর চিতার তাড়া-খাওয়া হনুমান - দলের হুপ্-হুপ্-হুপ্-হুপ্ ডাকে রাতের বনকে মুখরিত করা নেই। আজ কিছুই নেই।

বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ আমার মনে হল, আমি যে পাথরটায় বসে ছিলাম, ঠিক তার পিছনে আমার গা-ঘেঁষে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। কোনো মানুষ। আমি যেন আমার খাকি বুশ-শার্টের কলারের কাছে তার নিশ্বাসের আভাস পেলাম।

চমকে পিছন ফিরেই দেখি, কেউ নেই।

একটা একশো বছরের পুরোনো জংলী আমগাছ থেকে ঝুপ্ করে শুকনো পাতার উপর হাওয়ায় একটা আম ঝরে পড়ল। সেই নিস্তব্ধ রাতে সেই আওয়াজটুকুকেই যেন বোমা পড়ার আওয়াজ বলে মনে হল।

ওখানে বসে-বসে আমি লক্ষ করছিলাম যে, জুড়ু রান্না করতে-করতে মাঝে-মাঝেই বাঁ হাত দিয়ে ওর গলার হাড়ের লকেটটাকে মুঠি করে ধরছিল।

আমি উৎসুক হয়ে শুধোলাম, "ওটা কিসের হাড় রে জুড়ু?"

জুড়ু আমার কথায় চমকে গিয়ে কেঁপে উঠল।

তারপর সামলে নিয়ে বলল, "এটা অজগরের হাড়, মন্ত্র-পড়া। আজ আমাকে বাঁচালে এই হাড়টাই বাঁচাবে মউলির হাত থেকে। আমার দিদিমা আমার ছোটবেলায় মন্ত্র পড়ে এই হাড়টা আমায় দিয়েছিল।"

আমি হাড়টার দিকে অপলকে চেয়ে রইলাম। অজগরের হাড় আমি কখনই দেখিনি। আগুনের আলোতে সেই হাড়টা রঙ বদলাচ্ছে বলে মনে হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আবার পাইপ ধরিয়ে বাইরে বসেছি পাথরটার উপর, এমন সময় জুড়ু যা কখনও করেনি তাই করল।

আমার কাছে এসে বলল, "বাবু, আজ আমি কিন্তু তাঁবুর মধ্যে তোমার কাছে শুয়ে থাকব।"

আমি অবাক হলাম।

তারপর বললাম, "বেশ! তাই-ই শুস।"

যাকে মানুষখেকো বাঘের জঙ্গলে কখনও গালাগালি করে তাঁবুর মধ্যে শোয়াতে পারিনি, সেই জুড়ু আজ স্বেচ্ছায় তাঁবুর মধ্যে শুতে চাইছে!

আমি পশ্চিমের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। জুড়ু আগুনের পাশেই বসে সেই তিরতিরে ঝর্ণায় আমাদের অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা, এনামেলের থালা দুটো ও কফির কাপ দুটো ধুচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, যেন কোনো মন্ত্রবলে পশ্চিমের পাহাড়ের দাবানলগুলো সব একই সঙ্গে নিভে গেল। মনে হল, কে যেন পা দিয়ে মাড়িয়ে জঙ্গল-পোড়ানো আগুন-গুলোকে একসঙ্গে নিবিয়ে দিল।

আগুনগুলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিমের দিক থেকে একটা জোর ঝড়ের মতো হঠাৎ হাওয়া উঠল।

অথচ পূর্ব মুহূর্তে সব কিছু শান্ত ছিল।

হাওয়াটা জঙ্গলের গাছ-গাছালিতে ঝর ঝর করে সমুদ্রের আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের মতো শব্দ করে আমাদের দিকে ধেয়ে এল। এত জোরে এল হাওয়াটা যে, তাঁবুটাকে প্রায় উড়িয়েই নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকেও পাথর থেকে ফেলে দেওয়ার মতো জোর ছিল হাওয়াটার।

কিন্তু আশ্চর্য! হাওয়াটা আমাদের তাঁবু অতিক্রম করে গিয়ে একেবারে মরে গেল।

কী ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করছি, এমন সময় নীচের উপত্যকা থেকে, ক্ষেতে লাঙল দেওয়ার সময় চাষারা বলদের লেজ-মুচড়ে যেরকম সব অদ্ভুত ভাষা বলে, তেমন ভাষায় কারা যেন কথা বলতে লাগল। মনে হল, কারা যেন এই এক রাতে পুরো উপত্যকাটা চষে ফেলবে বলে ঠিক করেছে।

সেই আওয়াজটাও দু মিনিট পর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

একটু পরে চাঁদ উঠল।

জুড়ু বলল, "বাবু, শুয়ে পড়ো। আজ আর বাইরে বেশী বসে কাজ নেই। চলো, শুয়ে পড়বে।"

সত্যি কথা, আমার একটু যে ভয় করছিল না তা নয়, কিন্তু ভয়ের চেয়েও বড় কথা, পুরো জায়গাটা, এই রাতের বেলার জঙ্গলের অদ্ভুত শব্দ ও কাণ্ড দেখে আমার দারুণ এক ঔৎসুক্য জেগেছিল। ভূত-প্রেতে আমি কখনও বিশ্বাস করিনি। হাতে একটা রাইফেল থাকলে পৃথিবীর যে কোনো বিপদ-সঙ্কুল জায়গায় আমি হেঁটে যেতে পারি, রাতে ও দিনে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত মানুষখেকো বাঘের থাবায় নিহত মানুষের অর্ধভুক্ত শবের কাছে কাটিয়েছি। একবার শুধু একটা মরা-মানুষের পা সটান সোজা হয়ে উঠেছিল। তখনও ভয় পাইনি, কারণ তারও একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য কারণ ছিল। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আমি কখনও হইনি এর আগে। ঠিক কী ভাবে এই অনুভূতিকে গ্রহণ করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

এই খন্দমালে আমার এই-ই প্রথম আসা নয়। আগেও বহুবার আমি এই অঞ্চলে এসেছি। কন্দদের নিয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা যায় করেছি। তাদের রীতি-নীতি দেব-দেবতা, সংস্কার-কুসংস্কার সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল।

কিন্তু জঙ্গল জীবনের আমার সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়েও এই সব কাণ্ডর কোনো ব্যাখ্যাতেই আমার পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছিল না।

কন্দরা ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের সীমানার গঞ্জাম জেলার একটি জায়গায় বাস করত বহু-বহু বছর আগে। জায়গাটা ছিল খুব উঁচু-উঁচু পাহাড়শ্রেণী আর জঙ্গলে ঘেরা। জায়গা-টার নাম ছিল শ্রাম্বুলি-ডিম্বুলি। সেখান থেকে এসে এরা এইখানে বাসা বাঁধে অন্যদের তাড়া খেয়ে। ওরা মনে করত যে, এইসব মাথা-উঁচু পাহাড়ের পরই পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে। ওদের রাজ্য থেকে সামনে যতদূর চোখ যায়, ততদূর আদিগন্ত এমন গভীর জঙ্গলাবৃত পাহাড় ও জমি দেখা যেত যে, তাতে মানুষ কখনও বসবাস করতে পারে একথা কেউই ভাবেনি। ওদের মধ্যে একটা জনশ্রুতি আছে যে, যখন কন্দরা এইসব পাহাড়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল তখন তৎকালীন পাহাড়ী আদিবাসী কুর্মুরা তাদের সমস্ত জমি-জমা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কন্দদের হাতে দিয়ে এইসব পাহাড়ের উপরের সমতল মালভূমি থেকে মেঘের ভেলায় চেপে চিরদিনের মতো অন্তর্ধান করেছিল। কন্দরা মনে করত যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা জামো পেনুর বড় ছেলের থেকে কুর্মুরা উদ্ভূত হয়েছে এবং কন্দরা উদ্ভূত হয়েছে জামো পেনুর সবচেয়ে ছোট ছেলের থেকে।

কিন্তু মউলি সম্বন্ধে আমি কখনও কিছু পড়িনি বা শুনিনি।

জুড়ু আবারও বলল, "বাবু, শুয়ে পড়ো। বাইরে থেকো না আর।"

তাঁবুর দু-পাশের পর্দা তোলা ছিল। গরমে এমন করেই আমরা শুই। জঙ্গলে গরমের দিনেও শেষ রাতে ভারী হিম পড়ে। তাই মাথার উপর তাঁবু থাকলেই যথেষ্ট। প্রথম রাতে গরম লাগে, তাই যাতে হাওয়া চলাচল করতে পারে তার জন্যে পর্দা খোলা থাকে।

তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই জুড়ু বলল, "বাবু, আজ পর্দা খুলে শুয়ো না।"

ওকে আমি ধমকে বললাম, "চুপ কর্ তো তুই। গরমে কি মারা যাব নাকি?"

তারপর প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে বললাম, "শম্বরটা কোন্-দিকে গেছে বল তো? আমার মনে হয়, ও ধারেকাছেই আছে। হয় নীচের নালার পাশে, নয়তো সামনের মালভূমির উপরে। কাল ভোরেই ওর সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হবে।"

জুড়ু তাঁবুর মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে সেই অজগরের হাড়টা ছুঁয়ে কী সব বিড়বিড় করে বলল। একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। ও বলল, "বাবু, আপনি বিশ্বাস করছেন না যে ওটা শম্বর নয়? অতবড় শম্বর যে হয় না এ-কথা আমার ও আপনার দুজনেরই বোঝা উচিত ছিল। আপনাকে বলছি আমি যে, ওটা মউলির চর।"

আমি যত না জুড়ুকে সাহস দেবার জন্যে বললাম, তার চেয়েও বেশী নিজেকে সাহস দেওয়ার জন্যে আবারও বললাম, "তোর মউলির নিকুচি করেছি।"

বলেই, রাইফেলের বোল্ট খুলে, আরো দুটি গুলি ভরে নিয়ে ম্যাগাজিনে পাঁচটা ও ব্যারেলে একটা রেখে, সেফটি ক্যাচ্টা দেখে নিয়ে জুতোটা খুলে ফেলে স্লিপিং ব্যাগের উপরে শুয়ে পড়লাম।

জুড়ু আমার পাশ ঘেঁষে শুলো।

সারাদিনে প্রায় দশ-বারো মাইল হাঁটা হয়েছে চড়াইয়ে-উৎরাইয়ে, বেশির ভাগই জানোয়ার-চলা সুঁড়িপথ দিয়ে। পথ বলতে এখানে কিছুই নেই। তারপর পেটে খাবার পড়েছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল।

বাইরে এখন কোনো শব্দ নেই। শব্দহীন জগতে জঙ্গল-পাহাড় উদ্ভাসিত করে চাঁদ উঠেছে। তাঁবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে। নীচের উপত্যকার সাদা-সাদা পত্রশূন্য গেণ্ডুলী গাছগুলোর ডালগুলোতে চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে।

মাঝে-মাঝে এই নিস্তব্ধ শব্দহীন পরিবেশকে চমকে দিয়ে নাইট-জার পাখিটা খাপু খাপু খাপু খাপু করে ডেকে উঠছে শুধু।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

হঠাৎ জোর ঝড়ের মতো হাওয়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ খুলেই, জঙ্গলে অস্বস্তি লাগলে যে-কোনো শিকারী যা করে, আমি তাই-ই করলাম। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, তাঁবুর গায়ে হেলান দিয়ে যেখানে লোডেড রাইফেলটা রেখেছিলাম সেদিকে।

কিন্তু রাইফেলটা পেলাম না।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখি রাইফেলটা লোপাট।

জুড়ুও নেই।

কোথায় গেল জুড়ু?

বাইরে তাকিয়ে দেখি, চাঁদ ডুবে গেছে পাহাড়ের আড়ালে। আর সেই অন্ধকারে শুধু সবুজ তারাগুলো নরম আলো ছড়াচ্ছে গ্রীষ্মের বাদামী জঙ্গলের উপর।

বালিশের তলা থেকে টর্চটা বের করে তাঁবুর বাইরে বেরোলাম। টর্চ জেলে এদিক-ওদিক দেখলাম। বার বার ডাকলাম, জুড়ু, জুড়ু, জুড়ু।

সেই ঝড়ের মতো হাওয়াটা শুকনো ফুলের মতো আমার ডাককে উড়িয়ে নিয়ে গেল। পাহাড়ে-পাহাড়ে যেন চতুর্দিক থেকে ডাক উঠল জুড়ু-জুড়ু-জুড়ু।

কিন্তু জুড়ুকে কোথাও দেখা গেল না। তাঁবুর ভিতরে ফেরার চেষ্টা করলাম। আমার টর্চের আলোয় তাঁবুর মধ্যে কী একটা সাদা জিনিস পড়ে থাকতে দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখি জুড়ুর গলার সেই অজগরের হাড়টা।

কে যেন আমাকে বলল, হাড়টা কুড়িয়ে নাও।

আমি দৌড়ে গিয়ে হাড়টা কুড়িয়ে নিয়ে আমার বুক পকেটে রাখলাম।

ততক্ষণে হাওয়াটা এত জোর হয়েছে যে, তাঁবুর মধ্যে থাকাটা নিরাপদ বলে মনে হল না আমার। যে-কোনো মুহূর্তে তাঁবু চাপা পড়তে হতে পারে।

আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে সেই পাথরটার উপরে বসলাম। নিজেকে স্বাভাবিক করার জন্যে পাইপটা ধরাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঐ হাওয়াতে কিছুতেই দেশলাই জ্বলল না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হাওয়াটা তাঁবুটাকে উল্টে ফেলল। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা হাওয়ার তোড়ে গড়িয়ে গিয়ে একটা পাথরে গিয়ে ধাক্কা খেল। টং করে আওয়াজ হল।

ধাতব আওয়াজটা শুনে ভাল লাগল। এটার মধ্যে অন্তত কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

হাওয়াটা যত জোর হতে লাগল, আমার মনে হতে লাগল নীচের উপত্যকা থেকে সবগুলো গাছ মাটি ছেড়ে উঠে আস্তে-আস্তে আমার দিকে হেঁটে আসছে। পিছনে তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ের গা থেকেও যেন গাছগুলো নেমে আমার দিকে হেঁটে আসছে। তাদের যেন পা গজিয়েছে। হাওয়াতে ডালপালাগুলো এমন আন্দোলিত হচ্ছিল যে, আমার মনে হল ওরা যেন ওদের হাত নেড়ে নেড়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে।

জঙ্গলে কখনও রাইফেল-বন্দুক ছাড়া থাকিনি। নিদেন-পক্ষে কোমরে পিস্তলটা গোঁজা থাকেই। অস্ত্র থাকলেও করার আমার কিছুই ছিল না, কিন্তু তবুও হয়তো এতটা অসহায়, নিরাশ্রয় লাগত না নিজেকে।

ভয়ে আমার কপাল ঘেমে উঠল।

আর-একবার জুড়ুকে ডাকবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বার হল না।

হঠাৎ দেখলাম দক্ষিণ দিকে গাছের-গুঁড়িতে-আটকে-থাকা ভূলুণ্ঠিত তাঁবুটার ঠিক সামনে সেই শম্বরটা দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পিঠের উপরে ভীষণ লম্বা রোগা একজন ঝাঁকড়া চুলওয়ালা নগ্ন লোক বসে আছে—একেবারে শিংটার পিছনে।

হঠাৎ আমার চতুর্দিকে গাছেদের সঙ্গে-সঙ্গে যেন নানা জানোয়ারও আমাকে ঘিরে ফেলতে লাগল। শম্বর, হরিণ, কোটরা, নীলগাই, শুয়োর, শজারু—যেসব জানোয়ার আমি ছোটবেলা থেকে সহজে শিকার করেছি। আমার মনে হল ঐ মহীরুহগুলো আর জানোয়ারগুলো আমাকে পায়ে মাড়িয়ে আজ পিষে ফেলবে।

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বলবার চেষ্টা করলাম, আর করব না। আর শিকার করব না। আমাকে ক্ষমা করো।

কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হল না।

আমি পিছন ফিরে দৌড়ে পালাতে গেলাম। কিন্তু আমার চারিদিকে ঐ শম্বরটা ঐ লোকটাকে পিঠে নিয়ে ঘুরতে লাগল।

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। আমি কাঁদতে গেলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে তবুও স্বর বেরোল না।

আমি আরেকবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না, পড়ে গেলাম।

তারপর আর কিছু মনে নেই আমার।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে আমার চোখের সামনে সেই প্রাগৈতিহাসিক সবুজ-রঙা শম্বরটার বড়-বড় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

॥ ২ ॥

কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছিল।

যেন অনেক দূর থেকে ডাকছিল, যেন স্বপ্নের মধ্যে ডাকছিল। যেন আমার মা ছোটবেলা স্কুল থেকে ফেরার পর আমার খাবার দিয়ে আমাকে ডাকছিলেন।

কে যেন বড় আদর করে, আনন্দে আমাকে ডাকছিল।

আস্তে আস্তে আমি চোখ খুললাম।

দেখি, আমার মুখের দিকে ঝুঁকে তিন-চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রবল জ্বরে যেমন ঘোর থাকে, তেমনই ঘোরে ছিলাম আমি।

চোখ খুলতে আমার ভারী কষ্ট হল।

অনেক কষ্টে চোখ খুলতেই রোদে আমার চোখ ঝলসে গেল। কে যেন আমার মাথাটাকে তুলে ধরে নিজের কোলে নিয়ে বসল।

আবার আমি তাকালাম, এবার দেখলাম, আমার মাথাটাকে কোলে নিয়ে বসে জুড়ু আমার মুখের উপর মুখ ঝুঁকিয়ে বসে আছে।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, আমার দুই বন্ধু জর্জ আর কেন্ আমার দুপাশে বসে আছে।

জর্জ বলল, "হাই ঋজু! হাউ ডু ইউ ফিল?"

জর্জ, আমার মাটিতে পড়ে-থাকা পাইপটা তুলে নিয়ে, নিজের টোব্যাকো-পাউচ থেকে বের করে গ্রী-নান টোব্যাকো ভরে দিতে লাগল।

আমি উঠে বসলাম।

আমার কফি খাওয়া শেষ হলে, জর্জ পাইপটা ধরিয়ে দিল ওর লাইটার দিয়ে।

ওরা দুজনে হাসছিল।

কেন্ হাসতে-হাসতে আমাকে বলল, "হোয়াট ডিড ইউ সী লাস্ট নাইট। ঘোস্ট্?"

আমি উত্তর দেবার আগেই জর্জ হাসতে-হাসতে বলল, "মাই ফুট।"

আমি উত্তর দিলাম না।

শুধু জর্জ বা কেন্ বলে কথা নেই, আমার সভ্য শিক্ষিত, শহুরে বন্ধুদের কেউই যে আমার কথা বিশ্বাস করবে না, তা আমি জানি।

কফি খেয়ে আস্তে-আস্তে উঠে পড়লাম। মাথাটা ভার। চোখে ব্যথা।

জর্জ বলল, "ইউ আর এ সীলি গোট। কেন্ শট আ টাইগার লাস্ট মর্ণিং ইন দি ফার্স্ট বীট্। অ্যান্ড ইউ কেম হিয়ার টু শুট আ ঘোস্ট্!"

জুড়ু ইংরিজী বোঝে না।

ও মালপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে রওয়ানা হবার জন্যে তৈরী হল।

জর্জ আর কেন্ আগে-আগে হাঁটতে লাগল।

জুড়ু ফিসফিস করে বলল, "বাবু, আমাকে মাপ করো, আমি না পালিয়ে গিয়ে পারি নি। আমার কিছু হত না। অজগরের মন্ত্রপড়া হাড় শুধু আমার কাছেই ছিল। তুমি আমার কথা শুনলে না—তাই তোমাকে ওটা দিয়ে আমি পালাতে বাধ্য হলাম।"

জর্জ পিছন ফিরে শুধোলো, "আর য়ু ডিসকাসিং বাউট দ্য ফিচারস অফ দ্য ঘোস্ট্? ইউ সিলি কাওয়ার্ড!"

আমি জবাব দিলাম না।

যেই ওরা আবার সামনে মুখ ফেরাল, আমি তাড়াতাড়ি বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে অজগরের হাড়টাকে জুড়ুর হাতের মুঠোয় লুকিয়ে দিয়ে দিলাম।

কেন্ বলল, "উই হ্যাভ সীন সাম পি-ফাউলস অন আওয়ার ওয়ে আপ্ হিয়ার। লেট্স্ শুট আ কাপ্ল্। জর্জ হ্যাজ হিজ শটগান উইথ্ হিম।"

আমি বললাম, "আই অ্যাম গোয়িং টু গিভ্ আপ্ শুটিং ফর গুড।"

জর্জ আর কেন্ দুজনে একই সংগে কল্‌কল্ করে হেসে উঠল।

বলল, "ওঃ ডিয়ার; ডিয়ার। দ্যাটস্ দা জোক অফ দা ইয়ার।"

আমি আর জুড়ু পাশাপাশি হেঁটে চললাম।

আমার বন্ধুদের কথার কোনো জবাব দিলাম না।

কারণ জবাব দিয়ে লাভ ছিল না কোনো।

ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

দয়ালু রাজা

নবনীতা দেবসেন

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁকে দেশের লোকেরা খুব ভালবাসে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না। রাজা যেন ঠিক আর-সব রাজাদের মতন নন। একটু আলাদা রকম মানুষ। রূপসায়রের পাড়ে একটা মেলা বসে প্রত্যেক ঝুলন-পূর্ণিমাতে। সেখানে সবদেশের সদাগরেরা বেসাতি নিয়ে আসে, যার যেটা সবচেয়ে ভাল জিনিস, রাজা সেটা কিনে নেন। তারপর যার কাজে লাগবে তেমন কাউকে দান করেন। যেমন ধরো, হিমানীপুরে থেকে সদাগরেরা সবাই আনে গরম ঘরকে ঠাণ্ডা করবার যন্ত্র। রাজা সবচেয়ে ভাল যন্ত্রটি কিনে দেশের সবচেয়ে ভাল গোয়ালাকে দিলেন। তার মাখন, ক্ষীর যাতে গরমে নষ্ট হয়ে না যায়। লেখনীপুরের সদাগরেরা আনে কলম। খাগের কলম, হাঁসের পাখার কলম, ময়ূরপাখার কলম, রুপোর কলম জড়োয়া-পাথর-বসানো কলম, একসঙ্গে লাল কালি, নীল কালি ভরা যায় এমনি দু'নলা ঝর্না কলম, এইসব। রাজা সবচেয়ে ভাল কলমটি কিনে কবিশেখরকে দিলেন। এমনি আর কী। রাজার যেমন দয়ার শরীর, তেমনি ধীরস্থির বুদ্ধি, আর খুব সাহসী তিনি। একবার পরদেশ থেকে অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে এক দস্যুরাজা এসেছিল, রাজা তখন গিয়ে এমন যুদ্ধ করলেন, দেশের লোকেরা অবাক হয়ে গেল। সেই থেকে তারা জানলে যে, তাদের রাজা অস্ত্রচালনায় পটু। আগে এ-খবরটা কেউ জানতই না। জানবে কী করে? এ-রাজা যে মৃগয়া করেন না! তিনি বলেন, আহা, বনের পশু বনে আছে, থাকুক। শুধু শুধু কেন তাদের কষ্ট দেওয়া। রাজাকে দুষ্টু লোকেরা পিছনে বলত—ভীরু, বনে যেতে ভয় পান। কিন্তু পরদেশী রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তারা দেখলে, রাজা কত সাহসী—প্রাণে ভয়ডর বলে কিছু নেই। দুষ্টু লোকেরা লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল।

রাজা আপনমনে রাজ্যময় ঘুরে বেড়ান পায়ে হেঁটে। কবিশেখরই তাঁর মন্ত্রী, রাজা নিজেই রাজ্যের সেনাপতি। রাজ্যে কোটাল বলে কেউ নেই। দেশে কাউকেই শূলে চড়ানো কিংবা ফাঁসি দেওয়া হয় না। কেউ চুরিচুরি করলে সেপাইরা ঠিক তাদের ধরে ফেলে; আর তাদের দুবছরের জন্যে একটা দ্বীপে খানিকটা জমি দিয়ে দেওয়া হয়। সেই জমিতে তারা কুটির বাঁধে, চাষবাস করে, একা একা থাকে। থাকতে থাকতে একটা মায়া পড়ে যায়। তখন তাদের বৌ-বাচ্চাদের সেখানে পাঠিয়ে দেন রাজা, তারা বৌ-বাচ্চাদের নিয়ে সেখানেই থাকে। আর চুরি করে না।

দেশে সবাই যথেষ্ট খেতে পায়, পরতে পায়, তাই চুরি-জোচ্চুরি করেও না কেউ বড়-একটা। সবাই মিলে সুখে-শান্তিতে থাকে।

রূপসায়রের মেলায় ব্যাধেরা কত পাখি ধরে আনে। রাজা একা সমস্ত পাখি কিনে নেন। তারপর প্রতিপদের ভোর-বেলায় সূয্যি ওঠার সময়ে তাদের খাঁচার দরজাগুলি খুলে দেন। বনের পাখিরা রাজাকে আশীর্বাদ করতে-করতে বনে উড়ে যায়।

রাজা মাছ খান না, মাংস খান না, ডিম খান না, জ্যান্ত

প্রাণী মেরে খাবার কথা ভাবতেই তাঁর মনে এত কষ্ট হয়।

রাজার রাজভোগ হয় ফলে, ছানায়, শাক-সব্জিতে; দুধে-ভাতে।

রানীদের এসব মোটে পছন্দ হয় না। রাজার তিনটি রানী। বড় রানী ধবধবে সাদা, সোনালী ঢেউ-খেলানো তাঁর চুল, নীল কাচের মতন চোখ। তিনি বেশ মিশুক। মেজরানীর গায়ের বর্ণ কাঁচা হলুদ, চোখ দুটি যেন বাদামচেরা, কুচকুচে কালো; খাড়াখাড়া পা-পর্যন্ত লম্বা ইয়া ভারী চুলের বহর—ছোটখাট্ট লাজুক মানুষটি। আর ছোটরানী? তাঁর গায়ের বর্ণ মাকালীর মত ঘনশ্যাম, কোঁকড়া-কোঁকড়া, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া একমাথা চুল, হাসিটি সেই কালো মুখে শ্বেতপদ্মের মতন ফুটে আছে—ঠিক যেন স্বয়ং শ্যামা-মা। কিন্তু শরীরে তাঁর রাগ নেই। তিন রানীতে খুব ভাব। কখখনো ঝগড়া হয় না। রাজা যখন যুবরাজ ছিলেন, একবার দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তখন নানাদেশ থেকে এইসব রত্নের মতন কন্যেগুলিকে কুড়িয়ে এনেছেন। এঁরা সবাই যে রাজকন্যে, তাঁদের হাবভাব, চলাফেরা দেখলেই তা বেশ বোঝা যায়। প্রত্যেকের মুখে নরম মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। কিন্তু কেউই তাঁরা রাজার ভাবসাব বোঝেন না। রাজামশাইয়ের বিধবার মতন নিরিমিষ্যি আহার, তাঁর ফকিরের মতন হেঁটে-হেঁটে রাজ্যিময় ঘোরা, তাঁর সোনার মুকুট পরতে লজ্জা করা, এসবই রানীদের আশ্চর্যি লাগে। রাজা মাথায় একটা মোটা জুঁই ফুলের গোড়ে মালা জড়িয়ে রাখেন—তার নীচে রাজমুকুটটা লুকোনো থাকে। রাজার হাতে নানা ফুলের গাঁথা একটা ছড়ি থাকে, সেটা ঘোরাতে-ঘোরাতে উনি পথ হাঁটেন। তার ভেতরে
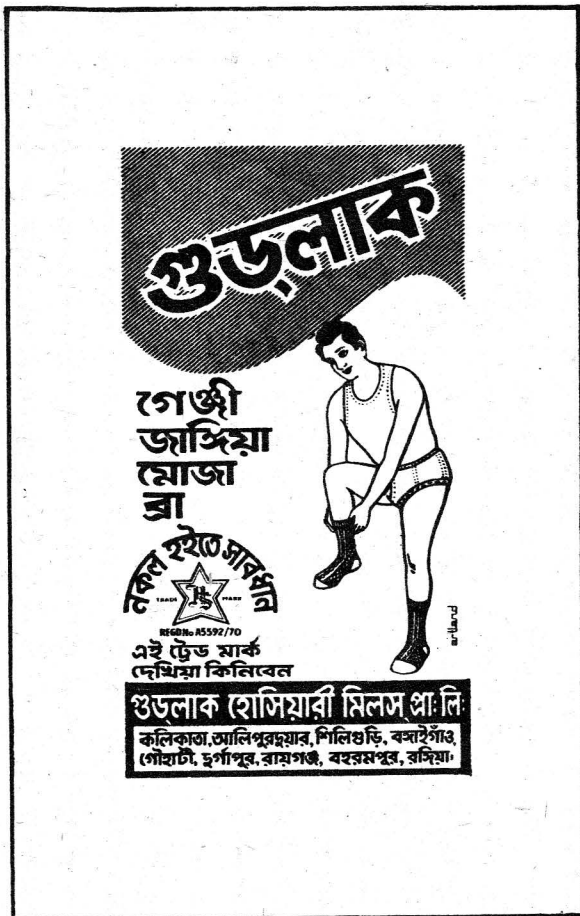
রাজদণ্ড লুকোনো আছে কি না-আছে, কেউই জানে না, এমন কী রানীরা পর্যন্ত না। তাঁরা নিজের দেশে যেমনটি দেখে এসেছেন, এ-রাজার সঙ্গে তার কিছুই যেন মেলে না। তাঁরা যত দেখেন, তত আশ্চর্যি হন।

রানীরা আবার অন্তঃপুরচারিণী নন। রাজা মোটে ভালবাসেন না কেবল অন্তঃপুরে থাকা। বলেন, তোমরাই দেশের লোকেদের মা। মায়ের কখনো সন্তানের কাছে পর্দার আড়াল হলে চলে? রানীরা তাই রাজার পাশে-পাশে তিনটি সিংহাসনে সভায় বসেন রোজ সকালে। বিচার যখন চলে, রাজা তখন রানীদেরও মত চান। রাজার দয়ালুপনাতে মাঝে মাঝে কিন্তু রানীদের খুব রাগ হয়ে যায়। কিন্তু মুখে প্রকাশ করেন না, লোকে তাহলে মন ছোট ভাববে কি-না।

একদিন একজন মৃত্যুমুখী ব্রাহ্মণ এসে বলল, মরবার সময়ও তার মনে শান্তি নেই। কেননা তাঁর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। বোবাকালা বলে সে-মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না। রাজা বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে আমিই তাকে বিয়ে করব। ব্রাহ্মণ, আপনি মেয়েকে ডাকুন।" গরিব ব্রাহ্মণ তো অবাক! সে নিজের কানকে নিজে বিশ্বাস করতে পারলে না। তার বোবাকালা মা-হারা অভাগী মেয়েটা হবে রাজরানী? সে আহ্লাদে দুহাত তুলে রাজাকে আশীর্বাদ করতে-করতে সেখানেই মরে গেল। রাজা তার মেয়েটিকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন। মেয়ের গায়ের রঙটি ঠিক যেন গঙ্গাজলের মত গেরুয়া-বাদামী। তার চোখ দুটি যেন তাতে ভেসে-বেড়ানো দুটি কালো-সাদা রাজহাঁস, সে-চোখে আজন্ম দুঃখের কাজল পরানো। এক-আকাশ মেঘের মত চুল, কেউ বেঁধে দেয়নি। মা নেই কিনা তার। পরনে ছেঁড়া ধানীরঙের শাড়ি, যেন গঙ্গার ধারে ধানক্ষেত! পদ্মলতা হাত দুটিতে দুটি রুলিও নেই, পায়ে নূপুর নেই, কানে মাকড়ি পর্যন্ত নেই। এত গরিব তারা। রাজা অবাক হয়ে ভাবলেন, আহা, আমার রাজ্যে এত গরিবও আছে! এবার তো আরও ভালো করে দেখতে হবে, আরও ঘুরে ঘুরে।

বড়-মেজ-ছোটরানী তিনজনে বাঁহাত দিয়ে বরণ করে হেলায় অচ্ছেদ্দায় নতুন রানীকে ঘরে তুললেন। তাঁরা তিনজনেই সুন্দরী, কিন্তু এই বোবাকালা মেয়ের দুঃখিনী রূপের কাছে তাঁরা যেন বাসীফুলের মতন মলিন হয়ে গেলেন। বড়রানী, মেজরানী, ছোটরানীর খুব হিংসে হল। এদিকে বোবাকালাকে হিংসে করতেও লজ্জা। তাকে তো ক্ষ্যামাঘেন্না দয়াধর্ম করতেই হবে। সে যে ধরিত্রীর মত চুপচাপ। অথচ রানীমায়েরা কিছুতেই মন থেকে তাকে ভালবাসতে পারছেন না। থালার কোণে ছাই বেড়ে খেতে দেন।

বামুনের মেয়েও মনে জানে, রানীরা তাকে ভালো চোখে দেখেননি। তাই সে প্রাণপণে খাটে। খেটেখেটে রানীদের মন রাখতে চায়। তাঁদের চুল ধুয়ে দেয়, চুল শুকিয়ে দেয়, পায়ে আলতা পরিয়ে দেয়, নখ কেটে দেয়, কাপড় কেচে দেয়, দাসী, নাপতিনী, ধোপানী সকলের কাজ একা করে। রাজবাড়ির দাসীদের কাজের ছুটি আছে, নতুন রানীর ছুটি নেই। সারারাত রানীদের বাতাস করে মশা তাড়িয়ে দেয়, পা টিপে দেয়। সে ভাল করে খায় না, ভাল করে ঘুমোয় না, কেবলই এক মনে রানীদের সেবা করে। তারপর একদিন তার একটি মেয়ে হল। তিন রানীকে নিয়ে রাজা গেলেন মেয়ে দেখতে। গিয়ে দেখেন মেয়ে মায়েরই মতন সুন্দরী। তিন রানীর খুব রাগ হল। তাঁরা ঠিকরে চলে এলেন। রাজা আদর করে মাথার জুঁইফুলের গোড়ে মালাটি মেয়ের গলায় পরিয়ে

দিলেন। অমনি তার বোবা মায়ের দুঃখী দুঃখী ভাবটি কেটে গিয়ে তাকে যেন দুর্গাপ্রতিমার মতন দেখতে হয়ে গেল।

এমন সময়ে একবার রাজপুত্তুরের খুব অসুখ করল। রাজবৈদ্য কিছুতেই সারাতে পারে না, কত হাকিম, কত বদ্যি এল গেল। শেষকালে দৈববাণী হল একদিন, "যদি কোনো মা তার সন্তানকে ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে মা কালীর কাছে বলি দিয়ে সেই রক্ত এনে রাজার ছেলের কপালে ছোঁয়ায়, তাহলেই রাজার ছেলে বাঁচবে। নইলে ঐ রাতেই তার মৃত্যু।"—রাজা শুনেই হুকুম জারী করলেন, "খবরদার! আমার ছেলের বেঁচে কাজ নেই। তার আয়ু যদি ফুরিয়ে থাকে, আমরা টানাটানি করে বাড়াতে পারব না। কিন্তু কোনো প্রজা যেন তার সন্তানকে বলি দিতে না যায়।"—রাজাকে খুশি করবার লোভে লোকে যে কত কী পাগলামি করে ফ্যালে তার তো ঠিক নেই। কারুর হয়ত দশটা ছেলেমেয়ে। সে এত গরিব সব ক'টাকে খেতে পরতে দিতে পারে না, সে তখুনি একটাকে বলি দিতে রাজী। তার বদলে রাজা নিশ্চয় অনেক ধন-সম্পত্তি দেবেন, তার অন্য নজন ছেলেমেয়ে ভালভাবে বেঁচে যাবে। এইসব হিসেব করে অনেকে। দুঃখে কষ্টে মানুষের হিসেব অনেক সময় অন্যরকম হয়ে যায় কিনা, রাজা তাই আগেই বারণ করে দিলেন সবাইকে।

রাজপুত্তুর এদিকে মারা যাচ্ছেন। তার দেহ বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। চার মা সারাদিন সেবা করেন। আর কাঁদেন। দয়ালু রাজার মুখে আর হাসি নেই। দেখতে দেখতে ঝুলন পূর্ণিমা এসে পড়ল। রূপসায়রে মেলা বসবে। বাইরের দেশের সদাগরেরা এল। রাজার মুখে হাসি নেই। দেশে আনন্দ নেই। কী হল? না রাজার ছেলে মারা যাচ্ছে। আজই তার শেষ রাত্রি। শুনে সদাগরেরা ছাউনি গুটিয়ে ফেলে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বসল।

রাজপুরীতে রাত্রি যেন কাটছে না। রাজা বিলাপ করছেন —"হে পূর্ণিমার রাত্রি, তুমি পোহায়ো না, হে আমার পুত্রের আয়ু, তুমি ফুরায়ো না।" রাজার খাওয়া নেই, ঘুম নেই— রাজা ছেলে কোলে করে ঠায় বসে আছেন। তিন রানী লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছেন। সোনার চাঁদ রাজপুত্তুরের চোখে চাউনি নেই। মুখে কথা নেই। নিশ্বাসটুকু পড়ে কি পড়ে না। ছোট্ট রাজকন্যেকে কোলে নিয়ে নতুন রানী পাশেই স্থির হয়ে বসে ভগবানের নাম করছেন মনে মনে। তাঁর মুখে তো শব্দ নেই। শুধু চোখ দিয়ে জল ঝরছে। ভোরের দিকে রাজা একবার চেয়ে দেখেন কি, চারজন রানীই উঠে গেছেন। রাজার খুব মন খারাপ হল। ছেলের শেষ সময়ে মা হয়ে তাঁরা উঠে গেলেন! তারপর ভাবলেন, হয়তো খুব নরম মন বলে এ-দৃশ্য দেখতে পারছেন না। বসে থাকতে-থাকতে কাঁদতে-কাঁদতে রাজার ভোরের দিকে একটু যেন তন্দ্রা মতন এসেছিল। আসলে তিন রানী তখন ঠাকুরঘরে হত্যে দিয়ে আছড়ে পড়েছেন। হঠাৎ রাজার মনে হল যেন রাজপুত্তুর চোখ মেলেছেন। ভাল করে চেয়ে দ্যাখেন—তাই তো? ঝুলন পূর্ণিমার চন্দ্রদেব কখন অস্ত গেছেন—পুব আকাশ আলো করে দিনমণি সূর্য উঠছেন, আর রাজপুত্তুর বাবার মুখের দিকে চেয়ে অল্প-অল্প হাসছেন!

এ কী হল? তবে তো দৈববাণী ভুল! রাজার ছেলের তো আয়ু ফুরিয়ে যাবার কথা এই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে? তাহলে? রাজা হঠাৎ দেখেন, ছেলের কপালে তাজা রক্তের টিপ!

কে দিলে? কে দিলে? কখন দিলে? কে করলে অমন ভয়ানক কাজ? কোন্ নিষ্ঠুর মা, কোন্ লোহার হৃদয় বাবা রাজার ছেলের প্রাণটা ফিরিয়ে দিয়ে গেল গো?

রাজা পিছনে, সামনে, আশপাশে কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না। তিন রানীমা ছুটে এলেন। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু নতুন রানী এলেন না। রানীরা বললেন "কী হিংসুটি! আমাদের ছেলে বেঁচে উঠেছে কিনা, তাই হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে তার। মেয়ে রাজসিংহাসন পেত যে নইলে?" রাজা বললেন "ছিঃ! এমন কথা মনেও আনতে নেই। হতেই পারে না। সারারাত জেগে সে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। দাসীদের পাঠাও ওকে ডাকতে। খুব আনন্দের দিন আজ। সবাই মিলে আনন্দ করতে হবে।" দাসীরা খুঁজে এল। অন্দরের কোথাও তো নেই ছোটরানী?

শেষে খুঁজতে-খুঁজতে দেখে কী, বাগানের মধ্যে শ্বেত-পাথরের মন্দির আছে, সেখানে মেয়ে-কোলে নতুন রানী অজ্ঞান হয়ে শুয়ে। মেয়ের ছোট্ট গলাটি খড়্গ দিয়ে কাটা। রক্ত পড়ে শ্বেতপাথরের দালান যেন লালপাথরের হয়ে গেছে।

রাজা দৌড়ে এলেন। এত রক্তও ছিল এইটুকুনি একরত্তি মেয়ের শরীরে! রানীরা ছুটে এলেন। কবিশেখর এলেন। প্রজারা এল। রাজবৈদ্যও এলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও রানীর জ্ঞান আর ফিরল না। নিশ্বাস আর পড়ল না। দয়ালু রাজা কেঁদে উঠে মা কালীকে বললেন, "মাগো তোমার মনে এই ছিল? বোবাকালা দুঃখিনী মেয়েটার কপালে এত দুঃখও তুমি লিখেছিলে! আমি যদি জীবনে জ্ঞাত-সারে কোনো পাপ না করে থাকি, তাহলে এই মুহূর্তে ওদের পুণ্যের প্রাণ ফিরিয়ে দাও। তার বদলে আমার প্রাণটা নাও।" বলে রাজা খড়্গটি তুলে নিজের গলায় এক কোপ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, খড়্গটি রাজার হাত থেকে ছিটকে মাকালীর হাতে ফিরে গেল। রাজা অবাক হয়ে দেখলেন, বামুনের মেয়ের কোলে রাজার মেয়েটি কেঁদে উঠল। নতুনরানী উঠে বসে চারদিকে এত লোকজন ভিড় দেখে লজ্জায় একগলা ঘোমটা টেনে মেয়েকে দুধ খাওয়াতে বসলেন। রাজা ডাকলেন নতুনরানীকে—"ধন্য মা তুমি! তুমি মানুষ নও নতুনরানী, তুমি দেবতা।" তিন রানীই ছুটে এসে, নতুন বউয়ের পায়ে পড়লেন। চোখের জলে ক্ষমা চাইলেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে বোবা বউ মিষ্টি গলায় কথা বললে, "ছি ছি রানীমা, কী যে করেন—কী যে করেন— উঠুন উঠুন।" শাঁখ বাজল, ঘণ্টা বাজল, দেবতাদের আনন্দে শুকনো আকাশে সাতরঙের রামধনু উঠল। রাজামশাই, চার-রানী, রাজকন্যা, রাজপুত্রকে নিয়ে দয়ালু রাজার প্রজারা আনন্দে নাচতে লাগল। মা সরস্বতীর দয়ায় বোবা রানীমা কথা বলেছেন, রানীর পুণ্যে রাজপুত্তুর বেঁচে উঠেছেন।—

দয়ালু রাজার পুণ্যের প্রাণ।
মরামানুষকে জীইয়ে দ্যান॥
বোবাকালা বউ দয়াবতী।
তাঁর জিবে যান সরস্বতী॥
তিন রানীমা লজ্জা পেল।
নতুন বউকে কোলে নিল॥
রাজা প্রজা সবাই নাচে।
রূপসায়রের মেলার মাঝে॥
সওদাগররা বাজায় ঢোল।
মেলার মাঠে হুলুস্থুল॥
নেইক দুঃখ নেইক ক্লেশ।
ধন্যিরাজার পুন্যি দেশ॥

ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার

আগন্তুক

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বাইরে প্রবল বৃষ্টি। এ বৃষ্টি হঠাৎ থামবে এমন আশা কম। ঘরের মধ্যে আমরা তিনজন। সমীর, পলাশ আর আমি। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। হাতে কোন কাজ নেই। আড্ডা দিয়েও সবাই ক্লান্ত।

বর্ষার বিকালে খবরের কাগজের ওপর তেলনুন-মাখা মুড়ি তেলেভাজা দিয়ে চিবোতে চিবোতে গল্প চলেছে। প্রথমে ক্রিকেটের গল্প, তারপর ফুটবল, কিছুক্ষণ সিনেমার কথা, শেষকালে এই আবহাওয়ার উপযুক্ত কাহিনী শুরু হল, ভূতের গল্প।

সমীর বলল, "ভূত আলবত আছে। পৃথিবীর বড় বড় লোক ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।"

পলাশ মুখ চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল, "আছে বই কী। আছে তোদের মতন নিষ্ক্রিয় লোকদের মগজে। ভূতের জন্মস্থান ভয়ের এলাকায়।"

দুজনে আমাকে সাক্ষী মানল।

বিপদে পড়লাম। খুব সাহসী এমন অপবাদ কেউ দেবে না। ভূত অবশ্য দেখিনি, কিন্তু ভূত নেই একথা জোর গলায় বলি কী করে!

সারাক্ষণ দিনের আলো থাকবে না। এক সময়ে অন্ধকার হবে। চারদিক থেকে নানারকম শব্দ শোনা যাবে। তখন?

কাজেই কোন পক্ষ সমর্থন না করে বললাম, "কী জানি ভাই, বলতে পারব না। ভবিষ্যৎ নিয়ে এত চিন্তা করছি যে, ভূতের কথা ভাববার সময়ই পাইনি।"

সমীর হাত গুটিয়ে টান হয়ে চেয়ারে বসল। বলল, "ভূত আছে কিনা শোন। আমাদের রাঁচীতে একটা বাড়ি আছে জানিস তো। আমি সেখানে অনেক দিন ছিলাম।"

পলাশ এমন সুযোগ ছাড়ল না। সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তুই যে রাঁচী-ফেরত, সেটা তোর হালচালেই মালুম হয়।"

সমীর খেপে লাল।

আমি বহুকষ্টে দুজনকে থামালাম। সমীরকে বললাম, "নাও, তোমার গল্প চালাও।"

সমীর তবু ক্ষুণ্ণ। "গল্প?"

নিজেকে সংশোধন করে বললাম. "না হে, গল্প নয়, সত্য ঘটনা বল।"

সমীর শুরু করল, "রাঁচীর বাড়িতে ভূতের উপদ্রব। আমরা খেতে বসেছি. হঠাৎ ভাতের ওপর মাটির গুঁড়ো পড়ল, ডালের বাটি নিজের থেকেই কাত হয়ে গেল, হাত বাড়াতে দুধের বাটি সরে যেতে লাগল। অন্য সময় কিছু নয়, সব স্বাভাবিক। যত গোলমাল কেবল খাবার সময়। আমার ঠাকুর্দা তখন বেঁচে। তিনি বললেন. এ নিশ্চয় অতৃপ্ত আত্মার ব্যাপার। গয়ায় পিণ্ড দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

"তাই স্থির হল। আমার এক কাকা রেলে চাকরি করতেন। তাঁকেই বলা হল পিণ্ড দিয়ে আসতে।

"কিন্তু গয়াতে পিণ্ড দিতে গিয়েই এক বিপত্তি।"

সমীরের বরাত। ভূতের গল্প কিছুতেই বেচারী শেষ করতে পারছে না।

এই অবধি বলেই তাকে থামতে হল।

বাইরে থেকে দারুণ একটা গোঙানির শব্দ আসছে। একটানা. থামবার লক্ষণ নেই।

এই গোঙানির মধ্যে গল্প বলা অসম্ভব।

আমরা তিনজনেই বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এক ফালি রোয়াক। বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। তারই এক কোণে একটি মানুষ।

মানুষ না বলে কঙ্কাল বলাই সমীচীন। খালি গা। প্রত্যেকটি হাড় গোনা যায়। মাথা ন্যাড়া। পরনে জরা-জীর্ণ ফুলপ্যান্ট, হাঁটুর ওপর গোটানো। শুধু কোমরবন্ধের বাহাদুরি আছে। লাল, প্রায়-নতুন একটা টাই কোমরে বাঁধা।"

লোকটা ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে আর দাঁতের ফাঁক দিয়ে গোঙানি বের হচ্ছে।

এ-দৃশ্য দেখে সকলেরই দয়া হল।

আমিই বললাম, "এই, তুমি ভিতরে এস। এই বৃষ্টিতে ভিজলে নিমোনিয়া হবে।"

লোকটা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমাদের দিকে দেখল। আমার কথা-গুলো যেন বুঝতেই পারল না।

এবার সমীর চেঁচিয়ে বলল, "উঠে ঘরের মধ্যে এস, শুনছ?"

লোকটা আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে দাঁড়াল। একটু দম নিল, তারপর

আমাদের পিছন-পিছন ঘরের মধ্যে এল।

"বস ওই কোণে।" পলাশ আঙুল দিয়ে ঘরের কোণ দেখিয়ে দিল।

লোকটা সসংকোচে বসল। দুটো হাঁটুর ওপর মুখ রেখে।

আমি ভিতরে গিয়ে একটা পুরনো শার্ট এনে লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

লোকটা কৃতজ্ঞতাভরা চোখে আমার দিকে দেখল, তারপর শার্টটা গায়ে দিয়ে নিল।

আমি সমীরের দিকে ফিরে বললাম, "এবার নাও হে, তোমার গয়ায় পিণ্ডদানের কাহিনী বল।"

সমীর ভ্রূ কোঁচকাল। "আমার পিণ্ডদানের কাহিনী?"

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, "আহা, তোমার নয়, তোমার ভূতের।"

পলাশ ফোড়ন কাটল, "ওই একই হল। ভূত আর সমীরে তফাত নেই। ভূত হচ্ছে গাঁজা, আর সমীর সেই গাঁজার আড়তদার।"

ঠিক এই সময় আমাদের তিনজনকে অবাক করে দিয়ে লোকটি কথা বলল।

"কে বললে বাবু, ভূত গাঁজা?"

পলাশ এবার লোকটির দিকে ফিরল।

"তুমিও ভূতের গল্প জানো নাকি হে?"

লোকটা দুটো হাত রগড়াতে-রগড়াতে বলল, "গল্প নয় বাবুরা, নিজের চোখে ভূত আমি দেখেছি।"

"সে কী হে? বল শুনি।"

তিনজনই লোকটার কাছে এগিয়ে বসলাম।

লোকটা হাতদুটো দিয়ে নিজের শরীর ঘষে নিল, বোধহয় গরম করার চেষ্টায়, তারপর বলতে লাগল।

"এক সময়ে আমি ট্রেনের কামরায়-কামরায় প্লাস্টিকের চিরুনি ফেরি করে বেড়াতাম। সকাল সাতটায় বের হতাম। দুপুরবেলা রাস্তার ধারে কিছু খেয়ে নিতাম, তারপর আবার রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত চিরুনি বিক্রির চেষ্টা। রাত্রিবেলা কোন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের এক কোণে শুয়ে কাটাতাম।

"একদিন হয়েছে কী, ঠিক এমনই বাদলা। যাত্রীর সংখ্যা কম। যারা আছে তাদের চিরুনি কেনার দিকে দৃষ্টি নেই, কোনরকমে বাড়ি পৌঁছতে পারলে বাঁচে। আমিও কোণের এক বেঞ্চে বসে ঢুলতে-ঢুলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

"যখন ঘুম ভাঙল, মনে হল অনেক রাত। বৃষ্টি থেমেছে। জানলা দিয়ে ম্লান জ্যোৎস্না গাড়ির মধ্যে এসে পড়েছে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বুঝতে পারলাম ট্রেন শেডের মধ্যে রয়েছে।

"ভালই হল। বেঞ্চের ওপর পা তুলে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। মনে হল কোথায় যেন খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে।

"একবার ভাবলাম ইঁদুর। কিন্তু ইঁদুর মালগাড়ি ছেড়ে এ-গাড়িতে আসবে কেন। এদিক ওদিক চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে দেখতে পেলাম, বাথরুমের হাতলটা নড়ছে। কে যেন খোলবার চেষ্টা করছে, পারছে না।

"একটু ভয় হল। চোর ডাকাত নয় তো?

"তারপর আবার মনে হল, চোর হোক, ডাকাত হোক, আমার কী! আমার সম্বল দু টাকার চিরুনি আর পকেটে দেড় টাকা।

"চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

"হঠাৎ মুখের ওপর গরম নিশ্বাস পড়তে চমকে চোখ খুলেই আঁতকে উঠলাম।

"সামনে একজন লোক। লোকই বা বলি কী করে! মুণ্ডু নেই, মুণ্ডুটা নিজের হাতে ধরা। দুটো চোখ বীভৎসভাবে বেরিয়ে আছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা ঝুলে পড়েছে। সেই জিভ দিয়ে টপ টপ করে রক্তের ফোঁটা ঝরছে।

"আমি চিৎকার করতেই মুণ্ডুটা জিভ ভিতরে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বলল, চুপ, ভয়ের কিছু নেই। আমিও তোমার মতন ট্রেনে লজেন্স, হজমী-গুলি ফেরি করে বেড়াতাম। নিজে গান বেঁধে সুর করে গাইতাম। গানের গলা ছিল বলে বাবুরা খুশী হয়ে শুনত, তারপর আমার জিনিস কিনত। সেইজন্য অন্য ফেরিওয়ালারা আমায় হিংসা করত, বিশেষ করে তারক। সে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। আমার মতন গাইবার চেষ্টা করত, পারত না। এক সন্ধ্যায় টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। আমি গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে। ট্রেনের গতি একটু কমলে পাশের গাড়িতে উঠব। তারক ঠিক আমার পিছনে। হঠাৎ সে সজোরে আমাকে ধাক্কা দিল। পাশের লাইন দিয়ে দার্জিলিং মেল আসছিল নক্ষত্র-বেগে। ট্রেনের গতিবিধি আমাদের নখ-দর্পণে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছিটকে একেবারে লাইনের ওপর। তারপর দার্জিলিং মেলের চাকা—"

লোকটার কথা শোনা গেল না। চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুতের আলো, তারপরই খুব কাছে কোথাও বাজ পড়ল।

জানালার কাঁচ ঝনঝন করে উঠল। মেঝে কেঁপে উঠে মনে হল চেয়ারগুলো উল্টে ফেলে দেবে।

আমরা সবাই প্রথমে ভাবলাম বুঝি ভূমিকম্প, তারপর বুঝতে পারলাম, না, বাজের শব্দ।

পলাশ বলল, "খুব ভূতের গল্প ফেঁদেছ তো হে।"

কোন উত্তর নেই।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে সুইচ টিপলাম। আলোয় ঘর ভরে গেল।

কী আশ্চর্য, কোণ খালি। লোকটা কোথাও নেই।

অথচ লোকটা ঘরের মধ্যে ঢোকবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দরজা সেই রকমই বন্ধ আছে।

বাইরে একটা মোটরের শব্দ। অনেকগুলো লোকের চিৎকার।

দরজা খুলে আমরা বাইরে এলাম। বৃষ্টি কমে গেছে।

একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। গোটা চারেক পুলিশ রোয়াকের কাছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কী হল?"

ইনসপেক্টর বলল, "আপনাদের পাশের বাড়ি থেকে থানায় ফোন করেছিল, এখানে একটা মড়া পড়ে আছে।"

মড়া!

আমরা উঁকি দিয়েই চমকে উঠলাম। সেই লোকটা পড়ে রয়েছে। চিত হয়ে। দুটো হাত বুকের ওপর জড় করা। দুটো চোখের তারা বিস্ফারিত।

"কখন মারা গেল?"

"ঠিক বলা মুশকিল। তবে ঘণ্টা দুয়েক তো নিশ্চয়। একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।"

"কিন্তু," বলতে গিয়েই সামলে নিলাম। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। লোকটার পরনে আমার দেওয়া পুরনো শার্ট, যেটা তাকে আধ ঘণ্টা আগে দেওয়া হয়েছিল।

ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, সমীর আর পলাশ দুজনেই সেটা লক্ষ করেছে।

ছবি এঁকেছেন শৈবাল ঘোষ

হাস্য সম্মেলন

ডোডো-তাতাই পালা-কাহিনী

তারাপদ রায়

সকাল বেলায় খবরের কাগজে কী একটা চমৎকার খবর বেরিয়েছে, সেটা পড়বার পর থেকেই তাতাইবাবুর খুব একটা খুশি খুশি ভাব। একেকবার সংবাদটা পড়ছেন আর একা-একাই ফিক্‌ফিক্ করে হাসছেন। গতকাল তাতাইবাবুদের ইস্কুলে প্রাইজ দেওয়ার অনুষ্ঠান ছিল, তাই ছুটি, তাতাই-বাবুর আজ ইস্কুলে যাওয়া নেই। তিনি বাইরের ঘরের দরজাটা খুলে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে খবরের কাগজটা হাতে করে বসলেন।

এদিকে ডোডোবাবুর ইস্কুল রয়েছে। তিনি কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ইস্কুলে যাওয়ার পথে দেখলেন, তাতাইবাবু সদর দরজায় খবরের কাগজহাতে হাসিমুখে বসে রয়েছেন। ডোডোবাবুদের সকাল বেলায় ক্লাশ, সাড়ে দশটায় ছুটি হয়,

এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখেন, তখনো সহাস্য তাতাই-বাবু খবরের কাগজ হাতে বসে রয়েছেন। ডোডোবাবু অবাক হয়ে গেলেন, আজ বহুকাল তাতাইবাবুকে দেখছেন, কিন্তু কখনও এমন দেখেননি। তাড়াতাড়ি বইয়ের বোঝা বাড়িতে নামিয়ে ডোডোবাবু ছুটে এলেন।

ডোডোবাবু (চোখে মুখে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার ভাব) ঃ কী হল তাতাইবাবু, সকাল থেকে এরকম হাসি-হাসি মুখে খবরের কাগজ হাতে করে কী দেখছেন? কোনো খারাপ খবর নেই তো?

(তাতাইবাবুর মৃদু হাস্য।)

ডোডোবাবু (আরো বিচলিত হয়ে) ঃ এত হাসবার কী আছে বুঝতে পারছি না।

(আবার তাতাইবাবুর মৃদু হাস্য, তবে এবার একটু সশব্দ।)

ডোডোবাবু (রীতিমত উত্তেজিত হয়ে) ঃ কী হয়েছে ব্যাপারটা খুলেই বলুন না মশায়, এত হাসাহাসির কী আছে, আর চিন্তায় রাখবেন না।

তাতাইবাবু (প্রথমে আবার মৃদুহাস্য, তারপর) ঃ পুরো ব্যাপারটাই হাসাহাসির, না হেসে উপায় আছে?

ডোডোবাবু ঃ কী হাসাহাসির ব্যাপার, একটু খুলেই বলুন না।

তাতাইবাবু ঃ আজকের খবরের কাগজ পড়েননি?

ডোডোবাবু ঃ আমার তো সকালে ইস্কুল, আমি দুপুর বেলায় খবরের কাগজ পড়ি।

তাতাইবাবু ঃ ঠিক আছে, ঐ মোড়াটা টেনে নিয়ে এসে বসুন। কাগজের এই খবরটা দেখুন।

ডোডোবাবু (মোড়া টেনে নিয়ে) ঃ কোন্ খবরটা?

তাতাইবাবু (কাগজটা এগিয়ে দিয়ে) ঃ এই যে দেখুন, ডানদিকে উপরে, 'বিশ্ব হাস্য সম্মেলন ও প্রতিযোগিতা।' দেখুন, ভাল করে খবরটা পড়ে দেখুন।

ডোডোবাবু (কাগজটা পড়তে পড়তে) ঃ হ্যাঁ, সামনের মাসে বিলেতে হাসাহাসির লড়াই। কিন্তু তাতে আমাদের কী হল?

তাতাইবাবু ঃ আমাদের কী হল মানে কী, এ তো বিশ্ব-প্রতিযোগিতা, আমরা যোগদান করব। আমরা সাহেবদের সঙ্গে, কাফ্রীদের সঙ্গে, বেদুইনদের সঙ্গে, চীনেদের সঙ্গে হাসির প্রতিযোগিতায় নামব। এটা ঠিক করার পরেই তো সকাল থেকে হেসে যাচ্ছি। আপনিও হাসা শুরু করে দিন, দুজনে মিলে যাব।

ডোডোবাবু ঃ শুধু-শুধু হাসব কী করে?

তাতাইবাবু ঃ শুধু-শুধু বিনা কারণে হাসতে আপনাকে কে বলেছে? কারণ তৈরি করুন।

ডোডোবাবু ঃ কারণ আবার কীভাবে তৈরি করব?

তাতাইবাবু ঃ মনে করুন আপনাদের হেডস্যার ইস্কুলের উঠোনে পা পিছলে পড়ে গেছেন. দেখুন কীরকম হাসি পায়।

ডোডোবাবু ঃ হেডস্যার পা পিছলে পড়ে গেলে হাসি পাবে, আপনি মশায় পাগল নাকি? এ-কথা ভাবাও তো অন্যায়। আমার তো ভাবতে গেলেই গা শিউরে উঠছে।

তাতাইবাবু ঃ আচ্ছা বেরসিক তো আপনি। আচ্ছা আপনি নিজেই একবার পরীক্ষার খাতায় লিখেছিলেন বিড়ালজাতীয় তিনটি প্রাণী হল হুলো, মেনি আর বিড়ালছানা. এটা মনে পড়লে হাসি পায় না?

ডোডোবাবু ঃ (রেগে গিয়ে) ঃ হাসি পায়. কিন্তু আমার আরও হাসি পায় এ-কথা মনে করলে যে. গত বছরই আপনি অ্যানুয়ালে উত্তর দিয়েছিলেন সেক্সপীয়রের দুটো নাটকের নাম হল রোমিও এবং জুলিয়েট।

তাতাইবাবু (কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে) ঃ আরে মশায়, ঠিক আছে. থাক, থাক। ভুল তো সবাই করে. কিন্তু একবার ভাবুন তো সেই ফুটবল খেলার কথাটা যেখানে আমরা শিশুসঙ্ঘের কাছে আট গোল খেলাম।

ডোডোবাবু ঃ শিশুসঙ্ঘ না কচু। অত বড়বড় ধুমসো মোষের মত শিশু, ওদের সঙ্গে আমরা পারি? খেলতে যাওয়াই অন্যায় হয়েছিল।

তাতাইবাবু ঃ তা হোক, তবু আটটা গোল তো খেয়েছিলাম।

ডোডোবাবু ঃ কিন্তু এতে হাসির ব্যাপার কী হল?

তাতাইবাবু (রেগে গিয়ে) ঃ মনে নেই. হাসির ব্যাপার নয়? মশায় আপনারা তো সব গোল খেয়ে. একে একে দৌড়ে মাঠ থেকে পালিয়ে গেলেন। আমি ছিলাম গোলে, আমি পালাতে পারলাম না। শিশুসঙ্ঘের সবাই মিলে আমাকে ঘিরে ধরল। বলল, "গোল শোধ দাও।"

ডোডোবাবু (অবাক হয়ে) ঃ গোল শোধ!

তাতাইবাবু ঃ হ্যাঁ, গোল শোধ। সবাই মিলে ঘিরে ধরল, "গোল খেয়েছ। গোল শোধ দাও, না দিলে ছাড়ব না।" আমি একা, আপনারা সব কাপুরুষ, আমাকে ফেলে পালিয়ে গেছেন। আমি আর কী করব, আমি কাকুতি-মিনতি করতে লাগলাম, "এগারজন আট গোল খেয়েছে; আমি একা শোধ করব কী করে?" শেষে শিশুসঙ্ঘের ছেলেদের মায়া হল, বলল, "ঠিক আছে, ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু একেক গোলে এক হাত করে আট গোলে আট হাত নাকে খত দিয়ে বলো আর কোনোদিন খেলব না।"

ডোডোবাবু ঃ আট হাত নাকে খত দিলেন?

তাতাইবাবু ঃ দিলাম না আবার? না-দিলে সেদিন রেহাই পেতাম? (নাকে একবার হাত বুলিয়ে তারপর) ছমাস হয়ে গেল এখনো নাকের ডগা তেতে রয়েছে।

ডোডোবাবু ঃ কিন্তু এ-কথা তো আপনি আগে বলেননি।

তাতাইবাবু ঃ এ কি বলার মতো কথা মশায় যে. আগে বলব। আজ হাসির প্রতিযোগিতায় নাম দিতে হবে ঠিক করে মনের মধ্যে খুঁজে-খুঁজে এই হাসির গল্পটা বার করলাম।

ডোডোবাবু ঃ এটা হাসির গল্প হল? আট গোল খেলেন, পালাতে পারলেন না, ধরা পড়লেন, নাকে খত দিলেন। এ আবার কীরকম হাসির গল্প?

তাতাইবাবু ঃ কিন্তু সকাল থেকে চেষ্টা করে-করে কিছুতেই একটা হাসির গল্প দূরে থাক, একটা হাসির কথা পর্যন্ত মনে পড়ল না। হাসি-হাসি মুখে কত চিন্তা করলাম, কিন্তু যা-ই ভাবি, দেখি আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে না, অন্যেরা আর কী হাসবে।

ডোডোবাবু ঃ তাহলে আর হাস্য সম্মেলনে যোগদান করতে চাইছেন কেন? তিনদিন মানে একনাগাড়ে বাহাত্তর ঘণ্টা ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই হেসে যাওয়া, হাসিয়ে যাওয়া সম্ভব? ও সব বদবুদ্ধি ছেড়ে দিন।

তাতাইবাবু (স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে) ঃ বাঁচালেন মশাই, আমি তো প্রতিযোগিতায় যোগদান করব বলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু হাসির কথা আর মনে আসে না। আপনার মশায় খুব ঠাণ্ডা মাথা, ঠিক ধরেছেন, এত হাসা সোজা নয়। তা ছাড়া বিলেত যাওয়া, সেও সোজা নয়।

ডোডোবাবু ঃ আরে বিলেত-টিলেত রাখুন মশায়। আসুন, আমরা নিজেরাই একটা বিশ্বপ্রতিযোগিতা ডাকি এই পণ্ডিতিয়াতে।

তাতাইবাবু (উত্তেজিত হয়ে) ঃ সাবাশ বুদ্ধি আপনার, বলুন তো কিসের প্রতিযোগিতা ডাকা যায়?

ডোডোবাবু ঃ কেন, আমরা একটা উল্টো প্রতিযোগিতা ডাকি।

তাতাইবাবু ঃ কী উল্টো প্রতিযোগিতা?

ডোডোবাবু ঃ না-হাসার।

তাতাইবাবু ঃ মানে?

ডোডোবাবু ঃ আমরা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার করব, কিন্তু সেটা দেখে কেউ হাসতে পারবে না। যে শেষ পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারবে সেই জিতবে।

তাতাইবাবু ঃ তাহলে এক কাজ করা যাক। ফুটপাথে আর লোকের বাড়ির বারান্দায় প্রতিযোগীরা দাঁড়িয়ে থাকবে। রাস্তায় ঢালাও করে ছড়িয়ে দেওয়া হবে আমের খোসা আর কলার খোসা। যত লোক হেঁটে যাবে দুপদাপ আছাড় পড়বে। আগাগোড়া যে গোমড়া মুখে এই দৃশ্য দেখে যেতে পারবে তাকেই দেওয়া হবে বিশ্বমুকুট।

ডোডোবাবু ঃ চমৎকার। গুড আইডিয়া।

তাতাইবাবু ঃ চমৎকার। এবার তাহলে সব রেডি করে ফেলুন, কাগজে-কাগজে নোটিশ দিন।

ডোডোবাবু (কাগজ পেন্সিল নিয়ে এসে) ঃ কী নোটিশ লিখব বলুন তো?

তাতাইবাবু (চেয়ারে জোড়াসন হয়ে বসে পা নাচাতে নাচাতে বিজ্ঞের মত) ঃ লিখুন।

নোটিশ! নোটিশ!! নোটিশ!!!

শারদীয়া পুজো উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে
পণ্ডিতিয়ায়

বিশ্ব-গোমড়া প্রতিযোগিতা

দর্শক বা প্রতিযোগী, কাহারও কোনও প্রবেশমূল্য নাই

(তাতাইবাবু জোড়াসন হয়ে বসে হাঁটু নাচাতে নাচাতে বলে যেতে লাগলেন আর মেজের উপর উবু হয়ে বসে ডোডোবাবু কাগজে লিখে যেতে লাগলেন। নিঝুম দুপুর, বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। কেউ কাছাকাছি কোথাও নেই, এমন কী রাস্তার বিখ্যাত কুকুরগুলি পর্যন্ত কোথায় বেড়াতে গেছে। শুধু জানলার উপরে বসে একটা কাক অত্যন্ত গোমড়া গলায় তিনবার কা-কা ডেকে এই আশ্চর্য পরিকল্পনা রচনায় তার সায় জানাল।)

ছবি এঁকেছেন অহিভূষণ মালিক

পোড়োবাড়ির রহস্য

অজেয় রায়

'দৈনিক খবর'-এর বার্তা-সম্পাদক রাখোহরিবাবু তাঁর টেবিলের সামনে কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়ানো যুবকটির উদ্দেশে বললেন, "শোনো বিকাশ, একটা নতুন কিছু লেখ। বেশ ইনটারেসটিং হওয়া চাই। যাতে সকলের নজরে পড়ে। তোমার চাকরির সুবিধা হবে। ওসব সভা-টভার রিপোর্ট পুরনো হয়ে গেছে। নতুন কিছু ট্রাই কর দিকি।"

বিকাশ দত্ত অনেক দিন ধরে 'দৈনিক খবর'-এ একটা সাংবাদিকের চাকরি যোগাড়ের আশায় ঘুরঘুর করছে। অনেক বেগার খেটে দিয়েছে। একটু-আধটু লিখেওছে। কিন্তু পাকা চাকরি আর জুটছে না। সে মাথা চুলকোয়, "ইনটারেসটিং? মানে নতুন? মানে সেরকম কই?"

টেবিলে দুম্ করে এক ঘুষি বসিয়ে রাখোহরিবাবু বলে উঠলেন, "আরে নতুন জিনিসের কি অভাব আছে? চোখ-কান খোলা রাখলে রিপোর্ট করার মতো কত অদ্ভুত ঘটনা পাবে। কেন, আজকের এই নিউজটা দেখেছ? এটাকে কাজে লাগাও। দিব্যি লেখা হবে একখানা।"

সম্পাদক সেদিনের কাগজখানা বাড়িয়ে দিলেন।

কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছোট্ট একটা সংবাদ। লাল পেনসিলে দাগানো। হেডলাইন 'পানিহাটির হানাবাড়ি'। বিকাশ পড়ল। খবরের মর্ম হচ্ছে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে পানিহাটিতে প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো এক প্রকাণ্ড বাড়ি নাকি ভুতুড়ে বলে খ্যাতি লাভ করেছে। বাড়িটির নাম 'মণি মঞ্জিল'। ভৌতিক ব্যাপারে কৌতূহলী কেউ-কেউ এ-বাড়িতে রাত কাটাতে এসে ভয় পেয়েছে। একজন নাকি মারাও পড়েছে। স্থানীয় লোক সন্ধের পর ও-বাড়ির ধারে-কাছে যায় না।

রাখোহরিবাবু উৎফুল্ল স্বরে বললেন, "যাও না, ওই বাড়িতে রাত কাটিয়ে এসে লিখে ফেল—মণি মঞ্জিলে এক রাত। দারুণ জমবে। পয়সাও পাবে। অবিশ্যি তোমার যদি ভূত-টুতের ভয় থাকে তবে না যাওয়াই ভাল।"

ভূতের ভয় যে বিকাশের একদম নেই, তা নয়। কিন্তু বার্তা-সম্পাদকের সামনে তা প্রকাশ করা চলে না। বিশেষত রাখোহরিবাবু কতবার শুনিয়েছেন যে, রিপোর্টারের নাকি ভয়-ডর নামক বস্তু থাকতে নেই। সুতরাং সে নির্বিকার ভাবে বলল, "আজ্ঞে, আমি আজই ওখানে যাচ্ছি বিকেলে। কাল আমার লেখা পেয়ে যাবেন।"

মণি মঞ্জিলের পাঁচিলের চারপাশে ঘুরে বিকাশের মনে হল, হ্যাঁ ভুতুড়ে বাড়িই বটে। কয়েক বিঘা জমিতে বড় বড় গাছ আর আগাছার জঙ্গল। মাঝখানে বিশাল দোতলা বাড়ি। বিরাট হাঁ-করা ফটক। উঁচু পাঁচিল জায়গায়-জায়গায় ভেঙে পড়েছে। বিকাশ ফটক পেরিয়ে ধীরে-ধীরে বাড়ির দিকে চলল।

বাড়িটাকে পাক খায় বিকাশ। বেশ মজবুত গঠন। তবে

বেশির ভাগ জানলা-দরজার কবাট নেই। জনহীন বাড়ি খাঁখাঁ করছে। হঠাৎ সে আর-একজন লোকের মুখোমুখি হল। থমকে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগল এই অচেনা আগন্তুককে।

মাঝবয়সী ভদ্রলোক। রঙ ফরসা। ছোটখাটো নাদুস-নুদুস ভাল-মানুষ চেহারা। পরনে কালো রঙের ফুল প্যান্ট ও সাদা হাওয়াই শার্ট। সামনের চুলে অল্প টাক পড়েছে। বুক-পকেটে একটি কলম গোঁজা। ভদ্রলোকও বিকাশকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর চোখে কৌতুকের ছোঁয়া।

"হুঁ, জার্নালিস্ট বুঝি?" ভদ্রলোকের গলার স্বর কিঞ্চিৎ মিহি।

থতমত খেয়ে বিকাশ ঘাড় নাড়ে "হ্যাঁ। আপনি?"

"আমিও তাই।" ঠোঁট-টেপা হাসি নিয়ে ভদ্রলোক মাথা দোলালেন।

"হানাবাড়ি কভার করতে এসেছেন বোধহয়? তা দেখে শুনে এখন ফিরে যাবেন, না রাত কাটাবেন?"

বিকাশ উত্তর দিল, "আমার রাতে থাকার প্ল্যান আছে। আপনার?"

"আমারও। ভেরি গুড। এক সঙ্গে কাটানো যাবে আজ।"

বিকাশ মনে-মনে বেজায় দমে গেল। কারণ ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য নিশ্চয় বিকাশের মতোই ভুতুড়ে বাড়িতে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা। এখানে এমন একজন ভাগিদার জুটবে কে ভেবেছিল? দুজনে একই অভিজ্ঞতা লিখলে আর বিশেষত্ব থাকে না। সম্পাদক তা ছাপবেন না। অর্থাৎ বিকাশের খাটুনিটা মাঠে মারা গেল।

একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল বিকাশ, "আপনি কোন্ কাগজের?"

"কোনো কাগজের নই। আমি ফ্রি-লান্স করি। অর্থাৎ স্বাধীন সাংবাদিক। যেখানে খুশি লিখি। তা ভাই, আপনার নামটি জানতে পারি কি? কোন্ কাগজ?"

"বিকাশ দত্ত। দৈনিক খবর।"

'আমি জগদীশ মুখুজ্যে। তা আপনার ভুতুড়ে বাড়িতে এই প্রথম নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"হঠাৎ এ-শখ কেন? এ লাইন বিপজ্জনক জানেন তো?"

"জানি। কিন্তু মানে—" বিকাশ তার আগমনের আসল কারণ এবার বলে ফেলল।

জগদীশবাবু হেসে বললেন, "ও, পেটের দায়। আমিও পয়সার ধান্দায় অনেক ভৌতিক জায়গায় রাত কাটানোর বর্ণনা লিখেছি। কাগজের লোকেরা লুফে নেয়।"

বিকাশ বলল, "আপনি বুঝি আরও ভুতুড়ে জায়গায় রাত কাটিয়েছেন?"

"প্রচুর। হানাবাড়ি। শ্মশান। কবরখানা। কত কী। শেষে এ-ব্যাপারে বেশ নেশা ধরে গেল। তাই, না-লিখলেও দেখতে আসি।"

বিকাশ প্রশ্ন করল, "মণি মঞ্জিল নিয়ে কিছু লিখবেন আপনি?"

জগদীশবাবু বিকাশের দিকে খানিক তাকিয়ে থাকলেন। একবার ভুরু নাচালেন। বললেন, "হুম্, বুঝেছি। অলরাইট, আজকের অভিজ্ঞতাটা আপনার কলমেই বেরোক। এসব আমার একঘেয়ে হয়ে গেছে। তবে এক্সপিরিয়েন্স্‌টা এক সঙ্গে করা যাক। কী বলেন?"

বিকাশ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সত্যি বলতে কী, এই নির্জন বাড়িতে একা রাত কাটাতে হবে ভেবে তার রীতিমত

অস্বস্তি হচ্ছিল। ভাগ্যের জোরে এমন খাসা সঙ্গী জুটে গেল।

জগদীশবাবু স্বচ্ছন্দ পায়ে মণি মঞ্জিলের ভিতরে ঢুকলেন। পিছনে বিকাশ। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা হল। দোতলায় সারি-সারি ঘর। সামনে বারান্দা। কোনো ঘরের দরজা খোলা। কোনোটার বা বন্ধ। ছাদে ঘুলঘুলিতে চামচিকে ও বাদুড়ের আস্তানা। নোংরা মেঝে। ভ্যাপসা গন্ধ। জগদীশবাবু তরতর করে এগোলেন। রকম দেখে মনে হচ্ছিল, এ-বাড়ি তিনি ভালমত চেনেন। হয়ত আগে এসে ঘুরে দেখে গেছেন। একটা দরজার সামনে থামলেন জগদীশ-বাবু। বললেন, "এই ঘরে বসা যাক।"

দুজনে ভিতরে ঢুকল।

মস্ত ঘর। চারটে বড় বড় গরাদহীন জানলা। হাট করে খোলা। পাল্লাগুলো ভাঙা বা উধাও। এক ধারে পুরনো আমলের একটা পালঙ্ক। পাশেই একটি টেবিল। বাস্। আর কোনো জিনিস নেই ঘরে।

বিকাশ ব্যাগ থেকে সতরঞ্চি বের করে পালঙ্কের ছেঁড়া গদির ওপর পাতল। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর দুজনে বসল খাটে।

জগদীশবাবু বিকাশ সম্বন্ধে নানা খোঁজ খবর নিলেন। কদ্দুর পড়াশুনো, বাড়িতে কে কে আছে, ইত্যাদি। তিনি ইতিমধ্যে বিকাশকে 'তুমি' এবং 'ভাই' বলতে শুরু করেছেন। বিকাশ কিন্তু কিছু মনে করেনি। লোকটি ভারী মাই-ডিয়ার টাইপ। বিকাশের তাঁকে বেশ পছন্দ হয়েছে। বিকাশ নোটবই বের করে আপাতত যা দেখেছে, যা ঘটেছে, লিখে ফেলতে লাগল। জগদীশবাবু বললেন, "খুব ভাল অভ্যেস। নইলে পরে দেখবে অনেক খুঁটিনাটি ভুলে গেছ।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বিকাশের লেখা থামল।

জগদীশবাবু চুপচাপ বাবু হয়ে বসে আছেন। চোখ আধবোঁজা। মগ্ন ভাব। তবে ঠোঁটে হাসিটি লেগে রয়েছে।

বাইরে তখন আঁধার নেমেছে। নিঝুম অট্টালিকা। শুধু বাদুড়ের ডানার ঝটপটানি কানে আসছে। বিকাশ ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালল। জগদীশবাবু বললেন, "সরি, চা খাই না। আগে খেতাম। ছেড়ে দিয়েছি।"

বিকাশ চা খেয়ে সিগারেট ধরাল। জগদীশবাবু আশ্চর্য লোক। চা-সিগারেট ছাড়া ভূতের বাড়িতে কাটায় কী করে! সে একটু উশখুশ করে বলল, "সত্যি কিছু দেখা যাবে তো?"

"যাবে বইকী। লোকে যখন বলে।"

"লোকে তো অনেক বাজে গুজবও ছড়ায়।"

"দেখাই যাক। এখনও ঢের সময় আছে।"

পরপর কয়েকটা সিগারেট খেল বিকাশ। রাত যেন বড় ধীরে এগোচ্ছে। কেমন ঝিমুনি আসছে। জগদীশবাবু ঠায় এক-ভাবে বসে। বিকাশ জগদীশবাবুকে বলল, "একটা গল্প বলুন শুনি। আপনার কোনো অভিজ্ঞতা। সময় কেটে যাবে।"

"গল্প?" জগদীশবাবু নড়েচড়ে বসলেন। "বেশ, এই মণি মঞ্জিলের একসপিরিয়েনসটাই বলি। খুব ইনটারেসটিং।"

"অ্যাঁ। এখানে আপনি থেকেছেন আগে?" বিকাশ অবাক।

"হুঁ।"

"রাত কাটিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"সে-বিষয়ে লিখেছেন কিছু?"

"উঁহু, লেখা হয়নি। কারণ আছে।"

বিকাশ তক্ষুনি ভেবে নেয়, আজ যদি নেহাত কিছু না ঘটে, জগদীশবাবুর আগের অভিজ্ঞতাকেই তার নিজের বলে চালিয়ে দেবে। ভদ্রলোক মনে হয় আপত্তি করবেন না।'

জগদীশবাবু বলতে শুরু করেন। "বছর দুই আগে এই বাড়ির খোঁজ পেয়ে সোজা চলে এলাম একা। ঠিক এমনি রাত। বসেছি এই খাটে। মোমবাতির আলোয় একখানা ডিটেকটিভ বই পড়ছি আর কখনো-কখনো চোখ তুলে চাইছি। মাঝে মাঝে খাচ্ছি চা। তখন চা-কফি খেতাম। সিগারেট অবশ্য আমার কোনো কালে চলে না। রাত একটা বেজে গেল। টনটন করছে পিঠ। হঠাৎ সামনের ওই জানলায় একটা মুখ বাইরে থেকে উঁকি মেরে সরে গেল। আবছা দেখে মনে হল মুখখানা কোনো অল্পবয়সী মেয়ের, এবং অপূর্ব সুন্দর। ফের সেই কাণ্ড। যেন লুকোচুরি খেলছে। উঠে জানলার কাছে গেলাম। জানলার নীচ দিয়ে চওড়া কার্নিশ গেছে। তার তলায় খাড়া দেওয়াল। টর্চের আলো ফেললাম এদিক ওদিক। কারো চিহ্ন নেই। ভাবলাম, কী ব্যাপার! মানুষ না ভূত? কেউ ভয় দেখাচ্ছে? কার্নিশ বেয়ে চলাফেরা করছে? সত্যি মেয়ে, না নকল? ঘাবড়াইনি, কারণ সাহস আমার চিরকালই একটু বেশী। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস ছিল, ভূত-প্রেত যদি বা থাকে, তাদের যত কেরামতি দূর থেকে। মানুষের গায়ে তারা হাত দেয় না। জেদ চেপে গেল। জানলার ঠিক পাশে লুকিয়ে রইলাম। এবার উঁকি দিলেই আবিষ্কার করব রহস্যখানা।"

জগদীশবাবু খাট থেকে নেমে সামনের জানলার কাছে গিয়ে বললেন, "বুঝেছ, এইখানে দাঁড়িয়েছি, একটু পরে আবার সেই মুখের আবির্ভাব। তারপর কী হল জান?" জগদীশবাবু মুচকি হাসলেন।

"কী?" উত্তেজনায় বিকাশ মেঝেতে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সহসা জগদীশবাবু দু হাত বাড়িয়ে জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং পরক্ষণেই ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হলেন বাইরে অন্ধকার শূন্যে।

'আ-আ—' জগদীশবাবুর কণ্ঠের এক বুকফাটা আর্তনাদে নিস্তব্ধ পোড়োবাড়ি যেন শিউরে উঠল।

বিকাশ কয়েক মুহূর্ত থ হয়ে থেকে ছুটে গেল জানলায়। টর্চের আলো ফেলল একতলায়। দেখতে পেল না কিছু। সে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে এসে হাজির হল সেই জানলার নীচে উঠোনে। পাগলের মতো খুঁজতে লাগল —কোথায় জগদীশবাবুর দেহ?......

"ওহে, ওখানে কিস্সু নেই। ওপরে এস।"

জগদীশবাবুর গলা শুনে বিকাশ চমকে মাথা তোলে। দোতলার জানলায় তাঁর হাসি-হাসি মুখ। তিনি হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

নিমেষে বিকাশ যেন কাঠ হয়ে গেল। তার সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। ধড়াস্ করে উঠল হৃৎপিণ্ড। প্রাণপণ চেষ্টায় সে দৃষ্টি নামাল। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল ফটকের দিকে।

"আরে ভাই, যাচ্ছ কোথা? আসল রহস্যটাই তো বলা হয়নি।" জগদীশবাবুর কথা ভেসে আসে।

মণি মঞ্জিলের আসল রহস্য জানতে বিকাশের কোনো দিনও আর সাহসে কুলয়নি।

ছবি এঁকেছেন প্রণবেশ মাইতি

হাতির ঘড়ি

বলরাম বসাক
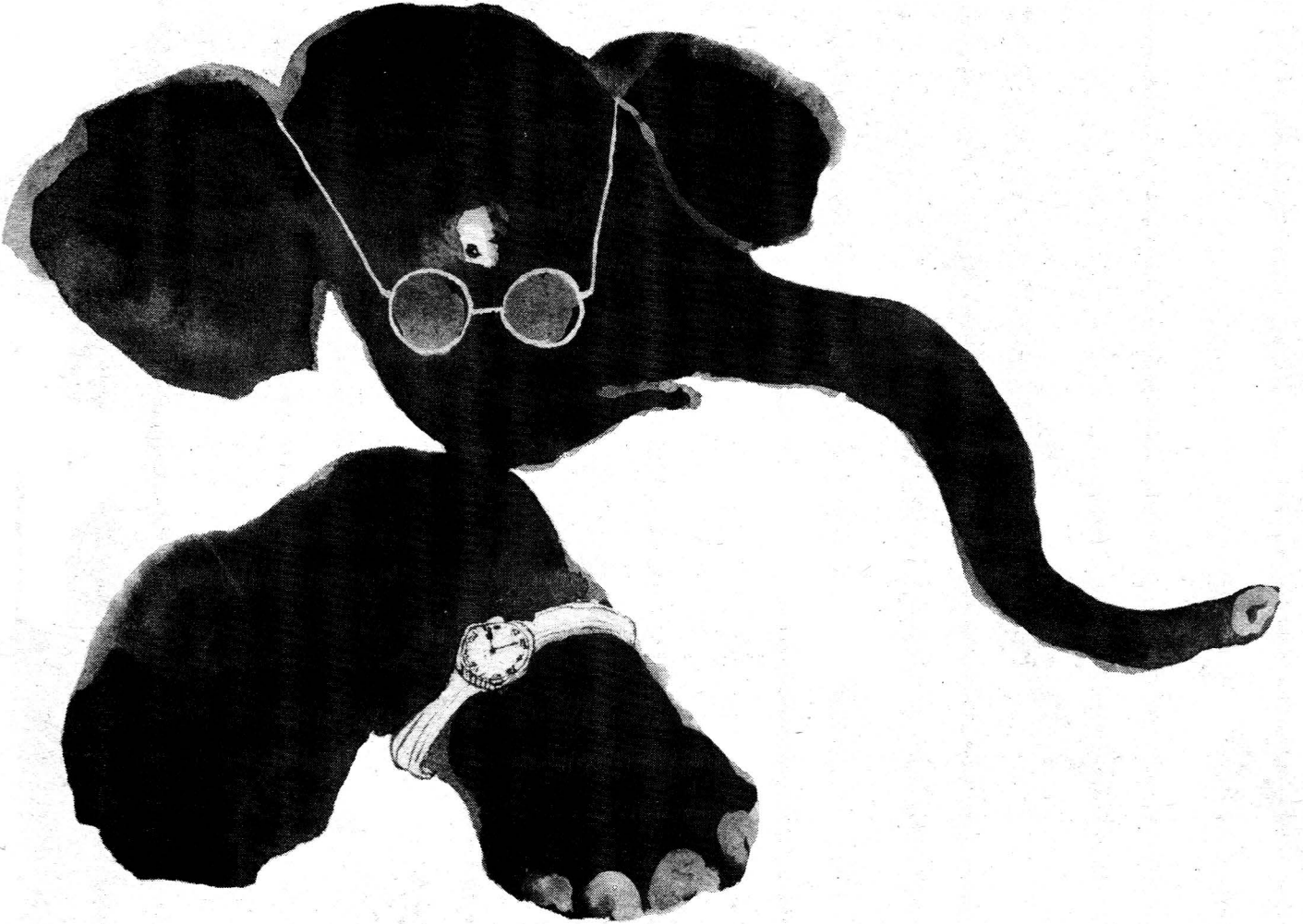
হাতিদাদা একটা হাতঘড়ি কিনেছে। খুউব্ ভালো ঘড়ি। বেশ চকচকে। সাদা ধবধবে। আর মাঝখানটায় লাল টুকটুকে মতন কী যেন একটা বন্‌বন্ করে ঘুরছে। পাড়া-পড়শী হাঁস-মুরগী গাধা ঘোড়া উট সব্বাই দেখতে এল, "কী চমৎকার, কত দিয়ে কিনলে হাতিদাদা...?"

হাতিদাদা মাথা দুলিয়ে, কান নেড়ে, শুঁড় দুলিয়ে, হে-হে করে হাসে। কিচ্ছু বলে না। শুধু একবার বলল, "ফিতেটা এত ছোট। আমার সামনের ডান পায়ে ওটা ঠিক লাগছে না।"

শুনে মুখে-পাইপ্ ঘোড়ামামা ঠুক ঠুক করে পা ঠুকতে-ঠুকতে এল। তারপর মুখ থেকে পাইপটা নিয়ে আস্তে আস্তে ঠুকল, বলল, "বড় ফিতে লাগাও।"

হাতিদাদা বলল, "পাচ্ছি কোথায় বড় ফিতে?"

"ঠিক আছে," ঘোড়ামামা বলল, "আমার লাগামটা আর লাগছে না। ওটা তুমি নিয়ে নাও।"

"লাগাম?" হাতিদাদার চোখ চক চক করে উঠল, "ওতে হবে?"

"খুউব হবে, ভালো চামড়ার তৈরি। তারপর এত মজবুত!"

ঘোড়ামামা তার লাগামটা হাতিদাদাকে দিয়ে দিলে। হাতিদাদা তখন লাগাম দিয়ে কোন মতে তো বাঁধলে ঘড়িটা তার সামনের ডান পায়ে। তারপর জামা প্যাণ্ট টাই জুতো

পড়ে হেলতে-দুলতে হেলতে-দুলতে চললে আপিস।

এমন সময় কোঁচা দুলিয়ে ঝোলা কাঁধে কচ্ছপ-খুড়ো আসছিল, তার সঙ্গে দেখা, "আরে হাতিদাদা, নতুন ঘড়ি কিনেচো। বেশ বেশ। তা ঘড়িটায় ঠিকমত চাবি-টাবি দিচ্ছ তো?"

"না-তো," হাতিদাদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার কান নড়ে না, শুঁড় দোলে না। "একদম মনেই ছিল না।" তারপর ঘড়িটা খুলে ফেলে। চাবি ঘোরাতে চেষ্টা করে। কিন্তু চাবিটা এত ছোট্ট, শুঁড় দিয়ে ঠিক ধরা যাচ্ছে না। দেখে কচ্ছপ-খুড়ো হো-হো করে হাসল। তারপর, "সবুর কর, সবুর কর," বলেই ঝোলা থেকে একটা অদ্ভুত রনচু বার করল। রনচুর হাতলটা ইয়া লম্বা। ডগাটা সুচের মত ছুঁচলো, তাতে খাঁজ কাটা।

"এই নাও হাতিদাদা, এটা দিয়ে ঘড়ির চাবি ঘোরাতে পারবে।"

হাতিদাদা রনচুটা নিয়ে তার এপাশ-ওপাশ দেখলে। তারপর ঘড়ির চাবিটা রনচুটার খাঁজের সঙ্গে জুড়ে, জল-কলের মিস্ত্রির মত "হেইও-হো হেইও-হো" বলে ঘড়িতে দম দিয়ে দিল। অদ্ভুত রনচুটা পিঠে নিয়ে কচ্ছপ-খুড়োকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে হাতিদাদা চললে আপিস হেলতে-দুলতে।

আঙ্কল্ জিরাফ তখন গোল-গোল গগল্স পড়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হাতিদাদাকে দেখে বলল, "গুড মর্নিং হাতিদাদা, কটা বাজে বলুন তো।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও, বলছি," বলেই হাতিদাদা তার সামনের ডান পা তুলে ঘড়িটা দেখতে চেষ্টা করল। অত ছোট ঘড়ি হাতিদাদা দেখতে পেলে তো? তাই আবার ঘড়িটা খুলল। শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে ঘড়িটা চোখের সামনে ধরল। ইশ্, ভেতরের লেখাগুলো এত ছোট...কী করে যে পড়া যায়...

"এই নাও," জিরাফ একটা চশমা বের করেছে, "এই চশমাটা পরে ঘড়িটা দেখে বলে দাও দিকি কটা বাজে।"

"ওহ্—ঘড়ির জন্যে চশমাটাও লাগবে দেখছি।" হাতি-দাদা চশমাটা পরলে। এতক্ষণে ঘড়ির সব লেখাই সে দেখতে পেল। তাই খুব খুশী হয়ে আঙ্কল জিরাফকে অনেক ধন্যবাদ জানালে। কিন্তু হাতিদাদা যে ঘড়ি চেনে না। জিরাফকে সময় বলবে কী করে? অনেকক্ষণ ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে হাতিদাদা বলল, "মনে হচ্ছে স্লো যাচ্ছে..., ওহ্ না-না ফাসট যাচ্ছে, ঠিক সময় বলতে পারব না ভাই।" তারপর অদ্ভুত রনচু ও ঘড়ি-দেখার চশমা পিঠে নিয়ে, আর কি দাঁড়ানো উচিত? হাতিদাদা আবার ঘড়ি পায়ে ছুটলে আপিসের দিকে।

ব্যাগ হাতে ছোট্ট খরগোশ হাফপ্যাণ্ট পরে দৌড়তে দৌড়তে চলে যাচ্ছিল। হাতিদাদার ঘড়ি দেখে দৌড়তে দৌড়তে ছুটে এল, "কটা বেজেছে?"

সব্বোনাশ! আঙ্কল জিরাফের কাছ থেকে তো কোন-মতে ছাড়া পাওয়া গেছে, এখন খরগোশকে কী বলা যায়।

"কী, হাতিদাদা, বলতে পারছ না কটা বেজেছে! ওটা কি তোমার খেলনা-ঘড়ি?"

"কী বললে?" হাতিদাদা ভীষণ চটে গেল। সত্যিকারের ঘড়িকে খেলনা-ঘড়ি বলা! "খেলনা-ঘড়ি পড়ে কি কেউ আপিস যায়?"

ছোট্ট খরগোশ তাড়াতাড়ি ঢোঁক গিলে ফেলল, বলল, "বলছিলাম কি, ঘড়িটা চলছে-তো?"

"কেন চলবে না?" হাতিদাদা ঘড়িটা খুলে কানের কাছে ধরল। ঘড়ির শব্দটা শুনতে চেষ্টা করল। হায় কপাল, হাতি-দাদার অত্তো বড় কান; ঘড়ির টিক-টিক শব্দটাই শুনতে

পেলে না। হাতিদাদা একেবারে কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল. "তাই তো, ঘড়িটা বোধহয় চলছে না। কিন্তু আমি নিজে দম দিলাম তখন রনচু দিয়ে।"

ছোট্ট খরগোশ বলল, "দেখি, আমার কানের কাছে ধর তো।"

হাতিদাদা ছোট্ট খরগোশের খাড়া-খাড়া কানের সামনে ঘড়িটা ধরল। খরগোশ হাসল, "হ্যাঁ, ঠিক চলছে। তবে শব্দটা এত আস্তে হচ্ছে হাতিদাদা, তুমি কিছুতেই শুনতে পাবে না।"

তারপর ব্যাগ থেকে একটা কানের যন্ত্র বের করল, "এই যন্তরটা কানে পরে নাও, ঘড়ির শব্দটা ঠিক শুনতে পাবে।"

"ঘড়ির জন্যে এত যন্তর, তার উপরে আবার কানের যন্তর। এ যে মহা ঝামেলা হল।" কানে যন্ত্রটা লাগিয়ে হাতিদাদা ঠিক শুনলে শব্দটা, টিক-টিক টিক-টিক...।

তারপর আবার পায়ে ঘড়ি বেঁধে অদ্ভুত রনচু, ঘড়ি-দেখার চশমা, আর কানের যন্ত্র পিঠে নিয়ে হাতিদাদা চললে আপিস হেলতে-দুলতে হেলতে-দুলতে।

খরগোশের হাত থেকে তো কোনমতে ছাড়া পাওয়া গেল। কিন্তু এরপর ফের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, কটা বেজেছে, তখন কী হবে? হাতিদাদা তখন কী উত্তর দেবে?

ঠিক তাই হল। তালগাছতলায় বসে ভাঁড়ে করে ঘেসো চা খাচ্ছিল ফতুয়া গায়ে শেয়াল-মেসো। বলল, "ও হাতি ভাই, কটা বেজেছে তোমার ঘড়িতে?"

হাতিদাদা মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল দেখে চায়ের

ভাঁড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শেয়াল-মেসো বলল, "ওহো, তুমি দেখছি ঘড়িই চেন না, এহ্।"

লজ্জায় শুঁড়ে কামড় দিয়ে হাতিদাদা বলল, "কী করে চিনতে হয়, দাও না একটু শিখিয়ে।"

তখন শেয়াল-মেসো হুক্‌হুক্ করে একটু হেসে বলল, "দেখি তো ঘড়িটা।" তারপর ঘড়িটা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে, খুব গুরুগম্ভীর মুখ করে বলল, "ওয়ান-টু পড়তে জান?"

"জানি।"

"বেশ, নামতা জান? পাঁচ-এক্কে-পাঁচ, পাঁচ-দু-গুণে-দশ...।"

"নামতা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঁচের নামতা। মিনিটের কাঁটা পাঁচ মিনিট করে এগিয়ে যায় তো, তাই বলছি—জান?"

"পাঁচের নামতা?" হাতিদাদা আমতা-আমতা করে বলল, "মনে হচ্ছে ঐ নামতাটা শিখিনি...।"

"আহ্-হা, চুক-চুক," শেয়াল-মেসো মাথা নাড়াল কিছুক্ষণ, তারপর পট্ করে ঝুলি থেকে একটা নামতার-বই বের করে বলল, "এই নাও হাতি ভাই, আগে নামতা মুখস্থ করো, তারপর ঘড়ি-পড়া শিখিয়ে দেবো।"

হায় কপাল! ঘড়ি পরার এত্তো ঝকমারি। নামতা মুখস্থ করতে হবে! আর পারিনে বাপু! এই ঝামেলা থেকে রেহাই পেলে বাঁচি।

ইস্, হাতিদাদা, ছোট্ট এত্তোটুকু একটা ঘড়ি নিয়ে কী প্রচণ্ড ফাঁপরে পড়েছে। চশমা পরে দেখ। রন্‌চু দিয়ে দম দাও। কানের যনতর দিয়ে "টিক-টিক" শোন। তার উপর আবার নামতা...। ওহ্।

যাই হোক, শেষমেষ হাতিদাদা মুখ ব্যাজার করে, আপিস আর না গিয়ে, তরমুজবনের তরমুজ খেয়ে, মনের দুঃখে রাজুদের বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল। ধুঁধুল গাছের মাচার ছায়ায় বসে, অদ্ভুত রন্‌চু, চশমা, আর কানের যন্ত্র, সব পরপর সাজিয়ে রাখল। তারপর নামতার বই খুলে শুঁড় তুলে, সুর করে পড়তে লাগল, "পাঁচ এক্কে পাঁচ,—পাঁচ দু-গুণে দশ,—তিন পাঁচে পনের...।"

এমনি করে সারা দুপুর কেটে গেল। তখন আকাশ ভরতি রুপোলী হাঁস উড়ে আসছিল। অনেক দূরে সোনালী মেঘ ভাসছিল। "সোনালী মেঘ ভেসে উঠেছে, চারটে বেজেছে, চারটে বেজেছে," বলতে বলতে হাঁসেরা উড়ে গেল।

হাতিদাদা শুধু এদিক-ওদিক তাকায়। আবার নামতা পড়ে, "পাঁচ-সাতে পঁয়তিরিশ—পাঁচ-আটে চল্লিশ...।"

কিন্তু কিছুতেই মুখস্থ হয় না। অথচ নামতা শেখা না হলে ঘড়ি চেনা যাবে না। ঘড়ি-পড়তে না জানলে আপিসের সব্বাই বলবে, "ছি-ছি, ঘড়ি পরেছ, কটা বাজে বলতে পারছ না?"

তারপর দেখতে-দেখতে চারদিকে লাল-টুকটুকে সন্ধ্যেমণি ফুলে ছেয়ে গেল। "পাঁচটা, পাঁচটা বেজেছে" বলতে বলতে প্রজাপতিরা ফুরফুর করে বেরিয়ে পড়ল। হাতিদাদা চেয়ে-চেয়ে দেখে—তারপর আবার শুঁড় তুলে সুর করে নামতা পড়ে, "চারে-পাঁচে বিশ, পাঁচে-পাঁচে পঁচিশ—।"

ঐটুকু পাঁচের নামতা শিখতে অতক্ষণ লাগে কখনো? কিন্তু হাতিদাদা যে হাতি। তার মাথাটা অতবড় হলে কী হয়, হাতির মাথা যে। কী করে ঐ মোটা মাথায় নামতা ঢুকবে।

শেষে যখন, "ছটা বেজেছে, সূর্য ডুবছে, ছটা বেজেছে," বলতে-বলতে একরাশ কাঠচড়াই মাথার ওপর দিয়ে গেল, তখন হাতিদাদা আর নামতা পড়ল না। বই বন্ধ করে, চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। আকাশে তখন একটি-দুটি করে তারা ফুটছে। তারপর সারা আকাশ ভরতি করে যখন তারা ফুটল, তখন "সাতটা বেজেছে, সাতটা বেজেছে..." বলতে বলতে জোনাকি পোকারা ঝিলমিল করে জ্বলতে শুরু করে দিল।

আর ঠিক সেই সময় রাজুদের বাড়ির ভেতর থেকে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। কে যেন কাঁদছে। কে যেন কাকে বকছে। বেত লাগাচ্ছে। আর থাকতে পারল না হাতিদাদা। রাজুদের জানলা দিয়ে শুঁড় ঢুকিয়ে দেখলে, রাজু কাঁদছে, "ও-রে, বাবা-রে, মা-রে, গেলুম-রে।" আর রাজুর বাবা বেত উঁচিয়ে বলছে, "আর করবি? আর করবি?"

"আহা-আহা, মারবেন না। ছোট্ট ছেলে, দুষ্টুমি করে ফেলেছে।"

"দুষ্টুমি বলতে দুষ্টুমি, আজ ইশকুলেই যায় নি," রাজুর বাবা বলল।

হাতিদাদা তখন দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে দুপা ঢুকে বলল, "থাক থাক, আর না, ও ঠিক কাল ইশকুলে যাবে।"

"যাবে? ঠিক যাবে?" রাজুর বাবা বেতটা আলমারির ওপর রেখে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, হাতিদাদা যখন অত করে বলছে, ছেড়ে দিলাম।" বলেই রাজুর বাবা বাইরে চলে গেল। আর রাজু অঁ-অঁ করে কাঁদতে লাগল।

হাতিদাদা কী ভালো! রাজুর পিঠে শুঁড় বুলিয়ে বলল, "কেন? ইশকুলে যাওনি কেন?" রাজু এবারে কান্না থামিয়ে বলল, "ইশকুলে তো গেছিলাম, দারোয়ান আমাকে ঢুকতে দেয়নি।"

"কেন ঢুকতে দেয়নি?"

"অনেক দেরি হয়ে গেছিল।"

"কেন দেরি হল?"

"সকালবেলা খেলতে-খেলতে কখন ইশকুলের সময় হয়ে গেছিল বুঝতে পারিনি।"

"ও," তারপর ফোঁ-ও-স্ করে একটা ইয়া লম্বা নিশ্বাস ফেলল হাতিদাদা। ছোট্ট ঘড়িটা পা থেকে খুলতে লাগল। ইস্, ঘড়ি পড়তে কিনা এত্তো ঝামেলা। ঘোড়ার লাগাম দিয়ে বাঁধো। অদ্ভুত রন্‌চু দিয়ে দম দাও। চোখে চশমা আঁটো। কানে যন্ত্র লাগাও। তার ওপর নামতা মুখস্থ কর—। দূর্, দূর্। এত ঝঞ্ঝাট কে করে। এখনি সুযোগ। রাজুকে ঘড়িটা দিয়ে ঝামেলা বিদেয় করে দিই।

"না ভাই, ঘড়িটা তুমিই নাও। ঠিক সময়ে খেলা কোরো, ঠিক সময়ে ইশকুলে যেও।" বলেই হাতিদাদা ঘড়ি, চশমা, রন্‌চু, কানের যন্ত্র, নামতা-বই সব রাজুকে দিয়ে, তারপর "আহ্ বাঁচলাম" বলতে-বলতে বনে চলে গেল। যাবার সময় পুব দিকের তালগাছের মাথায় হলদে গোল চাঁদ উঠেছে দেখে, একবার খালি বলল হাতিদাদা, "তাহলে এখন আটটা বেজেছে।"

ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা যখন বাউণ্ডুলে

পিলু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। আকাশ দেখল. মাথার ওপরে অসীম নীলাকাশ আর শীতের মিহি রোদ সারা বনভূমিতে। অনেক দূরে বনের ভেতর ওদের ছোট্ট বাড়ি. কিছু খালি জমি তারপর সড়কের ওপাশের ব্যারাক-বাড়িটা আশ্চর্যরকমের শান্ত। সে এতদূর থেকে বাবার হাঁকডাক আর বিন্দুমাত্র শুনতে পাচ্ছে না। রাতে তার বাবা ফিরে এসেছিল ভারি ভাল মানুষের মতো। সকালে সেই বাবা প্রায় যেন খাঁড়া হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ে গেছে, তার চারচারটা কাচ্চা বাচ্চা শীতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। জমিতে পালং শাক, মাচানে সীম, লাউ গাছে লাউ, এ-ভাবে যখন সবই হয়ে যাচ্ছে তখন আর পড়াশোনাটা বাদ থাকে কেন! হাঁকডাঁক শুরু হয়ে গেল বাবার, বাবাধনেরা আর বেশি ঘুমোয় না। উঠে, পড়তে বসো দেখি। কেমন ভালোমানুষের ছা, মা-জননীরে পড়ে দেখাও দেখি।

মা-জননীর ছেলেপুলেরা বেশ ছিল, এইসব কথাবার্তা শুনলে তাদের পিলে চমকে যায়। পিলু তখন ভীষণ ঘাবড়ে যায়। সব বিষয়ে বাবা তার ভারি ভাল। এমন বাউণ্ডুলে বাবা সত্যি ভূ-ভারতে কারো আছে বলে সে জানে না। দেশ ছেড়ে আসার পর বাবা তো এখানে সেখানে, যখন যেখানে খুশি চলে গেছে। একবার বাবা তাদের প্ল্যাটফরমে ফেলে কোথায় যে চলে গিয়েছিল! তিন চারদিন পর দানের নতুন কাপড়, শ্রাদ্ধের চাল-ডাল মাথায় বড় পুটলি বেঁধে যখন ফিরে এল, কে বলবে বাবা তার ঠিক সংসারী মানুষ না।

এ-ভাবে বলা নেই কওয়া নেই, কখনও চলে যেত গলসি. কখনও ধুবুলিয়া। কখনও বলে যেত, বুঝলে ধনবৌ, হাইজাদির ঘোষেরা আসানসোলে বাড়ি করেছে। বড় ঘোষের ছোট ছেলে রেলে কাজ করে। মা লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা। খোঁজ খবর করে দেখি, কম দামে কী জমি পাওয়া যায়।

একবার বাবা ছোট্ট রেলে চেপে গিয়েছিল কাপাসিয়া। দেশের রেবতী কবিরাজ যখন বাড়ি করেছে, কাছাকাছি কোথাও একটা জায়গা হয়ে যাবে। কোথাও বাবার জায়গা হয়নি, জায়গা হলেও শেষ পর্যন্ত থাকা হয়নি। পেটের ধান্ধায় ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এই বনের ভেতরে তাদের ছোট্ট বাড়ি। ভারি আশ্চর্য, সকালের রোদ কেমন সব দুঃখ ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়। তখন কেন যে বাবার মাথায় এমন একটা বদখেয়াল জেগে গেল! দাদার বইটই সব বাকসে আছে। ঠিকঠাক হয়ে না বসা পর্যন্ত বাবা বাক্স থেকে বই খুলে দেয়নি। এবং এবারে ঠিকঠাক হয়ে বসে পড়তেই বাবার বুঝি মনে পড়ে গেল, লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে। পড়া দরকার। পরীক্ষা দেওয়া দরকার।

পিলু শীতের রোদে হাঁটছিল, আর গজগজ করছিল মনে মনে। সব কিছু যার এত দরকার, তার এমন বাবা হলে চলে না! বগলে খেরো খাতা, বলা নেই কওয়া নেই যাযাবর মানুষ। খেরো খাতায় রাজ্যের মানুষের নাম-ধাম-ঠিকানা। যত চেনাজানা মানুষ দেশের, যজমান দেশের, সবার নাম ঠিকানা, কে কী-ভাবে বেঁচে আছে, খোঁজ পেলে, দু'চারদিন ঘুরে বেড়িয়ে, আর দু চারজনের আবাস নিবাসের খবর লিখে ফের বের হয়ে পড়া। কে বলবে, মানুষটার চার-পাঁচজন পুষ্যি আছে বাড়িতে! অবশ্য পিলুর এমন বাজে মানুষটাকেই বেশি পছন্দ। সে তখন সুবিধেমতো স্বাধীন কাজকর্ম করে বেড়াতে পারে। গাছের পেঁপে বিক্রি করে আসতে পারে শহরে। ঘরে পেটে দেবার মতো কিছু না থাকলে একা গভীর বনে ঢুকে যায়। হাতির দাঁতের মতো লম্বা সাদা বন-আলুর খোঁজ পেলে মা ভারি খুশি হয়। কখনও সে মাচানের সীম কুমড়ো বিক্রি করে, বাবার মতো বড় মানুষ সংসারে। বাজার হাট পর্যন্ত সব তখন তার জিম্মায়।

বাবা বাড়ি না-থাকলে পিলুর একটাই দুঃখ। রাতে গা ছম-ছম করে। বনের অন্ধকারটা পায়ে পায়ে ঢুকে যায় বাড়িটার চারপাশে। শিরীষ গাছগুলোর শরশর পাতা পড়ার শব্দ।

SONODYNE

PRESENTING AN ADVANCED ALL SILICON INTEGRATED STEREO AMPLIFIER OF LATEST INTERNATIONAL DESIGN WITH 70 WATTS MUSIC POWER OUTPUT

SC-615

ATTRACTIVE PROFESSIONAL STYLING : Housed in ultra modern low-line teak veneered cabinet SC-615 is fitted with aluminium dial with brushed aluminium finish. Combination of specially designed knobs, slide balance control and latest type lever switches gives the amplifier very sophisticated appearance **AUDIO SECTION OTL AND ITL CIRCUIT** : A quasi complementary ITL-OTL circuit gives distortion-free performance with wider range of frequency response. **ALL SILICON TRANSISTOR CIRCUIT** : High quality silicon transistors ensure long durability and satisfactory performance. High fidelity frequency response, wider frequency range, better S/N ratio, heat resistant characteristics etc. are the results of this epoch making "ALL SILICON TRANSISTOR CIRCUIT". **RIAA EQUALIZATION** : Special RIAA equalization circuit has been used which matches the response at magnetic input to within ± 1 db of the Standard RIAA curve. This results in perfect hi-fi reproduction while using magnetic cartridge.

SPECIFICATIONS

Continuous Power : (R.M.S.) At 4 Ohms load 25+25 Watts.
8 Ohms load 17.5+17.5 Watts.
Total Harmonic Distortion : Less than 0.5% at rated output.
Frequency Response : Overall 20 HZ. to 30,000 HZ.
Power Bandwidth : 25 HZ. to 20,000 HZ. Input Impedance, Sensitivity and Overload at 1 KHZ : Sensitivity Overload Impedance
Ceramic : 250 mv 2 v 300 K Ohms.
Magnetic : 3 mv 75 mv 47 K Ohms.
Tape : 100 mv 600 mv 150 K Ohms.
Tuner : 100 mv 600 mv 150 K Ohms.
Tape Recording Output : 200 mv at Din Socket Hum : Better than 50 db
Cross Talk at 1 KHZ Ceramic 45 db. or better
Magnetic 40 db. or better
Input Sockets : 5 x 5 Pin DIN for all inputs with 5 Pin DIN socket for tape replay Output Sockets : 2 x 2 Pin DIN for channel Speakers
1/4" type Socket for Headphones.

Manufactured by

অজস্র সব কীট পতঙ্গের আওয়াজ। শেয়ালেরা অন্ধকারে বাড়িটার চারপাশে ঘোরাফেরা করে।

সাঁজ লাগলেই দাদা দানের গরুটা বেঁধে রাখে তাল-পাতার ছাউনি দেওয়া ঘরটায়। মা তাড়াতাড়ি যা কিছু বাইরে থাকে সব নিয়ে আসে ঘরে। তারপর দরমার বেড়াটা দরজায় ঠেলে দেওয়া। একটা লম্ফ জ্বলে। এবং অন্ধকার আরও গভীর হলে পিলু শীতের কাঁথার ভেতর ভয়ে মুখ ঢেকে দেয়। মনে হয় সারাটা বনের সব বড় বড় গাছগুলো কেমন অশরীরী হয়ে যাচ্ছে। বড় বড় লম্বা হাত পা গজাচ্ছে। তারপর ঠাট্টা করে বরের টুপি তুলে নেবার মতো তাদের ছোট্ট ঘরটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তখনই তার বাবার ওপর অভিমানে কান্না পায়। বাড়ি ফিরে এলে এবারে ঠিক সে ভেবেছিল, বাবাকে বাল্যশিক্ষা পড়াবে।

কিন্তু পড়াবে কাকে! উল্টে তাকেই পড়তে বলছে! বাবাকে খাঁড়া হাতে ঘুরতে দেখে দাদা ভয়ে-ভয়ে পড়তে বসে গেছে। দাদা বুঝি বাবার দুঃখটা ঠিক টের পায়। আর সে তখন কুকুরের বাচ্চাটা বগলে নিয়ে দৌড়েছে মাঠে। সকাল-বেলাটাতে বাবা আর তার নাগাল পাচ্ছে না। সে বন-বাদাড়ে কিংবা বাদশাহী সড়কে, বাগদিপাড়ায় বাচ্চার মাটাকে খুঁজবে। তারপর সেই বনটার ভেতরে ঢুকে যাবে। কত সব গাছপালা, মরা ডাল, শুকনো পাতার ডাঁই আর সব বিচিত্র রঙের পাখপাখালি। কোথাও একটা বন-আলুর খোঁজ পেলে তো সাত খুন মাপ। কে কম কে বেশি, বাবা না সে, মার কাছে কার দাম বেশি, তখন ঠ্যালা সামলাবে বাবা।

গায়ে তার শীতের চাদর। বগলের নীচে কুকুরের বাচ্চাটা। বাচ্চাটাকে সে আদর করে ডাকে অবু। ওর মা'টা যে কোথায়! যতদূর চোখ যায় সে দেখে। কোনো গাছের নীচে শুয়ে থাকতে পারে। অথবা বন পেরিয়ে চলে যেতে পারে গঞ্জের দিকটাতে। সে যে কী করবে বুঝতে পারছে না। অবুর জন্য তার ভারি কষ্ট হচ্ছে। একটু দুধ খাওয়ানো দরকার। এত-গুলো লাথি খেয়ে ভারি ঝিম মেরে আছে বগলের নীচে।

সে ফের হাঁটিয়ে দেখল। না, একদম পারছে না। উলের বলের মতো শীতে ফুলে আছে। ওর ভারি কষ্ট হচ্ছিল। রাতে বাবা বলা নেই কওয়া নেই হাজির। কুকুরটা কাঁথার নীচেই গাঁক গাঁক করে উঠেছিল। বাবা বুঝতেই পারেনি বাড়িতে দানের গরুটা আসার পর একটা নেড়ি কুকুরও চলে আসতে পারে; বাবা বাড়ি না থাকলে ব্যারাক-বাড়ির সেই কানা গুণ্ডামতন লোকটাও আসতে পারে। ঠিক কী করে খবর পেয়ে যায়!

বাবা বাড়ি নেই। খাওয়া নেই ভাল মন্দ। একবেলা কোনোরকমে কিছু শাকপাতা, বন-আলু পেটে দেওয়া। রেগেমেগে একদিন পিলুর এরই মধ্যে ইচ্ছে হয়েছিল—পেট ভরে ভাত খাবে। সে কিছু পেঁপে নিয়ে গিয়েছিল শহরে। একটা দানের নতুন কাপড় বের করে দিয়েছিল মা। সব বিক্রি করে সে আর দাদা বাজার করে এনেছে। রাতে কলাপাতায় ভাত মাছ, আর কী সুগন্ধ দিল ধনেপাতার। লম্ফ জ্বেলে দিয়েছিল মা। মায়া আর ছোট ভাইটা খুশি মনে খাচ্ছিল। বেশ উৎসবের মতো। মার চোখ বেশ বড় বড় দেখাচ্ছিল। তখন বনের ভেতর থেকে সেই বিদঘুটে অন্ধকারটা এগিয়ে আসছে। উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে যেতেই মা আঁতকে উঠল। পিলু দেখল ভুতুড়ে অন্ধকারটার চোখে জোনাকি পোকা জ্বলছে! কে যেন বলছে—ঠাকুরমশাই বাড়ি আছেন?

দাদা বলেছিল, না নেই। বাবা এলে বলব।

ওদের নিরিবিলি সংসারে চোর ছ্যাঁচড়রাও ভারি উৎপাত আরম্ভ করেছে। পিলু ঠিক টের পায়। সে সারারাত ঘুমোতে পারেনি। সকালে বের হয়ে গেছিল। ফিরেছে বিকেলে।

মা বলেছিল, তাই বলে এমন দুধের ছা। বাঁচবে না বাবা. দিয়ে আয়।

পিলুর গোয়ার্তুমিতে দাদা ভারি ভয় পায়। মাও পায়। সকাল দুপুর বিকেল, পিলুর কাজ হয়ে গেছে মা'টাকে খুঁজে দুধ খাওয়ানো! তারপর শীতের রাতে কিছু নড়ে উঠতেই যখন অবু বাঘের মতো একদিন ডেকে উঠল, পিলুর কী আনন্দ!—এবার এবার! বাবা না থাকলে সংসারে কেউ উৎপাত করতে এলেই লেলিয়ে দেবে। সে বেশ নিশ্চিন্তই ছিল, কিন্তু কেউ তো আর এল না! তখন কিনা রাতে বিনা নোটিশে নিজের বাবাই হাজির। আর যায় কোথায়! বাচ্চাটা কাঁথার ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়েছে নীচে। দরজায় দু পা তুলে গাঁক গাঁক করে তেড়ে গেছে বাবাকে।

বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ গলায় বলেছে. তোমার সংসারে এ আবার কী আপদ জোটালে ধনবৌ!

বাবার গলা পেয়ে মা বলেছে, থাম থাম! খুব হয়েছে। তাড়াতাড়ি লম্ফ জেলে প্রায় বাণিজ্য সেরে ফিরে আসা সওদাগরের মতো বাবাকে বলেছে, গিয়ে পর্যন্ত না একটা চিঠি, না কোনো খবর!

বাবা কিছুই শুনছে না। কুকুরটার দিকে ভিতু বালকের মতো তাকিয়ে বলছে, ও ধনবৌ, তোমার নতুন অতিথিকে সামলাও।

পিলু তখন এক লাফে মাচান থেকে নেমে অবুকে বুকে তুলে নিয়েছিল। বলেছিল, কিছু করবে না। এস। এস না!

বাবা ঠিক পিলুর কথায় ভরসা পাচ্ছিল না। যা দাপাচ্ছে! যেন কতদিন পর যা হোক একজন চোর ছ্যাঁচড় পাওয়া গেল। বীরত্ব ফলাবার যা হোক একটা বিশ্বাসী কাজটাজও হয়ে যাবে। পিলু কিছুতেই বশে আনতে পারছিল না। হেড়ে গলায় কী চেঁচাচ্ছে!

মা বলেছিল, কী তেজ!

পিলু বলেছিল, পা নামিয়ে বোসো বাবা। কিছু করবে না।

কুকুরটা কোল থেকে তখন নীচে। আর তিড়িং তিড়িং করে যেন নাচছিল। কখনও লাফাচ্ছিল, কখনও তার বাবাকে তেড়ে যাচ্ছিল। কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না। পিলুর ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল, আবার নিরানন্দও কম না। বাবাকে চিনতে এত সময় লাগছে— কী যে হবে!

সে ফের কুকুরটাকে কোলে নিয়ে বাবার কাছে গিয়েছিল। —আমার বাবা, মা কালীর দিব্যি, আমার বাবা। তুমি ওকে একটু আদর কর না! কিন্তু বাবা তেমনি ভিতু বালকের মতো বসে আছে। হাত বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না। পিলু কী যে করে! সে ফের অবুকে বলেছিল, আমার বাবা, দাদার বাবা, মায়ার বাবা, ভাইটার বাবা।

দাদা কাঁথার ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে বলেছিল, হ্যাঁরে আমাদের বাবা।

বাবা শেষ পর্যন্ত বুঝি ঘাবড়ে গিয়ে বলে ফেলল, সত্যি আমি ওদের বাবা হই। আর এত কথার পরও যখন বিশ্বাস করল না অবুর তখন নির্ঘাৎ বেয়াদপি অপরিসীম। কষে মাজায় সবেগে লাথি। উলের ছোট্ট নীল বলের মতো কিছু ঘুরপাক, তারপর কুণ্ডলীবৎ এক কোণে কিছু কাউ মাউ শব্দ। হেড়ে গলায় পিলু চিৎকার করে বলেছিল, আমার বাবা হয় বলছি, একদম মেজাজ দেখাবে না।

বাবা যেন ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বলেছিল, আহা, ওটার কী দোষ! বাড়িতে থাকতে

পারি না, কখন যাই আসি কেউ টের পায় না। ও তো চোর ছ্যাঁচড় ভাববেই।

সেই বাবা সকালে উঠে এই! কী গলা! চেঁচাচ্ছিল—কেবল খাবে ঘুমোবে, বন বাদাড়ে ঘুরবে, পড়বে না! না পড়লে হাঁড়িতে ভাত চড়বে না! কে তোমাদের ভাত দেয় দেখি! ও ধনবৌ, ছেলেরা তোমার কি সব শীতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রা করে না কেন! সকাল হয় না! সূর্য ওঠে না। পড়তে বসে না কেন? ওরা কি সব লাটের ব্যাটা হয়ে গেল!

পিলু কাঁথামুড়ি দিয়ে সব শুনছিল। কী ঠাণ্ডা! সব একেবারে যেন হিম হয়ে আছে। সকাল হতে না হতেই, পড়ার কথা! সারা রাত তো দেশের কোন এক বড়লোক সীম বাড়ি ধনেপাতা দিয়ে পাবদা মাছের ঝোল খাইয়েছে, মায়ের সঙ্গে সেই গল্প। কতকাল পর পাবদা মাছ, এবং ঝোলের কথা শুনতে শুনতেই পিলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে উঠে সেই মানুষ এমন বাবা হয়ে যায় কেন ভগমান!

কুকুরের বাচ্চাটাকে পিলু তখন কাঁথার নীচে খুঁজছে। অবুকে ওর মা'টার দুধ খাওয়ানো দরকার। লাথি খেয়ে কখন সব হজম হয়ে গেছে। বাবাকে কামড়ে দিলেই ভাল ছিল! কেন যে সে মারতে গেল অবুকে! ঠিক তখন শোধ নেবে বলে ডেকেছিল অ...বু। কোনো সাড়া নেই। কাছে পিঠে কোথাও নেই। বাবাকে লেলিয়ে দেবে। বাবা ভয় পেলে বেশ মজা হবে। আবার সেই ভিতু বালকের মতো চোখ, গলার জোর তখন একদম থাকবে না। বলবে, সত্যি আমি ওদের বাবা হই।

আর শীতের কাঁথা মুখ থেকে সরাতেই সে ট্যারা। বাবার পায়ে পায়ে খোঁড়া অবু খেলা করছে। মেজাজটা ওর নিমেষে ভারি রুক্ষ হয়ে গেল। আসল মানুষের খোঁজ পেয়ে তাকে একদম পাত্তা দিচ্ছে না। বেইমান। গোনাগুনতি একটা লাথি না, গোনাগুনতি দরকার চার-চারটা লাথি। চারটা পা'ই তবে খোঁড়া করে দিতে পারবে।

তখন সে মাঠের ভেতর খুঁজছে ওর মা'টাকে। সে আবার হেঁটে যেতে থাকল। মাঠে নামিয়ে সে এই কিছুক্ষণ আগে গোনাগুনতি বাকি তিনটে লাথি মেরেছিল। তারপর কেন যে সে অবুর চোখে জল দেখতে পেল। ওটা বুঝি পিলুকে বলছিল, পিলুদা আমায় তুমি মারলে কেন? তুমিই তো বলেছ, তোমার বাবা। বাবাকে মান্য করতে হয়। সকালে বাবাকে মান্য করছিলুম। তুমি আমাকে মারলে!

পিলু সত্যি ভারি কষ্টের ভেতর পড়ে গেছে। রাতে খায়নি কিছু, দুধের বাচ্চা। সারা দিনমান, সূর্য অস্ত গেলেও তার খুঁজে বের করা দরকার অবুর মাকে। সে শীতের সকালে অবুকে বুকে নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে—কোথায় যে গেল! কোনো গাছের নীচে, অথবা শীতের মাঠে শুয়ে থাকতে পারে। সে খুঁজে বেড়াল। পেল না। সড়কের ও-পাশে, ব্যারাক-বাড়িতে, যদি বনের ও-পাশে গঞ্জের মতো জায়গাটায় চলে যায়! বনটা পার হতে তার ভারি ভয় করছে। ঢুকলেই সাঁজ লেগে যাবে। সে পথ হারিয়ে ফেলবে, আর সেই বড় বড় গাছেরা ভূতের মতো হাত পা বাড়িয়ে গাছের মগডালে তুলে নিলে কী যে হবে! তবু সে অবুকে বুকে নিয়ে হাঁটছে। ভয় পেলে বলছে, ভগমান, ওর মা'টা কোথায় তুমি জানো? সারাটা দিন না খেয়ে আছে। কী কষ্ট বলো!

ছবি এঁকেছেন মদন সরকার